রবীন্দ্র-নাট্যে নারী

পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

২০১৩

মোছাঃ মাহফুজা সুলতানা হিলালী

রেজি. ৮০/২০০৮-২০০৯

Dhaka University Institutional Repository

ড. সৌমিত্র শেখর
অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ফোন : ০১৭৩২-১০২১০৩

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মোছাঃ মাহফুজা সুলতানা হিলালী, আমার তত্ত্বাবধানে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করার জন্য 'রবীন্দ্র-নাট্যে নারী' শীর্ষক বর্তমান গবেষণা-অভিসন্দর্ভটি রচনা করেছে। আমার জানা মতে, এই অভিসন্দর্ভের কোনো পরিচ্ছেদ এর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো প্রকার ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত হয় নি অথবা এর অংশ-বিশেষ অন্য কোথাও ইতঃপূর্বে প্রকাশিত হয় নি বা প্রকাশ করার জন্য জমা দেওয়া হয় নি। আমি অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সমীপে উপস্থাপনের জন্য অনুমোদন করছি।

(ড. সৌমিত্র শেখর)

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) সাহিত্যের সব শাখাতেই উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। তাঁর নাট্যসাহিত্য বিপুল ও বিরাট সম্ভাবনাময়। এই নাট্যসমূহে বিভিন্ন চরিত্রের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নারীকে স্থাপন করেছেন জীবনের কেন্দ্রে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীচরিত্র সৃষ্টিতে সমাজবাস্তবতার বৃত্ত ভেঙেছেন; আবার বৃত্তাবদ্ধও হয়েছেন তিনি। তবে কয়েকটি নারীর চিন্তা-চেতনা সময়ের চেয়ে এগিয়ে। নাটকে রবীন্দ্রসৃষ্ট নারীচরিত্রগুলোর এধরনের রূপরেখা ও স্বভাববৈশিষ্ট্য সম্যকভাবে পরীক্ষার জন্য গবেষণার বিষয় হিসেবে আমি ২০০৯ সালে 'রবীন্দ্র-নাট্যে নারী' শীর্ষক শিরোনাম নির্বাচন করি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ. ডি. গবেষণার জন্য সার-সংক্ষেপ জমা দিই। এরপর বাংলা বিভাগ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি. বিষয়ক গবেষণার উচ্চতর কমিটি আমাকে উক্ত শিরোনামে পিএইচ. ডি. গবেষণার অনুমতি প্রদান করে। উল্লেখ্য, ২০০৮ সালে আধুনিক কথাসাহিত্যের ওপর গবেষণা করে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই এম. ফিল. ডিগ্রি অর্জন করি।

এই অভিসন্দর্ভ রচনায় আমি অনেকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা পেয়েছি। গবেষণাটি সার্বিকভাবে সমস্ত বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ তত্ত্বাবধানের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখরকে। তাঁর দিক নির্দেশনা, সুচিন্তিত মূল্যায়ন-পরামর্শ এ অভিসন্দর্ভ রচনার মূল চালিকাশক্তি। তিনি অসীম ধৈর্যের সঙ্গে গবেষণাকর্ম সংশোধন এবং বিভিন্ন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর এ ঋণ অপরিশোধ্য। গবেষণা ও বিষয়-বিশ্লেষণে সুচিন্তিত মতামত দিয়ে সাহায্য করেছেন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. গোলাম মুরশিদ এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, বর্তমানে উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) ড. আফসার আহমদ। গবেষণায় উৎসাহ দিয়েছেন সরকারী আনন্দমোহন কলেজের সহযোগী অধ্যাপক আয়েশা আফরোজ।

আমাকে পিএইচ. ডি. গবেষণার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন আমার বাবা মোঃ গোলাম মোস্তফা হিলালী। তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি রইল। প্রতিটি সময় পাশে থেকেছেন আমিনুর রহমান মুকুল, আমার তিন ভাইবোন এবং আমার সন্তান টইটই। সাহায্য করেছেন নাট্যজন আতাউর রহমান।

গবেষণা কাজে আমি ব্যক্তিগত সংগ্রহ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি, বাংলা একাডেমি লাইব্রেরি, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি ইত্যাদি ব্যবহার করেছি। এছাড়া বই সংগ্রহ করে সাহায্য করেছেন পিএইচ. ডি. গবেষক মিলন রায় এবং বাংলা একাডেমির কর্মকর্তা খোরশেদ আলম। প্রতিনিয়ত আশীর্বাদে সিক্ত করেছেন আমার মা মমতাজ

মহল। আরো যাঁদের সহায়তা পেয়েছি স্বল্প পরিসরে তাদের নাম উল্লেখ সম্ভব হলো না। সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

–মোছাঃ মাহফুজা সুলতানা হিলালী

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রস্তাবনা	১
প্রথম অধ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মানসগঠন	৪
দ্বিতীয় অধ্যায় সমকালীন নাটক এবং রবীন্দ্রনাথ	৫২
তৃতীয় অধ্যায় রবীন্দ্র-নাট্যের বিষয়ভিত্তিক শ্রেণিকরণ	৭৪
চতুর্থ অধ্যায় রবীন্দ্র-নাট্যে নারীচরিত্র : সৃজন ও বিশ্লেষণ	৯৪
পঞ্চম অধ্যায় রবীন্দ্র-নাট্যে নারীচরিত্র : পারস্পরিক তুলনা	২১৫
উপসংহার	২৫৬
পরিশিষ্ট। ১	২৬০
পরিশিষ্ট। ২	২৬২
পরিশিষ্ট। ৩	২৭৫

Dhaka University Institutional Repository

অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্ট

রবীন্দ্র-নাট্যে নারী

পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগেউপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

২০১৩

মোছাঃ মাহফুজা সুলতানা হিলালী

রেজি. ৮০/২০০৮-২০০৯

তত্ত্বাবধায়ক : ড. সৌমিত্র শেখর, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) বাংলা সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ লেখক। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতিটি শাখাকে তিনি সমৃদ্ধ করেছেন, দিয়েছেন নতুন মাত্রা। এ মহৎকর্ম সম্পাদন করার পেছনে নিজের শিক্ষা, পারিবারিক ঐতিহ্য, সামাজিক অঙ্গীকার ইত্যাদি অন্তঃসলিলার মতো কার্যকর ছিল। ভারতবর্ষের প্রাচীন দর্শনসমূহ ও লোকসংস্কৃতিকেও তিনি নিজের অভিজ্ঞতা ও বোধের আলোকে জারিত করে আধুনিক বা নবরূপায়ণের মাধ্যমে উন্মোচন করেছেন নতুন দিগন্ত। একইভাবে তিনি পাশ্চাত্যের বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার থেকেও উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। তাঁর রচিত নাটকে এর উদাহরণ রয়েছে। নাটকের কাহিনি এবং চরিত্রচিত্রণে বিভিন্ন নিরীক্ষা করেছেন তিনি। বৈচিত্র্যময় কাহিনির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ চিত্রিত করেছেন নারী, পুরুষ ও শিশুচরিত্র। এ চরিত্রগুলোর মধ্যে বক্তব্য ও উপস্থাপনায় নানা মাত্রা পরিলক্ষিত হয়। তবে রবীন্দ্র-সৃষ্ট অধিকাংশ নারীচরিত্রই নবতর উপস্থাপনায় বাঙ্ময়। চিত্রাঙ্গদা, অপর্ণা, নন্দিনী, অমাবাই ইত্যাদি চরিত্র সে সাক্ষ্য বহন করছে। তাঁর ৫৩টি নাটকে প্রায় ১৯০টি নারী চরিত্র রয়েছে। যাদের প্রায় প্রত্যেকেই মনস্তত্ত্ব ও দর্শনগত দিক দিয়ে অনন্য। সঙ্গত কারণে চরিত্রগুলো যুগোত্তীর্ণ হয়েছে।

রবীন্দ্রনাট্যবীক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে, রবীন্দ্র-সৃষ্ট নারীচরিত্রসমূহ বিশ্লেষণ। রবীন্দ্রনাথ নারীকে তার স্বসময় থেকে যেমন দেখেছেন, তেমনি স্বসময়ের আগে ও পরে থেকেও দেখেছেন। অর্থাৎ রবীন্দ্রভাবনায় নারী তিনটি কালেই উঠে এসেছে। অন্য দিকে নারীচরিত্রসমূহ অন্য চরিত্রাবলি, বিশেষ করে পুরুষচরিত্রাবলি সাপেক্ষেও অবস্থিতি গ্রহণ করেছে। যে সময় নারীস্বাধীনতার কথা সার্বিকভাবে ভাবনার অবকাশই পাওয়া যায় নি বাঙালি সমাজে, সে সময় রবীন্দ্রনাথ নারীকে কীভাবে দেখেছেন, কেমনই-বা ছিল তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি? সামন্তপরিবারের একজন পুরুষ হয়ে রবীন্দ্রনাথ নারীকে কতটুকু স্বাধীনতা দিতে চেয়েছেন– এ সবই উঠে এসেছে বর্তমান গবেষণায়। স্মরণ করা যেতে পারে নিজ নাটকে রবীন্দ্র-সৃষ্ট চরিত্রাবলি: *বাল্মীকি প্রতিভায়* নারীচরিত্রগুলো, বালিকা, দেবী সরস্বতী, দেবী লক্ষ্মী; *প্রকৃতির প্রতিশোধএর* বালিকা; *রাজা ও রানীতে* নারীচরিত্র সুমিত্রা, ইলা; *বিসর্জনএ* অপর্ণা, গুণবতী; *বিদায় অভিশাপএ* দেবযানী; *চিত্রাঙ্গদায়* চিত্রাঙ্গদা; *মালিনীতে* মালিনী, মহিষী; *গান্ধারীর আবেদনএ* গান্ধারী; *পতিতা* নাটকে পতিতা নারী; *লক্ষ্মীর পরীক্ষায়* রানি কল্যাণী, ক্ষীরো; *সতী* নাটকে অমাবাই, রমাবাই; *কর্ণ-কুন্তী-সংবাদএ* কুন্তী; *প্রায়শ্চিত্তএ* বিভা, সুরমা, বামী; *রাজায়* সুরঙ্গমা, সুদর্শনা; *গৃহপ্রবেশএ* মাসী, মণি, হিমি; *নটীর পূজায়* শ্রীমতী, লোকেশ্বরী, মল্লিকা; *রক্তকরবীএ* নন্দিনী, চন্দ্রা; *তপতীতে* সুমিত্রা, বিপাশা; *চণ্ডালিকায়* প্রকৃতি, মা; *তাসের দেশএ* রানীবিবি; *বাঁশরীএ* বাঁশরী; *যোগাযোগএ* কুমুদিনী, মতির মা; *মুক্তির উপায়এ* পুষ্প; *শ্যামায়* শ্যামা ইত্যাদি।

একথা লেখা বাহুল্য হবে না যে, রবীন্দ্রনাট্যের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য চরিত্র-সৃষ্টি; বিশেষ করে নারীচরিত্রসৃষ্টি। পরাধীন ভারতবর্ষে মধ্যবিত্তের মনে যখন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যই গড়ে ওঠে নি, তখন তিনি তাঁর নাটকে চরিত্রাবলিতে

'ব্যক্তিত্ব' প্রয়োগ করেছিলেন। এ বোধটিই বাংলা নাট্যে নতুন। আর নারীকে যখন তিনি স্থাপন করেছিলেন কেন্দ্রে এবং একের পর এক তা করেই যাচ্ছিলেন– সেটা ছিল রীতিমতো বিপ্লব! তিনি দেখিয়েছিলেন নারীর অন্তর্গত শক্তি ও সম্ভাবনা। সমাজে বিভিন্ন সম্পর্কে নারী সংযুক্ত হয়েও তারা নিজ নিজ অবস্থান থেকে নিজস্ব শক্তি ও সম্ভাবনায় বিকশিত হয়েছেন রবীন্দ্রনাথের নাটকে। ১৯৩৬ সালে লেখা 'নারী' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আশা প্রকাশ করেছেন এভাবে–

> সভ্যতাসৃষ্টির নূতন কল্প আশা করা যাক। এ আশা যদি রূপ ধারণ করে তবে এবারকার এই সৃষ্টিতে মেয়েদের কাজ পূর্ণ পরিমাণে নিযুক্ত হবে সন্দেহ নেই। নবযুগের এই আহ্বান আমাদের মেয়েদের মনে যদি পৌঁছে থাকে তবে তাঁদের রক্ষণশীল মন যেন বহু যুগের অস্বাস্থ্যকর আবর্জনাকে একান্ত আসক্তির সঙ্গে বুকে চেপে না ধরে। তাঁরা যেন মুক্ত করেন হৃদয়কে, উজ্জ্বল করেন বুদ্ধিকে, নিষ্ঠা প্রয়োগ করেন জ্ঞানের তপস্যায়। মনে রাখেন, নির্বিচার অন্ধরক্ষণশীলতা-সৃষ্টিশীলতার বিরোধী। সামনে আসছে নূতন সৃষ্টির যুগ। সেই যুগের অধিকার লাভ করতে হলে মোহমুক্ত মনকে সর্বতোভাবে শ্রদ্ধার যোগ্য করতে হবে, অজ্ঞানের জড়তা এবং সকলপ্রকার কাল্পনিক ও বাস্তবিক ভয়ের নিম্নগামী আকর্ষণ থেকে টেনে আপনাকে উপরের দিকে তুলতে হবে। ফললাভের কথা পরে আসবে– এমন-কি, না আসতেও পারে– কিন্তু যোগ্যতা-লাভের কথা সর্বাগ্রে।

অনুসন্ধানীদের মনে প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক, রবীন্দ্রনাথের নারী সম্পর্কে এই বোধ কোথা থেকে এসেছিলো, কোন কারণেইবা রবীন্দ্রমানস উদার এবং নারীর প্রতি অধিকার সচেতন হয়েছিলো? তাছাড়া তিনি তাঁর সৃষ্ট নারীচরিত্রে এর প্রয়োগ কতোটা করেছিলেন? কোন বোধ তাঁর নারীচরিত্রে বেশি প্রকাশিত হয়েছিলো, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রগুলোর কী কী পরিবর্তন হয়েছে, শেষ পর্যন্ত তিনি কোনো বোধে স্থির হয়েছিলেন কি-না? –এসবই তাঁর সৃষ্ট নারীচরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাস্য। বর্তমান অভিসন্দর্ভে উপরিউক্ত জিজ্ঞাসাসমূহকে নানাভাবে বিবেচনায় রাখা হয়েছে এবং রবীন্দ্রসৃষ্ট নারীচরিত্রসমূহ গভীরভাবে পরীক্ষা করে তুলে ধরা হয়েছে পর্যবেক্ষণসমূহ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তাবনা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) বাংলা সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ লেখক। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতিটি শাখাকে তিনি সমৃদ্ধ করেছেন, দিয়েছেন নতুন মাত্রা। এ মহৎকর্ম সম্পাদন করার পেছনে নিজের শিক্ষা, পারিবারিক ঐতিহ্য, সামাজিক অঙ্গীকার ইত্যাদি অন্তঃসলিলার মতো কার্যকর ছিল। ভারতবর্ষের প্রাচীন দর্শনসমূহ ও লোকসংস্কৃতিকেও তিনি নিজের অভিজ্ঞতা ও বোধের আলোকে জারিত করে আধুনিক বা নবরূপায়ণের মাধ্যমে উন্মোচন করেছেন সেখানে নতুন দিগন্ত। একইভাবে তিনি পাশ্চাত্যের বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার থেকেও উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। তাঁর রচিত নাটকে এর উদাহরণ রয়েছে। নাটকের কাহিনি এবং চরিত্রচিত্রণে বিভিন্ন নিরীক্ষা করেছেন তিনি। বৈচিত্র্যময় কাহিনির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ চিত্রিত করেছেন নারী, পুরুষ ও শিশুচরিত্র। এ চরিত্রগুলোর মধ্যে বক্তব্য ও উপস্থাপনায় নানা মাত্রা পরিলক্ষিত হয়। তবে রবীন্দ্র-সৃষ্ট অধিকাংশ নারীচরিত্রই নবতর উপস্থাপনায় বাঙ্ময়। চিত্রাঙ্গদা, অপর্ণা, নন্দিনী, অমাবাই ইত্যাদি চরিত্র সে সাক্ষ্য বহন করছে। তাঁর ৫৩টি নাটকে প্রায় ১৯০টি নারী চরিত্র রয়েছে। যাদের প্রায় প্রত্যেকেই মনস্তত্ত্ব ও দর্শনগত দিক দিয়ে অনন্য। সঙ্গত কারণে চরিত্রগুলো যুগোত্তীর্ণ হয়েছে।

রবীন্দ্রনাট্যবীক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে, রবীন্দ্র-সৃষ্ট নারীচরিত্রসমূহ বিশ্লেষণ। রবীন্দ্রনাথ নারীকে তার স্বসময় থেকে যেমন দেখেছেন, তেমনি স্বসময়ের আগে ও পরে থেকেও দেখেছেন। অর্থাৎ রবীন্দ্রভাবনায় নারী তিনটি কালেই উঠে এসেছে। অন্য দিকে নারীচরিত্রসমূহ অন্য চরিত্রাবলি, বিশেষ করে পুরুষচরিত্রাবলি সাপেক্ষেও অবস্থিতি গ্রহণ করেছে। যে সময় নারীস্বাধীনতার কথা সার্বিকভাবে ভাবনার অবকাশই পাওয়া যায় নি বাঙালি সমাজে, সে সময় রবীন্দ্রনাথ নারীকে কীভাবে দেখেছেন, কেমনই-বা ছিল তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি? সামন্তপরিবারের একজন পুরুষ হয়ে রবীন্দ্রনাথ নারীকে কতটুকু স্বাধীনতা দিতে চেয়েছেন– এ সবই উঠে এসেছে বর্তমান গবেষণায়। স্মরণ করা যেতে পারে নিজ নাটকে রবীন্দ্র-সৃষ্ট চরিত্রাবলি: *বাল্মীকি প্রতিভায়* নারীচরিত্রগুলো, বালিকা, দেবী সরস্বতী, দেবী লক্ষ্মী; *প্রকৃতির প্রতিশোধ*এর বালিকা; *রাজা ও রানী*তে নারীচরিত্র সুমিত্রা, ইলা; *বিসর্জন*এ অপর্ণা, গুণবতী; *বিদায় অভিশাপ*এ দেবযানী; *চিত্রাঙ্গদায়* চিত্রাঙ্গদা; *মালিনী*তে মালিনী, মহিষী; *গান্ধারীর আবেদন*এ গান্ধারী; *পতিতা* নাটকে পতিতা নারী; *লক্ষ্মীর পরীক্ষায়* রানি কল্যাণী, ক্ষীরো; *সতী* নাটকে অমাবাই, রমাবাই; *কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ*এ কুন্তী; *প্রায়শ্চিত্ত*এ বিভা, সুরমা, বামী; *রাজায়* সুরঙ্গমা, সুদর্শনা; *গৃহপ্রবেশ*এ মাসী, মণি, হিমি; *নটীর পূজায়* শ্রীমতী, লোকেশ্বরী, মল্লিকা; *রক্তকরবী*এ নন্দিনী, চন্দ্রা; *তপতী*তে সুমিত্রা, বিপাশা; *চণ্ডালিকায়* প্রকৃতি, মা;

*তাসের দেশ*এ রানীবিবি; *বাঁশরী*এ বাঁশরী; *যোগাযোগ*এ কুমুদিনী, মতির মা; *মুক্তির উপায়*এ পুষ্প; *শ্যামায়* শ্যামা ইত্যাদি।

একথা লেখা বাহুল্য হবে না যে, রবীন্দ্রনাট্যের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য চরিত্র-সৃষ্টি; বিশেষ করে নারীচরিত্রসৃষ্টি। পরাধীন ভারতবর্ষে মধ্যবিত্তের মনে যখন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যই গড়ে ওঠে নি, তখন তিনি তাঁর নাটকে চরিত্রাবলিতে 'ব্যক্তিত্ব' প্রয়োগ করেছিলেন। এ বোধটিই বাংলা নাট্যে নতুন। আর নারীকে যখন তিনি স্থাপন করেছিলেন কেন্দ্রে এবং একের পর এক তা করেই যাচ্ছিলেন– সেটা ছিল রীতিমতো বিপ্লব! তিনি দেখিয়েছিলেন নারীর অন্তর্গত শক্তি ও সম্ভাবনা। সমাজে বিভিন্ন সম্পর্কে নারী সংযুক্ত হয়েও তারা নিজ নিজ অবস্থান থেকে নিজস্ব শক্তি ও সম্ভাবনায় বিকশিত হয়েছেন রবীন্দ্রনাথের নাটকে। ১৯৩৬ সালে লেখা 'নারী' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আশা প্রকাশ করেছেন এভাবে–

> সভ্যতাসৃষ্টির নূতন কল্প আশা করা যাক। এ আশা যদি রূপ ধারণ করে তবে এবারকার এই সৃষ্টিতে মেয়েদের কাজ পূর্ণ পরিমাণে নিযুক্ত হবে সন্দেহ নেই। নবযুগের এই আহ্বান আমাদের মেয়েদের মনে যদি পৌঁছে থাকে তবে তাঁদের রক্ষণশীল মন যেন বহু যুগের অস্বাস্থ্যকর আবর্জনাকে একান্ত আসক্তির সঙ্গে বুকে চেপে না ধরে। তাঁরা যেন মুক্ত করেন হৃদয়কে, উজ্জ্বল করেন বুদ্ধিকে, নিষ্ঠা প্রয়োগ করেন জ্ঞানের তপস্যায়। মনে রাখেন, নির্বিচার অন্ধরক্ষণশীলতা-সৃষ্টিশীলতার বিরোধী। সামনে আসছে নূতন সৃষ্টির যুগ। সেই যুগের অধিকার লাভ করতে হলে মোহমুক্ত মনকে সর্বতোভাবে শ্রদ্ধার যোগ্য করতে হবে, অজ্ঞানের জড়তা এবং সকলপ্রকার কাল্পনিক ও বাস্তবিক ভয়ের নিম্নগামী আকর্ষণ থেকে টেনে আপনাকে উপরের দিকে তুলতে হবে। ফললাভের কথা পরে আসবে– এমন-কি, না আসতেও পারে– কিন্তু যোগ্যতা-লাভের কথা সর্বাগ্রে।[১]

অনুসন্ধানীদের মনে প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক, রবীন্দ্রনাথের নারী সম্পর্কে এই বোধ কোথা থেকে এসেছিলো, কোন কারণেইবা রবীন্দ্রমানস উদার এবং নারীর প্রতি অধিকার সচেতন হয়েছিলো? তাছাড়া তিনি তাঁর সৃষ্ট নারীচরিত্রে এর প্রয়োগ কতোটা করেছিলেন? কোন বোধ তাঁর নারীচরিত্রে বেশি প্রকাশিত হয়েছিলো, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রগুলোর কী কী পরিবর্তন হয়েছে, শেষ পর্যন্ত তিনি কোনো বোধে স্থির হয়েছিলেন কি-না? –এসবই তাঁর সৃষ্ট নারীচরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাস্য। বর্তমান অভিসন্দর্ভে উপরিউক্ত জিজ্ঞাসাসমূহকে নানাভাবে বিবেচনায় রাখা হয়েছে এবং রবীন্দ্রসৃষ্ট নারীচরিত্রসমূহ গভীরভাবে পরীক্ষা করে তুলে ধরা হয়েছে পর্যবেক্ষণসমূহ।

তথ্যনির্দেশ:

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নারী, কালান্তর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৪১০, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৬২৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মানসগঠন

মানুষের মানসগঠন শুরু হয় শিশু অবস্থা থেকেই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৮৪১)ও এর ব্যতিক্রম নন। তাঁদের বাড়িকে বলা যায় সাহিত্য-সংস্কৃতির তীর্থক্ষেত্র। জন্মগতভাবেই পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬) এবং পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৯১৭-১৯০৫) বৈশিষ্ট্য তাঁর ভিতরে সঞ্চারিত হয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলো পারিবারিক পরিবেশ : মুক্তচিন্তা এবং মুক্তচর্চা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পঠিত প্রথম কবিতা– 'জল পড়ে পাতা নড়ে'। 'কল', 'খল'– এরূপ বানান শেখার পরই তাঁর কবিতা পাঠ শুরু হয়। এই কবিতা পড়তে পড়তে কবিতার ছন্দ তাকে দোলা দেয়। কবিতার মিলটা কানের সঙ্গে মনের সঙ্গে খেলা করতে থাকে। প্রথমদিন কবিতা পড়া সম্পর্কে তিনি *জীবনস্মৃতি*তে লিখেছেন :

> এমনি করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া সেদিন আমার সমস্ত চৈতন্যের মধ্যে জল পড়িতে ও পাতা নড়িতে লাগিল।[১]

– এ কথায় বোঝা যায় ছন্দের যাদু তাঁকে ছোট থেকেই মোহাচ্ছন্ন করেছিলো। তাঁদের বাড়ির খাজাঞ্চি ছিলো কৈলাশ মুখুজ্যে। এই কৈলাস মুখুজ্যে রবীন্দ্রনাথকে শিশুকালে অতি দ্রুতবেগে মস্ত একটা ছড়ার মতো বলে তাঁর মনোরঞ্জন করতো। এই ছড়ার দ্রুত উচ্চারিত শব্দচ্ছটা এবং ছন্দের দোলা রবীন্দ্রনাথের মনকে মাতিয়ে দিতো। শিশুকালের সাহিত্যরসভোগের আরেকটি কথা তিনি বলেছেন, সে হলো– 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদে এল বান' ছড়াটির কথা। এই ছড়াটিকে তিনি বলেছেন, 'শৈশবের মেঘদূত'। এতে বোঝা যায় শিশুকালেই তিনি ছন্দের প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হন। একবার ফোর্ট উইলিয়ামের প্রকাশিত বাংলা অক্ষরে ছাপা *গীতগোবিন্দ* তাঁর হাতে আসে। তিনি বারবার তা পড়েছিলেন। এর অর্থ যে তিনি বুঝতেন তা নয়, তবে এর ছন্দ তাঁর মনের ভিতরে আলোড়ন তুলেছিলো। আর একটু বড় হলে *কুমারসম্ভবের* শ্লোকও তাঁকে মুগ্ধ করে। সমস্ত জীবন তিনি ছন্দের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। প্রকৃতির ছন্দের প্রতি ছিলো তাঁর নিবিড় টান। বড় হয়ে সন্ধ্যায় ছাদে দাঁড়িয়ে নক্ষত্রলোকের দিকে চেয়ে রম্যবীণা শুনেছেন, নদীর বুকে ভাসতে ভাসতে তিনি ছন্দ আবিষ্কার করেছেন, বাতাসের ঢেউ আর গাছের পাতার আলিঙ্গনে তিনি ছন্দ পেয়েছেন। শুধু ছন্দ নয়, প্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রতিও শিশুকাল থেকেই তার আকর্ষণ প্রবল। চাকরদের মহলে চাকরদের শাসনের অধীনে তাদেরকে শিশুবেলা পার করতে হয়েছে। তাদের চাকর শ্যাম

চাকরমহলে খড়ি দিয়ে তাঁর চারদিকে গণ্ডি এঁকে দিয়ে চলে যেতো। তিনি তখন আধিভৌতিক বিপদের ভয়ে গণ্ডির বাইরে যেতেন না। জানলার নিচেই একটি ঘাটবাঁধানো পুকুর ছিল, পুকুরের পূর্বধারের প্রাচীরের গায়ে প্রকাণ্ড একটা চীনা বট– দক্ষিণধারে নারিকেলশ্রেণি। গণ্ডিবন্ধনের বন্দী শিশু রবীন্দ্রনাথ জানলার খড়খড়ি খুলে প্রায় সমস্ত দিন সেই পুকুরকে দেখতেন। নানা রকম মানুষ স্নান করতে আসতো, নানা রকম তাদের অঙ্গভঙ্গি-প্রকৃতি। সেই মানুষদের প্রকৃতিও রবীন্দ্রনাথের জানা হয়েগিয়েছিলো। বেলা একটা হলে আস্তে আস্তে পুকুর জনশূন্য হতো। তখন রাজহাঁস আর পাতিহাঁসদের অবাধ বিচরণ দেখতেন; বটগাছটিতে মনোসংযোগ করতেন। রবীন্দ্রনাথের মনে হতো, বটগাছের গুঁড়ির চারধারে নামা ঝুরিগুলি একটা অন্ধকারময় জটিলতার সৃষ্টি করতো। তিনি লিখেছেন :

> সেই কুহকের মধ্যে, বিশ্বের সেই একটা অস্পষ্ট কোণে যেন ভ্রমক্রমে বিশ্বের নিয়ম ঠেকিয়া গেছে। দৈবাৎ সেখানে যেন স্বপ্নযুগের একটা অসম্ভবের রাজত্ব বিধাতার চোখ এড়াইয়া আজও দিনের আলোর মাঝখানে রহিয়া গিয়াছে। মনের চক্ষে সেখানে যে কাহাদের দেখিতাম এবং তাহাদের ক্রিয়াকলাপ যে কী রকম, আজ তাহা স্পষ্ট ভাষায় বলা অসম্ভব।[২]

এই বটগাছ তাঁর মনে একটি স্থায়ী আসন নিয়েছিলো। পরবর্তী সময়ে তিনি'পুরোনো বট' নামে একটি কবিতাও লিখেছিলেন। –এভাবে প্রকৃতির লীলায় তিনি সিক্ত হয়েছিলেন ছেলেবেলা থেকেই। এ বয়সে তাঁর বাড়ির বাইরে যাওয়া বারণ ছিলো। আড়াল-আবডাল থেকে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হতো। অর্থাৎ দরজা-জানলার ফাঁক-ফোকর দিয়ে তিনি প্রকৃতিকে আস্বাদন করতেন। বড়ো হয়ে সেই বোধেই লিখেছিলেন 'দুই পাখি' কবিতাটি। বাড়ির ভিতরের লেবু-কুল-আমড়া-নারকেলগাছও রবীন্দ্রনাথের কাছে ছিলো স্বর্গের বাগান। ভোরবেলা এই গাছগুলোর আড়াল থেকে যখন সূর্য উঠত, তখন তিনি অভিভূত হয়ে তাকিয়ে থাকতেন। প্রকৃতিকেই তাঁর কাছে সবচেয়ে রহস্যময় মনে হতো। তিনি লিখেছেন :

> প্রকৃতি যেন হাত মুঠা করিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিত, কী আছে বলো দেখি।[৩]

তাঁর ছেলেবেলায় একবার কলকাতায় ডেঙ্গুজ্বরের প্রকোপ হলে, তাঁরা পেনেটিতে গঙ্গার তীরে আশ্রয় নেন। তখন তাঁর মনে হয় পৃথিবীর উপর থেকে যেন একটা অভ্যাসের তুচ্ছতার আবরণ ঘুচে গেল। সেই সময় সম্পর্কে লিখেছেন :

> ঘাটে একলা বসিয়া পুকুরের গভীর তলাটার মধ্যে যক্ষপুরীর ভয়ের রাজ্য কল্পনা করিয়াছি।[৪]

গঙ্গার সম্মুখে এই পুকুরটিকে তাঁর মনে হতো ঘরের বধূ। ছোট বয়সে গঙ্গা এবং পুকুরের এই তুলনা তাঁর মনের সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় বহন করে নিঃসন্দেহে। মাঘোৎসব উপলক্ষে তাঁদের বাড়িতে উঠানের চারিধারে সারি সারি করে কাঠের থাম পুঁতে ঝাড় টাঙিয়ে যখন মাটি-কাটা হতো, তখন তাঁর মনে হত রহস্যসিন্ধুকের ডালা খোলা হচ্ছে।

কিন্তু ডালা আর খুলত না। তিনি মনে করতেন, খুব বেশি খোঁড়া হতো না বলে ডালা খুলছে না। ছেলেবেলায়ই তিনি এভাবে কল্পনা করেছেন। ছেলেবেলায় তিনি আরেকটি কল্পনা করতেন, সেটি হল 'আকাশ ছোঁয়া'র কল্পনা। আকাশ ছোঁয়ার জন্য তিনি পণ্ডিত মহাশয়কে কেবল সিঁড়ি বাড়িয়ে দিতে বলতেন। তাঁর মনে কল্পনাপ্রবণতা এবং বাইরের জগতের প্রতি আকর্ষণ জন্মাবার ক্ষেত্রে ভাগ্নেয় সত্যপ্রাসাদ এবং ভাগ্নি ইরাবতীর বড় অবদান রয়েছে। ইরাবতী মাঝে মাঝে তাঁকে শোনাতো'রাজার বাড়ি'র কথা। ইরাবতী বলত রাজার বাড়ি তাঁদের জোড়াসাঁকোর বাড়ির ভিতরেই অবস্থিত। শিশু রবীন্দ্রনাথ তখন সেই 'রাজার বাড়ি' নিয়ে নানা রকম কল্পনা করতেন। অন্যদিকে সত্যপ্রাসাদ বাড়ির বাইরে বিভিন্ন জায়গা থেকে বেড়িয়ে এসে তাঁর কাছে গল্প করতো। রবীন্দ্রনাথ তখন সেই সব জায়গা নিয়ে কল্পনায় মেতে থাকতেন। এছাড়া দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেশ-বিদেশ থেকে চাকর আসতো, তিনি সেই চাকরদের কাছে তাদের দেশের গল্প শুনতেন এবং কল্পনার চোখে তা দেখতেও পেতেন। এর অনেক পরে ১৮৮৩ সালে মে-জুন মাসে সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি কিছুদিন কারোয়ারে সমুদ্রতীরে ছিলেন। সেই শৈলমালাবেষ্টিত সমুদ্রবন্দরটি দেখে তিনি মুগ্ধ হন। এর অর্ধচন্দ্রাকার বেলাভূমি, অকূল নীলাম্বুরাশি, প্রশস্তবালুতটের প্রান্তে বড়ো বড়ো ঝাউগাছের অরণ্য, শুক্লপক্ষের গোধূলিতে অরণ্যের সীমায় কালানদীতে ছোট নৌকায় ঘুরে বেড়ানো সবই তিনি অন্তর দিয়ে উপভোগ করেন। সেখানে তীরে একজন চাষার কুটিরে বেড়া-দেওয়া নিকানো আঙিনায় আসন পেতে আহার করেন। তারপর যখন ফিরে এলেন সমুদ্রতীরে, তখন নিশীথরাত্রি সমুদ্র নিস্তরঙ্গ ঝাউবনের নিয়মমর্মরিত চাঞ্চল্য থেমে গিয়েছে। বালুতটের উপর দিয়ে হেঁটে বাড়ি পৌঁছালেন। এই নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য তাঁর হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে প্রকৃতির সঙ্গে পরিপূর্ণ করে মিলিয়ে দিল। তিনি একান্ত বাল্যকালে যেমন অন্তরের একটি অনির্দেশ্যময় অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রবেশ করে বাহিরের সহজ অধিকারটি হারিয়েছিলেন, তেমনি এই দিনের আলো তাঁর অন্তরকে পরিপূর্ণ করে দিলো। রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ের এই ইতিহাসটিই একটু অন্যরকম করে লিখিত হয়েছে *প্রকৃতির প্রতিশোধ* নাটকটিতে। তিনি একে তাঁর সমস্ত নাট্যরচনার ভূমিকাও বলেছেন। তিনি লিখেছেন :

> আমার তো মনে হয়, আমার কাব্যরচনার এই একটিমাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে, সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন-সাধনের পালা।[৫]

এই সীমা-অসীমের খেলা তাঁর শেষ জীবনের লেখা পর্যন্ত দৃশ্যমান হয়েছে। তাঁর অধিকাংশ নাটক এই বোধেই লিখিত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য পড়ার সূচনা হয় চাকর মহলের বই দিয়ে। সেখানে ছিল মূলত চাণক্যশ্লোকের বাংলা অনুবাদ এবং কৃত্তিবাস-রামায়ন। আবার, চাকরদের মুখেই শুনতেন রূপকথার গল্প, ভুতের গল্প, ডাকাতের গল্প; কখনও বা চাকরদের গ্রামের গল্প।– সকল কিছুই তাঁর মনকে গঠন করতে সাহায্য করেছিলো। চাকরদের ছোট

সর্দার শ্যামের কাছে তাঁরা (সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যপ্রাসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) ডাকাতের গল্প শুনতেন। সে সময় শুনেছিলেন, রঘুডাকাত-বিশুডাকাতের কথা। সেই ডাকাতরা আগে থাকতে খবর দিয়ে ডাকাতি করতো, ইতরপনা করতো না। দূর থেকে তাদের হাঁক শুনে পাড়ার লোকের রক্ত যেতো হিম হয়ে। বলা যেতে পারে *বাল্মীকিপ্রতিভা* নাটক লেখার মূল প্রেরণা এখানেই। তাঁর ছেলেবেলায় বিভিন্ন রকম বিদ্যা শিখতে হয়েছিলো : সাহিত্য-সংগীত, কুস্তি লড়াই, মানুষের অস্থিবিদ্যা, গণিত-পদার্থ-রসায়ন, ইংরেজি, ধর্মগ্রন্থ, জিমনাস্টিক, ছবি-আঁকা, ল্যাতিন শেখা, সংস্কৃত শেখা। তবে এ সকল শিখতে গিয়ে তাঁর কিছু হলো না, যা হলো তা ক্লাসের পড়ার বাইরে। গৃহশিক্ষক জ্ঞানবাবু এর মধ্যে একটা পথ বের করেছিলেন। তাঁকে আগাগোড়া *কুমারসম্ভব* মুখস্থ করিয়েছেন, ঘরে বন্ধ করে রেখে *ম্যাকবেথ* অনুবাদ করিয়েছিলেন। অন্যদিকে, রামসর্বস্ব পণ্ডিতমশায় তাঁকে পড়িয়ে দিলেন *শকুন্তলা*। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন :

> আমার ছেলেবয়সের মন গড়বার এই ছিল মালমসলা, আর ছিল বাংলা বই যা-তা, তার বাছবিচার ছিল না।[৬]

এ থেকে বোঝা যায়, প্রাতিষ্ঠানিক পড়ার প্রতি তাঁর অনাগ্রহ সৃষ্টি হলেও, বই পড়ার প্রতি আগ্রহ ছিল প্রবল। ছেলেবেলায় পাঠ্য অপাঠ্য যে সমস্ত বই ছিল সবই তিনি পড়েছিলেন, এমনকি দীনবন্ধু মিত্রের *জামাইবারিক* প্রহসন তাঁর উপযোগী নয় বলে এক আত্মীয়া বাক্সে চাবিবন্ধ করে রাখলে, চাবি চুরি করে তিনি বইটি পড়েন। তখন যে পত্রিকাগুলো প্রকাশ হতো, সেগুলোও তিনি নিয়ম করে পড়তেন। এছাড়া কৌতুহল ছিল ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি। তিনি লিখেছেন :

> গাছের বীজের মধ্যে যে-অঙ্কুর প্রচ্ছন্ন ও মাটির নীচে যে-রহস্য অনাবিস্কৃত, তাহার প্রতি যেমন একটি একান্ত কৌতূহল বোধ করিতাম, প্রাচীন পদকর্তাদের রচনা সম্বন্ধেও আমার ঠিক সেই ভাবনাটা ছিল।[৭]

এই প্রাচীন কাব্যের ভাববস্তু থেকে তাঁর অনেক কবিতা-গান-নাটক লিখিত হয়েছে। ছোটোবেলায় অনেক সাদাসিধে জীবনযাপন করা ছিলো তাঁদের পারিবারিক রীতি। তাই অনাড়ম্বর খাওয়া-পরা, অনাড়ম্বর সাজ-সজ্জায় চিত্ত ছিল মুক্ত। বাল্যকালের এই অনাড়ম্বরতা তাঁকে কিছুটা সহায়তা করেছিল। তিনি লিখেছেন :

> অনাদর একটা মস্ত স্বাধীনতা– সেই স্বাধীনতায় আমাদের মন মুক্ত ছিল।[৮]

তাঁর *জীবনস্মৃতি*তে পাওয়া যায়, এগার বছর বয়সে হিমালয়ে যাওয়ার সময় প্রথম তাঁর জন্য আয়োজন করে জামা বানানো হয়, তাঁর জন্য জুতা-মোজা আসে এবং আসে জড়ির টুপি।– এতোটাই অনাড়ম্বর এবং অনাদরের ছিলো দশ বছর বয়স পর্যন্ত সময়।

স্কুলের অভিজ্ঞতা তাঁকে সব সময় পীড়া দিয়েছে। প্রথমে স্কুলে যাওয়ার জন্য তাঁর উৎসাহ ছিল আকাশ ছোঁয়া। স্কুলে যাওয়ার বয়স হওয়ার আগেই তাঁর কান্নার কাছে হার মেনে বড়রা তাঁকে 'ওরিয়েন্ট সেমিনারি'তে ভর্তি করেন। কিন্তু সেখানকার শাসনপ্রণালী তাঁর শিশুমনকে আহত করেছিলো। *জীবনস্মৃতি*তে পাওয়া য়ায় :

> পড়া বলিতে না পারিলে ছেলেকে বেঞ্চে দাঁড় করাইয়া তাহার দুই প্রসারিত হাতের উপর ক্লাসের অনেকগুলি শ্লেট একত্র করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হইত।[৯]

এর পর তিনি ভর্তি হন 'নর্মাল স্কুলে'। সেখানকার স্মৃতিও সুখকর ছিলো না। এরা আবার প্রতিদিন প্রথমেই ছেলেদের আনন্দ দেওয়ার জন্য একটি ইংরেজি কবিতা গানের সুরে আবৃত্তি করাত। এতে ছেলেদের কোন আনন্দ হত না, এমন কি তারা কিছু বুঝতোও না। রবীন্দ্রনাথ বড় হয়েও এর কথাগুলো উদ্ধার করতে পারেন নি। সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার জন্যই তিনি শিশুদের আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষার কথা বলেছেন। তাঁর শারদোৎসব, গুরু, ঋণশোধ ইত্যাদি নাটকে ছুটির আনন্দের কথা লিখেছেন, *অচলায়তন* নাটকে লিখেছেন বুঝে এবং আনন্দে পড়ার কথা, *ডাকঘর* নাটকে শিশুর মানসিক অবস্থা দেখিয়েছেন নিয়মের বেড়াজালে নয় মুক্তির আনন্দে শিশু বেঁচে থাকে; তাই অমল পণ্ডিত হতে চায় না ডাকহরকরা হয়ে দেশে দেশে ঘুরতে চায়। এছাড়া, প্রকৃতি থেকে শিক্ষা নেওয়ার কথাও এসেছে কয়েকটি নাটকে। আবার এই উদ্দেশ্যেই তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন 'শান্তিনিকেতন'। তিনি জ্ঞানসাধনাকে আনন্দের বেদীতে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। ঋতুদের আগমনী গানে ছাত্রদের মনকে বিশ্বপ্রকৃতির উৎসব প্রাঙ্গনে উদবোধিত করেছিলেন তিনি।

ছোটো থেকেই একা থাকবার প্রবণতা তাঁর মধ্যে দেখা যায়। যখন তিনি একটু বড় হয়েছেন, চাকরদের শাসন কিঞ্চিত শিথিল হয়েছিলো, তখন নানারকমভাবে একাকীত্বের স্বাধীনতা ভোগ করতেন। মধ্যাহ্নের আহার শেষে, সকলে যখন ঘুমাতো, তিনি ছাদে গিয়ে চারদিক দেখে নিতেন। চোখে পড়তো দূরের বাড়ি-ঘর। একেকটি বাড়ি যেন তাঁর কাছে এক-একটি কাহিনি হয়ে উঁকি দিতো। তাঁর আরেকটি প্রিয় জায়গা ছিল বাড়ির উত্তর-অংশের গোলাবাড়ি। এটি ছিল তাঁদের বাড়ির পরিত্যক্ত অংশ : কেউ যেত না, লোক নেই-গাছ নেই। এইখানে দাঁড়িয়ে তিনি আপন ইচ্ছেমতো কল্পনার জাল বুনতেন। এছাড়া এক-একদিন দুপুরবেলা সকলের চোখ লুকিয়ে পিতা দেবেন্দ্রনাথের তেতালার বন্ধ ঘর খুলে সোফায় চুপ করে পড়ে থাকতেন। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন :

> একে তো অনেক দিনের বন্ধ-করা ঘর, নিষিদ্ধপ্রবেশ, সে-ঘরে যেন একটা রহস্যের ঘন গন্ধ ছিল। তাহার পরে সম্মুখের জনশূন্য খোলা ছাদের উপর রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিত, তাহাতেও মনটাকে উদাস করিয়া দিত।[১০]

এইখানে তিনি একটি ইচ্ছে পূরণও করতেন– তখন সবেমাত্র শহরে জলের কল হয়েছে, তেতলাতে পিতার স্নানের ঘরে গিয়ে অকালে মনের সাধ মিটিয়ে স্নান করতেন। সে-স্নান আরামের জন্য ছিলো না, ইচ্ছেকে লাগাম ছেড়ে

দেওয়ার জন্য ছিলো। বিলেত যাওয়ার আগে আহমেদাবাদে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে যখন ছিলেন, তখন সত্যেন্দ্রনাথ আদালতে চলে গেলে তিনি একা হয়ে পড়তেন। তাঁর মনে হত সাবেক দিনগুলো যেন যক্ষের ধনের মত মাটির নিচে পোঁতা রয়েছে। শত শত বৎসরের কথা : নহবৎখানায় বাজছে রোশনচৌকি দিনরাত্রে অষ্ট প্রহরের রাগিণীতে, রাস্তায় তালে তালে ঘোড়ার খুরের শব্দ উঠছে, ঘোড়সওয়ার তুর্কি ফৌজের চলছে কুচকাওয়াজ, তাদের বর্শার ফলায় রোদ উঠছে ঝক্‌ঝকিয়ে। বাদশাহি দরবারের চার দিকে চলছে সর্বনেশে কানাকানি ফুসফাস। অন্দরমহলে খোলা তলোয়ার হাতে হাকসি খোজারা পাহারা দিচ্ছে। বেগমদের হামামে ছুটছে গোলাপজলের ফোয়ারা, উঠছে বাজুবন্ধ-কাঁকনের ঝন্‌ঝনানি।– এ সকল কিছু তিনি দেখতে পেতেন। যেন তাঁর খেয়ালের খেলনা। এই খেয়াল থেকেই অঙ্কুরিত হয়েছিল 'ক্ষুধিত পাষাণে'র অবয়ব। ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের প্রতি মোহও এখান থেকেই। তাঁর নাটকের ঐতিহাসিক বোধের বীজও এই শাহী মহল। *প্রায়শ্চিত্ত*, *মুক্তধারায়* যে রাজদৌড়াত্ম অঙ্কিত হয়েছে, আমেদাবাদের কল্পনার জগতে তার হাতছানি আছে। এর আরও পরে বিলেত থেকে ফিরে এসে যখন তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে দশ নম্বর সদর স্ট্রিটে বাস করছিলেন। তখন একদিন জোড়াসাঁকোর বাড়ির ছাদের উপর দাঁড়িয়ে অপরাহ্নের শেষে, দিবাবসানের ম্লানিমার উপরে সূর্যাস্তের আভা তাঁর কাছে বিশেষ মনোহর হয়ে উঠেছিলো। তাঁর মনে হয়েছিলো, তিনি নিজে সরে গিয়ে 'জগৎকে নিজের স্বরূপে' দেখছেন। 'সে-স্বরূপ কখনোই তুচ্ছ নহে– তাহা আনন্দময় সুন্দর'। এরপর থেকে তিনি মাঝে মাঝেই ইচ্ছে করে নিজেকে সরিয়ে ফেলে জগৎকে দর্শকের মতো দেখার চেষ্টা করতেন এবং খুশি হয়ে উঠতেন। রবীন্দ্রনাথের মানসজগতের বড় পরিবর্তনের প্রান্তবিন্দু এখানে নিহিত। সদর স্ট্রীটে থাকতেই একদিন ভোরে বারান্দায় দাঁড়িয়েছেন। গাছের পল্লবান্তরাল থেকে সূর্যোদয় হচ্ছিল। দেখতে দেখতে তাঁর মনে হলো চোখের উপর থেকে যেন একটি পর্দা সরে গেলো। তিনি লিখেছেন :

> দেখিলাম, একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত।[১১]

এই দিনই তিনি 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' (১৮৮২) কবিতাটি লিখেছিলেন। এই কবিতাকে তিনি উল্লেখ করেছেন, তাঁর সমস্ত কাব্যের ভূমিকা হিসেবে। কবিতা লেখা শেষ হলেও জগতের আনন্দরূপের উপর যবনিকা পড়লো না। এ সময় থেকে তিনি জগৎকে নতুনরূপে দেখতে শুরু করেছিলেন। রাস্তা দিয়ে যে মুটে-মজুর চলতো, তাদের গতিভঙ্গি, শরীরের গঠন, মুখশ্রী একেবারে সমস্ত চৈতন্য দিয়ে দেখতে আরম্ভ করেছিলেন। এক যুবক আরেক যুবকের কাঁধে হাত দিয়ে হাসতে-হাসতে চলে যাওয়াকেও একটি ঘটনা বলে মনে হতো তাঁর। তিনি সমস্তকে স্বতন্ত্র করে দেখতে শুরু করেছিলেন। 'প্রভাত-উৎসব'-এ সে কথাই তিনি লিখেছেন:

> হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি,

জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি-[১২]

এ মুক্তি তাঁর একান্ত নিজ হৃদয়ের। কোনো আরোপিত বা প্রভাবিত নয়। মূলত হৃদয়ের মুক্তিই তাঁর চৈতন্যকে খুলে দিয়েছিলো। একা থাকলেই তাঁর কল্পনারাজ্য বাড়তে থাকে এবং তিনি নতুন নতুন লেখা লিখতে পারেন। একা থাকার উচ্ছ্বাস দেখা গেছে ১৮৯৪ সালের একটি চিঠিতে। তিনি লিখেছেন :

> বোলপুরের মতো এমন সুগভীর শান্তি এবং বিরাম আর কোথাও পাওয়া যেতো না। দার্জিলিঙের স্যানিটেরিয়মে বিপরীত ভিড়, পরগনাতেও কাজ এবং লোক এসে পড়ে, বোলপুরে কোনো কর্তব্যও নেই লোকের উপদ্রবও নেই–... দুপুর বেলাটি এমন সুগভীর নিস্তব্ধ নির্জন এবং পরিপূর্ণ যে, আমার সমস্ত অন্তঃকরণটিকে একেবারে আবিষ্ট করে রেখে দেয়– লিখি, পড়ি, ভাবি, যাই করি, এই সুবিস্তীর্ণ সুবৃহৎ সকরুণ মধ্যাহ্ন আমাকে নীরবে সস্নেহে বেষ্টন করে থাকে।[১৩]

রবীন্দ্রনাথের জীবনের সবচেয়ে বড় ঘটনা এগারো বছর বয়সে পিতার সঙ্গে হিমালয়ে যাওয়া। পইতা উপলক্ষে যখন মাথা মুড়ানো হয়েছিলো, তখন তিনি স্কুলে যেতে রাজি হলেন না। কারণ, ফিরিঙ্গি ছেলেরা হাস্যবর্ষন করবেই। ছোট বালকের এই মানসিক দুঃসময়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাকে নিয়ে যান হিমালয়ে। এই সময়ই তিনি পিতার প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব, আদর্শ এবং জীবননিষ্ঠার সান্নিধ্যে আসেন। পিতার মধ্যে তিনি একই সঙ্গে প্রতাপ এবং স্নেহ দুই-ই দেখতে পান। তাঁর নাটকের 'রাজা' কনসেপ্টও তিনি মহর্ষির কাছ থেকে পান। মহর্ষি সম্পর্কে তিনি বলেছেন :

> হিমালয়যাত্রায় তাঁহার কাছে যতদিন ছিলাম, একদিকে আমার প্রচুর পরিমাণে স্বাধীনতা ছিল, অন্যদিকে সমস্ত আচরণ অলঙ্ঘরূপে নির্দিষ্ট ছিল। যেখানে তিনি ছুটি দিতেন সেখানে তিনি কোনো কারণে কোনো বাধাই দিতেন না, যেখানে তিনি নিয়ম বাঁধতেন সেখানে তিনি লেশমাত্র ছিদ্র রাখিতেন না।[১৪]

শিশু রবীন্দ্রনাথের জন্য এই শৃঙ্খল যেমন বিস্ময়ের তেমন শিক্ষণীয়। এ সময় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে ভগবদগীতার কিছু শ্লোক বাংলা অনুবাদসহ কপি করতে দিয়েছিলেন। ক্ষুদ্র নগণ্য বালকের উপর এ সকল গুরুতর কাজের ভার একদিকে তাঁকে আত্মবিশ্বাসী করে, অন্যদিকে জ্ঞানের ভাণ্ডারও হয় সমৃদ্ধ। দায়িত্বজ্ঞান বৃদ্ধির জন্য মহর্ষি তাঁর কাছে ছোট ক্যাশবাক্স রাখারও ভার দিয়েছিলেন। রাতের বেলা মহর্ষি তাঁকে গ্রহতারকা চিনিয়ে জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধে আলোচনা করতেন। বক্রোটায় বাসকালে তাঁদের বাসা ছিলো একটি পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়ায়। বৈশাখ মাসেও ছিলো বরফ। বাসার নিম্নবর্তী এক অধিত্যকায় ছিলো বিস্তীর্ণ কেলুবন। এই বনে একটি লৌহফলক বিশিষ্ট লাঠি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ একা বেড়াতেন। কোনো বিপদ আশঙ্কায় পিতা তাঁকে বাধা দেন নি। শুধু ছেলেবেলায় নয়, পরবর্তীতে যখন তিনি আদিব্রাহ্মসমাজের সেক্রেটারি ছিলেন, তখন তিনি দেখতে পান বেদিতে ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কেউ বসে না। রবীন্দ্রনাথের মনে এ নিয়ে খটকা লেগেছিলো। তিনি পিতার কাছে অনুমতি চেয়েছিন, এর

প্রতিকার করতে। মহর্ষি কোনো বিতর্কে না গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে প্রতিকার করতে বলেন। কিন্তু তিনি কার্যে গিয়ে দেখলেন, প্রতিকার সম্ভব নয়। আরো একবার যৌবনারম্ভে তিনি পিতার কাছে প্রশ্রয় পেয়েছিলেন– তাঁর ইচ্ছে হয়েছিলো, গরুর গাড়িতে করে গ্রাণ্ড্ট্রাঙ্ক রোড ধরে পেশোয়ার পর্যন্ত যাবেন। এ প্রস্তাব কেউ অনুমোদন করে নি, কিন্তু মহর্ষি একে 'খুব ভালো কথা' বলেছিলেন।– এভাবেই পিতার প্রশ্রয় লাভ করে নিজের স্বাতন্ত্র্যে চলেছেন তিনি। হিমালয়েই তিনি দেখেছিলেন দেবেন্দ্রনাথের উপাসনানিষ্ঠা : রাতে লাল শাল পরে কাঁচের আবরণে ঘেরা বাইরের বারান্দায় উপাসনা করতে চলতেন, সূর্যোদয়ের পূর্বে প্রভাতের উপাসনা, এরপর রবীন্দ্রনাথকে পাশে নিয়ে দাঁড়িয়ে আরেকবার উপাসনা। রাত্রির অন্ধকার দূর হওয়ার আগেই পিতা তাঁকে ঘুম থেকে তুলে দিতেন, উপক্রমণিকা হতে 'নরঃ নরৌঃ নরাঃ' মুখস্ত করার জন্য। সমস্ত জীবন রবীন্দ্রনাথ এই অভ্যাস রেখেছিলেন– 'ভোরে ওঠার অভ্যাস'। মহর্ষির কাছে এই বয়সেই তিনি বাল্মীকি রামায়ণ, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের জীবনী পড়েছিলেন। মূলত হিমালয়ে পিতার কাছেই তিনি আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠেছিলেন– নিজের ভিতরে একটি শক্তি টের পেয়েছিন। তাঁর মানসগঠনে পিতার প্রভাব খুব বেশি। পিতার নিষ্ঠা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন :

> তিনি মনের মধ্যে কোনো জিনিস ঝাপসা রাখিতে পারিতেন না, এবং তাঁহার কাজেও যেমন-তেমন করিয়া কিছু হইবার জো ছিল না। তাঁহার প্রতি অন্যের এবং অন্যের প্রতি তাঁহার সমস্ত কর্তব্য অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট ছিল। আমাদের জাতিগত স্বভাবটা যথেষ্ট ঢিলাঢালা। অল্পস্বল্প এদিক-ওদিক হওয়াকে আমরা ধর্তব্যের মধ্যেই গন্য করি না। সেইজন্য তাঁহার সঙ্গে ব্যবহারে আমাদের সকলকেই অত্যন্ত ভীত ও সতর্ক থাকিতে হইত।[১৫]

ঠাকুরবাড়িতে স্বদেশপ্রেমের দীপ্তি ছিল চোখে পড়ার মতো। তিনি লিখেছেন :

> স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকলপ্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুণ্ন ছিল, তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল।[১৬]

জীবনস্মৃতিতে জানা যায়, মহর্ষিকে কেউ ইংরেজিতে চিঠি লিখলে পত্র-লেখকের নিকট ফিরে যেত। ১৮৬৬ সালে তাঁদের বাড়িতে হিন্দুমেলার সৃষ্টি হয়। যেখানে দেশের স্তবগান গীত হতো, দেশানুরাগের কবিতা পঠিত হতো, দেশি শিল্প ব্যায়াম প্রদর্শিত হতো এবং দেশী গুণীলোক পুরস্কৃত হতো। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদযোগে তাঁরা স্বাদেশীকের সভা করতেন। স্বদেশে দিয়াশলাই তৈরির কারখানা স্থাপনের চেষ্টা করেছেন, একজন অল্পবয়স্ক ছাত্র কাপড়ের কল তৈরির চেষ্টায় প্রবৃত্ত হলে তাকে অর্থ সাহায্য করেছিলেন। যদিও এ সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিলো। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সবচেয়ে বড় উদ্যোগ ছিলো জাহাজের ব্যবসা। খুলনা-বরিশালের নদীপথে ইংরেজদের জাহাজকে হারিয়ে স্বদেশি জাহাজ চালানো তাঁর এক ধরনের নেশায় পরিণত হয়। তিনি কেবল যাত্রীদেরকে বিনাভাড়ায় যাতায়াতের সুযোগ দেন নি, মিষ্টান্ন খাওয়াতেও শুরু করেন। বরিশালের ভলন্টিয়াররা স্বদেশী কীর্তন

গেয়ে যাত্রী সংগ্রহ করতো। তাই যাত্রীর অভাব হয় নি, তবে ঋণ বেড়ে গিয়েছিলো। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এ ব্যবসা ডুবে গেলেও তাঁর স্বদেশিকতা উদাহরণ হয়ে রইলো। *রাজা ও রানী*, *মুক্তধারা*, *প্রায়শ্চিত্ত* ইত্যাদি নাটকের স্বদেশিকতার দীপ্তি পরিবারে স্বদেশিকতার প্রভাবেই ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ শেষ বয়সেও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলাচিঠির রীতি পালন করেছিলেন। ১৯৪০ সালে সজনীকান্ত দাসকে লিখেছিলেন–

> এখানে তোমার যে বন্ধুটি আমার সিংহদ্বার আগলিয়ে থাকেন– ইংরেজিতে লেখবার জন্যে তোমার হয়ে তিনি আমাকে তাগিদ জানালেন। গৌড়িয় সাহিত্যমণ্ডলীর প্রতিনিধি আমি– এমন দুর্নীতি কাজ পারৎপক্ষে করিনে।[১৭]

এখানে বলা প্রয়োজন যে, শুধু বাংলাভাষার ক্ষেত্রেই নয়, অল্প কিছু বিষয় ছাড়া রবীন্দ্রনাথ জীবনের প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দেবেন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা লেখার হাতেখড়ি বাড়ির আবহাওয়া থেকেই। বয়োজ্যেষ্ঠ ভাগ্নেয় জ্যোতিঃপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে পড়ছিলেন, তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স সাত-আট বছর। জ্যোতিঃপ্রকাশ এক দিন দুপুরবেলা রবীন্দ্রনাথকে ডেকে পয়ারছন্দে চৌদ্দ অক্ষর যোগাযোগের রীতিপদ্ধতি শিখিয়ে দেন এবং বলেন, "তোমাকে পদ্য লিখিতে হইবে।"[১৮]এ কথার আকস্মিকতায় রবীন্দ্রনাথ প্রথমে থমকে যান। ছাপার বইয়ে যে পদ্য তা তিনি লিখবেন কিভাবে! কিন্তু এ ঘটনার পরই তিনি কবিতা লেখা শুরু করেছিলেন। বাড়িতে প্রেরণাদানকারী মানুষের অভাব ছিল না। তাঁর খুড়তুত ভাই গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪১-৬৯) সাহিত্য ও ললিতকলায় উৎসাহী ছিলেন। আবার বাংলায় দেশানুরাগের গান ও কবিতার সূত্রপাতও তাঁরাই করেছিলেন। গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ ভাই ছিলেন গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর– তার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন উদার-মহৎ-আমোদে মন। কচি বয়সে এরূপ মানবিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মানুষের সংস্পর্শ তাঁর মানসগঠনে সাহায্য করেছিলো। তাছাড়া নিজের বড় ভাইয়েরা সকলেই বাংলাদেশের উদাহরণ হয়ে রয়েছেন, তাঁদের কর্মোদ্যমও রবীন্দ্রনাথকে ভিষণভাবে প্রভাবিত করেছিলো। ছোট থেকেই বাড়িতে নাট্যাভিনয় দেখেছেন তিনি। তাঁদের বাড়িতেই নাটক হতো, লিখতেন ভাইয়েরা, অভিনয় করতেন নিজেরা। শিশু রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে ঘুম ঘুম চোখে বারান্দা থেকে সেই নাটকের ঝলমলে জগৎ দেখতেন। একদিন তাঁদের ছোটদেরও নাটক দেখানো হয়েছিল। সেদিন অর্ধেক ঘুম হওয়ার পর যখন তাঁকে নাটক দেখতে নিয়ে যাওয়া হল, তখন নাটক দেখে তাঁর বিস্ময়ের সীমা ছিল না। তাই তাঁর মানসগঠনে সাংস্কৃতিক আবহ দৃঢ়ভাবেই গ্রথিত ছিল। *জীবনস্মৃতি*তে তিনি লিখেছেন :

> সাহিত্যের শিক্ষায়, ভাবের চর্চায়, বাল্যকাল হইতে জ্যোতিদাদা আমার প্রধান সহায় ছিলেন। তিনি নিজে উৎসাহী এবং অন্যকে উৎসাহ দিতে তাঁহার আনন্দ। আমি অবাধে তাঁহার সঙ্গে ভাবের ও জ্ঞানের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতাম– তিনি বালক বলিয়া আমাকে অবজ্ঞা করিতেন না।[১৯]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে তিনি আরো বলেন :

> তাঁহার সংস্রবে আমার ভিতরকার সংকোচ ঘুচিয়া গিয়াছিল।[২০]

এই সংকোচ ঘোচার ফলেই তিনি আত্মোপলব্ধি করতে পারলেন। শাসন এবং পীড়নের দ্বারা যা না হলো, স্বাধীনতায় তা হলো সহজেই। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁকে যেমন শিকারে নিয়ে গিয়েছিলেন, ঘোড়ার পিঠে একা তুলে দিয়েছিলেন, তেমনি আবার সাহিত্যকর্মেও স্বচ্ছন্দে ডেকে নিয়েছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনেক নাটকে রবীন্দ্রনাথের কাঁচা হাতের গান রয়েছে। তিনি জানিয়েছেন :

> তখন হইতেই আমার আপন শক্তি নিজের কাঁটা ও নিজের ফুল বিকাশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারিয়াছে।[২১]

ঠাকুরবাড়িতে গানের চর্চা ছিল প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের আমল থেকেই। পরিবারের সকলে কমবেশি গান গাইতেন। যখন পিতার সঙ্গে তিনি হিমালয়ে ছিলেন, তখন প্রতিদিন সন্ধ্যায় বাগানের সম্মুখে বারান্দায় পিতাকে ব্রহ্মসংগীত শোনানোর জন্য তাঁর ডাক পড়তো। তিনি তখন বেহাগে গান গাইতেন। তাঁর পিতা যখন চুঁচুড়ায় ছিলেন, তখন রবীন্দ্রনাথ এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ডাক পড়েছিল গান গাওয়ার জন্য। রবীন্দ্রনাথের গান শুনে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং পাঁচশো টাকার চেক রবীন্দ্রনাথের হাতে তুলে দিয়েছিলেন এই বলে–

> দেশের রাজা যদি দেশের ভাষা জানিত ও সাহিত্যের আদর বুঝিত, তবে কবিকে তো তাহারা পুরস্কার দিত। রাজার দিক হইতে যখন তাহার কোনো সম্ভাবনা নাই তখন আমাকেই সে-কাজ করিতে হইবে।[২২]

আবার যারা পারিবারিক বন্ধু ছিলেন, তাঁরাও গায়ক বা গানের সমোঝদার। রায়পুরের সিংহপরিবারের শ্রীকণ্ঠ সিংহ মহাশয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বন্ধু ছিলেন। শ্রীকণ্ঠবাবুর কোলে সর্বদাই থাকতো একটি সেতার এবং কণ্ঠে গানের বিশ্রাম ছিলো না। এই শ্রীকণ্ঠবাবুর 'গান সম্বন্ধে' প্রিয় শিষ্য ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে গান গাওয়াতেন এবং নিজে সেতার বাজাতেন। এ সময় অনেক গানের সুর এবং ছন্দের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে, যা তাঁর লেখনিতে প্রভাব ফেলেছে। তবে, রবীন্দ্রনাথের গান শেখারও হাতে খড়ি হয়েছে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর পিয়ানো বাজিয়ে নতুন নতুন সুর তৈরি করায় মেতেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বন্ধু অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী সেই সদ্যোজাত সুরগুলিকে কথা দিয়ে বেঁধে রাখতেন। এভাবেই রবীন্দ্রনাথের গান বাঁধার শিক্ষানবিসি আরম্ভ হয়। তিনি যখন লন্ডনে একটি ডাক্তার পরিবারের সঙ্গে বাস করছিলেন, তখন সেখানে সন্ধ্যায় এক-একদিন গান-বাজনা হতো। তিনি তখন অনেক ইংরেজি গান শিখেছেন। তিনি লিখেছেন :

> আমি গান করি। মিস– ক বাজান। মিস ক– আমাকে অনেকগুলি গান শিখিয়েছেন। কিন্তু প্রায় সন্ধ্যেবেলায় আমাদের একটু আধটু পড়াশুনা হয়। আমরা পালা করে ছদিনে ছরকমের বই পড়ি। বই পড়তে পড়তে এক-একদিন প্রায় সাড়ে-এগারোটা বারোটা হয়ে যায়।[২৩]

বিদেশের চেয়ে স্বদেশী সুর তাঁকে আলোড়িত করেছে বেশি। শিলাইদহে যখন গিয়েছিলেন বাউল সুর তাঁকে আকৃষ্ট করেছিলো। এই সুরে এবং এই ভাবে বহু গান তিনি লিখেছেন। সুর তাকে সকল সময়ই মোহিত করেছে। প্রিয়নাথ সেনকে লেখা চিঠিতে রেমিনির বিখ্যাত বেহালা শুনতে যাওয়ার কথা লিখেছেন। আবার তিনি একা সেই সুর উপভোগ করতে যান নি, ছেলেদের নিয়ে গিয়েছিলেন। প্রিয়নাথ সেনকেও আহ্বান করেছিলেন নিজেকে সেই সুর থেকে বঞ্চিত না করতে।

পিতার সঙ্গে হিমালয়ে বাসকালে পাহাড়-বন-নদী নিয়ে কবিতার পর কবিতা লিখেছিলেন, সে নীল মলাটের খাতাটি হারিয়ে ফেলেছিলেন, পাওয়া যায় নি। কিন্তু কবিতা লেখার মক্স তখনই। হিমালয় থেকে ফিরলেন একা, সঙ্গে শুধু ভৃত্য। এ বয়সী কেউ একা ভ্রমণ করত না, এ কারণে রেলগাড়ি থেকেই তাঁর আদর শুরু হয়ে গেলো। বাড়ি এসে দেখলেন, অন্তঃপুরের দ্বার তাঁর জন্য খুলে গেছে, চাকরদের মহলে আর তাঁকে কুলোলো না। তিনি অন্তঃপুরের একজন হয়ে উঠলেন। এ সময়ই স্কুলকে তাঁর মনে হলো– চারদিকের জীবন ও সৌন্দর্যের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন জেলখানা ও হাসপাতাল জাতীয় একটা নির্মম বিভীষিকা। শ্রেনিভিত্তিক লেখাপড়া এবং স্কুল পালানো স্বভাব দেখে তাঁর বড়দিদি সৌদামিনী দেবী বলেছিলেন, "আমরা সকলেই আশা করিয়াছিলাম বড়ো হইলে রবি মানুষের মতো মানুষ হইবে কিন্তু তাহার আশাই সকলের চেয়ে নষ্ট হইয়া গেল।"[২৪]কারো কথায়ই কর্ণপাত না করে, লেখাপড়ার পাঠ চুকিয়ে দিয়ে কেবল কবিতা লেখা শুরু করলেন। তিনি লিখেছেন :

> কোনোদিন আমার কিছু হইবে এমন আশা না আমার না আর-কাহারও মনে রহিল। কাজেই কোনো কিছুর ভরসা না রাখিয়া আপন-মনে কেবল কবিতার খাতা ভরাইতে লাগিলাম।[২৫]

এ সময় বউঠাকুরানী কাদম্বরী দেবীর সঙ্গে বেশিরভাগ সময়ে সাহিত্যচর্চা করতেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি তরুণ বয়সে সাহিত্য সাধনায় প্রকৃত বন্ধুর সান্নিধ্যই পেয়েছিলেন। যিনি তাঁকে উৎসাহ দিয়েছেন নিরন্তর, ভালোকে ভালো এবং খারাপকে খারাপ বলতে কুণ্ঠিত হন নি। কাদম্বরী দেবীর চেষ্টা ছিলো রবীন্দ্রনাথকে নিখুঁত করে গড়ে তোলা। যখন তিনি গড়ে উঠছিলেন, তখন তা তেমন করে বোঝেন নি। বুঝেছিলেন কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পর। অনুভব করেছিলেন 'নূতন বৌঠান' কতোটা এগিয়ে তাঁকে দিয়েছিলেন। তাঁর বিভিন্ন গল্প-উপন্যাস নাটকের মেয়েরা বিকেলে গা ধুয়ে চুল বাঁধে– এও বোধ করি কাদম্বরী দেবীর প্রভাবেই সৃষ্ট। কারণ *ছেলেবেলায়* পাওয়া যায় :

> দিনের শেষে ছাদের উপর পড়ত মাদুর আর তাকিয়া। একটা রুপোর রেকাবিতে বেলফুলের গোড়ে মালা ভিজে রুমালে, পিরিচে একগ্লাস বরফ-দেওয়া জল আর বাটাতে ছাঁচিপান।
>
> বউঠাকরুন গা ধুয়ে চুল বেঁধে তৈরি হয়ে বসতেন।[২৬]

তাঁর তারুণ্যের এই দৃশ্য *শেষের কবিতায়* অমিতের স্বপ্নতে পাওয়া যায়। অমিত স্বপ্ন দেখে লাবণ্য এমনি করে তার সামনে এসে বসবে। কাদম্বরী ছিলেন বিহারীলালের কবিতার ভক্ত পাঠক। তিনি যেমন কবির কবিতা পড়তেন, তেমনি তাঁর ছাদের সান্ধ্য আসরে কবিকে নিমন্ত্রণও করতেন। তাই এ সময় রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পান। পারিবারিক এই পরিস্থিতিতেই তাঁর সাহিত্যজীবন শুরু হয়। তাঁর চারদিকের সাথীরা যে ধরনের কবিতা পছন্দ করতেন এবং যা লিখলে সাথীদের কাছে খ্যাতি পাওয়া যায়, সেই ধরনের কবিতা-গানই তিনি লিখতে শুরু করেন। তবে, পাঠকের এ বাঁধনে খুব বেশিদিন তিনি বাঁধা ছিলেন না। নিজের মনে মুক্তি ঘটেছিলো অচিরেই। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সপরিবারে দূরদেশে ভ্রমণ করতে গেলে, তেতালার ঘরগুলো শূন্য ছিল। সেই নির্জন ছাদ এবং ঘরগুলোতে তিনি একা আপন খুশিতে কাব্য রচনা শুরু করেছিলেন। একটি দুটি কবিতা রচনা করে তাঁর মনের মধ্যে আনন্দ উপস্থিত হয়েছিলো। মনে হয়েছিলো, এ সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব। এই লেখাগুলোই *সন্ধ্যাসংগীত* কাব্যে স্থান পেয়েছে। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন :

> সে-লেখাটার মূল্য না থাকিতে পারে কিন্তু খুশিটার মূল্য আছে।[২৭]

এ কাব্য প্রকাশিত হলে, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়(১৮৩৮-৯৪)ও এর প্রশংসা করেছিলেন, যা ছিলো রবীন্দ্রনাথের অন্যতম অনুপ্রেরণা। "খণ্ড ও ক্ষুদ্রও কবির মনকে আকৃষ্ট করেছে, কিন্তু ধরে রাখতে পারেনি; রবীন্দ্রনাথ অনুসন্ধান করেছেন সমগ্রকে– স্পর্শ করতে চেয়েছেন অনন্তকে, অসীমকে, চিরন্তনকে, পূর্ণকে, পরমকে, অক্ষয়কে, অমর ও অমরতাকে।"[২৮]তিনি আগের লেখাগুলোকে জনসম্মুখে আনতে কুণ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এই লেখা প্রসঙ্গে লিখেছেন, "সেগুলি প্রকাশের যোগ্য নহে বলিয়া রবীন্দ্রনাথ তাহাদের অপাংক্তেয় করিয়া দেন; তাই তাহাদের আদিম অবিকৃত রূপটি পাই– ভাষা ও ভাবের পরিমার্জনার অবসর ও প্রয়োজন হয় নাই। মালতীপুঁথির কবিতাগুলি হইতে বালক-কবির চিত্তের মধ্যে যে আগ্নেয়গিরি গুমরাইতেছে তাহারই তপ্ত শ্বাস অনুভব করা যায়।"[২৯] হায়াৎ মামুদ লিখেছেন, "রবীন্দ্রনাথের জীবনে, আমার বিবেচনায়, দুটি অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল। এদের মধ্যে একটি আকস্মিক ও নৈসর্গিক। সেটা এই যে তাঁর জন্ম ঠাকুরবাড়িতে, ব্রাহ্ম পরিবারে। অন্যটি হল রবীন্দ্রনাথের অনুচ্চারিত একটি সিদ্ধান্ত : তিনি শিল্পসাধনা করবেন, তিনি লিখবেন, ছবি আঁকবেন। এই দুই ঘটনা তাঁর জীবনে সুদূরপ্রসারী ফসল ফলিয়েছিল। রবীন্দ্রচৈতন্যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে অর্থরূপ পরিগ্রহ করেছিল তার বীজ লুকানো আছে মহর্ষি-পরিবারের আচরিত প্রাত্যহিক জীবনধারায়– শুদ্ধাচার, মননশীলতা ও রুচির অনুশীলনে; এবং পারিবারিক এই অবস্থানটি প্রত্যক্ষভাবে ব্রাহ্ম মতাদর্শ ও আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত।"[৩০]

তাঁর প্রথম বয়সে 'অনুকূল আলোকের মতো' কাব্যরচনার বিকাশে প্রাণসঞ্চার করেছেন শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন (১৮৫৪-১৯১৬)। প্রিয়নাথ সেন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজে বলেছেন– 'সাহিত্যের সাত সমুদ্রের নাবিক তিনি।'দেশি

ও বিদেশি প্রায় সকল ভাষার সকল সাহিত্যে প্রিয়ননাথ সেন দক্ষ ছিলেন। তাই তাঁর কাছে ভাবরাজ্যের দূর দিগন্তের দৃশ্য পর্যন্ত দেখা যেত, যা তাঁকে সমৃদ্ধ করেছে। প্রিয়নাথ সেনের আরেকটি বড় গুণ ছিল, তিনি সাহসের সঙ্গে সাহিত্যালোচনা করতেন। তাঁর সে ভালোলাগা বা মন্দলাগা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত রুচির কথা নয়, বিশ্বসাহিত্যের রসভাণ্ডারের সঙ্গে নিজের শক্তির প্রতি নির্ভর ও বিশ্বাস যুক্ত ছিল। প্রিয়নাথ সেন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

> তখনকার দিনে যত কবিতাই লিখিয়াছি সমস্তই তাঁহাকে শুনাইয়াছি এবং তাঁহার আনন্দের দ্বারাই আমার কবিতাগুলির অভিষেক হইয়াছে। এই সুযোগটি যদি না পাইতাম তবে সেই প্রথম বয়সের চাষ-আবাদে বর্ষা নামিত না এবং তাহার পরে কাব্যের ফসলে ফলন কতটা হইত তাহা বলা শক্ত।[৩১]

সারা জীবনই প্রিয়নাথ সেনের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিলো। প্রিয়নাথ সেনের পরামর্শ তিনি গ্রহণ করেছেন নির্দ্বিধায়। অর্থনৈতিক সমস্যার কথা বার বার জানা গেছে প্রিয়নাথ সেনকে লেখা চিঠিতে। ধার এবং ধার শোধের ব্যাপারটা প্রিয়নাথ সেনের সঙ্গে প্রায় সময়ই ঘটতো। চিঠিতে লিখেছেন :

> অল্প টাকা হাতে পেয়েছিলুম কিন্তু সে তৎক্ষনাৎ ধার শুধতে উড়ে গেছে। প্রতিদিনের খুচরা খরচ প্রায় ধার করে চালাতে হয়। জমিদারী থেকে এবারে অল্প টাকা এসেছে– আর দশ পনেরো দিনে বাকি টাকা আসবার কথা আছে। যা হোক্ আমি দ্বিপুর কাছে ঐ তিনশ টাকা ধার করবার চেষ্টা দেখব যদি পাওয়া যায়। ভগবান অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্রই আছেন– তাঁহারই আলোক আকাশ পরিব্যাপ্ত করিয়া তোমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে তাঁহারই বায়ু প্রতি মুহূর্তে নিশ্বাসরূপে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করিতেছ; তাঁহারই সঙ্গে তোমার একান্ত যোগ ত এক মুহূর্ত্তকালও বিচ্ছিন্ন নাই– যিনি এমন করিয়া ধরা দিয়াছেন সেই অন্তর্যামীকে যে কেমন করিয়া পাওয়া যায় তাহা কেহ বলিতে পারেন না।[৩২]

তাঁকে প্রায়ই ধার করতে হয়েছে। বিদেশে যাওয়ার সময় ধার করে কাপড়ও বানিয়েছেন। কখনো কখনো নিজের ব্যবহার্য জিনিস বিক্রি করেছেন। তিনি নিজের বইয়ের কপিরাইট বিক্রি করে টাকা পেতে চেয়েছেন। তাঁর পরিস্থিতি এতো ভয়াবহ হয় যে, বাড়ি বন্দক রেখে ধার নেওয়ার কথা চিন্তা করে প্রিয়নাথ সেনের কাছে মতামত চেয়েছেন। প্রিয়নাথ সেনের সঙ্গে তিনি কাপড়, ফুল, মাছের ব্যবসা, রেশম চাষ ইত্যাদি নিয়েও আলোচনা করেছেন। কুষ্টিয়ায় কাপড়ের ব্যবসা সংক্রান্ত আলোচনা প্রসঙ্গে চিঠিতে লিখেছেন–

> কুষ্টিয়ায় প্রধানতঃ সুতা এবং কাপড়ের খুব কাট্‌তি। ... এখানে একটি কাজ ভালরূপ হইতে পারে। এখানকার জোলাদিগকে সুতা দাদন দিয়া তোয়ালে, ন্যাপকিন, বিছানার চাদর, কোটের কাপড়, টেবিলক্লথ প্রভৃতি নানা প্রকার ব্যবহার্য দ্রব্য সস্তায় প্রস্তুত করাইয়া কলিকাতায় বিক্রয় করান যাইতে পারে।[৩৩]

জমিদারি পরগনায়ও দেনার কথা তার চিঠিতে পাওয়া যায়। আমলার সাহাবাবুদের ঋণশোধ করতে তাকে সুদে টাকা ধার করতে হয়েছিলো। শুধু সাহাবাবুই নয়, লোকেন পালিত, চন্দ্র ব্রাদার্স, মোতিচাঁদসহ আরো অনেকের কাছে থেকেও তিনি সুদে ধার নিয়েছেন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রয়োজনে। ধারণা করা যায়, এই দেনা-পাওনার হিসাব-নিকাশ থেকেই যোগাযোগের বিপ্রদাসের উৎপত্তি, এবং কূললক্ষ্মী কুমুদিনীর অবতারণা। নিজের দারিদ্র্য যেমন তিনি প্রিয়নাথের কাছে অসঙ্কোচে প্রকাশ করেছেন, তেমনি প্রিয়নাথও তাঁর কাছে নিজের দারিদ্র্যের কথা প্রকাশ করেছেন। প্রিয়নাথ সেনের ছেলের অসুখের সময়, প্রিয়নাথ নিজের বইগুলো বিক্রি করতে চান। সে সময় রবীন্দ্রনাথ বই বিক্রিতে বাধা দিয়ে অন্য উপায়ে টাকা জোগাড় করে দেন। প্রিয়নাথ সেনের সঙ্গে বই দেওয়া-নেওয়া নিয়ে পত্র আদান-প্রদানও তাঁর হয়েছে। মোটকথা, সমস্ত জীবন প্রিয়নাথ সেনের বন্ধুত্ব তাঁকে আনন্দ এবং নির্ভরতা দিয়েছে।

প্রায় এরূপ কথা বলা যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-৯১) সম্পর্কেও। ১৮৮২ সালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে সাহিত্যিকগণকে এক করে *সারস্বত সমাজ* নামে একটি 'পরিষৎ' গঠিত হয়। এই পরিষদের সভাপতি ছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র। রবীন্দ্রনাথ সে সময় অল্পবয়সের অবিবেচনাবসতই রাজেন্দ্রলাল মিত্রের কাছে যেতেন এবং নানারূপ আলোচনা করতেন। তিনি লিখেছেন :

> আর কাহারও সঙ্গে বাক্যালাপে এত নূতন নূতন বিষয়ে এত বেশি করিয়া ভাববার জিনিস পাই নাই। আমি মুগ্ধ হইয়া তাঁহার আলাপ শুনিতাম।[৩৪]

শুধু আলাপেই নয়, রাজেন্দ্রনালের ব্যক্তিত্বেও তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। অন্যদিকে ভৌগোলিক পরিভাষা নির্ণয়, বাংলা ভাষারীতি ও ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে বিস্তর উপকার পেয়েছিলেন। অনেক উদার-দেবসম মানুষের সংস্পর্শে এসেছিলেন তিনি। সেন্টজেবিয়ার্স স্কুলের শিক্ষক ফাদার ডি পেনেরান্ডা সম্পর্কে বলেছেন :

> ... তাঁহার ভিতরকার একটি বৃহৎ মনকে দেখিতে পাইতাম– আজও তাহা স্মরণ করিলে আমি যেন নিভৃত নিস্তব্ধ দেবমন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার পাই।[৩৫]

দেখা যায়, ব্যক্তিত্ববান ব্যক্তি পরিবেষ্ঠিত হয়ে তিনি বেড়ে উঠেছিলেন। "ডিরোজিও থেকে মুক্ত হয়ে প্রগতির দিকে যাচ্ছিল, যার শুরু রামমোহন থেকে। ডিরোজিও, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত– তাঁরা প্রগতির ধারায় কাজ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ রেনেসাঁসের সেই উত্তাপের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ রেনেসাঁসের সন্তান, এ কথা আমাদের মনে রাখা ভালো। রামমোহন, ইয়ং বেঙ্গল দল, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়সহ অনেক মনীষী মিলে বাংলা ভাষাকে

অনেকখানি সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁরা বাঙালির চিন্তাভাবনা, রুচি, পছন্দ, দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করে দিয়ে গিয়েছিলেন। সেই উত্তরাধিকার নিয়ে রবীন্দ্রনাথের জন্ম, তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বিকাশ।"[৩৬]

গঙ্গার ধারের বাগানবাড়িতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন হাওয়া বদলে সপরিবারে যেতেন, রবীন্দ্রনাথও যেতেন তাঁর সঙ্গে। সেই আলস্যে আনন্দে বিষাদে ব্যাকুলতায় স্নিগ্ধ শ্যামল নদীতীরের কলধ্বনিকরুণ দিনরাত্রি তাঁকে যেন মাতৃহস্তের অন্নপরিবেশন করতো।

> ... এই আকাশভরা আলো,এই দক্ষিণের বাতাস, এই গঙ্গার প্রবাহ, এই রাজকীয় আলস্য, এই আকাশের নীল ও পৃথিবীর সবুজের মাঝখানকার দিগন্তপ্রসারিত উদার আকাশের মধ্যে সমস্ত শরীরমন ছাড়িয়া দিয়া আত্মসমর্পণ–তৃষ্ণার জল ও ক্ষুধার খাদ্যের মতোই অত্যাবশ্যক ছিল।[৩৭]

এই গঙ্গার তীরে মোরান সাহেবের বাগান বাড়িতে তাঁরা বাস করতেন। এ বাড়ির সর্বোচ্চতলে চারদিক খোলা একটি গোল ঘর ছিল। সেখানে বসলে কেবল ঘনগাছের মাথা এবং খোলা আকাশ চোখে পড়তো। সেইখানে বসে তিনি লিখতেন। সে সম্পর্কে তিনি লিখেছেন :

> অনন্ত এ আকাশের কোলে
> টলমল মেঘের মাঝারে–
> এইখানে বাঁধিয়াছি ঘর
> তোর তরে কবিতা আমার।[৩৮]

বাদল দিনে সেই পরিবেশে তিনি গান রচনা করতেন। শোনাতেন নতুন বউঠানকে। কিন্তু তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারতেন না। তাই আরো লিখতেন। এভাবে তিনি সমৃদ্ধ হন। কাদম্বরী দেবী বেঁচে থাকতে যেমন তাঁকে গড়েছেন, তেমনি মৃত্যুতেও রেখে গেছেন রবীন্দ্রনাথের জন্য আরেক চৈতন্য। তিনি অল্প বয়সে যে সকল মৃত্যু দেখেছেন তার কথা অন্তরে গভীরভাবে রেখাপাত করে নি। বেশি বয়সে দেখা কাদম্বরীর মৃত্যু তাঁর জীবনে একটি বোধের জন্ম দিয়েছিলো। মৃত্যুর সঙ্গে এ সময়ই হয়েছিলো তাঁর স্থায়ী পরিচয়। জীবন তাঁর হাসিকান্নায় বোনা ছিলো, সেখানে মৃত্যু স্বরূপে হাজির হলো। তখন তিনি অনুভব করলেন, গাছপালা মাটিজল চন্দ্রসূর্য গ্রহতারা নিশ্চিত সত্যের মতো বিরাজ করছে অথচ যার দেহ-মন-প্রাণ ছিলো, যে সকলের চেয়ে বেশি অনুভবযোগ্য ছিলো– একজন মানুষ সেই স্বপ্নের মত মিলিয়ে গেলো। এই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে জীবনের একটি অতলস্পর্শ অন্ধকার দিক প্রকাশিত হলো। এই শূন্যতার দিকে তাকিয়ে তিনি বারবার খুঁজতে থাকেন– 'যা গেল তার পরিবর্তে কী আছে।' অর্থাৎ তিনি মৃত্যুর ভিতরের গূঢ় সত্য অনুসন্ধানে লিপ্ত হন। এ সময় তাঁর জীবনদর্শনে একটি নতুন বাঁক সংযোজন হয়। 'নাই' এবং 'আছে'র একটি যোগসূত্র নির্মানের চেষ্টা করেন তিনি। অন্ধকারকে অতিক্রমের পথ অন্ধকারে না

পেয়ে দুঃখবোধে নিমজ্জিত হয়েছিলেন। এই নিমজ্জনে সাঁতরাতে-সাঁতরাতে হঠাৎই একটি বাতিঘরের সন্ধান পান। তাঁর ভিতরে একটি অজানা সত্য উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তিনি লিখেছেন :

> এই দুঃসহ দুঃখের ভিতর দিয়া আমার মনের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে একটা আকস্মিক আনন্দের হাওয়া বহিতে লাগিল, তাহাতে আমি নিজেই আশ্চর্য হইতাম। জীবন যে একেবারে অবিচলিত নিশ্চিত নহে, এই দুঃখের সংবাদেই মনের ভার লঘু হইয়া গেল। আমরা যে নিশ্চল সত্যের পাথরে-গাঁথা দেয়ালের মধ্যে চিরদিনের কয়েদি নহি, এই চিন্তায় আমি ভিতরে ভিতরে উল্লাস বোধ করিতে লাগিলাম। যাহাকে ধরিয়াছিলাম তাহাকে ছাড়িতেই হইল, এইটাকে ক্ষতির দিক দিয়া দেখিয়া যেমন বেদনা পাইলাম তেমনি সেইক্ষণেই ইহাকে মুক্তির দিক দিয়া দেখিয়া একটা উদার শান্তি বোধ করিলাম। সংসারের বিশ্বব্যাপী অতি বিপুল ভার জীবনমৃত্যুর হরণপূরণে আপনাকে আপনি সহজেই নিয়মিত করিয়া চারি দিকে কেবলই প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, সে-ভার বদ্ধ হইয়া কাহাকেও কোনোখানে চাপিয়া রাখিয়া দিবে না– একেশ্বর জীবনের দ্যেরাত্ম্য কাহাকেও বহন করিতে হইবে না– এই কথাটা একটা আশ্চর্য নূতন সত্যের মতো আমি সেদিন যেন প্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলাম।[৩৯]

এ রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ নতুন বোধ। এই মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন জীবনের ভার আছে। আবার এই মৃত্যুতেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন এই ভারের শেষও আছে। *প্রকৃতির প্রতিশোধ*, *রাজা ও রানী*, *বিসর্জন*, *মুক্তধারা*, *নটীর পূজা*, *সতী* ইত্যাদি নাটকে এই বোধের প্রতিফলন দেখি। "মিলনে কাছে না পেয়েও যে বিরহে কাছে পাওয়া যায়– এই উপলব্ধিতে তিনি যতই পৌঁছেছেন, ততই তাঁর কবিতায় মৃত্যু আর প্রেমের দ্বৈরথ একটি দ্বৈতলীলায় রূপান্তরিত হয়েছে।"[৪০]

কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুতে তিনি আরেকটি উপলব্ধিতে উপনিত হন : সংসারের লৌকিকতার প্রতি নির্লিপ্ততা। সংসারের লোকলৌকিকতাকে সদাসর্বদা মেনে চলাকে তাঁর হাস্যকর মনে হয় : মানুষের জীবন-বেঁচে থাকাই যখন সত্য নয়, তখন তার আচার-আচরণ, নিয়ম-কানুন এত কঠোরভাবে পালনের কী আছে। তাই তিনি কোনো লৌকিকতার ধার না ধরে ধুতির উপর একটা মোটা চাদর জড়িয়ে চটি পায়ে চলে যেতেন বই কিনতে কিংবা বৃষ্টি-বাদল-শীতে তেতলায় বাইরের বারান্দায় শুয়ে থেকেছেন। আবার হয়তো গভীর অন্ধকারে মৃত্যুরাজ্যের ধ্বজপতাকা দেখার জন্য সমস্ত রাত্রির উপর অন্ধের মত হাত বুলিয়েছেন। এতে যে কেবল তিনি অনিয়মের মহড়া দিতেন তাই নয়, রাতের তারা আর ভোরের আলো তাঁকে নতুন দিগন্ত খুলে দিতো। জীবনের এই অবস্থাকে তিনি বলেছেন 'ছুটি'। তাঁর যেন সমস্ত কিছু থেকে ছুটি হয়েছে। তিনি লিখেছেন :

> ... সংসারের বেত-হাতে গুরুমহাশয়কে যখন নিতান্ত একটা ফাঁকি বলিয়া মনে হইল তখন পাঠশালার প্রত্যেক ছোটো ছোটো শাসনও এড়াইয়া মুক্তির আস্বাদনে প্রবৃত্ত হইলাম।[৪১]

এভাবেই তিনি বিভিন্ন সত্য উদ্ভাবনে লিপ্ত হন এবং জীবনলোকের প্রসারিত ছবি তাঁর সম্মুখে ফুটে ওঠে। "এক-একটা জিনিস এক-এক সময়ে তাঁহার অন্তরের মধ্যে একটা খুব নাড়া দিয়াছে, এবং তাহারই ফলে তিনি সেই জিনিসকে ভোগ করিয়াছেন, পাইয়াছেন, অনুভব করিয়াছেন; বুদ্ধিদ্বারা, চিন্তাদ্বারা তাহাকে জানিতে অথবা প্রয়োজনের খাতিরে তাহাকে একান্ত করিয়া তুলিতে চাহেন নাই।"[৪২]

তাঁদের নিজেদের বাড়ি থেকেই পত্রিকা প্রকাশ হতো। কাদম্বরী দেবীর উৎসাহে বেড়িয়েছিল 'ভারতী'। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এর নিয়মিত লেখক, তাই লেখনিতে ছেদ পড়ে নি। জ্ঞানদানন্দিনীর বিশেষ অনুরোধে ঠাকুরবাড়ি থেকে *বালক* পত্রিকা একবছরের জন্য প্রকাশ হয়েছিল। তবে, ঔষধির ন্যায় একবছর তার স্থায়ীত্বকাল থাকলেও এবং শুধু বালকদের লেখার কথা হলেও, জ্ঞানদানন্দিনীর অনুরোধে রবীন্দ্রনাথকেও লিখতে হয়েছে এ পত্রিকায়। সে লেখা দায়সারা নয়, দায়বদ্ধতারই ছিল। এরপর বেরোলো *সাধনা*। এখানেও রবীন্দ্রনাথের লেখাই প্রধান হয়ে উঠল। তাই পত্রিকাগুলোও তাঁকে লেখক হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে অনেকাংশে।

তিনি পারিবারিক কারণে সামাজিক অবস্থার বিশেষত্ববশত সাধারণ মানুষের মাঝখানে গিয়ে বসতে পারেন নি। শৈশবে যেমন ভৃত্যের খড়ির গণ্ডির মধ্যে বসে বাইরের পৃথিবীকে অনুভবের চেষ্টা করেছেন, যৌবনেও 'বিশেষত্বে'র গণ্ডিতে বসে মানুষের বিরাট হৃদয়লোকের দিকে হাত বাড়িয়েছেন। জীবনের উৎসবের সুখ-দুঃখের নিমন্ত্রণ পাওয়ার জন্য তাঁর একলা-ঘরের প্রাণ কেঁদেছে। তাই মানুষের মাঝখানে যাওয়ার, মানুষের সঙ্গে এক হওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাঁর প্রবল। পরবর্তী সময়ে এই 'বোধ' তাঁর প্রায় সবগুলো নাটকের মূলকথা হয়েছে। পারিবারিক গণ্ডির বাইরে তিনি গিয়েছিলেন জমিদারীর কাজ দেখা উপলক্ষে শিলাইদহ-সাজাদপুর[৪৩]-পতিসর-দক্ষিণডিহি। এ অঞ্চলে অবস্থান তাঁর মানসগঠনে নতুন দ্বার উন্মোচন করেছিলো। এখানে তিনি প্রকৃতি এবং মানুষের নতুন রূপ দেখতে পেয়েছিলেন। এই জনপদের অভিজ্ঞতা ছিলো তাঁর সম্পূর্ণ নতুন। প্রকৃতির সান্নিধ্য তাঁর নতুন নয়, কিন্তু এই অঞ্চলের প্রকৃতি তাঁকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে মোহিত করেছিলো। তিনি লিখেছেন :

> পৃথিবী যে বাস্তবিক কী আশ্চর্য সুন্দরী তা কলকাতায় থাকলে ভুলে যেতে হয়। এই-যে ছোটো নদীর ধারে শান্তিময় গাছপালার মধ্যে সূর্য প্রতিদিন অস্ত যাচ্ছে, এবং এই অনন্ত ধূসর নির্জন নিঃশব্দ চরের উপরে প্রতি রাত্রে শত সহস্র নক্ষত্রের নিঃশব্দ অভ্যুদয় হচ্ছে, জগৎ সংসারে এ-যে কী একটা আশ্চর্য মহৎ ঘটনা তা এখানে থাকলে তবে বোঝা যায়।[৪৪]

প্রকৃতির লীলাভূমে তিনি শুধু মুগ্ধই নন, তিনি এখানে এসে মুক্তির স্বাদও আস্বাদন করেন। "... জন্মসূত্রে যে কলকাতার প্রভাব রবীন্দ্র-জীবনে স্বাভাবিক সেখানে থাকলে বিশ্ব প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্যের সঙ্গে তার পরিচয়

ঘটত না এবং তিনি নিজেকে মহৎ সৃষ্টির উপযুক্ত করে তুলতে পারতেন না।"[৪৫] শীতের সারাবেলা মা যেমন ছেলে কোলে করে রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে গুন গুন করে দোলা দেয়, এই প্রকৃতির কোলে তাঁর নিজেকে সেই রকমই মনে হয়েছিলো। মনে হয়েছিলো প্রকৃতি তাঁকে আপন কোলে বসিয়ে গুন গুন করে গান গাইছিলো আর দোলা দিচ্ছিলো। পদ্মা নদীকে বার বার তিনি 'আমার পদ্মা' বলেছেন। তিনি লিখেছেন :

> আমাদের দুটো জীবন আছে– একটা মনুষ্যলোক, আর একটা ভাবলোক। সেই ভাবলোকের জীবনবৃত্তান্তের অনেকগুলি পৃষ্ঠা আমি এই পদ্মার উপরকার আকাশে লিখে গেছি।[৪৬]

সাজাদপুরে আসবার পথে একটি অন্তঃপুরচারিণী নদীর ঘাটে মেয়েদের জল নেওয়া, জলের ধারে বসে গামছা দিয়ে শরীর মাজা দেখে তাঁর মনে হয়েছিলো তাদের সঙ্গে নদীর যেন প্রতিদিনের মনের কথা এবং ঘরকন্নার গল্প চলে। প্রকৃতির শুধু স্নিগ্ধ রূপই তিনি দেখেন নি, দেখেছেন রুদ্ররূপও। এই ভারসাম্য তাঁকে নতুন পথের দিকে ঠেলেছিলো। সাজাদপুরে পৌঁছানোর প্রাককালে জলপথে এক দুর্যোগে পড়েছিলেন তিনি। তখন শুরু হয়েছিল প্রলয় ঝড়। তিনি লিখেছেন :

> মাঝি থেকে থেকে বলতে লাগল, 'ভয় কোরো না ভাই, আল্লার নাম করো– আল্লা মালেক।' থেকে থেকে সকলে 'আল্লা' 'আল্লা' করতে লাগল। আমাদের বোটের দুই পাশের পর্দা বাতাসে আছাড় খেয়ে খেয়ে শব্দ করতে লাগল, আমাদের বোটটা যেন একটা শিকলি-বাঁধা পাখির মতো পাখা ঝাপটে ঝট্‌পট্ ঝট্‌পট্ করছিল– ঝড়টা থেকে থেকে চীঁহি চীঁহি শব্দ করে একটা বিপর্যয় চিলের মতো হঠাৎ এসে পড়ে বোটের ঝুঁটি ধরে ছোঁ মেরে ছিঁড়ে নিয়ে যেতে চায়, বোটটা অমনি সশব্দে ধড়ফড় করে ওঠে।[৪৭]

প্রকৃতির এই খেয়াল নতুন নয়, তিনি নতুন করে অনুভব করেন এ তো মানুষেরও প্রকৃতি। এই প্রকৃতিকে রবীন্দ্রনাথ তাই প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন। এ কারণেই পৃথিবী তাঁর কাছে জীবন্ত মনে হতো। তীরে বাঁধা নৌকোয় বসে ঘাসের গন্ধ পেয়েছেন তিনি, গায়ে গরম ভাপ অনুভব করেছেন। এই ভাপকে তিনি বলেছেন পৃথিবীর নিঃশ্বাস। তিনি বলেছেন, এই নিঃশ্বাস যেমন তাঁর গায়ে লেগেছে, তেমনি তাঁর নিঃশ্বাসও পৃথিবীর গায়ে লেগেছে। তবে বোলপুরে এক ঝড়ে পরে তিনি অনেক বেশি শিক্ষা নিয়েছিলেন। প্রকৃতির শোভা দেখতে তিনজনের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলেন, তখন তাদের উপর ঝড় আছড়ে পড়েছিলো। তাঁরা বাড়ির দিকে ছুঁটেছিলেন। ধুলোয় এমন অন্ধকার যে পাঁচহাত দূরের জিনিস দেখা যায় না, কাঁকরগুলো ছিটে গায়ে বেঁধে, পায়ে কাঁটা-সুদ্ধ শুকনো ডাল বিঁধে যায়, বড় বড় বৃষ্টি মুখের উপর সবেগে আঘাত করে। এভাবে বাড়িতে এসে উঠলেন। এ সময়ই অনুভব করেছিলেন, ঝড়-বৃষ্টি ভেঙ্গে একজন নায়ক নায়িকার মধুর মুখচ্ছবি স্মরণ করে অকাতরে চলে যেতে পারবে না বরং কী করলে চোখে কাঁকর ঢুকবে না সেই চিন্তাই প্রবল হয়ে উঠবে। তিনি তাঁর লেখায় তাই

ঝড়ের সময় নিয়ে সতর্ক হওয়ার চিন্তা করেন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বৈষ্ণব কবিদেরও সমালোচনা করেছেন। গভীর রাত্রে ঝড়ের সময় রাধিকার অকাতর অভিসারে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন :

> চুলগুলোর অবস্থা যে কী রকম হত সে তো তোরা বেশ বুঝতে পারবি। বেশ-বিন্যাসেরই কিরকম দশা! ধুলোতে লিপ্ত হয়ে, তার উপর বৃষ্টির জলে কাদা জমিয়ে, কুঞ্জবনে কিরকম অপরূপ মূর্তি করে গিয়েই দাঁড়াতেন! ... পাছে দেখা যায় বলে নীলাম্বরী কাপড় পরেছেন, কিন্তু পাছে ভিজে যান বলে ছাতা নেন নি, পাছে পড়ে যান বলে বাতি আনা আবশ্যক বোধ করেন নি।[৪৮]

এমনি করে বাস্তব এবং কাব্যের বোধগত পার্থক্য করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেখার চোখ খুব তীক্ষ্ণ। প্রকৃতি কিংবা মানুষ যা-ই দেখেছেন, একেবারে সম্পূর্ণ করে দেখেছেন। দেখার মধ্যে রং-গন্ধ-অনুভব কোনো কিছুই বাদ দেন নি। এভাব তাঁর দৃষ্টি হয়ে ওঠে নিরাসক্ত। "নিরাসক্ত জীবনদৃষ্টিই রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথের নিরাসক্তি এবং সমগ্রতাবোধ পরস্পরবিরোধী নয়, একে অপরের পরিপূরক। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের নিরাসক্তি তাঁর সমগ্রতাবোধের মধ্যে নিহিত। রবীন্দ্রনাথ মানুষকে বিচার করতেন তাঁর সমগ্র জীবনের এবং দেশকাল সভ্যতার প্রেক্ষিতে, তার অস্তিত্বকে শ্রদ্ধা করে। বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে ব্যক্তিকে রূপায়িত করেছেন, রবীন্দ্রনাথ অস্তিত্বের সংঘর্ষকে অঙ্কন করেছেন। এটি সম্ভব হয়েছিল এজন্যে যে রবীন্দ্রনাথ কেবল ভাবসাধক ছিলেন না, তিনি ছিলেন রূপসাধক।"[৪৯] মৈত্রেয়ী দেবী লিখেছেন, "আদর্শবাদী বাস্তববাদী বললে কি বোঝায় জানি না, কিন্তু মনে হয় তিনি সমস্ত বাস্তবতার ভিতর দিয়ে আদর্শকে স্পর্শ করেছেন!"[৫০] তবে প্রকৃতিকে উপভোগ করবার ব্যাকুলতা তাঁর মধ্যে ছিলো। তাই জীবনের প্রত্যেক সূর্যোদয়কে সজ্ঞানভাবে অভিবাদন এবং প্রত্যেক সূর্যাস্তকে পরিচিত বন্ধুর মতো বিদায় দিয়েছেন তিনি। তিনি বলেছেন তিনি যদি সাধু প্রকৃতির লোক হতেন তবে সৎকার্যে এবং হরিনাম যপকরে কাটিয়ে দিতেন। কিন্তু তাঁর প্রকৃতি সেরূপ নয়, তিনি মনে করেছেন, যে দিনরাত্রিগুলি জীবন থেকে প্রতিদিন চলে যাচ্ছে তার সমস্তটা গ্রহণ করা দরকার। দিনরাতের সমস্ত রঙ, আলো-ছায়া, আকাশব্যাপী নিঃশব্দ সমারোহ, এই দ্যুলোক ভূলোকের মাঝখানে সমস্ত-শূন্য-পরিপূর্ণ-করা শান্তি এবং সৌন্দর্য সমস্তটা উপভোগ করতে চান। তাঁর কাছে মনে হতো এই প্রকৃতি নিজেই একটা বড় উৎসবের ক্ষেত্র। তিনি আক্ষেপ করে লিখেছিলেন :

> এত বড়ো আশ্চর্য কাণ্ডটা প্রতিদিন আমাদের বাইরে হয়ে যাচ্ছে, আর আমাদের ভিতরে ভালো করে তার সাড়া পাওয়াই যায় না! জগৎ থেকে এতই তফাতে আমরা বাস করি![৫১]

প্রকৃতির সঙ্গে এরূপ এক হওয়ার কথা *ছিন্নপত্রের* ছত্রে ছত্রে পাওয়া যায়। শিলাইদহ-সাজাদপুরের জীবন তাঁর কাছে বাল্যে পড়া রবিনসনক্রুশো পৌলভর্জিনি প্রভৃতি বইয়ের ছবির মত মনে হতো। তিনি যেন জাজ্বল্যমান ছবির মধ্যে বাস করছেন, বাস্তব জগতের কোনো কঠিনতা সেখানে নেই। এখানে এসে প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর নিজের সম্পর্ক

নিয়ে মনে হলো, এক সময় তিনি প্রকৃতির সঙ্গে এক হয়ে ছিলেন। তখন তাঁর শরীরের উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, সূর্যকিরণে সুদূরবিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ উত্থিত হতে থাকত। সে কারণেই তাঁর মনের ভাব প্রতিনিয়ত অঙ্কুরিত মুকুলিত পুলকিত আদিম পৃথিবীর ভাব। তিনি লিখেছেন :

> ... নব নব যুগে এই পৃথিবীর মাটিতে আমি জন্মেছি। আমরা দুজনে একলা মুখোমুখি করে বসলেই আমাদের সেই বহুকালের পরিচয় যেন অল্পে অল্পে মনে পড়ে।[৫২]

এই পরিচয়ের কথা তিনি বহুবার বলেছেন। "যে প্রকৃতি-চেতনা words-worth-এর বেদনাবোধ জাগিয়েছে, যে রূপ-অন্বেষা ও প্রেমানুভূতি শেলীকে আকাশচারী করেছে, সেই সৌন্দর্যচেতনা রবীন্দ্রনাথে এনেছিল এক অনন্য অনুভুতি, একপ্রকারের মুগ্ধতা বা অনুভূতি, সারা জীবনেও কবি যার সীমা-শেষ খুঁজে পাননি। সে রূপ-মাধুরীর অনুভব কবিকে 'তিলে তিলে নতুন' করে তুলেছে।"[৫৩]তিনি আলো এবং আকাশ ভালোবাসতেন। তিনি লিখেছেন :

> গেটে মরবার সময় বলেছিলেন : More light !– আমার যদি সে সময় কোনো ইচ্ছা প্রকাশ করবার থাকে তো আমি বলি : More light and more space ![৫৪]

পূর্ববঙ্গে এসে তিনি জীবজন্তুর সুখদুঃখের মধ্যেও প্রবেশ করেছিলেন। একবার পদ্মার পার ভেঙ্গে গাছ উপড়ে যায়, সেখানে গাছের অনেক পাখি মরে যায়। এই মৃত পাখিগুলোর জন্য তিনি ব্যাকুল হয়েছিলেন এবং তা নিজের মৃত্যুর চেয়ে কম শোচনীয় মনে করেন নি তিনি। তাই এখানে পাখির মাংস খেতে গেলে তাঁর নিজের ছেলেমেয়েদের কথা মনে হতো। তিনি লিখেছেন :

> পাড়াগাঁয়ে আমি ভারতবাসী হই, আর কলকাতায় গিয়ে আমি য়ুরোপীয় হয়ে যাই। কোনটা আমার যথার্থ প্রকৃতি কে জানে?[৫৫]

পূর্ববঙ্গেই তিনি সমস্ত দেশের নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করেছিলেন। "পদ্মাতীরে এসে কবি রবীন্দ্রনাথ জীবনস্রোতকে দেখে নেন ভিন্ন রূপে জলস্রোতের বিচিত্রগামিতার সঙ্গে মিলিয়ে, বুঝে নিতে পারেন প্রকৃতির সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা জীবনধারার চিরকালীন ছন্দময়তার বিষয়টি। সেক্ষেত্রে জলস্রোত ও জীবনস্রোতের মধ্যে কোনো তফাত নেই।"[৫৬]

প্রকৃতির মধ্যে এসে যে তাঁর ভাবোদয় হয় তাকে তিনি মনে করেন তাঁর নিজের স্বভাবের-নিজের শক্তির অতিরিক্ত একটা ব্যাপার। কখনো কখনো তিনি প্রকৃতির সঙ্গে এক হয়েছেন। জ্যোৎস্নার আলোকে তাঁর মনে হয়েছে শুভ্রহস্ত আদরের স্পর্শ, আকাশব্যাপী স্নিগ্ধ রাত্রি রোমে রোমে প্রবেশ করে শরীরের উত্তাপ জুড়িয়ে দিয়েছে। তিনি লিখেছেন :

> ... চোখ বুজে, কান পেতে, দেহ প্রসারিত ক'রে প্রকৃতির একমাত্র যত্নের জিনিসের মতো পড়ে থাকি: তার সহস্র সহচরী আমার সেবা করে। মনের কল্পনারও কোনো বাধা থাকে না, সেও তার দুটি হস্তে থালা সাজিয়ে অনেকগুলি ছায়াময়ী মায়াসেবিকা-পরিবৃত হয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়ায়– মৃদুমন্দ বাতাসের সঙ্গে তার কোমল অঙ্গুলির স্পর্শ আমার চুলের মধ্যে অনুভব করি।[৫৭]

শুধু নিস্তব্ধ রাত্রি নয়, সাজাদপুরে বসে শরতের দুপুরবেলার মোহও তিনি ছাড়তে পারেন নি। সেই দুপুরের আলো-বাতাস তাঁর রোমকূপের ভিতরে প্রবেশ করে রক্তের মধ্যে মিশে গেছে। প্রকৃতির এই পুনরাবৃত্তি তাঁর কাছে চির নতুনত্ব বহন করে এনেছিলো। শিলাইদহে একসন্ধ্যায় চরে বেড়াবার সময় একজন কর্মচারী জমিদারীর আলোচনা করছিল, রবীন্দ্রনাথও তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। হঠাৎ কথা বন্ধ করলে তিনি অনুভব করলেন অনন্ত জগৎ সেই সন্ধ্যার আকাশে নীরবে দাঁড়িয়েছে। একটি মানুষের কণ্ঠস্বর বন্ধ হওয়ায় নক্ষত্রলোক থেকে শান্তি নেমে তাঁর হৃদয় পরিপূর্ণ করে দেয়। তিনি মনে করলেন, যে সভার মধ্যে অনন্তকোটি জ্যোতিষ্ক নীরবে সমাগত হয়েছে তিনিও সেই সভার এক প্রান্তে স্থান পেয়েছেন।

বন্ধন ছেড়ে বেড়িয়ে পড়বার ডাকও প্রকৃতির কাছেই পাওয়া। এ বন্ধন হল প্রথা আর নিয়মের বন্ধন। তাঁর নাটকগুলোর 'ঠাকুরদা' কনসেপ্ট প্রকৃতির সান্নিধ্যেই তৈরি হয়েছে বলা যায়। পদ্মায় বোটে বসে জেলেডিঙ্গির মাঝির গান শুনে তাঁর আপন নিয়মে জীবনযাপন করতে ইচ্ছে করতো। ইচ্ছে করতো নিজেকে জানান দিতে এবং অন্যকে জানতে। "যাঁরা বলেন, রবীন্দ্রনাথ গ্রামকে দেখেছেন খুবই আলগোছে, কবির দৃষ্টিতে, আমরা যেমন সিনেমা দেখি, প্রায় তেমনিভাবে, তাঁরা মোটেই ঠিক কথা বলেন না। এঁরাই বলেন, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে প্রকৃতির অপরূপ রূপ ফুটেছে। এটা যেন একটা গালাগালি– রবীন্দ্রনাথ মানুষের দেখা পান নি বা মানুষকে দেখতে চাননি বলে প্রকৃতি দিয়েই ভরে তুলতে চেয়েছেন তাঁর ছোটগল্পের ফাঁক। এর উল্‌টোটাই কিন্তু সত্যি। তাঁর গল্পের মধ্যে প্রকৃতির যে রূপ তিনি দেখেছিলেন এবং যে রূপকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছিলেন, সেই রূপ, এখন তো আর নেই, তবু আজও তাঁর গল্পের মূল্য কিসে? আসলে প্রকৃতি নয়, প্রকৃতির পটে, অর্থাৎ চিরন্তনতার পটে– প্রকৃতির পট থেকে মানুষকে তো কখনোই বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হবে না– মানুষকে স্থাপন করতে পেরেছিলেন বলেই রবীন্দ্রনাথের গল্প প্রকৃতির নির্দিষ্ট রূপ এবং মানুষের দৈনন্দিন জীবনের দৈনন্দিন আচরণ এবং কর্ম অবলম্বন করেও প্রকৃতির এবং সমাজের নির্দিষ্টতা অতিক্রম করতে পারে।"[৫৮]হাসান আজিজুল হক লিখেছেন : "আমি পশ্চিমবঙ্গের মানুষ, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জোর দিয়ে বলতে পারি রবীন্দ্রনাথের গল্পে পশ্চিমবাংলার গ্রামের উপস্থিতি একরকম নেই বললেই চলে। ... রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের ভূগোল যদি নির্দিষ্ট করে দিতেই হয়, তাহলে সে ভূগোল পশ্চিমবঙ্গের কোনো অঞ্চলের নয়, তা তখনকার পূর্ববঙ্গের, বর্তমান বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চল অর্থাৎ পাবনা, কুষ্টিয়া,

খানিকটা বা যশোর ফরিদপুরেরই ভূগোল।"[৫৯] এ অঞ্চলই তাঁকে সাধারণ মানুষকে কাছে থেকে দেখার সুযোগ করে দিয়েছে। মানুষের অলস সময় তিনি অদ্ভূতভাবে ধরে রেখেছেন। কালীগ্রামে একদিন বোটে বসে তিনি সেই সময় এবং মানুষগুলোকে দেখেছিলেন : কেউ আপদমস্তক কাপড়ে মুড়ে রোদে নিদ্রা যাচ্ছে, কেউ দড়ি পাকাচ্ছে, কেউ রোদ পোহাচ্ছে, কেউ অনাবৃত গাত্রে অকারণে বোটের দিকে চেয়ে আছে ইত্যাদি। সাজাদপুরে একদিন তিনি বেদে পরিবারের জীবনযাপন দেখেছিলেন নিজের কাছারির জানলা দিয়ে। বেদেদের জীবনে তিনি গতিময়তা দেখেছেন। এরা একদল শুয়োর, একটি/দুটি কুকুর এবং কতকগুলো ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। তারাই বাখারির উপর দর্মা-কাপড় টাঙিয়ে তাঁর জানলার সামনে আশ্রয় নিয়েছিল। বেদে-মেয়েদের দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। বেশ ছিপছিপে লম্বা– আঁটসাঁট, অনেকটা ইংরেজ মেয়েদের মতো শরীরের স্বাধীন ভঙ্গী। অর্থাৎ বেশ অসংকোচ চাল-চলন, নড়াচড়ার মধ্যে সহজ সরল দ্রুততান আছে– তাঁর মনে হয় কালো ইংরেজের মেয়ে। এদের পারিবারিক হালচালও তাঁকে মুগ্ধ করেছিলো। পুরুষরা রান্না চড়িয়ে দিয়ে বসে বসে বাঁশের ধামা চাঙারি কুলা প্রভৃতি তৈরি করে। মেয়েরা সাপের খেলা দেখিয়ে ফেরে। এই মেয়েদেরও সৌন্দর্যের আকর্ষণ এবং মনোরঞ্জনের চেষ্টা আছে। মেয়েরা কোলের উপর ছোট্ট আয়না নিয়ে অত্যন্ত সাবধানে যত্নে সিঁথি কেটে চুল আঁচড়ায়, তারপর গামছা ভিজিয়ে মুখটি মোছে, ফিটফাট হয়ে স্বামীর সঙ্গে একটু-আধটু কাজে হাত দেয়। বেদে পরিবারের ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের সাহস বেশি। তাদেরকে নির্ভীক চিত্তে দারোগার সামনে দাঁড়াতে দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ। ভারতবর্ষে পারিবারিক এই কনসেপ্ট তাঁর মানসজগতে নতুন সংযোজন হয়েছিলো। তিনি আরও লক্ষ্য করেছেন গ্রামের মেয়েদের সাহস একটু বেশি। তাঁর নিজের দরবারেও কোনো মেয়ে নালিশ করতে এলে ঘোমটায় আচ্ছন্ন হয়ে আসে ঠিকই, কিন্তু তার কণ্ঠে ভয়-সংকোচ বা কাকুতি-মিনতি থাকে না– পরিস্কার তর্ক করে। নারীদের এই নিঃসংকোচ তাঁকে অভিভূত করে। তিনি উপলব্ধি করেন, নারীর মধ্যে এক ধরনের শক্তি আছে যার জন্য তারা সংকুচিত নয়, বোধ করি, এখানেই 'নন্দিনী'র বোধ। সম্ভবত এ সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথ এমন একজন নারীকে কল্পনা করেছেন, যে নিজের স্বাভাবিক স্বভাব দিয়ে সমাজের ভীতকে নাড়িয়ে দিতে পারে; রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে পারে।

সাজাদপুরের জমিদারীতে একজন পোস্টমাস্টারের সঙ্গে তাঁর কথোপোকথন হতো। পোস্টমাস্টারের মাধ্যমে এ অঞ্চলের প্রচলিত বিশ্বাস-মিথ জানতে পারতেন তিনি। জানলায় বা বারান্দায় দাঁড়িয়ে খেয়া পাড়াপাড়, হাটের লোকদের দেখেও কেটেছে তাঁর সময়। সাজাদপুরের ছোট নদীর দুইপারে দুই গ্রাম। মাঝখানে খেয়াঘাট। ও পারে হাট। কেউ বা ঘাসের বোঝা, কেউ বা একটা চুপড়ি, কেউ বা একটা বস্তা কাঁধে করে হাটে যাচ্ছে এবং হাট থেকে ফিরে আসছে, তাদের অল্প অল্প কলরব শোনা যাচ্ছে। তিনি লিখেছেন :

... এই সংসারের হাটে ছোটোখাটো সুখদুঃখের চেষ্টায় একটুখানি আনাগোনা দেখা যায়।[৬০]

এ ছাড়া, দোতলার সঙ্গীহীন নির্জন জানলা দিয়ে খালের উপরকার নৌকাশ্রেণি, পারের তরুমধ্যগত গ্রাম, খেয়া পারাপার, পান্থদের ছাতা হাতে চলাচল, মেয়েদের ধুনুচি ডুবিয়ে চাল ধোয়া, চাষাদের আঁটিবাঁধা পাট মাথায় নিয়ে হাটে আসা, লোকদের কাঠ চেলা করা, ছুতোরের জেলেডিঙ্গি মেরামত, ছেলেমেয়েদের খেলার কল্লোল, রাখালের গান দাঁড়ের ঝুপঝাপ ধ্বনি, কলুর ঘানির তীক্ষ্ণকাতর স্বর, পাখির ডাক-পাতার শব্দ সব মিলে বাংলার সাধারণ চিত্র দেখে আনন্দিত হয়েছিলেন। শুধু কাছারি থেকেই নয়, গ্রামের ঘাটে বোট লাগিয়েও সাধারণ মানুষকে দেখতেন তিনি। ঘাটে ছেলেদের খেলা-আনন্দহাস্য, মান-অভিমান, গায়ে কাঁদা মেখে গোসল করা, বাপের বাড়ি থেকে মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠানো– সংসারের কত কিছু তিনি দেখেছেন। জমিদারী পরগনা দেখেই তিনি অনুভব করেছিলেন দরিদ্র চাষীদের অসহায়তা : রোদ-বৃষ্টির উপর তাদের নির্ভরতা। এই দীনতা তাঁকে ব্যাথিত করেছিলো। বর্ষায় এ অঞ্চলের গ্রামগুলোর অস্বাস্থ্যকর আরামহীন জীবন দেখে ব্যাথিত হয়েছেন তিনি। মেয়েরা একখানা ভিজে শাড়ি গায়ে জড়িয়ে বাদলার ঠাণ্ডা হাওয়ায় বৃষ্টির জলে ভিজতে ভিজতে হাঁটুর উপর কাপড় তুলে জল ঠেলে ঠেলে সহিষ্ণু জন্তুর মতো ঘরকন্নার নিত্যকর্ম করছে, প্রতি ঘরে ঘরে বাতে ধরেছে, পা ফুলেছে, সর্দি হচ্ছে, জ্বর হচ্ছে, পিলেওয়ালা ছেলেগুলো অবিশ্রাম ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে কাঁদছে– এই অবহেলা অস্বাস্থ্য অসৌন্দর্য দারিদ্র বর্বরতা দেখে কষ্ট পেয়েছেন তিনি। গরীব প্রজাদের ভক্তিতে তিনি অনেক সময় কুণ্ঠিত হয়েছেন। কালীগ্রামের এক বৃদ্ধ প্রজার কথা তিনি চিঠিতে লিখেছেন। বৃদ্ধের শুভ্র সরল কোমলমনে স্থির-বিশ্বাসপূর্ণ একাগ্র নিষ্ঠা। তিনি লিখেছেন :

আমি কি এই বৃদ্ধটির রাজা হবার যোগ্য![৬১]

এই বৃদ্ধের প্রতি তিনি জমিদারের কর্তব্য করেই ক্ষান্ত হন নি, নিজের অন্তরের মঙ্গল ইচ্ছায় তার মঙ্গল কামনা করেছেন। সরল-সহজ প্রজাদের প্রতি নিজের শ্রদ্ধার কথা তাঁর অনেক চিঠিতে পাওয়া যায়। **১১১** নম্বর চিঠিতে লিখেছেন :

এদের উপর যে আমার কতখানি শ্রদ্ধা হয়, আপনার চেয়ে যে এদের কতখানি ভালো মনে হয়, তা এরা জানে না।[৬২]

এখানে জমিদার রবীন্দ্রনাথের আড়ালের মানুষ রবীন্দ্রনাথকে আমরা দেখতে পাই। জমিদারি করতে এসে তিনি জমিদারি প্রথা সম্পর্কেও বিশেষভাবে জ্ঞাত হন। এ সম্পর্কে তিনি অনেক চিঠি ইন্দিরা দেবীকে লিখেছিলেন। যে গুলোর মূল কথা হলো : জমিদারিটা আসলেই হাস্যরসপ্রিয়তা প্রকাশের জায়গাই নয়– এখানে কেবল গাম্ভীর্য এবং বিজ্ঞতা। তিনি অনুভব করেছিলেন তিনি প্রজাদের থেকে স্বতন্ত্র কেউ নন, কেবল চৌকিটার উপর বসে বসে ভান

করা। তাঁর মনে হয়, অন্তরে তিনিও প্রজাদের মতই দরিদ্র সুখদুঃখকাতর মানুষ। তিনি বুঝতে পারেন, ছেলেপিলে-গরুলাঙল-ঘরকন্না-ওয়ালা সরলহৃদয় চাষাভূষোরা তাঁকে ভুল জানে। আবার এই ভুলটি রক্ষা করার জন্য নায়েব-গোমস্তারাও নানা রকম আয়োজন চালিয়ে যায়। ঘাট থেকে কাছারি পর্যন্ত তিনি হেঁটে যাওয়ার প্রস্তাব করেছিলেন কিন্তু নায়েব তা মানতে রাজি ছিলেন না। আবার বিকেলে যখন গ্রামের ঘাটে বোট লাগান, সেই ঘাটে ছেলেদের খেলা বন্ধ করে দেয় তারা, চাষারা ঘাটে গরুকে জল খাওয়াতে আনলে তৎক্ষনাৎ লাঠি হাতে রাজমর্যাদা রক্ষা করে, মাঝিরা নিজেদের মধ্যে মন খুলে হাসি গল্প করলে তারা রাজার প্রতি অসম্মান জ্ঞান করে। রবীন্দ্রনাথের মনে হয়, প্রজারাও হয়তো তাঁর সঙ্গে অভিনয় করছে। এভাবে জমিদারের আড়াল থেকে ব্যক্তিমানুষ বেরিয়ে আসে। মানসগঠনে নতুন সংযোজন ঘটে। রাজার মনে সাধারণ মানুষের সঙ্গে এক হওয়ার আকাঙ্খা জাগতো। তাঁর *শারদোৎসব*, *ঋণশোধ*, *অচলাতন* নাটকে এই বোধ দেখা যায়। জমিদারী পেশায় পুরোনো হলে তিনি আস্তে আস্তে প্রজাদের সঙ্গে সহজ হয়ে গিয়েছিলেন। প্রজাদের কথা শুনে তিনি হাসলে প্রজারাও হেসে উঠতো। রবীন্দ্রনাথের তখন ভারি ভালো লাগতো। প্রজাদের ছেলেমানুষের মতো অকৃত্রিম স্নেহের আবদার শুনে মন আদ্র হতো। তারা তুমি বলতে-বলতে তুই সম্বোধনে নেমে আসতো, তখন রবীন্দ্রনাথের মন ভরে উঠতো। এভাবে তাঁর দেখার জগত বিস্তৃততর হয়েছিলো। তিনি এ অঞ্চলের প্রতি মুগ্ধ হয়ে লিখেছেন :

> এই প্রাচীন পৃথিবীতে কেবল সৌন্দর্য এবং মানুষের হৃদয়ের জিনিসগুলো কোনোকালেই কিছুতেই পুরোনো হয় না, তাই এই পৃথিবীটা তাজা রয়েছে এবং কবির কবিতা কোনোকালেই একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না।[৬৩]

সাজাদপুরে পুণ্যাহ'র দিন প্রজাদের ভক্তিতে মুগ্ধ হয়ে লিখেছিলেন :

> আমি যদি আমার প্রজাদের একমাত্র জমিদার হতুম তা হলে আমি এদের বড়ো সুখে রাখতুম– এবং এদের ভালোবাসায় আমিও সুখে থাকতুম।[৬৪]

এই সাজাদপুরের একজন খানসামার কাছে তিনি জীবনের চরম সত্য শিখেছিলেন। একদিন খানসামা দেরি করে আসাতে তিনি রাগ করেছিলেন। কিন্তু খানসামা জানালো আগের রাতে তার আট বছরের মেয়ে মারা গেছে। এ কথা বলেই সে ঝাড়ন নিয়ে বিছানাপত্র ঝাড়তে শুরু করে। এ ঘটনায় তিনি অনুভব করেছিলেন, কর্মই পারে বৃথা অনুশোচনার বন্ধন থেকে মুক্ত করে সম্মুখে প্রবাহিত করতে। তিনি আরো অনুভব করেছিলেন, যে মেয়ে মরে গেছে তার জন্যে শোক ছাড়া আর কিছুই করার নেই, কিন্তু যে ছেলে বেঁচে আছে তার জন্যে রীতিমতো খাটতে হবে। মানুষ তাই মৃত্যু, শোক, দুঃখ, নৈরাশ্যকে গোপন করে চাকরি করে, ব্যবসা করে, চাষ করে, মজুরি করে। তাই পৃথিবীর কর্মচক্র বন্ধ হয় না। *বিসর্জন*, *শারদোৎসব*, *ঋণশোধ*, *মুক্তধারা* ইত্যাদি নাটকে মৃত্যুর এই বোধ স্পষ্ট দেখা যায়। পূর্ববঙ্গে এসেই তাঁর মানস জগতে লালন শাহ ও বাউলদের বোধ সঞ্চারিত হয়েছিলো। "লালন শাহ

ও অন্যান্য বাউলদের জীবন-সাধনা ও সঙ্গীতচর্চা রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছিলো। তাঁর জীবন-দর্শন ও সাহিত্যকর্ম বিশ্লেষণ করলে তাতে মরমী-দর্শন ও সঙ্গীতের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মরমী গানের অন্যতম রূপকার লালন শাহের গানের ভিতর রবীন্দ্রনাথ খুঁজে পেয়েছিলেন বাংলার সনাতন সাধনার ধারাকে, যার মধ্যে নিহিত বাঙালীর অধ্যাত্ম সাধনার মর্মবাণী।"[৬৫]

পূর্ববঙ্গ থেকেই তিনি মেয়েলি ছড়া-ছেলেভুলানো ছড়া, লোকগীতি-লোকগাথা, গ্রাম্য উপকথা সংগ্রহ করেছিলেন। এগুলো থেকে তিনি আস্বাদন করেছিলেন স্বাভাবিক কাব্যরস এবং এর আড়ালের ঐতিহাসিক পটভূমি।

চলতে-চলতেই যে মানুষের মানসগঠন হয়, *ইউরোপ প্রবাসীর পত্র*, *জাপান-যাত্রী*, *যাত্রী*, *রাশিয়ার চিঠি*-তে এর উদাহরণ ছড়িয়ে রয়েছে। প্রথম ইউরোপ যাওয়ার সময় জাহাজে চলেছেন– যখন ভারতবর্ষের শেষ তটরেখা মিলে গেল, তখন তাঁর স্বদেশভূমির জন্য অবর্ণনাত্বক কষ্ট হয়েছিল। তিনি অনুভব করেছিলেন, বিলেতে না গেলে দেশের প্রতি এই মমত্ববোধ নিজের কাছে অচেনাই রয়ে যেতো। এরপর তাঁকে সমুদ্র পীড়ায় পেয়েছিল, সে-ও এক অভিজ্ঞতা বটে। পীড়া থেকে উঠেই তিনি জাহাজের বিভিন্ন মানুষের গতিবিধি এবং আচরণ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। প্রত্যক্ষ করেছিলেন সমুদ্রও। এখানে কল্পনা এবং বাস্তবের বিস্তর ব্যবধান দেখতে পান। তাঁর মনে হয় জাহাজ যেন চলছে না, কেবল একটি দিগন্তের গণ্ডির মধ্যে বাঁধা আছে। অথচ, বোম্বের উপকূলে দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখবার সময় তাঁর মনে হতো নীল জল আর নীল আকাশের মিলনে যে দিগন্ত, তার যবনিকা ওঠাতে পারলে এক অকূল অনন্ত সমুদ্র একেবারে উথলে উঠবে। দিগন্তের পর যে কী আছে তা তাঁর কল্পনাতেই থাকত– মনে হত না যে ঐ দিগন্তের পরে আরেক দিগন্ত আসবে। দূর থেকে দেখা এবং কাছে থেকে দেখার এই পার্থক্য তিনি উপলব্ধি করেন। এও এক অভিজ্ঞতা– এক বোধ। জাহাজে তিনি বিচিত্র সব মানুষের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন। এদের মধ্যে একজন সম্পর্কে জানিয়েছেন :

> তিনি কখনো বিবেচনা করে, মেজে ঘষে কথা কন না; ঠাট্টা করেন, সকল সময়ে তার মানে না থাকুক, তিনি নিজে হেসে আকুল হন। তিনি তাঁর বয়সের ও পদমানের গাম্ভির্য বুঝে হিসাব করে কথা কন না, মেপে জুকে হাসেন না ও দু-দিক বজায় রেখে মত প্রকাশ করেন না, এই-সকল কারণে তাঁকে আমার ভালো লাগত।[৬৬]

জাহাজে আরেকজন ছিলেন, যিনি ফিলজফার মানুষ কখনো চলিত ভাষায় কথা বলেন না, মনে হয় বক্তৃতা দিচ্ছেন। – এরকম বহু মানুষের জীবন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখেছিলেন তিনি। বিভিন্ন বন্দর ঘুরে তারা ইংলন্ডে পৌঁছেছিলেন। সকল শহর-হোটেল-গাড়ি-স্টিমার ইত্যাদি দেখে চলেছিলেন, অর্জিত হয়েছিলো বিচিত্র অভিজ্ঞতা। সুয়েজ শহরে গাধায় চড়ে বেড়ানো ছাড়া আর কোনো উপায় নেই, আলেকজান্দ্রিয়ায় যাওয়ার সময় চৌকোনা

বাড়ি-খেজুর কুঞ্জ, আলেকজান্দ্রিয়ার জমকালো বাড়ি-দোকান-বন্দর দেখে অবাক হয়েছেন তিনি। এরপর তিনি পৌঁছালেন ইতালিতে– য়ুরোপে প্রথম পদার্পন। এরপর যখন ব্রিন্দিসি থেকে ট্রেনে উঠলেন দুধারের দৃশ্যকে 'কবির স্বপ্নের সমস্ত ধন' বললেন। আঙুর ক্ষেত, পর্বত, নদী-হ্রদ, কুটির, শস্যক্ষেত, ছোটো-ছোটো গ্রাম– সমস্তকেই শোভা মনে হয়েছিলো। প্যারিসে গিয়ে এবং দেখে তাঁর মনে হয়েছিলো এখানে গরীব লোক নেই। তিনি বিলেত গিয়ে নারী-পুরুষদের সাধারণ বোধ সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েছিলেন। মনে করেছিলেন, বিলেতে সর্বত্র গ্ল্যাডস্টোনের বাগ্মিতা, ম্যাকসমূলরের বেদব্যাখ্যা, টিন্ড্যালের বিজ্ঞানতত্ত্ব, কার্লাইলের গভীর চিন্তা, বেনের দর্শনশাস্ত্রে মুখরিত। কিন্তু দেখা গেল, মেয়েরা বেশভূষায় লিপ্ত, পুরুষরা কাজকর্ম করছে। রাজনীতি বিষয়ে বিশেষ কোনো কোলাহল নেই। মেয়েরা জিজ্ঞাসা করে– নাচে গিয়েছিলে কি না, কনসার্ট কেমন লাগলো, থিয়েটারে একজন নতুন অ্যাকটর এসেছে, কাল অমুক জায়গায় ব্যান্ড হবে ইত্যাদি; পুরুষেরা বলবে– আফগান যুদ্ধের বিষয়ে তুমি কী বিবেচনা কর। লন্ডনের মেয়েদের কাজ তিনি বেশ ভালোভাবে প্রত্যক্ষ করেন। যারা বিবাহিত, তারা পিয়ানো বাজায়, গান গায়, আগুনের ধারে আগুন পোয়ায়, সোফায় ঠেস দিয়ে নভেল পড়ে, ভিজিটরদের সঙ্গে আলাপচারি করে ও আবশ্যক-অনাবশ্যক মতে যুবকদের সঙ্গে ফ্লার্ট করে। অন্যদিকে দেশের চির-আইবুড়ো মেয়েরা কাজের লোক– টেমপারেন্স মিটিং, ওয়ার্কিং মেন্স সোসাইটি প্রভৃতি সকলপ্রকার অনুষ্ঠানের কোলাহলে তাদের কণ্ঠ। ধনীর মেয়ে কিংবা ধনীর স্ত্রীর জীবন কর্মহীন একঘেয়েই মনে হয়েছিলো তাঁর কাছে। তাদের চাকর আছে,কাজকর্ম করতে হয় না, একজন হাউস-কীপার আছে, সে বাড়ির সমস্ত ঘরকন্নার তদারক করে, একজন গভর্নেস থাকে, যে ছেলেমেয়ের লেখাপড়া এবং অন্যান্য নানা বিষয় তদারক করে, আবার সাজসজ্জার জন্য থাকে লেডিজ মেড। সুতরাং মেয়েটির একেবারেই কোনো কাজ নেই। ইউরোপে এসে রবীন্দ্রনাথের বইয়ের দোকান সম্পর্কেও ভুল ভেঙ্গে গিয়েছিলো। তিনি ভেবেছিলেন এখানে বইয়ের দোকানের প্রাচুর্যতা বেশি, কিন্তু মদের দোকান, জুতোর দোকান, দরজির দোকান, মাংসের দোকান, খেলনার দোকান অনেক রয়েছে, কেবল বইয়ের দোকান ছাড়া। সব ছাপিয়ে চোখে পড়েছে এখানকার মানুষের ব্যস্ততা। তিনি লিখেছেন :

> মুখে যেন মহা উদ্‌বেগ, সময় তাদের ফাঁকি দিয়ে না পালায় এই তাদের প্রাণপণ চেষ্টা।[৬৭]

ব্যস্ত-কর্মময় সময় পার করলেও তাদের রয়েছে বৈকালিক এবং সান্ধ্য নাচের আসর; সেখানকার নানা রকম ডান্স, নানা রকম নিয়ম-কানুন। এ হলো লন্ডনের সাধারণ পরিবেশ। তবে, তাঁর কাছে সেখানকার সাধারণ জীবনযাপন নোংরা লেগেছিলো। সর্দি-কাশিতে তারা পিকদান ব্যবহার না করে রুমাল ব্যবহার করে– এটা রবীন্দ্রনাথের কাছে বিভৎস। তাছাড়া, চুল আঁচড়ানো, মুখ-হাত পরিস্কার করে তারা কিন্তু স্নানের বালাই নাই।– এ-ও ভারতবাসীর কাছে অপরিস্কার-নোংরামি। লন্ডনের প্রকৃতিও রবীন্দ্রনাথের কাছে কলকাতার চেয়ে অন্য রকম। ইউরোপ থেকে

তাঁর তৃতীয় পত্রে তিনি শীতের কথা লিখেছিলেন। সেখানে সকাল নয়টায় দিন আরম্ভ হয় আবার বিকেল চারটের সময়ই দিনের আলো নিভে যেতে শুরু করে। তাঁর মনে হয়েছিলো, দিনগুলো যেন দশটা চারটে আপিস করতে আসে। চ্যাঁক-ঘড়ির ডালা খুলতে খুলতেই এ দেশে দিন চলে যায়। এখানকার রাত্তির তেমনি ঘোড়ায় চড়ে আসে, আর পায়ে হেঁটে ফেরে। ভারতের মুষলধারে বৃষ্টির মত ইংলন্ডে হয় না, সেখানে বজ্রের শব্দ নেই– সারাদিন টিপটিপ করে একঘেয়ে বৃষ্টি পড়ে। রাস্তায় কাদা, পত্রহীন গাছগুলো স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেজে, কাঁচের জানলার উপর টিপ টিপ করে জল ছিটিয়ে পড়ে। আকাশ সমতল বলে মনে হয় না মেঘ করেছে, মনে হয় কোনো কারণে আকাশের রঙটা ঘুলিয়ে গেছে। আস্তে আস্তে তাপমাত্রা প্রিজিং পয়েন্টে চলে যায়, ফ্রস্ট দেখা দেয়। প্রকৃতির এই বৈচিত্র্য তিনি উপলব্ধি করেছিলেন হৃদয় দিয়ে। এছাড়া, লণ্ডনে 'হাউস অফ কমন্স' এর কার্যক্রম তিনি সচক্ষে দেখেছিলেন। তাদের আচার-আচরণ দেখে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিলো, তারা বক্তৃতা শুনে বা কোনো প্রকার যুক্তি শুনে ভোট দেবার মত স্থির করেন না। কারণ, বক্তৃতার সময় তারা কেউ কথা বলেন, কেউ কপালের উপর টুপি টেনে ঘুমান কেউ বাইরে চলে যান। তিনি বুঝতে পারেন, ভারতবর্ষ সম্পর্কে ইংরেজদের অবিবেচনার এটা একটা বড় কারণ। কারণ, তারা ভারতবর্ষ সম্পর্কে কেউ কিছু জানেনই না।

ইংরেজদের জীবনযাত্রা যতটা পেরেছেন, দেখবার চেষ্টা করেছেন। তাদের ভিতরের কুসংস্কারও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। যেমন, ইংরেজরা বছরের শেষ দিন শেষ রাত্রে জানলা খুলে রাখে। কারণ পুরোনো বছর ঘরের মধ্যে আটকা পড়ে থাকতে পারে, আবার নতুন বছর জানলার কাছে এসে বৃথাই ঘুরে ঘুরে চলে যেতে পারে। বিলেত গিয়ে তিনি ব্যারিস্টার না হলেও একেবারে রিক্ত হাতে এলেন না, এলেন সে দেশের মানুষ-সমাজ-সংস্কৃতিকে স্মৃতিতে নিয়ে। 'সাধারণ মেয়ে' কবিতায় যে নরেশের কথা লেখা আছে। তা-ও বিলেতে বাঙালিদের কার্যকলাপ দেখেই চিত্রিত। *য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র*তে লিখেছেন :

> প্রায় দেখা যায় আমাদের দেশের পুরুষরা এখানকার পুরুষ-সমাজে বড়ো মেশেন না। কারণ এখানকার পুরুষ-সমাজে মিশতে গেলে একরকম বলিষ্ঠ স্ফূর্তির ভাব থাকা চাই, বাধো বাধো মিঠে সুরে দু-চারটে সসংকোচ 'হাঁ না' দিয়ে গেলে চলে না। বাঙালি অভ্যাগত ডিনার টেবিলে তাঁর পার্শ্বস্থ মহিলাটির কানে কানে মিষ্টি মিষ্টি টুকরো টুকরো দুই-একটি কথা মৃদু ধীর স্বরে কইতে পারেন, আর সে মহিলার সহবাসে তিনি যে স্বর্গ-সুখ উপভোগ করছেন, তা তাঁর মাথার চুল থেকে বুট জুতোর আগা পর্যন্ত প্রকাশ হতে থাকে, সুতরাং মেয়ে-সমাজে বাঙালিরা পসার করে নিতে পারেন।[৬৮]

বিলেত থেকে এসেই লিখেছিলেন *বাল্মীকিপ্রতিভা*। তিনি লিখেছেন :

> এই দেশী এবং বিলাতি চর্চার মধ্যে বাল্মীকিপ্রতিভার জন্ম হইল।[৬৯]

এই নাটকটিকে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'সংগীতের নূতন পরীক্ষা'। এই পরীক্ষার প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন হাবার্ট স্পেনসরের একটা লেখায়। হাবার্ট স্পনসর বলেছেন, বস্তুত, রাগ দুঃখ আনন্দ বিস্ময় আমরা কেবলমাত্র কথা দিয়ে প্রকাশ করি না– কথার সঙ্গে সুর থাকে। এই কথাবার্তার-আনুষঙ্গিক সুরটাই উৎকর্ষসাধন করে মানুষ সংগীত পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

> ভাবিয়াছিলাম এই মত অনুসারে আগাগোড়া সুর করিয়া নানা ভাবকে গানের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়া অভিনয় করিয়া গেলে চলিবে না কেন?[৭০]

এই ভাবনার মধ্য দিয়ে তাঁর কয়েকটি নাটক লিখিত হয়েছে। প্রথমে *বাল্মীকিপ্রতিভা* তারপর *কালমৃগয়া*, *মায়ার খেলা*।

১৯১৬ সালে গিয়েছিলেন জাপান। রেঙ্গুনে দেখেছিলেন কর্মোদ্যমী মেয়েদের। বুঝতে পেরেছিলেন বাইরের কর্ম মেয়েদের উপরে জুলুম নয় বরং মুক্তি– কাজের সংকীর্ণতাই সবচেয়ে কঠোর খাঁচা। সেখানকার মেয়েরা সেই খাঁচা থেকে ছাড়া পেয়ে পূর্ণতা এবং আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তাই নিজেদের অস্তিত্ব নিয়ে তাদের কোনো সংকোচ নেই। রমণীর লাবণ্যে যেমন তারা প্রেয়সী, শক্তির মুক্তি গৌরবে তেমনি তারা মহীয়সী।– এই মুক্তির বিশালতা তাঁর মানসবৈশিষ্ট্যে বিশেষ প্রভাব ফেলেছিলো। এরপর সিঙ্গাপুরে গিয়ে একজন জাপানী রমণীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিলো। এই রমণীটির স্বামী রমণীটিরই অনুরোধে আইনব্যবসা ছেড়ে সিঙ্গাপুরে এসে দোকান খুলে ব্যবসা শুরু করেছিলেন। এতে তারা অনেক লাভবান হন। এই রমণীর পরিশ্রমে নৈপুণ্যে এবং লোকের সঙ্গে ব্যবহার কুশলতায় ক্রমাগত উন্নতি হয়। মেয়েদের কর্মনৈপুণ্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বাস্তব অভিজ্ঞতা আরো দৃঢ় হয়। তাঁর নাটকে নারীর যে বলিষ্ঠতা তা এই সকল নারীর মিলিত রূপ। ১৯১৬ সালে জাপানে এবং ১৯১৭ সালে জাভা ভ্রমণ করে সেখানকার নৃত্য দেখে তিনি মুগ্ধ হন। ভারতবর্ষীয় নর্তকী বাইজিদের আঁটপায়জামার উপর জবড়জঙ্গ কাপড়ে অসৌষ্ঠবতা– প্রচুর গয়না ঘাগরা ওড়না ভারী দেহের কাছে তাদের নৃত্যকে বাহুল্যবর্জিত সুপরিচ্ছন্ন-সামঞ্জস্য মনে হয়। তিনি একে কলাসৌন্দর্যের পরিপূর্ণ সৃষ্টি হিসেবে অনুভব করেন। তাদের হনুমানের বানরত্বের চেয়ে মনুষ্যত্বই বেশি ফুটে উঠেছে। তার লেজ আছে ঠিকই কিন্তু এমন একটি শোভনভঙ্গি যে দেখে হাসি পায় না। নাচের পোশাক পরিচ্ছদে মেয়েদেরকে দেখলে অজন্তার ছবিটিই ফুটে ওঠে। এখানে তিনি দেখলেন– 'নাচটা এদের ভাষা'। পুরাণ-ইতিহাস নাচের ভাষায় কথা বলে। নিমন্ত্রিতদের জন্য এরা নাচ আয়োজন করে। এমনকি তাদের সঙ্গীত ও নৃত্যচ্ছন্দের অনুসঙ্গ দেখার জন্য সৃষ্ট। এরই প্রভাবে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যগুলির সৃষ্টি হল। *জাভাযাত্রীর পত্র*তে পাওয়া যায়, ১৯২৭ সালে বালিদ্বীপে রাজবাড়িতে মুখোশ পরা নটেদের অভিনয় দেখেছিলেন। মুখোশ পরার কারণে নটকে আর বিশেষ মানুষরূপে দেখা যায় না, বরং বিশেষভাবে একশ্রেণির মানুষকে পাওয়া যায়। মানুষের

মুখের যে ছাঁদ তা এক-এক রকম শ্রেণি নির্দেশ করে। এই রীতি-বোধে টাইপ চরিত্র সৃষ্টি করে তিনি *তাসের দেশ* নাটক লিখলেন।

জাভায় এক রাজার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠান দেখেছিলেন, যক্ষক্ষেত্র লোকে লোকারণ্য। এতো মানুষের সমাবেশ অথচ কোনো গোলমাল, নোংরামি, অব্যবস্থা নেই। বহুদূর থেকে গ্রামের পথে পথে মেয়ে পুরুষেরা ভারে ভারে বিচিত্র রকমের নৈবেদ্য নিয়ে আসছে। যেন পুরাণে বর্ণিত যুগ প্রাণ পেয়েছে। "যেন অজন্তার শিল্পকলা চিত্রলোক থেকে প্রাণলোকে সূর্যের আলো ভোগ করতে এসেছে।"[৭১]অনুষ্ঠানের সুরুচি সুশোভন সৌন্দর্য রবীন্দ্রনাথকে অভিভূত করে। এতো বৃহৎ সমাগম, অথচ সংযত। এ যেন প্রকৃতির নিজের নিয়মের বন্ধন। এখানকার সকল অনুষ্ঠানের বৈচিত্র্যে এবং সৌন্দর্যে তিনি পুলকিত হয়ে ওঠেন। রাজ বাড়িতে দুটি বালিকার নাচ এবং তাদের সাজ-পোশাকে সৌন্দর্য এবং শালিনতা দেখে বিস্মিত হন। তাঁর কাছে মনে হয়, "বাক্যকে অধিকার করেছে কাব্য, বচনকে পেয়ে বসেছে বচনাতীত।"[৭২]

রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ায় গিয়েছিলেন ১৯৩০ সালে। রাশিয়ার অগ্রগতি দেখে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, ভারতবর্ষের সমস্ত দুঃখের একমাত্র কারণ অশিক্ষা। জাতিভেদ, ধর্মবিরোধ, কর্মজড়তা, আর্থিক দৌর্বাল্য সমস্তর মূলেই এই অশিক্ষা। শিক্ষার জন্য রাশিয়ার অচল মানুষেরা সচল হয়ে উঠেছে। অবশ্য তাদের শিক্ষা পড়া মুখস্ত করে পরীক্ষায় পাশ করার শিক্ষা নয়, মানুষ হওয়ার শিক্ষা।

> দেখতে দেখতে খুঁড়িয়ে চলবার লাঠি দিয়ে এরা ছুটে চলবার রথ বানিয়ে নিচ্ছে, পদাতিকের অধম যারা ছিল তারা বছর দশেকের মধ্যে হয়ে উঠেছে রথী। মানবসমাজে তারা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, তাদের বুদ্ধি স্ববশ, তাদের হাত-হাতিয়ার স্ববশ।[৭৩]

এক সময়, নিজের দেশের দিকে তাকিয়ে তিনি ভাগ্যকেই দোষ দিতেন। রাশিয়া ভ্রমণের পর তিনি নিজেদের কর্মকেই দোষ দিতে শুরু করলেন। রাশিয়ানদের যে শুধু জমির সত্ব এসেছে তাই নয়, তারা জ্ঞানের জন্য, আনন্দর জন্য সব কিছু অর্জন করেছে। তারা কাজ করছে ছবি, লোকসাহিত্য, লোকসংগীত নিয়ে। আবার এগুলো নিয়ে *শিক্ষার ব্যবস্থা*, *ভ্রমণ করে শিক্ষা লাভ* সবাই তারা শুরু করেছে।– এ সব দেখে তিনি অভিভূত হয়েছিলেন। কারণ দশ বছর আগে এই শ্রমিকদের অবস্থা ভারতীয় শ্রমিকদের মতোই ছিলো অথচ, তারা এতোটা এগিয়ে গিয়েছে। মস্কোকে একটি পার্ক দেখে তিনি মুগ্ধ হন। সেখানে পার্কে যারা ঘুরতে আসবে তারা তাদের ছোটো শিশুদের ধাত্রীদের জিম্মায় রেখে যেতে পারে। এখানে আছে ছোটোদের জন্য স্বতন্ত্র জায়গা। সেখানে ছেলেদের খেলনা, খেলা, থিয়েটার, লাইব্রেরি, মানচিত্র, দেয়ালে-ঝোলানো খবরের কাগজ রয়েছে। বড়োদের জন্য মণ্ডব রয়েছে, সেখানে দেশের সমস্ত সংবাদ শোনা যায়। সাধারণের জন্য কো-অপারেটিভ দোকান আছে, সেখানে মদ বিক্রি

বন্ধ। পশুশালার একটি দোকান আছে। সেখানে পাখি, মাছ, চারাগাছ পাওয়া যায়।– এই আয়োজন দেখে রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন–

> জনসাধারণকে এরা ভদ্রসাধারণের উচ্ছিষ্টে মানুষ করতে চায় না।[৭৪]

এ কারণেই রাশিয়ার শিক্ষা-কৃষি-শিল্প-সাহিত্য-আর্ট রবীন্দ্রনাথকে বিস্মিত করে। তিনি যেন নিজেই সেখানে প্রকৃত শিক্ষা লাভ করেন। তিনি একসময় চিন্তা করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, সমাজে উচুঁ নিচু দুটি শ্রেণি অনিবার্য। কিন্তু রাশিয়ায় গিয়ে তাঁর সেই ধারণা পাল্টে যায়। তিনি বলেন :

১. যে মানুষকে মানুষ সম্মান করতে পারে না সে মানুষকে মানুষ উপকার করতে অক্ষম। অন্তত যখনই নিজের স্বার্থে এসে ঠেকে তখনই মারামারি কাটাকাটি বেধে যায়। রাশিয়ায় একেবারে গোড়া ঘেঁষে এই সমস্যা সমাধান করবার চেষ্টা চলছে।[৭৫]

২. অন্য দেশে যাদের আমরা জনসাধারণ বলি এখানে তারাই একমাত্র।[৭৬]

৩. এখানে এসে সব চেয়ে যেটা আমার চোখে ভালো লেগেছে সে হচ্ছে, এই ধনগরিমার ইতরতার সম্পূর্ণ তিরোভাব। কেবলমাত্র এই কারণেই এ দেশে জনসাধারণের আত্মমর্যাদা এক মুহূর্তে অবারিত হয়েছে। চাষাভুষো সকলেই আজ অসমম্মানের বোঝা ঝেড়ে ফেলে মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছে, এইটে দেখে আমি যেমন বিস্মিত তেমনি আনন্দিত হয়েছি। মানুষে মানুষে ব্যবহার কী আশ্চর্য সহজ হয়ে গেছে।[৭৭]

৪. রাশিয়ায় এসে যদি দেখতুম এরা কেবলই মজুর সেজে কারখানাঘরের সরঞ্জাম জোগাচ্ছে আর লাঙল চালাচ্ছে, তা হলেই বুঝতুম, এরা শুকিয়ে মরবে। যে বনস্পতি পল্লবমর্মর বন্ধ করে দিয়ে খট্ খট্ আওয়াজে অহংকার করে বলতে থাকে 'আমার রসের দরকার নেই' সে নিশ্চয়ই ছুতোরের দোকানের নকল বনস্পতি– সে খুবই শক্ত হতে পারে, কিন্তু খুবই নিষ্ফল। অতএব আমি বীরপুরুষদের বলে রাখছি এবং তপস্বীদেরও সাবধান করে দিচ্ছি যে, দেশে যখন ফিরে যাব পুলিসের যষ্টিধারার শ্রাবনবর্ষণেও আমার নাচগান বন্ধ হবে না।

   রাশিয়ার নাট্যমঞ্চে যেকলাসাধনার বিকাশ হয়েছে সে অসামান্য। তার মধ্যে নূতন সৃষ্টির সাহস ক্রমাগতই দেখা দিচ্ছে, এখনো থামে নি। ওখানকার সমাজবিপ্লবে এই নূতন সৃষ্টিরই অসমসাহস কাজ করছে। এরা সমাজে রাষ্ট্রে কলাতত্ত্বে কোথাও নূতনকে ভয় করে নি।[৭৮]

৫. সোভিয়েটরা রুশসম্রাটকৃত অপমান এবং আত্মকৃত অপমানের হাত থেকে এই দেশকে বাঁচিয়েছে– অন্য দেশের ধার্মিকেরা ওদের যত নিন্দাই করুক আমি নিন্দা করতে পারব না। ধর্মমোহের চেয়ে নাস্তিকতা অনেক ভালো। রাশিয়ার বুকের 'পরে ধর্ম ও অত্যাচারী রাজার পাথর চাপা ছিল; দেশের উপর থেকে সেই পাথর নড়ে যাওয়ার কী প্রকাণ্ড নিষ্কৃতি হয়েছে, এখানে এলে সেটা স্বচক্ষে দেখতে পেতে।[৭৯]

রাশিয়া ভ্রমণে রবীন্দ্রনাথের মূল শিক্ষা হয়েছিলো দেশের কৃষক-শ্রমিক তথা নিম্নশ্রেণির মানুষের উন্নতি সাধন এবং সকল মানুষের একাত্ম হওয়া। মানুষের একাত্ম হওয়া তিনি সকল সময় চেয়েছেন কিন্তু নিজের দেশে সে ব্যবস্থা করতে পারেন নি। তাই রাশিয়ায় সে ব্যবস্থা দেখে তিনি আরো প্রেরণা পেলেন। মৃত্যুর দশ বছর আগে তাঁর এই ভ্রমণ তাঁর জীবনে অনেক বড়ো বোধের সংযোজন। এরপরই তিনি লিখেছেন *কালের যাত্রা*, *চণ্ডালিকা*, *নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা*।– এ সকল নাটকে তাঁর উঁচু-নিচু শ্রেণিকে এক করার বোধ সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পেয়েছে। আমরা দেখি যে, কাব্যনাট্য *চিত্রাঙ্গদা*'র চেয়ে নৃত্যনাট্য *চিত্রাঙ্গদা*'র 'চিত্রাঙ্গদা' বেশি শক্তিশালী-অস্তিত্ববাদী-ব্যক্তিত্বসম্পন্ন।

ভারতবর্ষের ইংরেজদের অভদ্রতা এবং অশিষ্ঠতা নিয়ে তিনি বরাবর অসন্তুষ্ট ছিলেন। ভারতবর্ষের ইংরেজরা ভারতীয়দের 'অবজ্ঞার ভাবে' দেখে বলে তিনি তাদের দুচক্ষে দেখতে পারতেন না। তাই তাঁর মনে হত, পৃথিবীর মধ্যে যখন নিজেদের কোনো প্রতিষ্ঠাভূমি হবে, পৃথিবীর কাজে যখন নিজেদের একটা কোন হাত থাকবে, তখন ইংরেজদের সঙ্গে কথা বলা উচিত। এর আগে লুকিয়ে থেকে চুপ করে আপনার কাজ করা ভালো। ইংরেজদের সঙ্গে হেসে-খেলে-যেচে-ঘেঁষে কথা বলাকে তাই তিনি মেনে নিতে পারতেন না। পাণ্ডবরা যেমন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হওয়ার সময় এক বছর অজ্ঞাতবাস করেছিলেন, গুরুগোবিন্দ যেমন তাঁর গুরুপদ গ্রহণ করার পূর্বে বহুকাল লোকচক্ষুর অন্তরালে নির্জনে প্রস্তুত হয়েছিলেন, ভারতীয়দেরও উচিত তেমনি প্রস্তুত হওয়া। যদিও ইংরেজদের দেখতে পারতেন না, তবু ইংরেজদের সান্নিধ্যে তাঁকে যেতে হত। কিন্তু তা সুখকর হত না কখনোই। তারা কথায় কথায় বলত, ভারতীয়রা জুরি হবার যোগ্য নয়– এতে তিনি কষ্ট পেতেন, বুকের ভিতরে রক্ত ফুটে উঠত কিন্তু কিছু বলতে পারতেন না। তবে পরবর্তীতে তাঁর লেখায় এ কথাগুলো স্পষ্ট হতো ঠিকই। অনেক চিঠিতে তিনি নিজেদের প্রস্তুত হওয়ার কথা বলেছেন। বলেছেন গাছের বীজ যেমন কিছুটা সময় নিয়ে মাটির উপরে আসে এ-ও তেমন। ভারতীয়দের প্রস্তুত হয়েই ইংরেজদের মোকাবেলা করতে হবে। শিক্ষিত ভারতীয়দের ইংরেজ প্রীতি এবং ইংরেজভক্তি দেখে তিনি বিরক্ত হয়েছেন। দেশের কিছু মানুষ ইংরেজদের গোলাম হতে পারলে ধন্য হয়ে যায় : যেখানে জুতো পরে যেতে দেয় না, সেখানে জুতো খুলে যায়, যেখানে মাথা তুলে যেতে দেয় না, সেখানে সেলাম করতে করতে ঢোকে, যেখানে স্বজাতির প্রবেশ নিষেধ সেখানে সাহেবের ছদ্মবেশে হাজির হয়; চেষ্টা করে, ফিকির করে, সুযোগ বুঝে, তোষামোদ করে, আপনার লোককে দূরে রেখে, স্বজাতির নিন্দায় যোগ দিয়ে, স্বদেশের সমস্ত অবমাননা পরিপাক করে যে কোনো প্রকারে ওদের সংস্রব পেতে চায়। এরূপ পরিস্থিতিতে ইংরেজদের দেওয়া খ্যাতি-সম্মানও তিনি ঘৃণা করেছেন। তিনি লিখেছেন :

> মুসলমানের শূকর যেমন, তোমাদের আদর আমার পক্ষে তেমনি। তাতে আমার জাত যায়, সত্যি জাত যায়– যাতে আত্মাবমাননা করা হয় তাতেই যথার্থ জাত যায়, নিজের কৌলীন্য এক মুহূর্তে নষ্ট হয়ে যায়– তার পরে আর আমার কিসের গৌরব![৮০]

বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই ইংরেজদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব তিক্ত হয়েছিলো। একবার কটকে অনিচ্ছা স্বত্ত্বেও জজ বিহারীবাবুর অনুরোধে ইংরেজের সঙ্গে দেখা করবার জন্য তিনি কার্ড পাঠান, কিন্তু কোনো নেটিভের সঙ্গে তৎক্ষনাৎ দেখা করতে রাজি নয় তারা; তাই রবীন্দ্রনাথকে পরদিন দেখা করতে বলে। এটা শুধুমাত্র ভারতীয়দের অবজ্ঞা প্রকাশ করার জন্যই তারা করেছিলো। এ ঘটনা একজন ভারতীয় হয়েই তাঁর আত্মসম্মানে লাগে। তিনি ইংরেজদের নিয়ে এতোই বিরূপ ছিলেন যে, লিখেছেন :

> আশ্চর্য এই আমার সব চেয়ে ভয় হয় পাছে আমি য়ুরোপে গিয়ে জন্মগ্রহণ করি।[৮১]

"রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ চরিত্রে মহত্ত্ব দেখেছিলেন আবার ইংরেজের নির্লজ্জ লোভের দিকও তাঁর নজর এড়ায় নি। দুটোকেই তিনি সত্য জেনেছেন, মহত্ত্বের দিকেই তাঁর অন্তরের টান, আর ক্ষুদ্রত্বকে তিনি নিন্দা করেছেন তীক্ষ্নতম ভাষায়।"[৮২]"যে-পাশ্চাত্যের কর্মচাঞ্চল্য শিল্প-সংস্কৃতি তাঁকে আকর্ষণ করেছিল, সেই পাশ্চাত্যের ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহের নৃশংসতা, এশিয়া ও আফ্রিকার উপনিবেশে অমানুষিক অত্যাচার কবিকে ব্যাথিত করেছিলো। কবির মনে হয়েছিলো, একদিকে দুর্বলের ভীরুতা, অন্যদিকে শক্তিমদমত্তের ঔদ্ধত্য, বিলাসিতা, স্ফীত লোভ, জাতিগর্ভ, মানবতার অপমান ঈশ্বরের প্রশান্তি চূর্ণ করেছে। কবির বিশ্বাস ঐ 'স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে' সুতরাং ঐ পাশ্চাত্যের কাছে প্রাচ্যের নেবার কিছু নেই; বরং তাঁর মনে হল–হয়তো প্রাচ্যেই আছে প্রত্যাশিত মঙ্গললোক।"[৮৩]রামায়ন-মহাভারত তো তিনি ছোটোবেলায়ই পড়ে শেষ করেছিলেন। তবে পাঠ করেছেন সারা জীবন। পড়তে পড়তে নিজের মনে পর্যালোচনা করতেন। যেমন, ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর পড়ে ভেবেছিলেন ইন্দুমতী যখন এক-একজনকে ত্যাগ করছেন, তখন নম্রভাবে সম্মান করে প্রণাম করে যাচ্ছেন। এখানে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতিকে ইউরোপীয় সংস্কৃতির সঙ্গে তুলনা করেন। তিনি লিখেছেন :

> ইংরাজ গরূবিণীর ঔদ্ধত্যের চেয়ে এ ঢের ভালো। সকলেই রাজা এবং সকলেই তার চেয়ে বয়সে বড়ো, ইন্দুমতী একটি বালিকা, সে যে তাঁদের একে একে অতিক্রম করে যাচ্ছে এই অবশ্য রূঢ়তাটুকু যদি একটি একটি সুন্দর সবিনয় প্রণাম দিয়ে না মুছে দিয়ে যেত তা হলে এই দৃশ্যের সৌন্দর্য থাকত না।[৮৪]

ভারতীয় সংস্কৃতির চির বিনয়কে তিনি এভাবেই উর্ধ্বে তুলে ধরেছেন।

১৯০০ থেকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ সক্রিয়ভাবে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলন। তাঁর ভাষণ, প্রবন্ধ, সংগীত সমগ্রজাতিকে মাতিলে তুলেছিলো। তিনি এই আন্দোলন আক্রমণাত্বক বোধে করেন নি, অহিংস পথে চলেছিলেন। এরপর আন্দোলন হিংসাত্মক হলে তিনি সেখান থেকে সরে দাঁড়ান। এরপর আর তিনি সক্রিয়

রাজনীতি করেন নি। তবে সাহিত্যে এবং উপদেশে তার দেশপ্রেম জাগ্রত ছিলো সকল সময়ই। *গোড়ায়* তাঁর মানসবোধের ঘাতপ্রতিঘাত প্রতিফলিত হয়েছে। ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডে 'স্যার' উপাধি ত্যাগ দুঃশাসনের বিরুদ্ধে তাঁর প্রবলতম প্রতিবাদ। *সভ্যতার সংকট*, *মানুষের ধর্ম* তাঁর রাজনৈতিক চেতনারই বহিঃপ্রকাশ।

জন্মকাল থেকেই তিনি দেখেছেন বাড়িতে পূর্বপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত পূজার দালান শূন্য পড়ে থাকতে। কোনো জীর্ণ যুগের শাস্ত্রীয় অবলেপন তাঁর উপরে প্রতিষ্ঠা পায় নি। তিনি আনন্দ পেয়েছেন বিশ্বদৃশ্যে– এইটিই ছিল তাঁর পূজা। ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক উপাসনা দেখে তিনি বিরক্ত হয়েছেন। বেদীতে বসে একজন সুদীর্ঘকাল বক্তৃতা করে, ধর্ম সম্পর্কে যেমন তেমন করে বলে যায়– অন্যদের তা ধৈর্যসহকারে শুনতে হয়। তিনি বুঝতে পারেন এতে মানুষের এমন কি তাঁর নিজেরও ধৈর্য থাকে না। ক্রমাগত কথা শুনতে শুনতে মন উদ্ভ্রান্ত হয়ে যায়। এতে তাঁর নিজের অশান্তি এবং বিদ্রোহের ভাব উপস্থিত হয়। তিনি এই ধর্ম-বক্তৃতাকে অনধিকার বলেছেন। তাঁর মতে সব বিষয়েরই ভালো-মন্দ দিক আছে, শুধু ধর্মের কথা হলেই তা পূণ্য নয়। তিনি লিখেছেন :

> যে ভালো করে বলতে পারে সেই বলবে এবং তারই কথা শুনব– এই হচ্ছে নিয়ম। বিষয় যত উচ্চ, বলবার লোকের ক্ষমতাও তত বেশি হওয়া চাই। কিন্তু হয়ে পড়েছে এমনি যে, প্রায় ধর্মবক্তৃতাই অযোগ্য বক্তার হাতে।[৮৫]

তিনি বেদান্তগ্রন্থ পড়ে রামমোহন রায়-ডয়্সন-সাহেবের মতো নিঃসংশয় হতে পারেন নি। তিনি মনে করেছেন বেদান্ত মত সরল, কিন্তু প্রকৃতিই সত্য।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও যদুনাথ সরকারের সাহায্যে তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাসচর্চা করেন। এরপর ভারত বর্ষের ইতিহাস এবং ভারতীয় সংস্কৃতি : আর্যদের আদিনিবাস, আর্য-অনার্য দ্বন্দ্ব এবং পরবর্তীতে সংস্কৃতির সমন্বয় চেষ্টা, শৈব-বৈষ্ণের সংঘাত-সমন্বয়, হিন্দুধর্মের প্রকৃতি, রামায়ণ-মহাভারতের সাংকেতিকতা, আশ্রমজীবন, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে ভারতীয় ধ্রুপদী আদর্শের অভিব্যক্তি, বুদ্ধদেব-বৌদ্ধধর্ম, মুসলিম শাসনকাল ইত্যাদি প্রসঙ্গে নিজের মানসবৈশিষ্ট্যে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার-বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা করেছিলেন তিনি। *আত্মশক্তি*, *ভারতবর্ষ* রচনা এই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণেরই ফল। ইতিহাসের মাধ্যমে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, ভারতবর্ষের চরিত্র ও প্রকৃতি রাষ্ট্রতন্ত্র নির্ভর নয়– সামাজিক ও সাংস্কৃতিক। উপনিষদের আশ্রম জীবন এবং প্রাচীন ভারতের শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষাপদ্ধতিতে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ভারতীয় সংস্কৃতির অহিংসা-আদর্শকেন্দ্রিক নাটক লেখেন। *কল্পনা*, *নৈবেদ্য*, *খেয়া* –র কবিতাগুলোও এই নীতি অনুসারী। বিংশ শতকের প্রথম দশক রবীন্দ্রনাথের এক অন্য উপলব্ধির সময়। "দেশকে গড়ে তুলবার সাধনা হিসেবে যখন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করছেন তিনি, 'সব

হারাবার জয়মালা' নিয়ে অন্য পথে চলবার কথা ভাবছেন যখন, তখনই একদিক থেকে আসে প্রিয়জনমৃত্যুর পরম্পরা আর অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় দুর্যোগ। কবি এসে দাঁড়ান আঘাত-সংঘাতের একেবারে মাঝখানে। ... এই পর্বের শেষ মৃত্যু-আঘাত, ছোটো ছেলে শমীন্দ্রের মৃত্যু। দুর্যোগের পর দুর্যোগের এসব আঘাত থেকে নিজেকে উত্তীর্ণ করবার জন্য চাই আরেক রকমের সংকল্প, অন্য এক দীক্ষা, আর সেও তো এক আত্মশক্তিরই বোধন। মনের নিভৃত অন্ধকারে নিজেকে দীক্ষিত করে তুলবার সেই ইতিহাসই ধরা আছে 'গীতাঞ্জলি'র পূজাশ্রয়ী গানগুলিতে, কিংবা 'রাজা' নাটকে সুদর্শনার অভিজ্ঞতায়। জীবনের পথ যে কুসুমাকীর্ণ নয়, দুঃখের ঝড় যে জীবনের মস্ত একটা পরীক্ষা, আত্মিক এই উপলব্ধি ঘটবার পর বাইরের আলোয় এসে আমরা দাঁড়াতে পারি সহজে।"[৮৬]

রবীন্দ্র-মানসগঠনে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছে উপনিষদ। তাঁর প্রথমযুগের লেখা থেকে শুরু করে শেষপর্যন্ত সমস্ত লেখায় উপনিষদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। রাজা রামমোহন রায় বিগ্রহ-বর্জিত উপাসনা-রীতির সন্ধানে ব্রহ্মসূত্র ও উপনিষদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ব্রহ্মসূত্রকে অবলম্বন করে তিনি নিরাকার উপাসনা-রীতির সমর্থন করেছিলেন এবং *বেদান্ত গ্রন্থ* রচনা করেছিলেন। প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ব্রাহ্মসমাজ। এর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। *ঈশ উপনিষদের* প্রথম পংক্তি দিয়ে শুরু হয় তাঁর সাধনজীবন। রবীন্দ্রনাথ প্রথমত পৈত্রিক সূত্রে উপনিষদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। উপনয়ন হবার পর রবীন্দ্রনাথ সোমেন্দ্রনাথ এবং সত্যপ্রাসাদকে অনেকদিন ধরে বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থে-সংগৃহীত উপনিষদের মন্ত্রগুলো বিশুদ্ধ রীতিকে বার বার আবৃত্তি করাতেন। সে সময়ই রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাই কৈশোরে উপনিষদের শ্লোকগুলো বার বার বিশুদ্ধ উচ্চারণে আবৃত্তি করতেন। আবার পিতার সঙ্গে হিমালয়ে যখন ছিলেন, তখন সূর্যোদয়কালে মহর্ষি শিশু রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে উপনিষদের মন্ত্রপাঠ দ্বারা উপাসনা করতেন। প্রথমজীবনের এই সরল-স্বাভাবিক চর্চা তাঁর সমস্ত জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল। তিনি কর্মকোলাহলের ভিতর দিয়ে, সকল উৎসব-আনন্দের মধ্য দিয়ে, জীবনের রূঢ় কঠোরতার মধ্য দিয়ে এই উপনিষদকে অনুভব করেছিলেন। শশিভূষণ দাশগুপ্ত এ সম্পর্কে বলেছেন, "উপনিষদগুলির মধ্যে প্রকাশিত যে মন আর রবীন্দ্রনাথের যে মন, এই উভয়ের মধ্যে রহিয়াছে একটা অত্যন্ত সহজ এবং আশ্চর্য মিল;"[৮৭] এ জন্যই তিনি নিজেকে বৈদিক ঋষিকবিগণের উত্তরাধিকারী বলেও পরিচয় দিয়েছেন। উপনিষদে একটিমাত্র নৈর্ব্যক্তিক সত্তাকে বিশ্বের মৌলিক শক্তিরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এর মূল কথা হল : বিশ্বসত্তা পরিকল্পিত হয়েছেন এক সর্বব্যাপী প্রচ্ছন্ন শক্তিরূপে। এই শক্তি সকল মানুষ-জীব-বস্তুতে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন। এই শক্তিই ব্রহ্ম। এ প্রসঙ্গে হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "বিশ্বশক্তি বিশ্বের মধ্যেই ছড়িয়ে রয়েছে– এই হল উপনিষদের ব্রহ্মবাদের মূল সুর।"[৮৮]ব্রহ্ম সব কিছু ব্যাপ্ত করে আছেন, ব্রহ্ম সব কিছু

ধারণ করে আছেন এবং সব কিছুর অন্তরে অধিষ্ঠান করেছেন–উপনিষদের নানা বাণীতে এই কথাই বার বার উল্লিখিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ *শান্তিনিকেতন* উপদেশমালায় উপনিষদের উদ্ধৃতি দিয়েছেন 'তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানং সর্বমেবাবিশন্তি' অর্থাৎ ধীর ব্যক্তিরা সর্বব্যাপীকে সকল দিক থেকে পেয়ে যুক্তাত্মা হয়ে সর্বত্রই প্রবেশ করেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

> এই যে আত্মা দিয়ে বিশ্বের সর্বত্র আত্মার মধ্যে প্রবেশ করা এই তো আমাদের সাধনার লক্ষ্য।[৮৯]

রবীন্দ্রনাথের উপর উপনিষদের প্রভাব সম্পর্কে ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী লিখেছেন, "তাঁর সমাজ-চিন্তা, ইতিহাস-চিন্তা, শিক্ষা-চিন্তা– এক কথায় তাঁর অখণ্ড ব্যক্তিসত্তা উপনিষদের সত্যাদর্শী ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিগণের শাশ্বত কল্যাণবাণীর দ্বারা অনুপ্রাণিত।"[৯০] *ঈশ উপনিষদে* আছে :

> তদেজতি তন্নৈজতি তদদূরে তদ্বন্তিকে।
> তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ।।[৯১]

অর্থাৎ, *তিনি চলেন, তিনি চলেন না। তিনি দূরে আছেন, তিনি নিকটেও আছেন। তিনি এই সমুদয়ের অন্তরে আছেন, তিনি এই সমুদয়ের বাহিরেও আছেন*। রবীন্দ্রনাথের 'সীমা-অসীম' -এর বোধও এ রকম। নিজের মধ্যে তিনি বিশ্বকে অনুভব করেছেন, আবার বিশ্বের মধ্যে নিজেকে অনুভব করেছেন। তিনি অন্যকে উপদেশও দিয়েছেন উপনিষদের শ্লোকের মাধ্যমে। তিনি কাদম্বিনী দেবীকে চিঠিতে লিখেছেন–

১. উপনিষদে ঋষি একটি কথা বলিয়াছেন– স এব বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা– ইহার তাৎপর্য এই যে, যিনি আমাদের সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি আমাদের বন্ধু– কারণ বন্ধুই যদি না হইবেন তবে সৃষ্টি করিলেন কেন? ... তাঁহার কাল অনন্ত তাঁহার পথ বিচিত্র এবং এই ক্ষুদ্র জীবনেই আমাদের শেষ নহে। অতএব প্রত্যহই তাঁহার প্রতি নির্ভর করিয়া থাক– ইহা নিশ্চয় মনে রাখ তিনি আমাদের এক মুহূর্ত্ত ছাড়েন না।[৯২]
২. সংসারক্লিষ্ট হৃদয়ের শান্তির জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহ ছাড়া আর কোনো উপায় নাই।[৯৩]
৩. ভগবান অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্রই আছেন– তাঁহারই আলোক আকাশ পরিব্যাপ্ত করিয়া তোমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে তাঁহারই বায়ু প্রতি মুহূর্তে নিশ্বাসরূপে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করিতেছ; তাঁহারই সঙ্গে তোমার একান্ত যোগ ত এক মুহূর্ত্তকালও বিচ্ছিন্ন নাই– যিনি এমন করিয়া ধরা দিয়াছেন সেই অন্তর্যামীকে যে কেমন করিয়া পাওয়া যায় তাহা কেহ বলিতে পারেন না।[৯৪]

পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকেও বলেছেন, প্রতিদিন ভক্তির সঙ্গে ঈশ্বরের কাছে নিজেকে নিবেদন করার কথা। বলেছেন, যিনি সকলের বড়ো তাঁকে যেন প্রতিমা দেবী সর্বত্র দেখতে পান, কঠিন দুঃখ বিপদেও যেন তাঁকে ভক্তির প্রণাম করেন, যেন মনে রাখেন সংসারের সমস্ত কর্মই তাঁর কর্ম। ঈশ্বর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বোধ স্বতন্ত্র। তাঁর কাছে ঈশ্বর সৌন্দর্যময়, মঙ্গলময়, আনন্দময়। "রবীন্দ্রনাথের সেই সৌন্দর্যময় মঙ্গলময় ঈশ্বর কোনো আনুষ্ঠানিক ধর্মের

অথবা সম্প্রদায়ের ঈশ্বর নন। তিনি প্রায় এক সেক্যুলার ঈশ্বর। রবীন্দ্রনাথ জীবন শুরু করেছিলেন ব্রাহ্ম পরিচয় দিয়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি যে-ধর্মকে স্বীকরণ করেছিলেন, তা মানুষের ধর্ম। তাতে কেবল উপনিষদ নয়, তাতে মিশে গিয়েছিলো গ্রাম-বাংলার দেবতা-বর্জিত আনুষ্ঠানিকতা-বর্জিত বাউলের সহজ ভক্তি।"[৯৫]তিনি নিজে বলেছেন :

> আমরা ধর্ম্মের নামেই অপরিচিত মুমূর্ষুকে পথের ধারে পড়ে মরে যেতে দিই পাছে জাত যায় (এ আমার জানা)– অপরিচিত মৃতদেহকে সৎকার করিনে– মানুষের স্পর্শকে বীভৎস জন্তুর চেয়ে বেশি ঘৃণা করি। ... আমরা ধর্ম্মকে আমাদের নিজের চেয়ে নেবে যেতে দিয়েছি।[৯৬]

– এই ধর্ম তাঁর নয়। সকল মানবের প্রতি সমান আচরণ তাঁর ধর্ম। তার *চণ্ডালিকা*, *সতী*, *পতিতা* ইত্যাদি নাটকে তিনি এই বোধ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

শুধু উপনিষদ নয়, জীবনযাত্রায় সমস্ত ভালোলাগা তিনি আত্মস্থ করেছিলেন। কোনো একটি মতবাদ নিয়ে স্থির থাকেন নি। বৌদ্ধধর্মের মৈত্রী-ভাবনা, বাউলের মানবতাবাদ, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের রস-সাধনা ও মধ্যযুগের মরমিয়া সাধকগণের প্রেমধর্ম তাঁর চেতনাকে সমৃদ্ধ করেছে। তেমনি গীতা-খ্রিষ্ট থেকেও তিনি বাণী আরোহন করেছেন। তিনি লিখেছেন :

> যদি কর্তা হতে চাই তবে মুক্ত হতে হবে। এইজন্য গীতা সেই যোগকেই কর্মযোগ বলেছেন যে যোগে আমরা অনাসক্ত হয়ে কর্ম করি। অনাসক্ত হয়ে কর্ম করলেই কর্মের উপর আমার পূর্ণ অধিকার জন্মে– নইলে কর্মের সঙ্গে জড়ীভূত হয়ে আমরা কর্মেরই অঙ্গীভূত হয়ে পড়ি, আমরা কর্মী হই নে।[৯৭]

এরূপ খ্রিষ্ট থেকেও তিনি উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন :

> খৃস্ট বলে গিয়েছেন, যে লোক ধনী তার পক্ষে মুক্তি বড়ো কঠিন। কেননা, যেটুকু ধন সে ছাড়তে না পারে সেইটুকু ধনই যে তাকে বাঁধে, এই বন্ধনটাকে যে যতই বড়ো করে তুলেছে সে যে ততই বিপদে পড়েছে।[৯৮]

পতিসরে তাঁর বাবুর্চিখানার নৌকা থেকে একটি মুরগি প্রাণভয়ে পালাচ্ছিল। কিন্তু 'যমদূত মানুষ' তাকে ধরে ফেলে। রবীন্দ্রনাথ তখন হঠাৎ-ই অনুভব করেন, এ অনেক বড় নিষ্ঠুরতা। এ ঘটনা তাঁকে নতুনভাবে ভাবতে শেখায়। তিনি লিখেছেন :

> আমার বোধ হয় সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ ধর্ম সর্বজীবে দয়া। প্রেম হচ্ছে সমস্ত ধর্মের মূল ভিত্তি। জগতে আমা হতে যেন দুঃখের সৃজন না হয়ে সুখের বিস্তার হতে থাকে। আমি যেন সকল প্রাণীর সুখ দুঃখ বেদনা বুঝে নিজের স্বার্থের জন্যে কাউকে আঘাত না করি– এই যথার্থ ধর্ম, এই যথার্থ ঈশ্বরচরিত্রের আদর্শে আপনাকে গঠিত করা।[৯৯]

তাই বুদ্ধদেবের জীবনাদর্শ এবং বৌদ্ধ দর্শন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একাকার হয়ে ছিল। "গৌতম বুদ্ধকে রবীন্দ্রনাথ মানুষের অধ্যাত্মবোধের স্ফটিকসংহত রূপ বলে বিবেচনা করতেন। রবীন্দ্রনাথের পরমার্থচেতনার বিশিষ্ট উৎস

গৌতম বুদ্ধ ও তাঁর ধর্মদর্শন।"[১০০]তাঁর নাটকে বৌদ্ধদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে। *রাজা*, *চণ্ডালিকা*, *মালিনী*, *নটীর পূজায়* সরাসরি বৌদ্ধ দর্শন এসেছে। তাছাড়া *বিসর্জন* বৌদ্ধ বোধে লেখা নাটক। "রবীন্দ্রনাথ দুটি সম্পন্ন ঐতিহ্যের ভিতরে মিলন ঘটিয়েছিলেন। তার প্রথমটি হল ভারতবর্ষের ঔপনিষদিক ঐতিহ্য। ঋষিদের মতো তিনিও অনুভব করেছিলেন যে এই বিশ্বজগৎ কোনও কল্যাণময় উপস্থিতির বিচিত্র বহিঃপ্রকাশ মাত্র, যে সংসারের সমস্ত দুঃখ, সংঘাত, ভাঙাচোরার অন্তরালে এমন কোনও চৈতন্যময় পুরুষ বর্তমান যিনি সব কিছুতেই নিয়ত সুষমা এবং সংগতি দান করছেন। ... রবীন্দ্রপ্রতিভার ভিতরে অপর যে মহৎ ঐতিহ্যের স্বীকরণ ঘটেছিল সেটি হল রেনেসাঁস-উত্তর পশ্চিমের মানবতন্ত্রী ঐতিহ্য।"[১০১] "রবীন্দ্রনাথের ধর্মের নাম দেয়া যায় 'মানবিকতা-ভিত্তিক আস্তিক্যবাদ'। গভীর আস্তিক্যবাদ থেকে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও ভাব উৎসারিত।"[১০২]

রবীন্দ্রনাথের জন্ম ব্রাহ্মধর্মের পরিবারে হওয়ায় তাঁর মধ্যে জন্মগতভাবেই নারীস্বাধীনতার প্রতি একধরনের উদারতা ছিলো। "ব্রাহ্ম আন্দোলনের দূরযানী সামাজিক সুকৃতির প্রধানতম দিক হচ্ছে বাঙালির জীবনাচরণে মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটানো। এই পরিবর্তনের দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপ প্রভাবিত হয়েছিলো নারীর প্রতি পুরুষের উদার শোভন ও সমতাভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিগ্রহণে এবং বঙ্গীয় সমাজে মানুষের ব্যক্তিক আচরণ ও আনুষ্ঠানিক আচার-ব্যবহারে সুরুচি ও পরিশীলনের নৈতিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে।"[১০৩] রবীন্দ্রনাথের লেখায় এই গুণগুলি বিদ্যমান – তা বলাই বাহুল্য। হুমায়ুন আজাদ লিখেছেন, "রবীন্দ্রনাথ মিত্র ছিলেন না নারীর, ছিলেন নারীর প্রতিপক্ষের এক বড়ো সেনাপতি। তিনি চেয়েছিলেন নারীরা ঘরে থাকবে, স্বামীর সেবা করবে, সন্তান পালন করবে; তবে কিছু নারী থাকবে, যারা কবিতা পড়বে, আর হবে তাঁর মতো কবির একান্ত অনুরাগিনী।"[১০৪]রবীন্দ্রনাথের নিজের পরিবারের নারীদের সম্পর্কে এ কথা সত্যিই খাটে। তিনি মেয়েদেরকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করেন নি এবং বাল্যবিবাহ দিয়েছেন। আবার বিয়েতে পণপ্রথাও মেনে নিয়েছেন। অন্যদিকে, পরিবারের বাইরের মেয়েদের শিক্ষা-সংস্কৃতিচর্চায় উৎসাহ দিয়েছেন। এ সম্পর্কে গোলাম মুরশিদ লিখেছেন, "অবরোধমুক্তি ও জীবনযাত্রার ব্যাপারে তিনি নিজের পরিবার ও অন্য নারীদের মধ্যে এই যে বৈষম্য দেখিয়েছিলেন, তা কি কেবল নিজের মেয়ে ও পরের মেয়ে বলে; নাকি সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিই বদলে গিয়েছিল বলে– তা সঠিকভাবে বলা মুশকিল।"[১০৫] এরপর তিনি আরো বলেছেন, "তবে এ কথা স্বীকার করতে হবে সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের তো কথাই নেই, তাঁর সমকালীন অন্য কোনো সাহিত্যিক অথবা ভাবুক বাঙালি নারীদের অবরোধ ও ব্যক্তিত্ব বিকাশে তাঁর মতো অবদান রাখতে পারেননি। তিনি নারী-প্রগতির বহু দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এবং তাঁর সর্বত্রগামী রচনা দিয়ে যেভাবে নারীমুক্তিকে উৎসাহিত করেছিলেন, তা বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত তুলননাহীন।"[১০৬] অবশ্য

হুমায়ুন আজাদও বলেছেন যে, শেষ পর্যন্ত নারী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মানস-পরিবর্তন ঘটেছিলো। তিনি বলেছেন, "... নারীরাই সৃষ্টি করেন এক নতুন রবীন্দ্রনাথকে, যখন তাঁর বয়স পঁচাত্তর। যে-নারীমুক্তি একদিন তাঁর কাছে ছিলো অপ্রকৃতিস্থ ভুলপ্যাককরা একদল নারীর আস্ফালন, তা এখন তাঁর কাছে হয়ে ওঠে অনিবার্য।"[১০৭]– এভাবে বহু বিতর্ক সত্বেও রবীন্দ্রনাথ নারী মিত্র হিসেবেই নিজেকে উপস্থাপন করেছেন।

সমাজের এবং ধর্মের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিশ্লেষণ প্রবণতা তাঁর মধ্যে ছিল; সে কারণে তাঁর মানসজগতে নতুন বোধের জন্ম হয়। একবার তিনি অনুভব করলেন, যাদের বক্ষের মধ্যে মন নামক পদার্থ আছে তাদেরই যত বিড়ম্বনা : বিশ্রাম নেই, কর্তব্যের শেষ নেই, মনের সন্তোষ নেই। এই মনের কারণেই তিনি আপাদমস্তক ঋণে নিমগ্ন হয়েও মাসে মাসে ঘরের কড়ি খরচ করে *সাধনা* বের করেন, অন্যদিকে নারায়ণ সিং ঘি দিয়ে আটা দিয়ে রুটি বানিয়ে দধি সংযোগে ভোজন করে তামাক টেনে দুপুরবেলায় নিদ্রা যায়। এই দুই ব্যক্তির মধ্যে কত বিভেদ : জীবন যাপনে, বোধে মননে। রবীন্দ্রনাথ যে কোনো বিষয় নিয়ে বিস্তর চিন্তা করেছেন। তিনি নিজে বলেছেন :

> মন জিনিষটা বুল্‌স্‌-আই লণ্ঠনের মতো। যে সময়ে যে পদার্থের উপর চিন্তার আলোক নিক্ষেপ করে তার পাশের জিনিষটাকে দেখতে পায় না– এমন-কি সেটাকে আরও দ্বিগুণ অন্ধকার করে দিয়ে কেবল একটি জিনিষকেই অতিরিক্ত জাজ্বল্যমান করে তোলে।[১০৮]

এই দেখার কারণে তাঁর মানসজগৎ সাধারণের চেয়ে আলাদা হয়েছে। তিনি বৃহৎ সংসারের একটি অংশকে আলাদা করে তার প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন, সংসারের অন্যদের সঙ্গে জুরে দিয়ে ঐ নির্দিষ্ট বিষয়ের বোধকে খাটো করেন নি। এই গভীর অনুভব তাঁর ভিতরে বিভিন্ন চেতনার জন্ম দিয়েছে, যা দার্শনিক মতবাদে পৌঁছেছে। "সাধারণত বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে লোকের রক্ষণশীলতাও বাড়ে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বেলায় হয়েছে ঠিক উল্টো; যত বয়স বেড়েছে ততই তিনি মুক্ত হয়েছেন, যা সাময়িক, প্রথাগত, যা দেশে-কালে আপেক্ষিক, যা লোকাচারের সংস্কার কিংবা ব্যবহারিক বিধি মাত্র, সে-সমস্তের উর্ধ্বে গেছে তাঁর দৃষ্টি, নীতির চেয়ে সত্যকে বড়ো করে দেখেছেন, রীতির চেয়ে জীবনকে। ... কুমুও তো সেই অতীত যুগেরই মেয়ে কিন্তু 'যোগাযোগ' সম্পূর্ণ হলে দেখা যেতো কুমু প্রাণপণ করেও সামাজিক প্রথাকে শেষ পর্যন্ত মেনে নিতে পারলে না।"[১০৯]

বৈচিত্র্যময় জীবনযাপন করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাই তাঁর সাহিত্য ভাণ্ডারও বৈচিত্র্যের আকর। রবীন্দ্রনাথ একটি আদর্শে বা একটি চিন্তা-চেতনায় স্থিত হন নি। অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ হয়ে নতুন জ্ঞানে প্রবেশ করে যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে সত্যকে-সুন্দরকে গ্রহণ করেছেন। সহজ-স্বাভাবিক প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের আনন্দের উৎসভূমি। তিনি শেলিকে অনেক

বড়লোকের চেয়ে ভালোবাসতেন কেবলমাত্র দ্বিধাহীন চরিত্রের জন্য। ভারতবর্ষের মানুষের দু রকম মানসিকতা : গৃহস্থ এবং সন্ন্যাসী। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ছিল এই দুইয়ের সমন্বয়। ঘরের কোণ যেমন তাঁকে টেনেছে, ঘরের বাহিরও তেমন তাঁকে আহ্বান করেছে। তিনি লিখেছেন :

> খুব ভ্রমণ করে করে দেখে বেড়াব ইচ্ছে করে, আবার উদভ্রান্ত শ্রান্ত মন একটি নীড়ের জন্যে লালায়িত হয়ে ওঠে।[১১০]

আজীবন অভিজ্ঞতায় এবং অনুভূতিতে তিনি সত্যের অন্বেষণ করেছিলেন। কোনো আরোপিত বিষয়কে অবলম্বন করে তিনি বেড়ে ওঠেন নি। তিনি নিজে বার বার বলেছেন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তিনি 'হয়ে উঠেছেন'। যেমন তিনি মত দিয়েছেন :

১. কোনো জিনিষ যথার্থ উপভোগ করতে গেলে তার চতুর্দিকে অবসরের বেড়া দিয়ে ঘিরে নিতে হয়– তাকে বেশ অনেকখানি মেলিয়ে দিয়ে, ছড়িয়ে দিয়ে, চতুর্দিকে বিছিয়ে দিয়ে, তবে তাকে ষোলো-আনা আয়ত্ত করা যায়।[১১১]

২. অন্যে কতটা দিতে পারে তা নিয়ে নালিশ-ফরিয়াদি করা ভুল, আমি কতটা নিতে পারি এইটেই হচ্ছে আসল কথা। ... সে শিক্ষা লাভ করতে জীবনের প্রায় বারো আনা কাল চলে যায়, তার পরে সে শিক্ষার ফলভোগ করবার আর বড়ো সময় পাওয়া যায় না।[১১২]

৩. ভালো জিনিষ এবং প্রিয় জিনিষ রক্ষা করতে যদি দুঃখ সইতেই হয় তা হলে দুঃখ সব– তা, আমি থাকি আর আমার জগৎটি থাকুক। ... সে দুঃখের চেয়ে যখন অস্তিত্ব ভালোবাসি এবং অস্তিত্বের জন্যই সে দুঃখ বহন করি, তখন তো আর কোনো কথা শোভা পায় না।[১১৩]

৪. ... আমাদের সব স্নেহ সব ভালোবাসাই রহস্যময়ের পূজা– কেবল সেটা আমরা অচেতন ভাবে করি।[১১৪]

৫. আমাদের ক্ষণিক জীবন যে সুখ দুঃখ ভোগ করে আমাদের চিরজীবন তার থেকে সারাংশ গ্রহণ করে।[১১৫]

রবীন্দ্রনাথ জনবহুল এবং নির্জন দুই জায়গাতেই জীবনযাপন করেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন মফস্বলে একলা থাকবার সময় পাওয়া চিঠিগুলোর প্রত্যেকটি অক্ষরকে গ্রহণ করতে পারেন, শব্দের ভেতর দিয়ে মনের কল্পনা পর্যন্ত ধরা পড়ে; আবার প্রকৃতির প্রতিটি অঙ্গও এরূপ অনুভব করবার অবসর পান। তাই দ্বিধাহীনভাবেই বলেছেন, অবসরের বেড়া না থাকলে ঠিকভাবে উপভোগ করা যায় না। দ্বিতীয় উদাহরণটিও নিজের অভিজ্ঞতায়ই সিক্ত। যা হাতের কাছে আসে তা হস্তগত না করে ভবিষ্যতের জন্য ফেলে রাখা ত্যাগ করারই মতো, কেননা জীবনের সময় খুব কম। এ কথা ওমর খৈয়ামের কথায়ও পাওয়া যায় :

> নগ্‌আ যা পা'স তাই ধরে থাক, ধারের পণ্য করিসনে।[১১৬]

তৃতীয় উদ্ধৃতির দুঃখভোগ ভারতবর্ষীয় আদি বোধ। দুঃখের মধ্য দিয়ে মানুষ লক্ষ্যে পৌঁছায়। রবীন্দ্রনাথের অনেক নাটকেই এই বোধ প্রতিষ্ঠালাভ করেছে।

তিনি সকল সময়ই সময়কে কাজে লাগাতে চেয়েছেন। একটু সময়ও যেন বৃথা নষ্ট না হয়। প্রতিমা দেবীদের কাছে মিস্ বুর্ডেট্স এলে তাকে শুধু বসিয়ে না রেখে তাঁকে কাজে লাগাতে বলেন। প্রতিমা দেবীকে তার কাছে শেলাই শিখে নিয়ে, তার সঙ্গে কথা বলে ইংরেজি বলার অভ্যাস করতে বলেন। আবার, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাহাজে চড়ার ইচ্ছা করলে তিনি জাহাজে করে জাপানে গিয়ে দেখেশুনে শিখে আসতে বলেন, যেন সময় এবং খরচপত্র সার্থক হয়। অন্যদিকে কাজপ্রিয় লোককে সাহায্য করাও তাঁর বৈশিষ্ট্যের একটি ছিলো। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুকে তাঁর গবেষণার জন্য তিনি ত্রিপুরার রাজার কাছ থেকে সাহায্য জোগাড় করে দেন অকুণ্ঠে-সানন্দে। তিনি জগদীশচন্দ্র বসুকে সাহস এবং উৎসাহ দিয়েছেন এভাবে–

> আপনার সফলতার পথে যদি আপনার স্বদেশও অন্তরায় হয় তবে তাহাকেও ক্ষুণ্ন মনে বিদায় দিতে হইবে।[১১৭]

এ কথার অর্থ দাঁড়ালো, কাজের সাফল্যের জন্য প্রিয়জনকে ছাড়তে রবীন্দ্রনাথ দ্বিধান্বিত ছিলেন না, তাই এই পরামর্শ তিনি জগদীশচন্দ্র বসুকে দিয়েছিলেন। কিন্তু বিদেশে জগদীশচন্দ্র বসুকে উপার্জন করতে হতো। এতে তাঁর গবেষণায় ব্যঘাত ঘটতো। বিজ্ঞানীর বিজ্ঞান সাধনায় তাঁকে মুক্ত করে কেবলমাত্র গবেষণায় রাখলে তিনি নিবিষ্ট মনে গবেষণা করতে পারেন। তাই রবীন্দ্রনাথ চেয়েছেন জগদীশচন্দ্র বসুকে সব দিক দিয়ে মুক্ত রাখতে। এ হলো রবীন্দ্র-মানসের স্বদেশ প্রেমের বহিঃপ্রকাশ। তিনি বলেছেন :

> আচ্ছা, তুমি এদেশে থেকেই যদি কাজ করতে চাও তোমাকে কি আমরা সকলে মিলে স্বাধীন করে দিতে পারি নে? কাজ করে তুমি সামান্য যে টাকাটা পাও সেটা যদি আমরা পূরিয়ে দিতে না পারি তা হলে আমাদের ধিক্। ... পায়ে বন্ধন জড়িয়ে পদে পদে লাঞ্ছনা সহ্য করে তুমি কাজ করতে পারবে কেন? আমরা তোমাকে মুক্তি দিতে ইচ্ছা করি।[১১৮]

শুধু প্রয়োজন আর দায়িত্বের কাজই নয়, আনন্দ করাও তাঁর কাছে প্রয়োজনীয়। তিনি প্রতিমা দেবীকে লিখেছিলেন :

> যতদিন তোমরা যেখানে থাকতে ইচ্ছা কর বেশ ভাল করে দেখে শুনে বেড়িয়ে চেড়িয়ে আনন্দ করে শরীর মনকে প্রফুল্ল করে তবে ফিরে এসো– কোনো কারণেই তাড়াতাড়ি কোরো না।[১১৯]

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত জীবনের সাধনা আনন্দের সাধনা। মানুষ নিজের ইচ্ছেয় নিজের মতো করে চলবে, এটা তাঁর সর্বাত্মক চাওয়া ছিলো। এবং তিনি মনে করেছিলেন, একজন মানুষের এটা অধিকার। কিন্তু দেশের মধ্যে এর কোনো চর্চা না দেখে তিনি বিমর্ষ হতেন। তিনি লিখেছেন ;

> আমার মনে আছে শান্তিনিকেতনে যখন দক্ষিণ-আফ্রিকা থেকে ফিরে এসে মহাত্মাজীর ছাত্রেরা ছিল তখন একদিন তাদের মধ্যে একজনকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, আমাদের ছেলেদের সঙ্গে পারুল-বনে বেড়াতে যেতে ইচ্ছা কর কি। সে বললে, জানি নে। এ সম্বন্ধে সে তাদের দলপতিকে জিজ্ঞাসা করতে চাইলে। আমি বললুম, জিজ্ঞাসা পরে কোরো, কিন্তু বেড়াতে যেতে তোমার ইচ্ছা আছে কি না আমাকে বলো। সে বললে, আমি জানি নে। অর্থাৎ এ ছাত্র স্বয়ং কোনো বিষয়ে কিছু ইচ্ছা করবার চর্চাই করে না; তাকে চালনা করা হয়, সে চলে, আপনা থেকে তাকে কিছু ভাবতে হয় না।[১২০]

– এ রকম মানুষ-পুতুলদের নিয়ে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার অন্ত ছিলো না। ভারতবর্ষের এই জালে আবদ্ধ মানুষের মুক্তির চিন্তা তিনি করেছেন। লিখেছিলেন *রাজা*, *ডাকঘর*, *অচলায়তন*, *তাসের দেশ* নাটক। ভাঙ্গতে চেয়েছিলেন আবদ্ধতার বেড়া। জাপান সম্পর্কে লিখেছিলেন–

> কত লোকের সত্যিকার শক্তি এবং প্রেম এদের দেশকে উপরে তুলে রেখেছে। আমাদের শক্তিহীন ভক্তিহীন দুর্ব্বল সৌখিনতার কথা স্মরণ করলে কোনো আশা থাকে না।[১২১]

– সবচেয়ে বড়ো কথা হলো নিরাশ হয়েও আবার তিনি আশার স্বপ্ন দেখেছিলেন। কাজ করেছেন, লিখেছেন, উপদেশ দিয়েছেন।– এই হলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। "তিনি নিজেকে সারাজীবন ধরে ভেঙ্গেছেন ও গড়েছেন, রূপদক্ষতায় শুধু নয়, চিন্তায় ও চেতনায়। তাঁর সৃষ্টির ইতিহাসে বারংবার ঋতু পরিবর্তন আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে।"[১২২]"জীবন-প্রভাত থেকে মৃত্যু-মুহূর্ত অবধি তিনি নব নব রাগে বিচিত্র অনুভবে নিজেকে রচনা করে গেছেন। চিন্তার ও কর্মের বহুধা ও বর্ণালি অভিব্যক্তিতে তাঁর জীবন বিপুল, বিচিত্র ও জটিল হয়ে প্রকটিত হয়েছে। বয়স তাঁর যতই বেড়েছে, তাঁর মনের দিগন্তও ততই হয়েছে প্রসারিত।"[১২৩]

সাধারণ গৃহস্থের মতো সংসারের ভার তাঁকে পুরোপুরিই বইতে হয়েছিলো। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সম্পূর্ণভাবে পারিবারিক মানুষ। শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা করে সেখানে রথীন্দ্রনাথ এবং প্রতিমা দেবীকে যুক্ত রেখেছিলেন– আলাদা করেন নি, সমস্ত পৃথিবীতে ঘুরে বেড়িয়েছেন কিন্তু পরিবারের শেকর আলগা করেন নি। এছাড়া রবীন্দ্রনাথকে বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়েই চলতে হতো। অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া, যৌতুক দেওয়া, মেয়েদের অসুস্থতা, মেয়েদের সাংসারিক অশান্তি, পিতার অসুস্থতা, আত্মীয়-বন্ধুজনের মৃত্যু, শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ধার-দেনা গ্রহণ-পরিশোধ ইত্যাদি বিপত্তির মধ্য দিয়ে চলেই তিনি জগতের দুঃখকে অনুভব করেছিলেন। এছাড়া 'শনিবারের চিঠি'র আক্রমণ তাকে যন্ত্রনাদগ্ধ করেছিলো। তারপরও তিনি থামেন নি। রবীন্দ্রনাথ বাঙালি সংস্কৃতিতে একটি সামগ্রিক আদর্শ গড়ে তুলেছেন। "রবীন্দ্রনাথের বাল্য-পরিবেশ গড়ে উঠেছিল কলকাতায়, যে-কলকাতা তখন কেবল বর্তমান রূপ গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছে বিদেশি ধনিক-রাষ্ট্রের প্রভুত্বের

আওতায়। তাঁর প্রতিভার যৌবনোন্মেষ ঘটল বাংলার সমতলক্ষেত্রে ক্ষীয়মাণ পল্লীসমাজের শীতল ছায়ায় এবং কতকাংশে নগরনির্ভর, নূতন ও প্রাগ্রসর মধ্যবিত্তসমাজের উজ্জ্বল কিরণপাতে। তারপর, পঞ্চাশোর্ধ্বে তিনি পদক্ষেপ করলেন বৃহত্তর পৃথিবীর আঙিনায় যেখানে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে ঊনবিংশ শতকের শেষ পাদ এবং বিংশ শতকের প্রথম যুগের বিচিত্র ও গভীর সমাজ-মানসের চঞ্চল জীবন-নাট্যের অভিনয়। ... এই সুদীর্ঘ ব্যক্তি-ইতিহাসের আর বাংলার নগরনির্ভর শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজজীবনের সঙ্গে বৃহত্তম পৃথিবীর প্রবহমান জীবনধারার যোগ এবং বাঙালির সমগ্র জীবনে পরদেশি ধনিক-রাষ্ট্রবাহিত বৃহত্তর পৃথিবীর জীবনধারার অসংখ্য শাখা প্রশাখার বিস্তার– এ দু'য়ের মর্মবাণী ও ঐতিহাসিক ইঙ্গিত একই। এই উভয়ই রবীন্দ্র-মানসপ্রকাশের ভিতর একটি অখণ্ড ঐক্য রূপায়ণ লাভ করেছে।"[১২৪]

রবীন্দ্রনাথের প্রায় ছয়-সাত বছর বয়স থেকে প্রকৃতি দেখা এবং কল্পনা করা শুরু হয়েছে। এগারো বছর বয়স থেকে শুরু করে সমস্ত জীবন ভারতবর্ষের বিভিন্নস্থান, এশিয়া-ইউরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন জায়গা ঘুরে বেড়িয়েছিলেন, বিভিন্ন শ্রেণির বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে মিশেছিলেন, দেখেছিলেন বিভিন্ন সংস্কৃতি-কৃষ্টি, মরমিয়া সাধক-কবি, বাউল সম্প্রদায়, মানুষের আচার-আচরণ-বোধ, শুনেছিলেন নানা লোককাহিনি-রূপকথা-উপকথা-গান, সিনেমেটিক ছবির মতো দেখেছিলেন দেশ ও জাতির বিভিন্ন পরিস্থিতি, পড়েছেন দেশ ও বিদেশের সাহিত্য-ইতিহাস, একাত্ম হয়েছেন প্রকৃতির সঙ্গে। এভাবে চলতে চলতে দেখতে দেখতে পড়তে পড়তে এক নিজস্ব স্বতন্ত্র বোধ তৈরি হয়েছিলো তাঁর। উপরের আলোচনায় দেখেছি তিনি আত্মস্থ করেছিলেন বেদ-উপনিষদ-রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ-বৌদ্ধধর্ম-সংস্কৃত সাহিত্য। অর্থাৎ প্রায় তিন হাজার বছরের সাহিত্য বোধ এবং ভ্রমণজাত অভিজ্ঞতার সঙ্গে সমসাময়িক কালের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে রবীন্দ্র মানসবোধ। এই মানসবোধেই পূর্ণ হয়েছে তাঁর সৃষ্টি সম্ভার।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি*, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, নবমখণ্ড (সুলভ সংস্করণ), পৌষ ১৪১০, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৪১২

২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪১৫

৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪১৮

৪. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪২৭

৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫০০

৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,*ছেলেবেলা*,*রবীন্দ্র রচনাবলী*, ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৭৩৭

৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি*, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, নবমখণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৬১

৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪১৪

৯. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪১৩

১০. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪১৬

১১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৯২

১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রভাত-উৎসব, *প্রভাতসংগীত*,*রবীন্দ্র রচনাবলী*, প্রথমখণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৫

১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ছিন্নপত্রাবলী*, ১৪১১, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃষ্ঠা-২৫৯

১৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি*, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, নবমখণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৩৯

১৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৩৯

১৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৬২

১৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,*চিঠিপত্র*, ঊনবিংশ খণ্ড, ১৩৯৯, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৫০

১৮. জ্যোতিপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, সূত্র– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি*, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, নবমখণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪২৩

১৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি*, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, নবমখণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৫৭

২০. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৫৮

২১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৫৮

২২. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সূত্র– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৪৩

২৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র*, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, প্রথমখণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮২৮

২৪. সৌদামিনী দেবী, সূত্র– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি*, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, নবমখণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৫০

২৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি*, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, নবমখণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৫৮

২৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,*ছেলেবেলা*,*রবীন্দ্র রচনাবলী*, ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৭২৮

২৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি*, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, নবমখণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৮৬

২৮. আবুল কাসেম ফজলুল হক, রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য, *সাহিত্যচিন্তা*, ১৯৯৫, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৩৬

২৯. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রজীবনী*, প্রথম খণ্ড, ১৪১৭, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৭৬

৩০. হায়াৎ মামুদ, বাঙালির সংস্কৃতি : রবীন্দ্রননাথের উপলব্ধি ও নির্মাণ, *ভ্রমি বিস্ময়ে প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ*, শব্দশৈলী, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৬২-৬৩

৩১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৯১

৩২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,*চিঠিপত্র*, অষ্টম খণ্ড, ১৩৯৯, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৩৩

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৬

৩৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র*, নবম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৯৭

৩৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি*, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, নবমখণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৫১

৩৬. আবুল কাসেম ফজলুল হক, আলোচনা, *রবীন্দ্রনাথ, এই সময়ে*, ২০১২, সম্পা. আনিসুজ্জামান, প্রথমা, ঢাকা, পৃষ্ঠা-২২৬

৩৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৮৮

৩৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গান আরম্ভ, *সন্ধ্যাসংগীত*,*রবীন্দ্র রচনাবলী*, প্রথমখণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৯

৩৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি*, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, নবমখণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫০৯

৪০. তপোব্রত ঘোষ, রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি রূপকল্প : বিষয় মৃত্যু, *নানা রবীন্দ্রনাথের মালা*, ২০১০, সম্পা. সুধীর চক্রবর্তী, পত্রলেখা, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৮২

৪১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫১০

৪২. নীহাররঞ্জন রায়, *ভারতীয় ঐতিহ্য ও রবীন্দ্রনাথ*, ২০০৪, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১৮

৪৩. 'সাজাদপুর' শব্দটিতে 'স' বর্ণ রবীন্দ্রনাথ লিখতেন। রবীন্দ্রনাথের আগে এবং পরের কিছু দিন এই বানানেই এলাকার নামটি লেখা হতো। পরবর্তী সময়ে পরিবর্তিত হয়ে 'শাহজাদপুর' হয়। এই অভিসন্দর্ভে রবীন্দ্রনাথের লেখা বানানটিই রাখা হলো।

৪৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ছিন্নপত্রাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪২

৪৫. আবু মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, বাংলাদেশ : রবীন্দ্র-সাহিত্যের মূল ভূখণ্ড, *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*, ২০১১, সম্পা. মোবারক হোসেন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১৬৬

৪৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২১৩

৪৭. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৫

৪৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮৫

৪৯. সৈয়দ আকরম হোসেন, *রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস দেশকাল ও শিল্পরূপ*, ১৯৬৯, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১৭২

৫০. মৈত্রেয়ী দেবী, *মংপুতে রবীন্দ্রনাথ*, ২০০৭, প্রাইমা পাবলিকেশনস্, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৪৫

৫১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ছিন্নপত্রাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৯১

৫২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১১৫

৫৩. আহমদ শরীফ, সৌন্দর্যবুদ্ধি ও রবীন্দ্রমনীষা, বিচিত চিন্তা, *আহমদ শরীফ রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, ২০১০, সম্পা. আহমদ কবির, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১৭৯-১৮০

৫৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৩৪

৫৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২১৫

৫৬. আহমদ রফিক, রবীন্দ্রনাথ : তাঁর প্রিয়সঙ্গিনী পদ্মা, *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*, প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-১৪৮

৫৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২২০

৫৮. হাসান আজিজুল হক, গ্রামের কথকতা : রবীন্দ্রনাথ, *রচনাসংগ্রহ*, চতুর্থ খণ্ড, ২০০৩, সাহিত্যিকা, ঢাকা, পৃষ্ঠ-২৮০

৫৯. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৭৭

৬০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৭

৬১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৪৯

৬২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৭১

৬৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৭৭

৬৪. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩১৪

৬৫. ডক্টর শাহীদা আখতার, রবীন্দ্রনাথ ও লালনশাহ, *রবীন্দ্রনাথ তুলনামূলক আলোচনা*, ২০০১, সম্পা. অধ্যাপক নীল কমল বিশ্বাস, এশিয়া পাবলিকেশনস, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১৭৩-১৭৪

৬৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র*, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, প্রথমখণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৭৯৯

৬৭. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮০৪

৬৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮১২

৬৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি*, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, নবমখণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৮২

৭০. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৮৩

৭১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র*, তৃতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৫

৭২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬৬

৭৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রাশিয়ার চিঠি*, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দশমখণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৭৯

৭৪. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৮৯

৭৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৫৫

৭৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৫৭

৭৭. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৫৮

৭৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৭৭

৭৯. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৭৮

৮০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ছিন্নপত্রাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১২২

৮১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৫১

৮২. জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী,সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা ও রবীন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*, প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-১১৮

৮৩. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিকতা, *রবীন্দ্রচেতনা*, ১৯৮৪, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ.২-৩

৮৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১০১

৮৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১২৮

৮৬. শঙ্খ ঘোষ, জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ, *নানা রবীন্দ্রনাথের মালা*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৭

৮৭. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, *উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রমানস*, ১৯৯২, সুপ্রীম পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৩

৮৮. হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, *ঠাকুরবাড়ীর কথা*, ২০০২,সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃষ্ঠা-২৪

৮৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মার দৃষ্টি, *শান্তিনিকেতন*, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, সপ্তমখণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫২৭

৯০. ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী, উপনিষদ ও ভারতীয় মনীষা, *উপনিষদ* (সম্পাঃ অতুল চন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, মহেশচন্দ্র ঘোষ), ২০০০, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৪৫

৯১. সম্পাদনা: অতুল চন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, মহেশচন্দ্র ঘোষ, *উপনিষদ*, ২০০০, হরফ প্রকাশনী,কলকাতা, পৃষ্ঠা-১২

৯২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র*, সপ্তম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২

৯৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬

৯৪. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১

৯৫. গোলাম মুরশিদ, *নারী ধর্ম ইত্যাদি*, ২০০৭, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১৪৪

৯৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র*, সপ্তম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩২

৯৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *শান্তিনিকেতন*, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, সপ্তমখণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৩১

৯৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৩১

৯৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ছিন্নপত্রাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৭৭

১০০. বিশ্বজিৎ ঘোষ, রবীন্দ্র-কবিতায় গৌতম বুদ্ধ : একটি ভিন্নমাত্রিক অনুষঙ্গ, সম্পা. আবুল হাসনাত, সার্ধশতজন্মবর্ষে রবীন্দ্রনাথ, কালি ও কলম, সপ্তম বর্ষ : একাদশ সংখ্যা, ১৪১৭, ঢাকা, পৃষ্ঠা-২৭২

১০১. শিবননারায়ণ রায়, রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক মন, *প্রবন্ধ সংগ্রহ*, ২০১০,আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১০৪

১০২. আবুল কাসেম ফজলুল হক, রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৭

১০৩. হায়াৎ মামুদ, রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রচিন্তা, *ভ্রমি বিস্ময়ে*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬৩

১০৪. হুমায়ুন আজাদ, *নারী*, ২০০৭, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১১৭

১০৫. গোলাম মুরশিদ, রবীন্দ্রনাথের নারী, *প্রথম আলো ঈদ সংখ্যা*, ২০১১, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১০৯

১০৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা -১১৪

১০৭. হুমায়ুন আজাদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা -১৪৯

১০৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৫৩

১০৯. বুদ্ধদেব বসু, মধুময় পৃথিবীর ধূলি, *বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধসমগ্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০০৭, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, পৃ.১৮৮

১১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১১৯

১১১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৫৪

১১২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৫৫

১১৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৫৭

১১৪. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২১৮

১১৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা–২৩৫

১১৬. ওমর খৈয়াম, *নজরুল অনূদিত রুবাইয়াৎ ও অন্যান্য*, ২০০৩,শামসুল আলম সাঈদ (সম্পাঃ), কাগজ প্রকাশন, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৫২

১১৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র*, ষষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৪

১১৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৭

১১৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র*, তৃতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৬

১২০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রাশিয়ার চিঠি*, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দশমখণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৭১

১২১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র*, তৃতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩১

১২২. জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা ও রবীন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১১২

১২৩. আহমদ শরীফ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৭৯

১২৪. নীহাররঞ্জন রায়, *ভারতীয় ঐতিহ্য ও রবীন্দ্রনাথ*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৭৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

সমকালীন নাটক এবং রবীন্দ্রনাথ

সাহিত্যের একটি শাখা নাটক। তবে 'সাহিত্য' ধারণার আগেই আদিম সমাজে নাটকের অভিনয় হয়েছিলো। একে তাত্ত্বিক দিক থেকে বিশুদ্ধ নাটক হয়তো বলা যাবে না, তবে নাট্য-প্রণোদনার ইঙ্গিত সেখানে ছিলো। তারা কেমন করে শিকার ধরেছে এবং কেমন করে শিকার ধরবে তার অভিনয়কে নিশ্চিতভাবেই নাট্য-প্রণোদনা বলা যেতে পারে। এরপর বৌদ্ধ ধর্ম আবির্ভূত হওয়ার পর আনুষ্ঠানিকভাবে আখ্যান রচনা করে গীত এবং অভিনীত হতে শুরু করে। বর্ণনিরপেক্ষভাবে সাধারণ লোকের মধ্যে নীতিধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বৌদ্ধরা চিত্তহর্ষক আখ্যান রচনা করেন। এগুলোই সাধারণ মানুষের ভিতরে অভিনীত হতো। চর্যাপদেই আমরা নৃত্য-গীত সমৃদ্ধ নাটকের উল্লেখ পাই। ১৭ নং *চর্যা*য় রয়েছে–

> নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী।
> বুদ্ধ-নাটক বিসমা হোই।।[১]

অর্থাৎ বুদ্ধের মহিমা প্রচারের জন্য সে সময় নাটক বেশ জনপ্রিয়ই ছিলো। এরপর হিন্দুধর্মের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলে জনগণের উপর থেকে বৌদ্ধপ্রভাব প্রতিরোধ করার জন্য বিভিন্ন পৌরাণিক আখ্যান ও দেবদেবীর চরিত্র অবলম্বনে লোকশিক্ষামূলক নাট্য-প্রয়োগ শুরু হয়। "সার্ববর্ণিক লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যেই বৈদিক যুগের পরে ভারতবর্ষে নাটকের উৎপত্তি হয়েছিল।"[২] অর্থাৎ ঋগ্বেদের যুগে নাট্যকলার জন্ম। "আচার্য ভরতের *নাট্যশাস্ত্র* মতে বৈদিক যুগের পরে মহেন্দ্র প্রমুখ দেবতাদের অনুরোধে সকল বর্ণকে আমোদানুষ্ঠানের প্রেরণা দিতে ব্রহ্মা চারটি বেদ থেকে উপাদান সংগ্রহ করে পঞ্চম বেদরূপে নাট্যের সৃষ্টি করেন। 'নাট্যশাস্ত্র' থেকে আরো জানা যায় যে মহেন্দ্র-বিজয়োৎসব বা ইন্দ্রোৎসবকে কেন্দ্র করে সংস্কৃতভাষায় প্রথম নাটক 'দেবাসুর যুদ্ধ' অভিনীত হয়েছিল এবং পরে হিমালয়ে ব্রহ্মা তাঁর দলবল নিয়ে 'ত্রিপুবদাহ'-এর অভিনয় করেন। প্রথম নাটকের অভিনয় অসুরদের অত্যাচারে নষ্ট হয়ে যায় বলে ব্রহ্মা বিশ্বকর্মাকে 'নাট্যবেশ্ম' তৈরি করার আদেশ দেন এবং তার ফলেই 'নাট্যগৃহ'-এর উৎপত্তি।"[৩] অর্থাৎ সেই সময়েই প্রেক্ষাগৃহে নাটক হতো; কখনো মন্দির প্রাঙ্গনে, কখনো নাটমন্দিরে। পরবর্তী সময়ে মুসলিম আমলে প্রেক্ষাগৃহ সংকুচিত হয়। তখন মন্দিরই নাট্য অভিনয়ের স্থান হয়ে ওঠে। সেই সময় রাম

এবং কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে আখ্যান লেখা হতো : রামায়ণ এবং মহাভারত। এই কাহিনিই গীত হতে হতে নাট্যরূপ লাভ করে।*শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* প্রায় সম্পূর্ণভাবে নাট্যগুণ সমৃদ্ধ। "চোখের সামনে অভিনয় করে দেখাতে পারলে তা যে বলার থেকে অনেক বেশি কার্যকর হয়, সেটা যে বাঙালিরা জানতেন না, তা নয়। অভিনয় করার প্রবণতাও মানুষের স্বাভাবিক। সে জন্যে চৈতন্যদেব ষোলো শতকের গোড়ায় রাধাকৃষ্ণের পালা অভিনয় করিয়েছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃত থেকে জানা যায় যে, তিনি নিজেও অভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন, রুক্মিণীর ভূমিকায়। নাটকে তাঁর আগ্রহ দেখে তাঁর গোস্বামীরা পরে নাটকের আঙ্গিকে বেশ কয়েকটি বই লিখেছিলেন। অবশ্য সে বইগুলোর বেশির ভাগই সংস্কৃত ভাষায় লেখা। বাংলায় কড়চা লেখা হয়েছিলো। কিন্তু সংলাপ আকারে লেখা হলেও সেগুলো আদৌ নাটক ছিলো না।"[৪] বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যদেবের প্রভাব অনস্বীকার্য। বৈষ্ণবধর্মের পথনির্দেশক বাণী এবং চৈতন্যের যাপিত জীবনও বাংলা নাটকের অঙ্গ হয়ে উঠেছিলো। "চৈতন্যদেব নিজে কোনও পুস্তক লিখে বৈষ্ণবধর্মের পথ নির্দেশ করে দেন নি। তিনি তাঁর শিষ্য-ভক্তদের যে-সব উপদেশ দিতেন পার্ষদ-ভক্ত বৈষ্ণবরা তা লিখে রাখতেন।"[৫] এগুলোও নাট্যধারাবাহিকতায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।এরপর অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে হেরাসিম লেবেডেফের দ্বারা বাংলা নাটকে বিদেশী প্রভাব পড়ে। তিনি *Disguise*এবং *Love is the Best Doctor*প্রহসন দুটি গোলকনাথ দাসকে দিয়ে অনুবাদ করান। এ নাটক দুটি ১৭৯৫ সালের ২৭শে নভেম্বর মঞ্চস্থ করেন। ইংরেজরা ক্যালকাটা থিয়েটার, চৌরঙ্গী থিয়েটার, সাঁসুলি রঙ্গালয় স্থাপন করেন। তবে এখানে সাধারণ বাঙালির প্রবেশাধিকার ছিলো না। "১৮২১ খ্রীস্টাব্দে 'কলিরাজার যাত্রা' নামক একখানি গ্রন্থের কথা জানা যাচ্ছে। 'সম্বাদ কৌমুদী', 'ক্যালকাটা রিভিউ' প্রভৃতি এ-কে নাটক বলেই অভিহিত করেছিল। ... ভবানীপুরের শ্যামসুন্দর সরকারের বাড়ীতে ১৮২২-এ 'কামরূপ যাত্রা নাটক'– নামে আর একটি নাটক অভিনীত হয়েছিল। ... কবি জগদীশ ১৮২২-এ 'হাস্যার্ণব' নামক একখানি সংস্কৃত প্রহসনের অনুবাদ করেন ... 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' সংস্কৃত প্রহসন থেকে অনুদিত আরো দুখানি নাটিকার কথা উল্লেখ করেছেন, 'ধুর্ত্তনর্ত্তক' এবং 'ধুর্ত্তসমাগম'। ... ১৮২২ সালেই কৃষ্ণ মিশ্রের লেখা ছয় অঙ্কের 'প্রবোধচন্দ্রোদয়'-এর বাংলা অনুবাদ 'আত্মতত্ত্ব কৌমুদী' প্রকাশিত হয়।"[৬] ১৮৩১ সালে প্রসন্নকুমার ঠাকুর 'হিন্দু থিয়েটার' প্রতিষ্ঠা করেন। এইটিই বাঙালি প্রতিষ্ঠিত প্রথম আধুনিক নাট্যশালা। এরপর 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ', 'বেলগাছিয়া নাট্যশালা', 'পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গ নাট্যালয়', 'জোড়াসাঁকো নাট্যশালা' প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সকল নাট্যশালায় অভিনীত হওয়ার জন্যই লিখিত হতে থাকে নাটক। এই ধারাবাহিকতায়ই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাটক রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম নাটক লিখলেন ১৮৮০ সালে। নাটকের নাম *বাল্মীকি প্রতিভা*।

বাংলা নাটকে পাশ্চাত্য নাটকের ধারণা ইংরেজরাই নিয়ে আসেন। ১৭৫৩ সালের আগে কলকাতার লালবাজারে প্রতিষ্ঠিত 'প্লে হাউস' ইংরেজদের প্রথম নাট্যশালা। তবে, এখানে বাঙালিরা প্রবেশ করতে পারতো না। হেরাসিম লেবেডেফ *Disguise*এবং *Love is the Best Doctor*প্রহসন দুটির অনুবাদ দেশীয় অভিনেতা-অভিনেত্রী এবং বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে নাটকাভিনয়ের প্রযোজনা করেন। *Disguise* নাটকে ভারতচন্দ্রের গানও ব্যবহৃত হয়েছিলো। এতে দর্শক হিসেবে দেশি এবং ইংরেজ উভয়ই উপস্থিত ছিলো। ১৮৩১ সালে 'হিন্দু থিয়েটার'এ ইংরেজি নাটক এবং সংস্কৃত নাটকের ইংরেজি অনুবাদ অভিনীত হয়েছিলো। তবে, এ প্রচেষ্টা দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। ১৮৩৫ সালে বাঙালির যথার্থ নাটক হয়েছিলো শ্যামবাজারের নবীনচন্দ্র বসুর বাড়িতে *বিদ্যাসুন্দর* অভিনয়ের মাধ্যমে। এ নাটকে স্ত্রীভূমিকায় বালিকারাই অভিনয় করেছিল। এরপর ১৮৫২ সালে জি.সি. গুপ্ত লিখেছিলেন *কীর্তিবিলাস*, তারাচরণ সিকদার লিখেছিলেন *ভদ্রার্জুন*, ১৮৫৩ সালে হরচন্দ্র ঘোষ লিখেছিলেন *ভানুমতী চিত্তবিলাস* ১৮৫৪ সালে রামনারায়ণ তর্করত্ন লিখেছিলেন *কুলীনকুলসর্বস্ব*, ১৮৫৬ সালে উমেশচন্দ্র মিত্র লিখেছিলেন *বিধবাবিবাহ নাটক*, ১৮৫৭ সালে নন্দকুমার রায় লেখেন *শকুন্তলা*, কালীপ্রসন্ন সিংহ লিখেছিলেন পৌরাণিক এবং অনুবাদ নাটক *বিক্রোমোর্বশী* (১৮৫৭), *সাবিতী সত্যবান* (১৮৫৮), *মালতীমাধব* (১৮৫৯)। "অনুবাদক নাট্যকারদের দ্বারাই বাংলা নাটকের অভ্যুদয়ের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। ইংরেজী ও সংস্কৃত উভয় প্রকার নাটকেরই অনুবাদ হইয়াছিল বটে কিন্তু অনুবাদ-যুগে ইংরাজী নাটকের কোনো লক্ষণীয় প্রভাব বাংলা নাটকের উপর পতিত হয় নাই, ইংরাজী নাটক হইতে অনুদিত নাটকের সংখ্যাও খুব বেশী ছিল না। প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃত নাটকের রীতি ও আদর্শই এই সময় অনুদিত বাংলা নাট্যসাহিত্যকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল। শুধু ভাষা নহে, আঙ্গিক ও ভাবচেতনার দিক দিয়াও নাট্যকারগণ সংস্কৃত নাট্যধারাকে সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। অবশ্য তাঁহাদের অনুবাদ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাবানুবাদ হইত এবং স্থানে স্থানে তাঁহারা যে দুই একটি স্বকপোলকল্পিত চরিত্র ও ঘটনা ঢুকাইয়া দিতেন না তাহাও নহে।"[৭] হরচন্দ্র ঘোষ, কালীপ্রসন্ন সিংহ, রামনারায়ণ তর্করত্ন অনুবাদ নাটক রচনার সূচনা করেছিলেন। হরচন্দ্র ঘোষের (১৮১৭-১৮৮৪) নাটক *ভানুমতী চিত্তবিলাস* (১৮৫২), *কৌরব বিয়োগ* (১৮৫৮), *চারুমুখ-চিত্তহরা* (১৮৬৪), *রজত গিরি নন্দিনী* (১৮৭৪)। এই সবগুলো নাটকই অনুবাদ। অবশ্য এ নাটকগুলো মঞ্চস্থ হওয়ার কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। "তাঁহার নাটকের ভাষা সংস্কৃত শব্দে আড়ষ্ট এবং নান্দী, সূত্রধার প্রভৃতি সংস্কৃত রীতিও ইহাতে আছে।"[৮]"বাংলা নাটকের ইতিহাসে তাঁহার মূল্য বেশি নহে।"[৯] কালীপ্রসন্ন সিংহ মৌলিক এবং অনুবাদ দুই রকম নাটকই লিখেছেন। তাছাড়া রঙ্গালয় স্থাপন এবং অভিনয়ও করেছেন তিনি। তাঁর *সাবিত্রী-সত্যবান* মৌলিক রচনা। এতে ইংরেজি এবং সংস্কৃত উভয় নাট্যরীতিই অনুসরণ করা হয়েছে। *মালতী মাধব* তাঁর অন্যতম নাটক। "নির্ভুল চলতি ভাষায় যে ইহা আদ্যোপান্ত রচিত শুধু তাহাই নহে, সংস্কৃত ভাষার

সন্ধি-সমাস অলঙ্কারযুক্ত ভারগ্রস্ত আড়ষ্টতা হইতেও ইহা সর্বাংশে মুক্ত।"[১০] ১৮৫৭ সালে আশুতোষ দেবের বাড়িতে নন্দকুমার রায়ের *শকুন্তলা* অভিনীত হয়েছিলো। এরপর ১৮৫৮ সালে রামনারায়ণ তর্করত্নের *রত্নাবলী* অভিনয়ের মধ্য দিয়ে 'বেলগাছিয়া নাট্যশালা'-য় নাটক মঞ্চায়ন শুরু হয়েছিলো। বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে এই নাট্যশালার অবদান অনস্বীকার্য। রামনারায়ণ তর্করত্নের অনুবাদ নাটক– *বেণীসংহার* (১৮৫৩), *রত্নাবলী* (১৮৫৮), *মালতীমাধব* (১৮৬৭), *অভিজ্ঞান শকুন্তলম* (১৮৮০) ইত্যাদি। তাঁর পৌরাণিক নাটক– *রুক্মিণীহরণ* (১৮৭২), *কংসবধ* (১৮৭৫), *ধর্মবিজয়* (১৮৭৬)। ১৮৫৪ সালে বাংলা ভাষায় প্রথম সমাজ সংস্কার-বিষয়ক নাটক লিখেছিলেন রামনারায়ণ তর্করত্ন। তাঁর নাটক *কুলীনকুলসর্বস্ব*। এ নাটকটি কৌলিন্যপ্রথা বিরোধী। "'কুলীনকুলসর্বস্ব' প্রথম নাটক– যা অসাধারণ অভিনয়-সাফল্য লাভ করেছিল। নাটকের কাহিনী ও চরিত্র এমন কিছু প্রশংসার যোগ্য নয়। কিন্তু সাধারণ লোকের চরিত্র, ভাষা ও ভঙ্গিমায় তর্করত্ন যে হাস্যকৌতুক, ব্যঙ্গ ও বাস্তবতার আমদানি করেছেন, শুধু সে জন্যই এই নাটক সেযুগে বহুবার অভিনীত হয়েছিল। এমন কি এই নাটকের অভিনয় দেখে কুলীনের দল তর্করত্নের ওপর মারমুখী হয়ে উঠেছিল, কোন কোন স্থানে কুলীন-ব্রাহ্মণদের জোটবাঁধার ফলে এ নাটক শেষ পর্যন্ত অভিনীত হতে পারেনি।"[১১] এরপর 'বহুবিবাহ'-র কুফল নিয়ে লিখেছিলেন *নবনাটক* (১৮৬৫)। অবশ্য এ নাটকটি অভিনয়সাফল্য পায় নি। তিনি *যেমন কর্ম তেমনি ফল* (দ্বি.স.১৮৭২), *চক্ষুদান* (১৮৬৯), *উভয় সঙ্কট* (১৮৬৯) নামের প্রহসনগুলো লিখেছেন। 'বিধবাবিবাহ' নিয়ে আন্দোলনের ফলে অনেকেই একে বিষয় করে নাটক লিখেছিলেন। উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *বিধবোদ্বাহ* (১৮৫৬), উমেশচন্দ্র মিত্রের *বিধবা বিবাহ নাটক* (১৮৫৬), রাধামাধব মিত্রের *বিধবা মনোরঞ্জন* (১৮৫৬), বিহারীলাল নন্দীর *বিধবা পরিণয়োৎসব* (১৮৫৭), শিমূয়েল পীর বক্সের *বিধবাবিরহ* (১৮৬০) ইত্যাদি বিধবাদের সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্না-মানসিক অবস্থা নিয়ে লেখা নাটক। "ভ্রূণহত্যায় সমাজের অনুমোদন থাকলেও বিধবাদের গর্ভসঞ্চার সব সময়ে সামাজিক কলঙ্কের সৃষ্টি করতো। তাছাড়া ভ্রূণহত্যা কোনো স্থায়ী কিংবা সন্তোষজনক ব্যবস্থা বলেও স্বীকৃত হতে পারে না। এজন্যেই নাট্যকারগণ বিধবাদের সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছেন বিধবাদের প্রতি তাঁদের সমর্থন জ্ঞাপন করে। যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় চপলাচিত্তচাপল্য নাটকে, অভয়ানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় অগত্যাস্বীকার প্রকরণে এবং অজ্ঞাতনামা নাট্যকার বিধবা সুখের দশায় রীতিমতো বিবাহ ঘটিয়ে সমস্যাটির সমাধান করতে চেয়েছেন। তিনটি নাটকেরই কাহিনীর বৈশিষ্ট্য এই যে বিবাহের পূর্বে নায়িকারা কেউ অবৈধভাবে গর্ভবতী হয়নি এবং তাদের অভিভাবকগণই তাদের বিবাহ দিয়েছে। ... বিধবাবিবাহ নাটকে উমেশচন্দ্র মিত্র সম্ভাব্য অন্য একটি পরিণতি– নায়িকার গর্ভসঞ্চার ও আত্মহত্যা– দেখিয়ে বিধবার বিবাহ না দেওয়ার কুফলের প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন।"[১২]

রামনারায়ণ তর্করত্নের *রত্নাবলী* নাটক দেখে মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩) মনে হয়েছিলো– এটা কোনো নাটক নয়। তিনি বন্ধু গৌরদাসের কাছে নিজে নাটক লেখার ইচ্ছে পোষণ করেছিলেন। এরপর খুব কম সময়ের মধ্যে লিখেছিলেন পৌরাণিক নাটক *শর্মিষ্ঠা* (১৮৫৯)। এই নাটকটি নাট্যসাহিত্যের ধারা পাল্টে দেয়। "বস্তুতঃ 'শর্মিষ্ঠা' প্রকাশের পর সংস্কৃতরীতি বাংলা নাটক থেকে প্রায় পুরোপুরি উঠে যায়।"[১৩]তাই নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, "বাজি রেখে বাঙলা রচনায় হাত দিলেন, এজন্যে তাঁর প্রস্তুতি ছিল না। সে বাজিতে তিনি জিতেছিলেন। বাঙালিকেও জিইয়ে ছিলেন নিস্পন্দ ধড়ে প্রাণের প্রতিষ্ঠা করে। এ কারণে বাঙলার সমাজে ও সাহিত্যে, মননে ও মেজাজে মধুসূদনই প্রথম সার্থক বিদ্রোহী ও বিপ্লবী, পথিকৃৎ ও যুগস্রষ্টা।"[১৪]*শর্মিষ্ঠা*র কাহিনি মহাভারতের শর্মিষ্ঠা-দেবযানী-যযাতি অবলম্বনে রচিত। শর্মিষ্ঠা চরিত্রে ভারতীয় নারীর আদর্শ সম্পূর্ণভাবে রক্ষা হয়েছে। তবে, দেবযানীর চরিত্র বেশি পরিস্ফুটিত এবং বিকশিত হয়েছে। দেবযানীর শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব কাহিনিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। তার জন্যই যযাতি বনবাসী হয়েছে। আবার দেবযানীই বলেছে :

> সে যা হউক, সখি, অদ্যাবধি আমাদের পূর্ণপ্রণয় সঞ্জীবিত হলো। এখন এসো, দুই জনেই পতিসেবায় কিছু দিন সুখে যাপন করি। (রাজার প্রতি) মহারাজ, এক বিশাল রসাল তরুবর, মালতী আর মাধবী উভয় লতিকার আশ্রয়স্থল হলো।[১৫]

–"শর্মিষ্ঠার মূল্য যতটা ঐতিহাসিক ততটা সাহিত্যিক নয়। নাটক হিসেবে যুগোত্তীর্ণ হবার উপকরণ এর মধ্যে নেই। ... চরিত্রচিত্রণের দিক দিয়েও নাটকটি ব্যর্থ ও বৈশিষ্ট্যহীন। যযাতিকে আমরা ইন্দ্রিয়াসক্ত, দুর্বলচিত্ত এবং শিথিল চরিত্রের ব্যক্তি হিসেবেই এখানে পেয়েছি। শর্মিষ্ঠা কতকটা প্রশান্ত কল্যাণময়ীরূপে মৌন সহনশীলতা নিয়ে দেখা দিয়েছে! দেবযানী চরিত্রে কঠোর ব্যক্তিত্ব সামান্যত পথ করে নেবার চেষ্টা করেছে। আসলে সংস্কৃত নাটকের ধীরোদাত্ত নায়ক, মুগ্ধা এবং প্রগল্‌ভা নায়িকার আদর্শে এদের অঙ্কন করতে যাওয়ায় অকিঞ্চিৎকরতা প্রধান হয়ে উঠেছে।"[১৬] তারপরও এ কথা সত্য যে, "মধুসূদন দত্তের 'শর্মিষ্ঠা'র অভিনয়, বাঙালীর প্রথম আধুনিক নাটক।"[১৭] তাঁর এরপরের নাটকগুলো হলো– *পদ্মাবতী* (১৮৬০), *কৃষ্ণকুমারী* (১৮৬১), *মায়াকানন* (১৮৭৪)। এছাড়া তিনি দুটি প্রহসন লেখেছেন– *একেই কি বলে সভ্যতা* (১৮৬০), *বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ* (১৮৬০)। *পদ্মাবতী* গ্রীক পুরাণের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। এখানেও সংস্কৃত রীতি রয়েছে। ভাষার আড়ম্বর, ঘটনার স্বল্পতা, বিবরণ ও বর্ণনার বাহুল্য নাটকে লক্ষ্য করা যায়। এই নাটকেই মধুসূদন প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেন। *কৃষ্ণকুমারী* মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ নাটক। নাটকটি সংস্কৃতরীতি বর্জন করে সম্পূর্ণ পাশ্চাত্যরীতিতে লেখা হয়েছে। এইটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডিও বটে। এর কাহিনী টডের *রাজস্থান* থেকে নেওয়া। কৃষ্ণকুমারীর নাট্যগঠনে নিপুণতার পরিচয় আছে। টডকে অনুসরণ করায় সমস্যা দেখা দিতে পারতো, মধুসূদন সুকৌশলে এই সমস্যার

সমাধান করেছেন। *মায়াকানন* মধুসূদনের মৌলিক নাটক। এখানে একটানা দুঃখের কাহিনি : নিজের দুঃখময় জীবনকেই স্মরণ করেছেন তিনি। কবির মৃত্যুর পর নাটকটি প্রকাশিত হয়। "'শর্মিষ্ঠা', 'পদ্মাবতী', 'কৃষ্ণকুমারী' ও 'মায়াকানন'– ইহাদের মধ্যে যেসব নাট্যকাহিনী রহিয়াছে সেগুলি গৃহীত হইয়াছে অতীত পুরাণ ও ইতিহাস হইতে। ইহাদের পরিবেশে রহিয়াছে এক অসচরাচর-দৃষ্ট জগতের ভাব মহিমা ও রসগাম্ভীর্য। সেজন্য ইহাদের ভাষা ও ভঙ্গিতে স্বভাবতই এক অসুলভ গুরুত্ব ও অসঙ্গত আড়ম্বর আসিয়া গিয়াছে। কিন্তু মধুসূদনের প্রতিভা ক্রমে ক্রমে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। 'শর্মিষ্ঠা'য় সংস্কৃত-প্রভাবিত ভাষা ও বর্ণনা-রীতির যতখানি প্রাধান্য, 'পদ্মাবতী'তে ততখানি নাই এবং 'কৃষ্ণকুমারী'তে তাহা প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে। আবার 'মায়াকানন' রচনা করিবার সময় তাঁহার প্রতিভার অন্তমুখী দুর্বলতার সুযোগ লইয়া সংস্কৃত প্রভাব পুনরায় তাঁহার নাট্যগতিকে কৃত্রিম ও আড়ষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে।"[১৮]তবে, এ কথা অনস্বীকার্য যে, "আমাদের সৃজনশীল সাহিত্যিকদের মধ্যে মধুসূদনই প্রতীচ্যের প্রথম চিত্তদূত।"[১৯] সৈকত আসগর বলেছেন, "মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক।"[২০]

নাটকের বিভিন্ন ত্রুটি লক্ষ্য করা গেলেও, মধুসূদনের প্রহসন তা থেকে মুক্ত। "প্রহসন দুইখানা মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ নাট্যপ্রতিভার অবিস্মরণীয় কীর্তিরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে।"[২১] সে সময়ের যুবসমাজের দোষ ও অনাচার নিয়ে লিখিত হয়েছে *একেই কি বলে সভ্যতা*। প্রহসনে মাতাল নববাবুকে নিয়ে পরিবারের সদস্যদের কথপোকথনে ঊনবিংশ শতাব্দির চিত্র প্রকাশ পেয়েছে স্পষ্টভাবে। কথোপকথন–

> গৃহিণী। ও মা, আবার কি হলো! এমন এলোমেলো বকচে কেন? ও মা, ছেলেটিকে তো ভূতে টুতে পায় নি।
>
> ...
>
> নব। হিয়র, হিয়র।
>
> কর্তা। (সরোষে) চুপ, বেহায়া, তোর কি কিছুমাত্র লজ্জা নাই?
>
> নব। ড্যাম লজ্জা, মদ ল্যাও।
>
> ...
>
> নব। হিয়র, হিয়র, আই সেকেন্ড দি রেজোলুসন।
>
> ...
>
> হর। ... আজকাল কলকেতায় যাঁরা লেখাপড়া শেখেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেরই কেবল এই জ্ঞানটি ভাল জন্মে। তা ভাই দেখ দেখি, এমন স্বামী থাকলেই বা কি আর না থাকলিই বা কি। ঠাকুরঝি! তোকে বলতে কি ভাই, এই সব দেখে শুনে আমার ইচ্ছে করে যে গলায় দড়ি দে মরি। (দীর্ঘনিশ্বাস) ছি, ছি, ছি! (চিন্তা

করিয়া) বেহায়ারা আবার বলে কি, যে আমরা সায়েবদের মতন সভ্য হয়েচি। হা আমার পোড়া কপাল! মদ মাস খ্যেয়ে ঢলাঢলি কল্লেই কি সভ্য হয়?– একেই কি বলে সভ্যতা?[২২]

যুবসমাজের প্রতি এরকম সরাসরি মন্তব্য তাদের স্বরূপ পুরোপুরি উন্মোচন করে দেয়। এ কারণে যুবসমাজের কয়েকজন প্রহসনটির অভিনয় পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছিলো। অন্যদিকে, *বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ* প্রহসনটি ভণ্ড, দুষ্কৃতিকারী, অত্যাচারী প্রাচীন সমাজকে উপহাস করে লেখা। অর্থাৎ মধুসূদন সমাজের সর্বস্তরের মানুষের অসঙ্গতিই তুলে ধরেছেন এবং তা সাহিত্যমানসম্পন্নভাবেই। "আয়তনে স্বল্প, দুখানিই দু অঙ্কের এবং প্রত্যেকেই দুই দুই চার দৃশ্যের।– কিন্তু প্রহসন দুখানির মধ্যে যে রসময় তীক্ষ্নতা ও স্বভাবগুণের নির্মল প্রকাশ আছে, তা ঊনবিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ প্রহসনে পাওয়া যাবে না। ঊনবিংশ শতাব্দীর এক বিশেষ সময়ের তিনটি দশক রাজধানী কলকাতা এবং বঙ্গদেশের সামাজিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার রূপরেখা প্রভূতভাবে সেকালের বিবিধ প্রহসনে উপস্থাপিত হয়ে আছে। বহু বিবাহ, বিধবা বিবাহ, ইংরেজি শিক্ষা, মদ্যপান, বৃদ্ধস্যতরুনী ভার্যা, মোহান্তের অনাচার ইত্যাদি শত প্রকার বিষয় প্রহসনের উপাদান হয়েছে। কিন্তু সকলের মূলেই মধুসূদনের এ দুখানি প্রহসনের অব্যর্থ অনুসরণ ও অবলম্বন বিদ্যমান।"[২৩] এ সম্পর্কে আরো বলা যায়, "মাইকেল মধুসূদনের প্রহসন দুখানি আমাদের মঞ্চ ও পাঠের জন্য অতীব মুল্যবান সম্পদ। এ দুখানি প্রহসন নিজের কালকে বিধৃত করেও কালের সীমানা ডিঙিয়ে একালে এসে সমভাবে তীক্ষ্নতা ও রঙ্গময়তা বিতরণ করছে। এমন সৃজন, বাংলা সাহিত্যে বড় সুলভ নয়।"[২৪]

"কৌতুক এবং অপক্ষপাত শিল্পদৃষ্টির সহযোগে বাংলা নাট্যসাহিত্যে দীনবন্ধু মিত্র নূতন প্রাণসঞ্চার করেছিলেন। তাঁর নীলদর্পণ নাটক সাময়িক উত্তেজনার কারণ হয়েছিল। আজ তা জাতীয় ইতিহাসের সামগ্রীরূপে সম্মানিত। জনগণেশকে সাহিত্যের খাসদরবারে আমন্ত্রণ জানিয়ে তিনি বিপ্লবী মনের পরিচয় দিয়েছিলেন। আর ভগ্ন বক্র বর্বর বিকৃত পাত্রপাত্রীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সৃষ্টিতে তিনি চিরকালকে স্পর্শ করেছেন।"[২৫] দীনবন্ধু মিত্রের (১৮৩০-১৮৭৩) নাটকগুলো– *নীলদর্পণ* (১৮৬০), *নবীন তপস্বিনী* (১৮৬০), *লীলাবতী* (১৮৬৭), *কমলে কামিনী* (১৮৭৩) এবং প্রহসনগুলো– *সধবার একাদশী* (১৮৬৬), *বিয়ে পাগলা বুড়ো* (১৮৬৬), *জামাইবারিক* (১৮৭২)। শুধু*নীলদর্পণ* লিখলেও তিনি বাংলা সাহিত্যে এবং ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকতেন। ভারতবাসীর উপর নীল চাষের জন্য ইংরেজদের অত্যাচার কতো ভয়াবহ হতে পারে তা এই একটি মাত্র নাটক পড়েই বোঝা যায়। সাবিত্রীর সংলাপে ইংরেজদের দৌরাত্ম স্পষ্ট হয়েছে–

কি সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনেশেরা সব কত্তে পারে– লোকের জমি কেড়ে নিচ্ছিস্, ধান কেড়ে নিচ্ছিস্, গোরু বাচুর কেড়ে নিচ্ছিস্, লাটির আগায় নীল বুনএয় নিচ্ছিস্– তা লোক কেঁদিই হোক্, কোকিয়েই হোক্ কচ্চে– এ কি! ভাল মানুষের জাত খাওয়া?[২৬]

নক্ষত্রের বিলাপে ফুটে উঠেছে সমকালের আরো পূর্ণ রূপ–

নীলকর বিষধর বিষপোরা মুখ।
অনল শিখায় ফেলে দিল যত সুখ।।
অবিচারে কারাগারে পিতার নিধন।
নীলক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠভ্রাতা হলেন পতন।।
পতিপুত্রশোকে মাতা হয়ে পাগলিনী।
স্বহস্তে করেন বধ সরলা কামিনী।।
আমার বিলাপে মার জ্ঞানের সঞ্চার।
একেবারে উথলিল দুঃখ পারাবার।।
শোকাশূলে মাথা হলো বিষ বিড়ম্বনা।
তখনি মলেন মাতা কে শোনে সান্তনা।।[২৭]

–এই চিত্র প্রতিটি কৃষক ঘরের নিত্য সঙ্গী ছিলো। "প্রযোজনার দিকে তাকিয়ে 'নীলদর্পণ' লেখেন নি দীনবন্ধু। তবু ঘটনাক্রমে এ নাটকখানি হয়ে উঠেছিল বাংলা নাট্যপ্রযোজনার দরকারি দলিল।"[২৮] দীনবন্ধু মিত্রের নাটকের চেয়ে প্রহসন বেশি শক্তিশালী। *বিয়ে পাগলা বুড়ো*তে একজন বিয়েরবাতিকগ্রস্ত বৃদ্ধের নকল বিয়ের আয়োজন করে স্কুলের অকালপরিপক্ক ছেলেরা। এরপর নাস্তানাবুদ করে। *জামাই বারিক*এ ধনিপরিবারের ঘরজামাই পোষার প্রথাকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। "দীনবন্ধু মিত্র সামাজিক রীতিনীতির একজন সূক্ষ্ম দর্শক ছিলেন। ... দ্বিধাবিমুক্ত উচ্ছ্বসিত হাসি দীনবন্ধুর বিশিষ্টতা। আমাদের জীবনে অসংগতি আছে, অসংলগ্নতা আছে, অসতর্ক বিচ্যুতি আছে। এ সমস্ত কিছুই একটি মনোরম হাস্যরসের মধ্যে প্রবাহিত হয়েছে। তিনি সমাজ-সংস্কারকের মতো নিষ্প্রাণ আঘাতে জীবনের বিচ্যুতি প্রকাশ করেন নি, স্বভাব-জাত পরিহাস-রসিকতায় সঙ্গত জীবনধারার ব্যতিক্রমকে আমাদের উপভোগের বস্তু করেছেন।"[২৯]এ সম্পর্কে অজিত কুমার ঘোষ লিখেছেন,"নাট্যকার যেন রঙের পিচকারি দিয়া সমাজের চতুর্দিকে ইতস্তত তরল রঙ চড়াইয়া দিয়াছেন, এবং যাহারাই রঞ্জিত হইয়াছে তাহারা যেন লজ্জিত, অপ্রতিভ ও হাস্যাস্পদ হইয়া পলায়ন করিতেছে। লোকে লাঠির বাড়ি সহ্য করিতে পারে কিন্তু লোকের মধ্যে লজ্জা সহ্য করিতে পারে না। দীনবন্ধুর নাটকে সমাজের যেরূপ চেতনা হইয়াছে প্রত্যেককে একশো ঘা মারিলে বোধহয় তাহা হইত না।"[৩০]

ঊনবিংশ শতকে রামমোহন-বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ-বহুবিবাহ নিবারণ-কৌলিন্য প্রথার অবসান-ধর্মের নামে ভণ্ডামি-বাল্যবিবাহ-মদ্যপান-বারাঙ্গনাসক্তি-ইয়ং বেঙ্গলদের উচ্ছৃঙ্খলতা ইত্যাদি নিয়ে প্রচণ্ড আন্দোলন করেছেন। সে কারণে সাহিত্যে এর প্রতিফলন হয়েছে। মূলত সমাজ সংস্কারের সহজ উপায় হিসাবে সংস্কারকগণ নাটক রচনা শুরু করেন। এ কারণে নাটকগুলো রসোত্তীর্ণ হয়েছিলো, কিন্তু সাহিত্যমান সম্পন্ন হয় নি। সংস্কারের খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় নাট্যকারদের রচনায় স্পষ্ট। মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং দীনবন্ধু মিত্রের মতো নাট্যকারও এ সকল সংস্কারমূলকনাটক রচনায় সাহিত্যমানসম্পন্ন নাটক রচনা করতে পারেন নি। তবে নাটকের গুণগত মান যাই হোক, সমাজ-সংস্কার আন্দোলনে এগুলোর অবদান অনস্বীকার্য। ১৮৮০ সাল পর্যন্ত এই সংস্কারমূলক নাটক রচিত হয়েছে। এরপরই এই ধারার অবসান ঘটে। "India Office Library -তে রক্ষিত ১৮৫৪ থেকে ১৮৮০সালের মধ্যে রচিত সাত শতাধিক নাটক-প্রহসনের (India Office Library -তে যত নাটক রক্ষিত আছে, অন্য কোনো গ্রন্থাগারেই তা নেই) বিষয়বস্তুকে স্থূলভাবে সামাজিক, ঐতিহাসিক ও দেশপ্রেমমূলক এবং পৌরাণিক– এই তিন ভাগে বিভক্ত করে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, শুরুতে বেশির ভাগ, বলতে গেলে প্রায় সব নাটক-প্রহসনেরই বিষয়বস্তু ছিলো সামাজিক কোনো না কোনো সমস্যা। তারপর দুটি-একটি করে ঐতিহাসিক ও দেশপ্রেমমূলক এবং পৌরাণিক নাটক রচিত হতে থাকে। ১৮৬০-এর দশকের শেষ দিকে জাতীয়তাবাদের উন্মেষের ফলে ঐতিহাসিক ও দেশপ্রেমমূলক নাটক-প্রহসন পূর্বের তুলনায় অধিক সংখ্যায় রচিত হয়। ১৮৭৫ সালে সামাজিক, ঐতিহাসিক ও দেশপ্রেমমূলক এবং পৌরাণিক নাটকের সংখ্যা প্রায় সমতা অর্জন করে। কিন্তু তারপরই সামাজিক নাটকের সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পায়। ১৮৭৬ সালের অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণীত হওয়ায় ঐতিহাসিক ও দেশপ্রেমমূলক নাটক রচনায়ও ভাঁটা পড়ে। কিন্তু পৌরাণিক নাটকের সংখ্যা খুব বৃদ্ধি পায়। পৌরাণিক নাট্যরচনার মাধ্যমে জাতীয়তা এবং দেশপ্রেমের চেতনাই উৎসাহিত ও তৃপ্ত হয়।"[৩১]

১৮৬৬ সালে কামিনীসুন্দরী দেবী নামে একজন মহিলা নাট্যকার *উর্বশী নাটক* নামে একটি নাটক লেখেন। "সে সময়ে মহিলাদের রচনা বলিয়া যাহা প্রকাশিত হইত তাহার অধিকাংশই পুরুষের বেনামি লেখা। উর্বশী-নাটক সম্বন্ধে সে অভিযোগ চলে না।"[৩২] এই নাট্যকারের অন্য দুটি নাটক– *ঊষা নাটক* (১৮৭১) এবং *রামের বনবাস নাটক* (দ্বি-স ১৮৭৭)। এছাড়া লক্ষ্মীমণি দেবী লিখেছেন *চির সন্ন্যাসিনী* (১৮৭২) এবং *সন্তাপিনী* (১৮৭৬), অজ্ঞাত কোনো মহিলা লিখেছেন, *শ্রীমতী*, প্রফুল্লনলিনী লিখেছেন *ষষ্ঠীবাঁটা প্রহসন* (১৮৭৭), স্বর্ণলতা লিখেছেন *শূরবালা সুরবালা* (১৮৭৮), নয়নতারা দে লিখেছেন, *মণিমোহিনী* (১৯৭৯), মণিমোহিনী লিখেছেন *বিনোদকানন* (১৮৮৪), তরঙ্গিণী দাসী লিখেছেন, *সুগ্রীব-মিলন-যাত্রা* (১৮৭৯)। এ সময়ে নারী নাট্যকারদের মধ্যে সবচেয়ে উচ্চস্তরের

নাটক লিখেছেন স্বর্ণকুমারী দেবী। তাঁর নাটকগুলো– *বসন্ত-উৎসব* (১৮৭৯), *বিবাহ-উৎসব* (১৯০১), *দেবকৌতুক* (১৯০৫), কনে-বদল (১৯০৬), পাকচক্র (১৯১১), রাজকন্য (১৯১১), নিবেদিতা (১৯১৭) ইত্যাদি।

মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২) প্রাচ্যের লুপ্ত রীতি আবার আনয়ণ করেন। তবে, তাঁর নাটককে নাটক না বলে যাত্রা বলাই সঙ্গত। তাঁর নাটকগুলো হলো– *রামাভিষেক নাটক অথবা রামের অধিবাস ও বনবাস* (১৮৬৭), *প্রণয়-পরীক্ষা* (১৮৬৯), *সতী* (১৮৭৩), *হরিশ্চন্দ্র* (১৮৭৫), *আনন্দময় নাটক* (১৮৯০)। "মনোমোহনের পৌরাণিক চরিত্রগুলি নিতান্তই সাধারণ মানবীয় চরিত্র হইয়া পড়িয়াছে। অতীতে পুরাণ কিংবা স্বর্গ হইতে তাহারা আসিয়া যেন আমাদের ঘর-সংসারে প্রবেশ করিয়াছে। সাধারণ দর্শকেরা দেব-দেবী এবং পৌরাণিক চরিত্র এইরূপ সহজ ও সাধারণ দেখিতেই ভালোবাসে এবং মনোমোহন তাহাদের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই নাটক প্রণয়ন করিয়াছিলেন।"[৩৩]

মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২) *বসন্তকুমারী* (১৮৭৩)এবং *জমীদার দর্পণ* (১৮৭৩) নামে দুটি নাটক লেখেন। *বসন্তকুমারী* নাটকে সপত্নী পুত্রের প্রতি বিমাতার প্রণয়-লালসা এবং এর শোচনীয় পরিণতি দেখানো হয়েছে। *জমীদার দর্পণ* নাটক জমীদারীর বাস্তব চিত্র। তিনি নিজে জমিদার পরিবারের সন্তান। তাই সম্পূর্ণ চিত্র অঙ্কন করতে তাঁকে বেগ পেতে হয় নি, তবে ব্যক্তিত্বের দরকার ছিলো, তা তিনি পূর্ণ মাত্রায় প্রয়োগ করেছেন। নাটকে বাস্তবজীবনের পৈশাচিক বীভৎসতা নাট্যকার বিশ্বস্তভাবে তুলে ধরেছেন। "'জমীদার দর্পণ' নাটকে সে আমলের জমীদারদের নির্মম অত্যাচারের বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।"[৩৪]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫) বাংলা নাটকে অনেকাংশে সংস্কৃত প্রভাব-মুক্ত করেছিলেন। তাঁর নাটক রচনার মূল উদ্দেশ্য ছিলো জাতীয় ভাব এবং দেশোপ্রেম জাগ্রত করা। "কোনো সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট জাতীয় ভাব অপেক্ষা স্নেহ-প্রেম-বাৎসল্য প্রভৃতির দ্বন্দ্বসমস্যাই বেশীভাবে তাঁহার নাটকের মধ্যে পরিস্ফুট হইয়াছে।"[৩৫] তাই নাটকগুলো উপদেশমূলক বা একঘেয়েমি হয় নি। তিনি তাঁর নাটকে ঐতিহাসিক অনেক চরিত্র নিজের মতো করে রূপায়ণ করেছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পূর্বে মধুসূদন এবং দীনবন্ধু প্রহসন লিখেছেন ঠিকই, কিন্তু তারা হাস্যরসকে রুচির বশীভূত করেন নি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথই প্রথম প্রহসনকে রুচিশীল করে তুললেন। তাঁর নাটকগুলো– *পুরুবিক্রম* (১৮৭৪), *সরোজিনী* (১৮৭৫), *অশ্রুমতী* (১৮৭৯), *স্বপ্নময়ী* (১৮৮২) ইত্যাদি এবং প্রহসনগুলো– *কিঞ্চিৎ জলযোগ* (১৮৭২), *এমন কর্ম আর করব না* বা *অলীকবাবু* (১৮৭৭), *হঠাৎ নবাব* (১৮৮৪), *দায়ে প'ড়ে দারগ্রহ* (১৮৯০), *হিতে বিপরীত* (১৮৯৬) ইত্যাদি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের *সরোজিনী* নাটকের *ভৈরবাচার্য* চরিত্রটি

রবীন্দ্রনাথের *রঘুপতির* পূর্বপুরুষ। "'স্বপ্নময়ী'র নাটকীয় ভঙ্গি ও চরিত্র রবীন্দ্রনাথের অনেক নাটকের পূর্বাভাস বটে। ... সাধারণ লোকেদের ধর্মবিশ্বাস এবং কুসংস্কার লইয়া নাট্যকার যে রকম পরিহাস করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথও বহু কবিতা ও নাটকে সেই ধরনের পরিহাস অনেক করিয়াছেন।"[৩৬] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সংস্কৃত নাটকের অনুবাদের জন্য শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করে আছেন। তাঁর অনূদিত নাটকগুলোয় মূলগ্রন্থের ভাবের এবং বর্ণনার ধারা অক্ষুণ্ন ছিলো এবং তিনি সংস্কৃত-অনভিজ্ঞ পাঠকের কাছে সংস্কৃত সাহিত্যের রস পৌঁছে দিয়েছিলেন।

নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯-১৮৯৪) পৌরাণিক নাটক লিখে সুনাম অর্জন করেছিলেন। তিনিই প্রথম ফারসী বিষয় নিয়ে চুটকি ধরনের নক্শা রচনা করেছিলেন। তাঁর নাটকগুলো– *পতিব্রতা* (১৮৭৫), *অনলে-বিজলী* (*সীতার অগ্নিপরীক্ষা*) (১৮৭৮), *প্রহ্লাদ চরিত্র* (১৮৮৪), *লায়লামজনু* (১৮৯১), *বেনজীর বদরেমুনির* (১৮৯৩) ইত্যাদি।– এ সকল রচনা অতি-নাটকীয়তা, হাস্যরস, ভাঁড়ামি দিয়ে পরিপূর্ণ। "এসব যাত্রাধর্মী নাটকের যেমন মূল্যই হোক না কেন তিনি অন্য ধরনের গদ্য ও পদ্য রচনায় তাঁর কালের পক্ষে প্রতিভা ও মৌলিকতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের অনেক আগে তিনি গদ্যকবিতার রচনারীতি সর্বপ্রথম বাংলা রচনায় ব্যবহার করেছিলেন– একে তিনি "পদ্য-পংক্তি গদ্য" বলেছিলেন।"[৩৭]

উপেন্দ্রনাথ দাস (১৮৪৮-১৮৯৫) ইংরেজ বিদ্বেষের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ খুন-জখমমূলক স্বদেশীভাবের নাটক লিখেছিলেন। *শরৎ-সরোজিনী* (১৮৭৪) এবং *সুরেন্দ্র-বিনোদিনী* (১৮৭৫) দুটি এ ধরনের নাটক। এর লোমহর্ষক কাহিনি দর্শকের মনে কৌতুহল জাগিয়েছিলো। তবে "সমগ্র নাটকের মধ্যে কোথাও জাতীয় ভাবের অনুকূল পরিবেশ নাই, সেজন্য মাঝে মাঝে তরল জাতীয়তার বহ্বাস্ফোট থাকিলেও ইহাকে জাতীয় ভাবোদ্দীপিত নাটক বলা চলে না।"[৩৮]

গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১১) -এর আবির্ভাব অভিনেতা হিসেবে। এরপর নাট্যালয়ে নাটকের অভাব দেখা দিলে তিনি নাটক লিখতে শুরু করেছিলেন। "গিরিশচন্দ্রের নাট্যরচনার মূল্য নির্ধারণের পূর্বে এই কথা অবশ্য স্মরণীয় যে তিনি যেমন সুদক্ষ অভিনেতা ছিলেন, তেমনি তাঁহার সহকারী সুযোগ্য অভিনেত্রীয় ছিল। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের উপযোগী করিয়াই তিনি নাটক লিখিতেন, এবং সাধারণ দর্শকের মন কিসে ভুলিত তাহা তিনি বেশ জানিতেন।"[৩৯] অভিনয়ের দক্ষতা এবং কুশলী-পরিচালনার জন্য তিনিই বাংলা নাটকের একটি ঐতিহ্য সৃষ্টি করেন। মঞ্চেই যে নাটকের সত্য প্রকাশিত হয় এ তথ্য তাঁরই আবিষ্কার। "গিরিশচন্দ্রকে জাতীয় রঙ্গালয়ের পিতা বলা হয়।"[৪০]তিনি পৌরাণিক -পারিবারিক সামাজিক-ঐতিহাসিক ইত্যাদি বিষয়ে নাটক লেখেন। "তাঁর চেষ্টাতেই বাংলা নাটক সর্বপ্রথম পেশাদারী ব্যাপারে পরিণত হয়, তিনিই সর্বপ্রথম নাট্যাভিনয়কে একটি সুচারু শিল্পরুপে

প্রতিষ্ঠিত করেন, চরিত্রাভিনয়ে তিনি একটি বিশিষ্ট রীতির প্রবর্তন করেন, নাট্যাভিনয়-শিক্ষক হিসেবে নতুন 'স্কুল' প্রতিষ্ঠিত করেন, যেখানে অশিক্ষিতা পণ্যরমণীকেও অসামান্যা অভিনেত্রীতে পরিণত করা সম্ভব হয়েছিল।"[৪১] তাঁর লিখিত নাটকের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ; প্রহসন, পঞ্চরং, রূপক, গীতিনাট্য ইত্যাদির সংখ্যাও পঞ্চাশের কাছাকাছি। রামায়ণ কাহিনি অবলম্বনে লেখেন *রাবণবধ* (১৮৮১), *সীতার বনবাস*, *লক্ষ্মণ-বর্জন*, *সীতার বিবাহ*, *রামের বনবাস*। মহাভারতের কাহিনি অবলম্বনে লেখেন, *অভিমন্যুবধ* (১৮৮১), *পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস* (১৮৮৩)। আরো উল্লেখযোগ্য নাটকগুলো হলো, *আগমনী (*১৮৭০), *অকালবোধন* (১৮৭৭), *দোললীলা*, *মোহিনীপ্রতিমা*, *চৈতন্যলীলা* (১৮৮৪), *বিল্বমঙ্গল* (১৮৮৮), *অশোক* (১৮৯১), *মায়াবসান* (১৮৯৮), *প্রফুল্ল* (১৮৮৯), *হারানিধি* (১৮৯০), *সৎনাম* (১৯০৪), *বলিদান* (১৯০৫), *সিরাজদ্দৌলা* (১৯০৬), *মীরকাশিম* (১৯০৬), *ছত্রপতি শিবাজী* (১৯০৭), *শাস্তি কি শাস্তি* (১৯১৮), *অভিশাপ* (১৯০১), *নন্দদুলাল* (১৮৯৩), *ধ্রুব-চরিত্র* (১৮৮৩), *প্রহ্লাদ-চরিত্র* (১৮৮৪) *লক্ষ্মণ-বর্জ্জন* (১৮৮১), *হর-গৌরী* (১৯০৫), *রূপ-সনাতন* (১৮৮৭), *কালাপাহাড়* (১৮৯৬), *শঙ্কারাচার্য্য* (১৯১৩), *চণ্ড* (১৮৮১), *বাসর* (১৯০৬), *মনের মতন* (১৯০১), *মলিন মালা* (১৮৮২), *হীরক জুবিলী* (১৮৯৭), *যামিনী চন্দ্রমাহীনা গোপন চুম্বন* (১৯১৩), *ভোটমঙ্গল* (১৮৮২), *সপ্তমীতে বিসর্জ্জন* (১৮৯৩), *ঝাঁসীর রানী* (১৯১১) ইত্যাদি। পূর্ববর্তী নাট্যকারদের প্রভাব তাঁর উপর প্রবলভাবে ছিলো। সামাজিক নাটকে তিনি দীনবন্ধু মিত্রের দ্বারা, ঐতিহাসিক নাটকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বারা, পৌরাণিক নাটকে পূর্ববর্তী পৌরাণিক নাটক (মনোমোহন বসু থেকে রাজকৃষ্ণ রায় পর্যন্ত) দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। *পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস* নাটকটি পৌরাণিক নাটক। কিন্তু এর নাট্যকাহিনি চিরকালীন। সুদেষ্ণার সংলাপে রাজঅন্তঃপুরে রাজাদের নারীঘটিত স্বভাব, রানির আশঙ্কায় সমাজের চিরন্তন মানবচরিত্র ফুটে উঠেছে।

রাণী আমি, তুমি সহচরী–
কভু না সম্ভবে বালা;
মাধুরী নিরখি,
নারী হ'য়ে ফিরাতে নারি গো আঁখি!
কেমনে রাখি গো পুরে,
হেরিলে তোমারে মদনে মাতিবে রাজা–
সাধে কেন বিষাদ কিনিব।[৪২]

দ্রৌপদীর সংলাপের মধ্য দিয়ে নারীর সম্মানবোধ এবং পুরুষের ব্যক্তিত্ববোধের মান নির্ধারিত হয়েছে–

নিজ পত্নী অপমান দাঁড়ায়ে
যে দেখে,

ত্যজি অন্য জনে,

যাহার চরণে রমণী স্মরণ লয়,

তারে পরিহরি অন্য নারী যার সাধ–

নপুংসক সেই জন।[৪৩]

নারীর প্রতি অবজ্ঞা-অসম্মান প্রকাশ পেয়েছে কীচকের সংলাপে। সে বলেছে-

পঞ্চস্বামী?

বেশ্যামধ্যে গণি তারে।[৪৪]

গিরিশ ঘোষের *অভিশাপ* (১৩০৮) নাটকে কুসুমকুমারী নৃত্য সংযোজনা করেন। বাংলা নাটকের ইতিহাসে কোনো নারীর নৃত্যশিক্ষা এই প্রথম। গিরিশচন্দ্র ঘোষের সবচেয়ে বড়ো অবদান, *গৈরিশ ছন্দ* প্রবর্তন। তবে, কালীপ্রসন্ন সিংহ *হুতোম পেঁচার নকসায়*, ব্রজমোহন রায় *দানব-বিজয়ে* এই ছন্দ ব্যবহার করেছিলেন। গিরিশচন্দ্র একে সংস্কার করে নাটকের উপযোগী করেন। "গিরিশচন্দ্রের এই মৌলিক এবং নাটকীয় ছন্দের জন্যই তাঁহার পৌরাণিক নাটকগুলি গতানুগতিক একঘেয়েমি হইতে রক্ষা পাইয়াছে।"[৪৫]

"শেক্সপীয়রের 'জুলিয়াস সিজার', 'হ্যামলেট', 'ম্যাকবেথ' প্রভৃতি নাটকে যেমন প্রেতাত্মার অস্তিত্ব আছে, গিরিশচন্দ্রের 'চণ্ড', 'কালাপাহাড়' ইত্যাদি নাটকেও তেমনি অশরীরী ছায়ামূর্তির আবির্ভাব দেখান হইয়াছে। শেক্সপীয়রের সহিত এসব সাদৃশ্য সত্ত্বেও একথা জোর করিয়া বলা যায় যে, গিরিশচন্দ্রের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির সহিত তাঁহার নাট্যগুরুর আদর্শের গুরুতর প্রভেদ বিদ্যমান। গিরিশচন্দ্রের সমস্ত নাটক ধর্মভাব ও নীতিভাবে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। ইহাই তাঁহার সর্বপ্রধান নিজস্ব বৈশিষ্ট্য।"[৪৬]*কালাপাহাড়* নাটকে *আত্মহত্যা* -র সংলাপে একদিকে ছায়ামূর্তি পাওয়া যায়, অন্যদিকে নারীর প্রতি সমাজের অন্যায়ও বোঝা যায়–

জান মোরে, চিনেছ আমায়?

আত্মহত্যা

নাম, ভ্রমি একাকিনী, খুঁজি কে রমণী

কোথা ডাকে। খুঁজি অট্টালিকামাঝে, খুঁজি

দরিদ্র-কুটীরে–শান্তিহীন নরনারী।

কহি কাণে কাণে, কেন কেন দুখভার

বহ? কহি মধুরবচনে, স্থিরচিত্তে

শুনে। যাই নরঘাতী যথা দ্বিচারিণী,

বিশ্বাসঘাতক, অভিমানী–রাখে কথা

> ত্যজিয়ে মমতা, নিজ করে–করে দেহ
> নাশ। ফেরে অশান্তহৃদয় আশাশূণ্য
> ছায়ায় ছায়ায়, এস ত্বরা ডাকে ছায়া।[৪৭]

"মধুসূদন-প্রবর্তিত চতুর্দশমাত্রিক অমিত্রাক্ষর ছন্দকে ভেঙে দিয়ে বা 'পদ্মাবতী' নাটকের নাট্য-ছন্দকে মেনে নিয়ে গিরিশচন্দ্র তাঁর 'গৈরিক ছন্দ' গড়েছিলেন। 'চণ্ড' নাটকের সংলাপকে বেগবান করে তুলবার জন্য। তিনি 'চণ্ড' নাটকে চতুর্দশমাত্রিক চরণবদ্ধ সংলাপ বসিয়েছেন, কিন্তু মধুসূদন বা রবীন্দ্রনাথ এই ছন্দোবন্ধে যে খেলা খেলেছেন, গিরিশচন্দ্র তা পারেননি।"[৪৮] *প্রফুল্ল* গিরিশচন্দ্রের প্রথম পারিবারিক সামাজিক নাটক। এ নাটকে মদ্যপান নিয়ে পারিবারিক ও সামাজিক প্রতিক্রিয়া দেখানো হয়েছে। এখানে নাট্যকার দেখিয়েছেন, পূর্ণ সুখ থেকে চরম দুঃখের নাটকীয় রূপান্তর। নাটকে যোগেশ সৎ, মাতৃবৎসল, ভায়ের প্রতি দায়িত্বশীল, স্ত্রীপুত্রের প্রতি স্নেহার্ত ছিলো, কিন্তু রমেশের চক্রান্তে মদের প্রভাবে সে অমানুষে পরিণত হয়। যোগেশের সংলাপ–

> মচ্ছো, রাস্তায় মরতে এসেছ? তোমাদের এত দূর হয়েছে? আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! যেদোও মরেছে? বেশ হয়েছে! মচ্ছো মর, আমি মদ খাইগে; ঘরে মরতে পাল্লে না? তা মর রাস্তায়ই মর; কি কর্ব্বো হাত নেই, মদ খাইগে! আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল![৪৯]

আবার, রমেশের সংলাপে তার পিশাচতা বোঝা যায় স্পষ্টভাবে–

> বৌ মারা গিয়েছে, সুরেশও মারা গিয়েছে, আমি আজ ডাক্তারকে ভাল করে জিজ্ঞাসা কল্লেম, শুনলেম পীতাম্বরে বেটা তার দেশে নিয়ে গেছলো, সেইখানে মারা গেছে। এখন ছেলেটা কোথায় গেল? সেইটাকে ধত্তে পাল্লেই যে আপদ চোকে; এড্‌মিনিষ্টেটারের কাছ থেকে টাকাটা বা'র করে আনি। দাদা পাগল হয়েছে। পীতাম্বরে বেটা মামলার উদ্যোগ করে, বেনামী স্বীকার পাব, দাদার না হয় খোরাকী বন্দোবস্ত কর্ব্বো,– সেও কি, দু এক বোতল মদ দিয়ে রেখে দেব, মদ খেতে খেতেই একদিন অক্কা পাবে।[৫০]

অন্যদিকে প্রফুল্লর সংলাপে তার মানবিক বোধ প্রকাশিত হয়–

> তুমি কি মনে কর আমি প্রাণ এত ভালবাসি যে, অবোধ নিরাশ্রয় বালককে রাক্ষসের হাতে রেখে প্রাণভয়ে পালাব? প্রাণভয়ে স্বামীকে পিশাচের অধর্ম কার্য্য করতে দেব? আমি ধর্ম্মকে চিরদিন আশ্রয় করেছি, ধর্ম্মকে ভয় করেছি, আমার প্রাণের অত ভয় নেই; নিশ্চয় জেন তোমার চেষ্টা বিফল হবে। সকল কার্য্যের শেষ আছে, তোমার কুকার্য্যের এই শেষ সীমা! ধর্ম্ম অনেক সহ্য করেছেন, আর সহ্য কর্ব্বেন না, সতর্ক হও; আমি সতী, আমার কথা শোন, যদি মঙ্গল চাও, আর ধর্ম্মবিরোধী হ'য়ো না। তুমি কখনই এ শিশুকে বধ করতে পার্ব্বে না।[৫১]

"'প্রফুল্ল' চরিত্রটি নাটকের শেষভাগে 'দেবী' পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে কিন্তু যথার্থ সার্থক নাটকীয় চরিত্রে উন্নীত হয়নি। 'আদর্শ' চরিত্রকে বাস্তব জীবনানুগ (trun to life) হতে হয়। কিন্তু গিরিশচন্দ্র 'রমেশ' চরিত্রকে মূর্তিমান

শয়তান এবং 'প্রফুল্ল'কে মুর্তিমতী ধর্মরূপে দেখাতে চেয়েছেন।"[৫২] এই নাটকের পর তিনি লেখেন *হারানিধি*, *বলিদান*, *শাস্তি কি শান্তি?* নাটক। *বলিদান* নাটকে বাঙালি পরিবারের কন্যাদায় সংকট এবং *শাস্তি কি শান্তি?* নাটকে বিধবা বিবাহ সংক্রান্ত কারণে পরিবারের যন্ত্রণা ও লাঞ্ছনা দেখানো হয়েছে। "গিরিশচন্দ্র মানবজীবনের সমস্যার সন্ধান খুঁজেছিলেন ধার্মিকতা এবং ত্যাগের মধ্যে। তাই তাঁর প্রতিটি নাটকে তত্ত্বানুসন্ধানের ইঙ্গিত আছে। ভক্তি ও করুণ রসে তাঁর নাটকগুলি গম্ভীর এবং সে কারণেই জীবনের সকল দিকেই পরিচর্যা সেখানে আমরা পাই।"[৫৩]

গিরিশচন্দ্র ঘোষের মতো অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯)ও প্রথমে অভিনেতা, তারপর নাট্যকার। তিনি ইতিহাস এবং সমাজকে কেন্দ্র করে নাটক লিখলেও তিনি মূলত প্রহসন লিখেছেন। তাঁর লেখায় গানের ব্যবহার বেশি। এছাড়া ছড়ারও ব্যবহার রয়েছে। নাটক এবং প্রহসনগুলো – *চোরের উপর বাটপাড়ি* (১৮৭৬), *বিবাহ-বিভ্রাট* (১৮৮৪), *চাটুয্যে ও বাঁড়ুয্যে* (১৮৮৬), *তাজ্জব ব্যাপার* (১৮৯০), *তরুবালা* (১৮৯১), *'বিমাতা' বা 'বিজয় বসন্ত'* (১৮৯৩), *বাবু* (১৮৯৪), *একাকার* (১৮৯৫), *বৌমা* (১৮৯৭), *আদর্শ বন্ধু* (১৯০০), *কৃপণের ধন* (১৯০০), *খাসদখল*(১৯১২), *নবযৌবন* (১৯১৪), *যাজ্ঞসেনী* (১৯১৮), *ব্যাপিকা বিদায়* (১৯২৬)। *বিবাহ-বিভ্রাট* অমৃতলাল বসুর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রহসন। এখানে বিজাতীয় ভাবাপন্ন নব্য সমাজ এবং ছেলের বিয়েতে পণ আদায় করার জন্য অসঙ্গত জুলুম– এই দুই বিষয়কে বিদ্রুপ করা হয়েছে। তাঁর প্রহসনগুলোতে অনেক সময় নাট্যকারের বক্তব্য প্রকাশের জন্য কোনো কোনো চরিত্র একেবারে বিনা কারণে চাপানো হয়েছে। এ সকল চরিত্রের মধ্য দিয়ে নাট্যকারের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। "পরোক্ষ ইঙ্গিতের মধ্য দিয়া আঘাত করিবার অধিকার সাহিত্যিকের আছে, কিন্তু পরোক্ষভাবে প্রচার করিবার দায়িত্ব তিনি নিতে পারেন না, কারন তাহা হইলে তাঁহার রচনা রসসৃষ্টিবহির্ভূত হইয়া পড়ে।"[৫৪]*বাবু*, *বৌমা*, *একাকার*, *সম্মতি সঙ্কট* ইত্যাদি প্রহসনে এরকম লেখকের প্রত্যক্ষ কথা রয়েছে। ইংরেজিয়ানা এবং ব্রাহ্ম বাড়াবাড়িকে তিনি বেশি আক্রমণ করেছেন। "অমৃতলাল শ্রেষ্ঠ কমেডিয়ান ছিলেন, নাটক-প্রহসনে অতি অদ্ভুত রঙ্গ-ব্যঙ্গ ও কৌতুকপরিহাস আমদানি করতে পারতেন। বুদ্ধির দীপ্তি, বাকরীতির মারপ্যাঁচ, কাহিনীর চাতুরী– সব কিছুর অধিকারী হয়েও তিনি আগামী যুগের পদধ্বনি শুনতে পাননি : যা কিছু সাম্প্রতিক, প্রগতিশীল, শুধু তার মন্দের দিকটাকেই নিন্দা-বিদ্রুপ করেছেন। সেই নিন্দা-বিদ্রুপ কখনও সম্প্রদায়বিশেষের প্রতি, কখনও আঞ্চলিক ভাষাভাষীদের প্রতি নির্মমভাবে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল।"[৫৫]

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) প্রহসন লেখার মাধ্যমে নাট্যজগতে প্রবেশ করেছিলেন, এরপর নাটক লিখেছিলেন। তাঁর সঙ্গে মঞ্চের কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিলো না, তাই তিনি দর্শক-আবেগের খোঁজ না রেখে

শিল্পমানের দিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন। বাংলা এবং ইংরেজি নাটক দেখে এবং পড়ে তাঁর মধ্যে নাট্যবোধ তৈরি হয় এবং তিনি নাটক লিখতে শুরু করেন। তাঁর প্রহসন *কল্কি-অবতার* (১৮৯৫), *বিরহ* (১৮৯৭), *ত্র্যহস্পর্শ* (১৯০০), *প্রায়শ্চিত্ত* (১৯০২), *পুনর্জন্ম* (১৯১১) ইত্যাদি। তাঁর নাটক– *পাষাণী* (১৯০০), *তারাবাই* (১৯০৩), *প্রতাপসিংহ* (১৯০৫), *দুর্গাদাস* (১৯০৬), *সীতা* (১৯০৮), *নুরজাহান* (১৯০৮), *মেবার পতন* (১৯০৮), *সাজাহান* (১৯০৯), *চন্দ্রগুপ্ত* (১৯১১), *পরপারে* (১৯১২), *ভীষ্ম* (১৯১৪), *সিংহলবিজয়* (১৯১৫), *বঙ্গনারী* (১৯১৬) ইত্যাদি। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসনে গান প্রধান। এছাড়া তাঁর কোনো নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাত ছিলো না। সমাজের সকলের অসঙ্গতিই তিনি অসংকোচে প্রকাশ করেছেন। এদিক দিয়ে তিনি সর্বাত্মকভাবে নিরপেক্ষ নাট্যকার। প্রথম প্রহসন *কল্কি-অবতারে* তিনি বিলেত ফেরত-ব্রাহ্ম-নব্যহিন্দু-গোঁড়া-পণ্ডিত– এই পাঁচ সম্প্রদায়কে বিদ্রুপ করেছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি প্রমাণ করেন যে, বিশ্বাস-প্রেম-মনুষত্বের উপরই সমাজের ভিত্তি। তবে, তাঁর প্রহসনগুলো সরস হতে পারে নি। তিনি পৌরাণিক নাটকও লিখেছেন। তাঁর পৌরাণিক চরিত্রগুলো আধুনিক যুগের ভাববৈশিষ্ট্যে ঐশ্বর্যবান হয়েছে। আধ্যাত্মিক মহিমামণ্ডিত না হয়ে হয়েছে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতমূলক মানবীয় ভাবাত্মক। তবে, সামাজিক নাটক রচনায় তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নি। গতানুগতিক নারী-পুরুষের জীবন নিয়ে তিনি নাটক লেখার চেষ্টা করেছিলেন। "গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকে এই বাঙালী জীবন লইয়া যথাসম্ভব ঘাঁটাঘাঁটি হইয়াছে। গিরিশচন্দ্র প্রভৃতিকে অনুসরণ করিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল নিরুদ্ধস্রোত নদীর মধ্যে একটু এদিক ওদিক যাতায়াত করিয়াছেন, নদীর মুখ কাটিয়া জলধারাকে চঞ্চল তরঙ্গময় ও গতিশীল করিতে পারেন নাই।"[৫৬] দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সবচেয়ে সাফল্যের দিক ঐতিহাসিক নাটক রচনা। "দ্বিজেন্দ্রলাল সর্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক নাটকের বন্যা প্রবাহিত করেন। তাঁর পূর্বে পৌরাণিক নাটকের বন্যাবেগ দেশকে আচ্ছন্ন রেখেছিল, বিচ্ছিন্নভাবে একটি-দুটি ঐতিহাসিক নাটকের সন্ধান পাওয়া গেলেও দ্বিজেন্দ্রলালের পূর্ব পর্যন্ত তা কোনও বলিষ্ঠ ধারা নির্ধারণ করেনি। ঐতিহাসিক নাটকে লৌকিক জীবনের সমৃদ্ধি এলো এবং পৌরাণিক নাটকের দৈবলীলা অন্তরালে গেল স্বদেশহিতৈষণা, পরাধীনতার মর্মবেদনা এবং জাতীয় জীবনে প্রতিনিয়ত যে বিক্ষোভ, ঐতিহাসিক নাটকের মাধ্যমে তার পরিচয় স্পষ্ট হল। রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রেরণাস্থল হল নতুন ঐতিহাসিক নাটক। এ সময়কার ঐতিহাসিক নাটকেই সর্বপ্রথম প্রতিপক্ষ হিসাবে এলো ইংরেজ এবং স্বাধীনতার ভিত্তিমুলে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত কর্মপ্রেরণার কথা উচ্চারিত হল।"[৫৭] তিনি সত্যনিষ্ঠভাবে ইতিহাসের অনুসরণ করেছেন, কিন্তু তাঁর নাটক নীরস হয় নি। তবে কিছু কিছু জায়গায় তিনি ইতিহাসকে অতিক্রম করেছেন। তবে, "জাতীয় মন্ত্র-দীক্ষিত দ্বিজেন্দ্রলাল পরাধীনতার ক্ষুব্ধ জ্বালা ও অপরিসীম বেদনার কথা ফুটাইয়া ভবিষ্যতের আশা ও আলোকের চিত্র অঙ্কিত করিয়া দেখাইলেন। তাঁহার নাটকে মহাপ্রাণের আত্মবলিদানে, চারণের শোকসঙ্গীতে এবং স্বাধীনতাব্রতী জাতির বিরাট

ত্যাগের গৌরবে মন ভরিয়া উঠে, পুনরায় মহাব্রতে দীক্ষিত হইবার জন্য হৃদয়ে দুর্বার প্রেরণা বোধ করা যায়। ভারতবাসীর শত প্রকার দুঃখলাঞ্ছনার মধ্যেও নাট্যকার আবার আমাদিগকে মানুষ হইবার জন্য আবেদন জানাইয়াছেন, এই সুগভীর আশাবাদ তাঁহার নাটকগুলিকে অমূল্য জাতীয় সম্পদে সমৃদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।"[৫৮] *সাজাহান* নাটকে জহরৎ উন্নিসার শেষ সংলাপে শত্রুর প্রতি আবার বিদ্বেষী হতে প্রেরণা দেয়–

> কিন্তু আমি ক্ষমা করি নাই ঘাতক! পৃথিবী শুদ্ধ যদি তোমায় ক্ষমা করে, আমি কর্ব্ব না। আমি তোমায় অভিশাপ দিচ্ছি। ক্রুদ্ধ ফণিনীর উষ্ণ নিঃশ্বাসে আমি তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি, সে অভিশাপের ভৈরব ছায়া যেন একটা আতঙ্কের মত তোমার আহারে বিহারে– তোমার পিছনে পিছনে ফিরে। নিদ্রায় সেই অভিশাপের পর্ব্বতভার যেন তোমার বক্ষে চেপে ধরে। সেই অভিশাপের বিকট ধ্বনি যেন তোমার সকল বিজয়বাদ্যে বেসুরো বেজে উঠে। তুমি আমার পিতাকে হত্যা করে যে সাম্রাজ্য অধিকার করেছো, আমি অভিশাপ দেই, যেন তুমি দীর্ঘকাল বাঁচো, আর সেই সাম্রাজ্য ভোগ কর; যেন সেই সাম্রাজ্য তোমার কালস্বরূপ হয়; যেন সে পাপ থেকে কেবল গাঢ়তর পাপে তোমায় নিক্ষেপ করে, যাতে মর্ব্বার সময় তোমার ঐ উত্তপ্ত ললাটে ঈশ্বরের করুণার এক কণাও না পাও।[৫৯]

– অর্থাৎ তাঁর নাটকে ইতিহাসের জগৎ জীবন্ত হয়ে ওঠে। "সব দিক বিবেচনা করে দ্বিজেন্দ্রলালকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নাট্যকার বলা যেতে পারে।"[৬০] দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের ভাষার অনবদ্যতা তাঁর নাটককে পূর্ববর্তী নাটক থেকে উচ্চস্তরে উত্তীর্ণ করেছে। তাঁর নাট্যভাষা সহজ-শক্তিশালী-কবিত্বপূর্ণ-নাটকীয় সর্বোপরি গতিশীল। "সংলাপের প্রতিটি কথা যেন এক একটা তীক্ষ্ণফলা ছুরিকার ন্যায় ঝকমক করিতেছে, যেন নিমেষগতিতে দর্শকের হৃদয়ে ইহা আমূল বিদ্ধহইয়া যাইবে। শব্দভাণ্ডারের উপর তাঁহার অবিচল অধিকার ছিল বলিয়া ভাষাকে তিনি নানা রত্ন-আভরণে সাজাইয়া অনিন্দ্যসুন্দরী করিয়া তুলিয়াছিলেন।"[৬১] দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে কোনো ধর্মভাব বা আধ্যাত্মিকতা নেই– সম্পূর্ণ বাস্তবধর্মী কাহিনি। তাঁর দৃষ্টি ছিলো মানুষের সর্বময় উন্নতি এবং কল্যাণের দিকে। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলোই প্রথম অন্তর্দ্বন্দ্বে এবং বিরুদ্ধ ভাব সংঘাতে মানবিক-জটিলতাপ্রাপ্ত হয়েছে। তিনি দর্শকদের রুচির মোড় ঘুড়িয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক আরেকজন নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৩-১৯২৭)। পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে পেশাদার নাটকলিখিয়ে হিসেবে তাঁর আবির্ভাব। তাঁর গীতিনাট্য– *আলিবাবা* (১৮৯৭), *জুলিয়া* (১৯০০), *বেদৌরা* (১৯০৩), *আলাদিন, বরুণা* (১৯০৮), ভূতের *বেগার* (১৯০৮), *বাসন্তী* (১৯০৮), *পলিন* (১৯১১), *মিডিয়া* (১৯১২), *কিন্নরী* (১৯১৮)। পৌরাণিক নাটক– *বভ্রুবাহন* (১৮৯৯), *সাবিত্রী* (১৯০২), *রঞ্জাবতী* (১৯০৪), *উলুপী* (১৯০৬), *ভীষ্ম* (১৯১৩), *মন্দাকিনী* (১৯২১), *নরনারায়ণ* (১৯২৬)। ঐতিহাসিক নাটক– *প্রতাপাদিত্য* (১৯০৩), *রঘুবীর* (১৯০৩), *পদ্মিনী* (১৯০৬), *চাঁদবিবি* (১৯০৭), *অশোক* (১৯০৮), *পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত*, *বাঙ্গলার মসনদ*

(১৯১০), *আলমগীর* (১৯২১), *বিদূরথ* (১৯২২)। কাল্পনিক ইতিবৃত্তমূলক নাটক– *খাঁজাহান* (১৯১২), *আহেরিয়া* (১৯১৫), *বঙ্গে রাঠোর* (১৯১৭)। *আলিবাবা* তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় নাটক। নাচ-গানের প্রাচুর্য এ নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য। *কিন্নরী*র সাফল্যও এখানেই। রবীন্দ্রনাথের নাটক ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের কাহিনির প্রভাব তাঁর নাটকে রয়েছে, তবে উৎকর্ষ নেই। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে জাতীয়চেতনার বিকাশে অনুপ্রেরণাসুলভ নাটক রচনার প্রভাব ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকে লক্ষ্যনীয়। এগুলো নাটক হিসেবে উৎকৃষ্ট না হলেও 'জাতীয়বোধ' উন্মোচনের গৌরবে অভিষিক্ত। কাল্পনিক ইতিবৃত্তমূলক নাটকগুলো ঐতিহাসিক চরিত্র সন্নিবেশে লেখা কিন্তু কাহিনি নিজের কল্পনাশ্রয়ী। তাঁর নাটকগুলো সম্পর্কে বলা যায়– "নাট্যকার তাঁর কালের অল্পশিক্ষিত এবং স্থূল রুচির জনসাধারণের মনতুষ্টি করতে গিয়েছিলেন বলে অনেক নাটকীয় মুহূর্তকে সস্তা ভাবালুতার মোহে একেবারে মাটি করে ফেলেছেন। সংলাপ রচনায় এবং রঙ্গরহস্যে তিনি প্রাকৃতরুচির বেশী প্রশ্রয় দিতেন বলে মার্জিত মনের দর্শক-পাঠক তাঁর অধিকাংশ নাটক থেকে বিশেষ কোন তৃপ্তি খুঁজে পান না।"[৬২]

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে আরো কয়েকজন নাট্যকার নতুনভাবে নাটক লিখেছেন। অপরেশচন্দ্র মুখ্যোপাধ্যায় (১৮৭৫-১৯৩৪) লিখেছেন *আহুতি* (১৯১৪), *রাখী* (১৯২০), *অযোধ্যার বেগম* (১৯২১)। যোগেশচন্দ্র চৌধুরী (১৮৮৬-১৯৪১) লিখেছেন *সীতা* (১৯২৪), *দিগ্বিজয়ী* (১৯৩৪)। মন্মথ রায় লেখেন *দেবাসুর* (১৯২৮), *কারাগার* (১৯৩০), *অশোক* (১৯৩৪)। শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৯২-১৯৬১) লেখেন *গৈরিক পতাকা* (১৯৩৩), *দেশের দাবী* (১৯৩৪) *প্রলয়* (১৯৩৭), *সিরাজদ্দৌলা* ইত্যাদি। এছাড়া বনফুলের (১৮৯৯-১৯৭৯) *শ্রীমধুসূদন* (১৯৩২) এবং *বিদ্যাসাগর* (১৯৪১), প্রমথনাথ বিশীর *ঋণং কৃত্বা* (১৯৩৫) এবং ঘৃতং *পিবেৎ* (১৯৩৯) বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি।

এঁদের সকলের নাটককে ছাপিয়ে উজ্জ্বলতায় ভাস্বর হয়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটক।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. অতীন্দ্র মজুমদার (সম্পা.),*চর্যাপদ* (বীণাপাদ কর্তৃক লিখিত ১৭ নং চর্যা),১৯৭২, নয়া প্রকাশ, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১৪১

২. ড. প্রদ্যোত সেনগুপ্ত, *বাংলার সামাজিক জীবন ও নাট্যসাহিত্য*, ১৯৭৬, সাহিত্যশ্রী, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১১

৩. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, *বাংলা নাট্যমঞ্চের রূপরেখা*, ১৩৯৪, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃষ্ঠা-২-৩

৪. গোলাম মুরশিদ, নাটক ও সিনেমা, *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*, ২০০৬, অবসর, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৩৫২

৫. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৩

৬. প্রবীর প্রামাণিক, *নদীয়া জেলার লোকধর্ম*, ২০১০, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৪০

৭. ড. অজিতকুমার ঘোষ, *বাংলা নাটকের ইতিহাস*, ২০০৫, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১৬

৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৬

৯. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা -১৭

১০. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা -১৮

১১. ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*, ১৯৯৫, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৩৪০

১২. গোলাম মুরশিদ, *সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক*, ১৯৮৪, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৭০-৭১

১৩. ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৪১

১৪. আহমদ শরীফ, মধুসূদনের অন্তর্লোক, বিচিত চিন্তা, *আহমদ শরীফ রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, ২০১০, সম্পা. আহমদ কবির, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১৭১

১৫. মাইকেল মধুসূদন দত্ত, শর্মিষ্ঠা, *মধুসূদন রচনাবলী*, ২০০৯, সম্পা. ডক্টর ক্ষেত্রগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃষ্ঠা-২৩৭

১৬. ডক্টর ক্ষেত্রগুপ্ত, ভূমিকা, *মধুসূদন রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-একান্ন

১৭. মমতাজ উদ্‌দীন আহমদ, বাংলাদেশের সাম্প্রতিক নাট্যচর্চার ইতিবৃত্ত, *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা*, ১৯৮৬, সম্পা. রামেন্দু মজুমদার, মুক্তধারা, পৃষ্ঠা-১১৯

১৮. ডক্টর ক্ষেত্রগুপ্ত, ভূমিকা, *মধুসূদন রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-ঊনষাট

১৯. আহমদ শরীফ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৭১

২০.সৈকত আসগর, আধুনিক বাংলা নাটকে লোকনাট্যের আঙ্গিক, *বাংলার লোকঐতিহ্য লোকনাট্য*, ১৯৯৯, সম্পা. সৈকত আসগর, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১৭৪

২১. ড. অজিতকুমার ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮২

২২.মাইকেল মধুসূদন দত্ত, একেই কি বলে সভ্যতা?, *মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রহসন*, ১৯৯০, সম্পা. মমতাজ উদদীন আহমদ, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৭০-৭১

২৩.মমতাজ উদদীন আহমদ, ভূমিকা, *মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রহসন*, ১৯৯০, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৬

২৪.প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬

২৫.ডক্টর ক্ষেত্র গুপ্ত, ভূমিকা, *দীনবন্ধু রচনাবলী*, ২০০৬, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃষ্ঠা-এগারো

২৬.দীনবন্ধু মিত্র, নীলদর্পন, *দীনবন্ধু রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২২

২৭.প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৫

২৮.বিষ্ণু বসু, ভূমিকা, *মধুসূদন-দীনবন্ধু রচনাবলী*, ১৯৮৭, তুলি-কলম, কলকাতা, পৃষ্ঠা-নয়

২৯.সৈয়দ আলী আহসান, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ১৩৮৯, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৩০২

৩০.ড. অজিতকুমার ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৯০

৩১.গোলাম মুরশিদ, *সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪১৭

৩২.সুকুমার সেন, আধুনিক নাটক : নাটুয়া-পর্ব, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, তৃতীয় খণ্ড, ১৪১৭, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১৩৬

৩৩.ড. অজিতকুমার ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১১৪

৩৪. মাহবুবুল আলম, ভূমিকা, *জমীদার দর্পণ*, ১৯৯৬, বর্ণবিচিত্রা, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১১

৩৫.ড. অজিতকুমার ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১২৫

৩৬.প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৩০

৩৭.ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা -৩৫৩

৩৮.ড. অজিতকুমার ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৩৫

৩৯. সুকুমার সেন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৫২

৪০. সৈয়দ আলী আহসান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৩১১

৪১.ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা -৩৫৫

৪২. গিরিশচন্দ্র ঘোষ, পান্ডবের অজ্ঞাতবাস, *গিরিশ রচনাবলী*, ১৯৯২, সম্পা. ডক্টর দেবীপদ ভট্টাচার্য, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৮২

৪৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮৩

৪৪.প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮৪

৪৫.ড. অজিতকুমার ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৪৭

৪৬.প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৪৭

৪৭.গিরিশচন্দ্র ঘোষ, কালাপাহাড়, *গিরিশ রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৭২

৪৮.ডক্টর দেবীপ্রদ ভট্টাচার্য. ভূমিকা, *গিরিশ রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩২-৩৩

৪৯. গিরিশচন্দ্র ঘোষ, প্রফুল্ল, *গিরিশ রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা -৫৩৬

৫০. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৩৭

৫১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৪৪

৫২.ডক্টর দেবীপ্রদ ভট্টাচার্য. ভূমিকা, *গিরিশ রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা -সাঁইত্রিশ

৫৩. সৈয়দ আলী আহসান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩১১

৫৪. ড. অজিতকুমার ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা -১৮৭

৫৫.ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা -৩৬১

৫৬.ড. অজিতকুমার ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা -২২৯

৫৭. সৈয়দ আলী আহসান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩১৫

৫৮.ড. অজিতকুমার ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা -২০৮-৯

৫৯.দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, সাজাহান, *শতবর্ষের নাটক*, ১৯৯৪, সম্পা. সৈয়দ শামসুল হক ও রশীদ হায়দার, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৩৬০

৬০.ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৩৯

৬১.ড. অজিতকুমার ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২১০

৬২.ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা–৫৪২

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

রবীন্দ্র-নাট্যের বিষয়ভিত্তিক শ্রেণিকরণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) এর জন্ম এবং বেড়ে ওঠা তাঁর বাড়ির সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে। শিশু অবস্থাতেই তিনি নিজেদের বাড়িতে নাটকের অভিনয় দেখেছেন। একটু বড় হওয়ার পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকেও তিনি অভিনয় করেছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনেক নাটকে তাঁর কাঁচা হাতের গান এবং সংলাপ সংযোজিত হয়েছিলো। এরপর বিলেত থেকে ফিরে এসে তিনি নিজেও নাটক লেখা শুরু করেছিলেন। তাঁর লেখা প্রথম নাটক গীতিনাট্য *বাল্মীকি-প্রতিভা* (১৮৮০)। এরপর তাঁর সমস্ত জীবন নাটক লেখা অব্যাহত ছিল।[১] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটক বিষয় ও আঙ্গিকে বিচিত্র। তিনি কোনো নির্দিষ্ট বক্তব্যে স্থির থাকেন নি; থাকেন নি নির্দিষ্ট আঙ্গিকে আবদ্ধ। নিজের লেখাকেই তিনি একাধিকবার ভেঙেছেন, সেখান থেকে বের করে এনেছেন ভিন্নতর বক্তব্য ও অনন্য রস। এই ভাঙন ও সৃজন প্রক্রিয়া তাঁর জীবনের শেষ অবধি অব্যাহত ছিলো। তাঁর রচিত নাটকসমূহ অভিনিবেশসহকারে পাঠ করলে বোঝা যায়, বিষয়ের ক্ষেত্রে তিনি যেমন নব নব ঘটনা-সৃজন করে বক্তব্যের ভিতরে প্রবেশ করেছেন, তেমনি প্রচলিত ও বহু চর্চিত অনেক কথা-কাহিনিকেও তিনি নবদৃষ্টিতে করেছেন উপস্থাপনা। তাই তাঁর নাটকে বিভিন্ন লোককাহিনি, জাতককাহিনি, রামায়ণ-মহাভারত ইত্যাদি থেকে কাহিনি বা ভাব সংগ্রহের সাক্ষ্য পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত নাট্যসমগ্র পাঠ করে কাহিনি সৃজনের দিক দিয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে এগুলোকে দুটো ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন :

ক. সম্পূর্ণ স্বসৃষ্ট কাহিনিভিত্তিক নাটক

খ. প্রচলিত কাহিনি বা ভাবাশ্রয়ী কাহিনিভিত্তিক নাটক

নিচে এর একটি তালিকা প্রদান করা যায় :

ক. সম্পূর্ণ স্বসৃষ্ট কাহিনিভিত্তিক নাটক :

১. নলিনী (১৮৮৪)

২. প্রকৃতির প্রতিশোধ (১৮৮৪)

৩. মায়ার খেলা (১৮৮৮)

৪. রাজা ও রানী (১৮৮৯)

৫. গোড়ায় গলদ (১৮৯২)

৬. বৈকুণ্ঠের খাতা (১৮৯৭)

৭. কাহিনী (১৮৯৯) [পতিতা, লক্ষ্মীর পরীক্ষা]

৮. চিরকুমার সভা (১৯০৪)

৯. হাস্যকৌতুক (১৯০৭)

১০. ব্যঙ্গকৌতুক (১৯০৭)

১১. শারদোৎসব (১৯০৮)

১২. মুকুট (১৯০৮)

১৩. অচলায়তন (১৯১১)

১৪. ডাকঘর (১৯১১)

১৫. ফাল্গুনী (১৯১৬)

১৬. গুরু (১৯১৭)

১৭. ঋণশোধ (১৯২১)

১৮. বসন্ত (১৯২৩)

১৯. গৃহপ্রবেশ (১৯২৫)

২০. শেষ বর্ষণ (১৯২৫)

২১. সুন্দর (১৯২৫)

২২. রক্তকরবী (১৯২৬)

২৩. শোধবোধ (১৯২৬)

২৪. শেষরক্ষা (১৯২৮)

২৫. তপতী (১৯২৯)

২৬. নবীন (১৯৩০)

২৭. কালের যাত্রা (১৯৩২)

২৮. তাসের দেশ (১৯৩৩)

২৯. বাঁশরী (১৯৩৩)

৩০. শ্রাবণগাথা (১৯৩৪)

৩১. নটরাজ (১৯৩৫)

৩২. মুক্তির উপায় (নাট্যরূপ ১৯৩৮)

৩৩. যোগাযোগ (নাট্যরূপ ১৯৩৬)

খ. প্রচলিত কাহিনি বা ভাবাশ্রয়ী কাহিনিভিত্তিক নাটক

১. বাল্মীকি-প্রতিভা (১৮৮০)

২. কালমৃগয়া (১৮৮২)

৩. বিসর্জন (১৮৯০)

৪. চিত্রাঙ্গদা (১৮৯৪)

৫. বিদায় অভিশাপ (১৮৯৪)

৬. মালিনী (১৮৯৬)

৭. কাহিনী (১৮৯৯) [গান্ধারীর আবেদন, সতী, নরকবাস, কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ]

৮. প্রায়শ্চিত্ত (১৯০৯)

৯. রাজা (১৯১০)

১০. অরূপরতন (১৯১৯)

১১. মুক্তধারা (১৯২২)

১২. নটীর পূজা (১৯২৫)

১৩. পরিত্রাণ (১৯২৯)

১৪. শাপমোচন (১৯৩১)

১৫. চণ্ডালিকা (১৯৩৩)

১৬. শ্যামা (১৯৩৯)

রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ নিজের সৃষ্ট কাহিনিতে প্রথম লিখেছিলেন *মায়ার খেলা* গীতিনাট্য। এই নাটক সম্পর্কে তিনি লিখেছেন :

> বাল্মীকিপ্রতিভা ও কালমৃগয়া যেমন গানের সূত্রে নাট্যের মালা, মায়ার খেলা তেমনি নাট্যের সূত্রে গানের মালা।[২]

গান এবং নাট্যের এই মিলনে তিনি বহুদিন কোনো নাটক লেখেন নি। এরপর শেষ পর্যায়ের *শাপমোচন*, *শ্রাবনগাথা* এবং *সুন্দর* নাটকে গানের প্রাধান্য। এই গানগুলির জন্যই তিনি গদ্য সংযোগে নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *প্রকৃতির প্রতিশোধ* নাটকটি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে কারোয়ারে বাসকালে লিখেছিলেন। নাটকের কাহিনি একজন সন্ন্যাসী এবং একটি বালিকাকে নিয়ে। এ নাটকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সন্ন্যাসজীবন এবং সংসারজীবনের চিত্র উপস্থাপন করে দেখিয়েছেন সংসারের বাইরে গিয়ে শান্তি পাওয়া যায় না, প্রকৃত সুখ সংসারেই নিহিত। *প্রকৃতির প্রতিশোধ* সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজে বলেছেন :

> এই বইটি কাব্যে এবং নাট্যে মিলিত। সন্ন্যাসীর যা অন্তরের কথা তা প্রকাশ হয়েছে কবিতায়।[৩]

তাছাড়া বালিকা-বৃদ্ধা-পুরোহিত এমনকি অনেক সময় পথিকরাও কাব্যে কথা বলেছে। এ নাটক সম্পর্কে সবচেয়ে বড় কথা এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য। রবীন্দ্রনাথ সমস্ত জীবন 'সীমার মধ্যে অসীম'কে ধরতে চেয়েছেন তার-ই প্রথম ধ্বনি এখানে শুনতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ এটি কাব্যনাট্য এবং এর ভিতরে আমরা 'রূপক' দেখতে পাই। এর মধ্যে আরো রয়েছে রবীন্দ্র-মানসের রূপ-অরূপের প্রতি আকাঙ্ক্ষা। *রাজা ও রানী*তে লিরিকের প্রাধান্য। কাহিনিতে রয়েছে ট্র্যাজেডির সুর। তাছাড়া কাহিনি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে। তাই একাধারে নাটকটি আঙ্গিকগত দিক দিয়ে যেমন কাব্যনাট্য তেমনি বিষয়গত দিক দিয়ে রাজনীতি প্রধান এবং হৃদয়কেন্দ্রিক। সুকুমার সেন বলেছেন : "হৃদয়ের ধনকে দেহে আঁকড়িয়া ধরিয়া রাখিবার বাসনা, 'সমগ্র মানব'কে পাইবার দুর্বাসনা ও দুঃসাহস রাজা-ও-রাণীর ট্রাজেডির হেতু।"[৪] রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী সময়ে *রাজা ও রানী*কে *তপতী* নাটকে রূপান্তর করেন। *তপতী* গদ্যে লেখা নাটক। *শারদোৎসব* শরতের ছুটিতে আনন্দে মেতে ওঠার কাহিনি। নাটকটি গদ্যে লেখা। এ নাটককে সংস্কার করে তিনি *ঋণশোধ* নাটকটি লেখেন। অমৃতের ঋণশোধ-ই যে জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া নাটকে এই ভাবটি স্পষ্ট হয়েছে। *অচলায়তন* রূপক নাটক। যুগ যুগ ধরে আকড়ে থাকা অসংগত প্রথার অসংগতি তুলে ধরা হয়েছে এ নাটক। মহাপঞ্চকের জ্ঞানসাধনা, শোনপাংশুদের কর্মসাধনা এবং দর্ভকদের ভক্তি সাধনা– তিনই অচলায়তন। 'কোনো কিছুর বাড়াবাড়িই উচিত নয়'– রবীন্দ্রনাথ এই বক্তব্য তুলে ধরেছেন নাটকে। এরপর *অচলায়তন*কে আকারে ছোট করে *গুরু* নাটক লিখেছেন। *ডাকঘর* বাইরে বেরিয়ে পড়ার আহ্বানে লেখা নাটক। জগৎটাকে দেখবার এবং বিশ্বাত্মার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার বাসনাই এর মূলসুর। *ফাল্গুনী* নাটকে বয়সের যৌবনোত্তীর্ণ রাজাকে মনের যৌবনের খোঁজ দিয়েছেন কবি। নাটকে রূপকের গুণাবলী যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে

সাংকেতিকতার। *বসন্ত* নাটকে বসন্ত ঋতুর স্বভাবের অন্তরালে দান এবং গ্রহণের বোধ প্রকাশিত হয়েছে। লেখক বলতে চেয়েছেন, যিনি রাজা তাঁর সন্ন্যাসী হওয়াও উচিত। *গৃহপ্রবেশ* নাটকে মানুষের মানসিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পারিবারিক এবং সামাজিক পরিস্থিতির স্বরূপ দেখানো হয়েছে। *শোধবোধ* নাটকটিতেও পারিবারিক এবং সামাজিক পরিবেশ এবং এর মধ্যে সৃষ্ট মানুষের মানসিক পরিবর্তন প্রকাশিত হয়েছে। *রক্তকরবী* নাটকে জড়ের সঙ্গে প্রাণের দ্বন্দ্ব। সবশেষে প্রাণধর্মেরই জয় হয়েছে। *যোগাযোগ* নাটকে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন স্বামী-স্ত্রীর ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব। তবে, স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্বের আড়ালে সমাজের শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত দুটি শ্রেণির মানসিক বোধ এবং তাদের বিরোধকেই তুলে ধরা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ *বাল্মীকি-প্রতিভার* ভাবটি কৃত্তিবাসের বাংলা রামায়ণ থেকে গ্রহণ করেছেন, তবে মূল রামায়ণের সঙ্গে এর কোনো মিল নেই। তিনি বিলেতে গিয়ে কতকগুলো আইরিশ মেলডীজ শুনেছিলেন এবং তা শিখেছিলেন। দেশে এসে এগুলো শোনানোর পর আত্মীয়-বন্ধুর কাছে তাঁর গলার স্বর অন্য রকম মনে হয়েছিলো। তিনি এই দেশি এবং বিলেতি সুরের চর্চার মধ্যে লিখেছেন *বাল্মীকিপ্রতিভা*। এই গীতিনাট্যপন্থায় তিনি *কালমৃগয়া* নাটকও লেখেছেন। পরবর্তী সময়ে একে *বাল্মীকিপ্রতিভায়* মিশিয়ে দেন। *কালমৃগয়া* নাটকের বিষয় রামায়ণে বর্ণিত রাজা দশরথ কর্তৃক অন্ধমুনির পুত্র সিন্ধু বধ। *চিত্রাঙ্গদা* মহাভারতের একটি কাহিনি অবলম্বনে পরিকল্পিত। এটি কাব্যনাট্য; পরবর্তী সময়ে রবীন্দ্রনাথ এর নৃত্যনাট্যরূপ দেন। গীতি বা নৃত্যনাট্য যাই হোক না কেন, এর একটি মূল কথা রয়েছে। লেখক দেখিয়েছেন নারী কেবল তার রূপেই অনন্য নয়, তার শৌর্য-বীর্যই প্রকৃত পরিচয়। *বিদায়-অভিশাপ* মহাভারতের কাহিনি অবলম্বনে লিখিত। এখানে রবীন্দ্রনাথ কচ এবং দেবযানী দুজনেরই অন্তর্জগতের কষ্ট উন্মোচন করেছেন। *মালিনী*র কাহিনির মূল রবীন্দ্রনাথের একটি স্বপ্নে পাওয়া। স্বপ্নটি দেখেছিলেন ১৮৯০ সালে লন্ডনে বাসকালে। তবে উপস্থাপনে বৌদ্ধ সাহিত্যের এক *জাতক* কাহিনীকে অনুসরণ করেছেন। এটি কাব্যে লেখা নাটক। নাটকে 'ক্ষমা'কে পরমধর্মের রূপ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া নাটকে রোমান্টিকতার গুণও রয়েছে। *কাহিনীর গান্ধারীর আবেদন* ও *কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ* মহাভারতের কাহিনি, *সতী*র আখ্যানভাগ একটি মারাঠী গাথা থেকে গৃহীত। *নরকবাস* মহাভারতের সোমক রাজার কাহিনির উপর ভিত্তি করে লেখা। এগুলি কাব্যাকারে লেখা। নাটকের কাহিনি একমুখী। *প্রায়শ্চিত্ত* গদ্যে লেখা নাটক। এ নাটকে একদিকে রয়েছে ঐতিহাসিক উপাদান, অন্যদিকে সাঙ্কেতিকতার আভাস, বিষয়ে রাজনীতি প্রধান। *মুক্তধারায়*ও এরূপ ঐতিহাসিকতা এবং সাঙ্কেতিকতা রয়েছে। বৌদ্ধ জাতক কাহিনি অবলম্বনে *রাজা*, *নটীর পূজা*, *চণ্ডালিকা*, *শ্যামা* নাটক লিখিত। *রাজা*র নবরূপ *অরূপরতন* এবং *শাপমোচন*। রাজায় দুটি তত্ত্ব নিহিত। একটি– বাইরের সৌন্দর্যের চেয়ে অন্তরের সৌন্দর্যই বড়,

অন্যটি– দুঃখের পথ অতিক্রম করে সত্যকে পাওয়া যায়। *নটীর পুজা* লেখা হয়েছে *অবদান শতক* থেকে কাহিনি নিয়ে। নাটকটি গদ্যে লেখা। এখানে বৌদ্ধধর্মের মহিমা প্রকাশিত হয়েছে। *চণ্ডালিকা* কাব্যনাট্য। এটি বৌদ্ধভিক্ষু আনন্দ এবং চণ্ডালকন্যা প্রকৃতির কাহিনি। পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথ এর নৃত্যনাট্যরূপ দেন। 'সকল মানুষের সমান মর্যাদা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নাটকে। *শ্যামা* নাটকে প্রেম এবং নিষ্ঠুরতার সমান্তরালতা দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। শ্যামা যেমন বজ্রসেনের প্রতি প্রেমার্ত কিন্তু উত্তীয়র জীবনের প্রতি মায়া করে নি, তেমনি বজ্রসেন শ্যামার প্রতি আসক্ত হলেও উত্তীয়র প্রতি কর্তব্যজ্ঞানে এবং শ্যামার পাপের কারণে শ্যামাকে ক্ষমা করে কাছে ডাকতে পারে না। এখানে বজ্রসেনের অন্তর্দ্বন্দ্ব আরো প্রকট। *বিসর্জন* গদ্য-পদ্যে লেখা নাটক। এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হলো– 'সর্বজীবে প্রেম'। বুদ্ধদেবের 'অহিংসা' তত্ত্বই এর মূল কথা। 'শাস্ত্রের চেয়ে প্রাণের মূল্য বড়' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নাটকে। নাটকটি কোনো জাতকাশ্রয়ী নয়, তবে এতে ঐতিহাসিক চরিত্র রয়েছে। যদিও ইতিহাসের সঙ্গে নাটকের সংশ্রব নেই।

রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলোর লেখ্যরীতি এবং বিষয়বস্তু আলোচনায় স্পষ্ট হয়েছে রবীন্দ্রনাথ একই রীতিতে বা একই বিষয়ে নাটক লেখেন নি। রবীন্দ্রগবেষকগণও বিভিন্নভাবে রবীন্দ্রনাথের নাটকের শ্রেণিবিভাগ করেছেন। সুকুমার সেন (১৯০০-১৯৯২) রবীন্দ্রনাটককে ছয় ভাগে ভাগ করেছেন। ভাগগুলো[৫]–

১. প্রকৃতি প্রতিযোগে ব্যক্তি(১৮৮১-১৮৮৮)– *বাল্মীকি-প্রতিভা*, *প্রকৃতির প্রতিশোধ*, *মায়ার খেলা*।
২. ব্যক্তি প্রতিযোগে ব্যক্তি (১৮৮৯-১৮৯৬)– *রাজা ও রাণী*, *বিসর্জন*, *চিত্রাঙ্গদা*, *বিদায়-অভিশাপ*, *মালিনী*।
৩. কৌতুকনাট্য (১৮৮৫-১৯০১)– *হাস্যকৌতুক*, *ব্যঙ্গকৌতুক*, *গোড়ায়-গলদ*, *শেষরক্ষা*, *বৈকুণ্ঠের খাতা*।
৪. অন্তরের অন্তপুরে (১৯০৮-১৯২৪)– *শারদোৎসব*, *মুকুট*, *ফাল্গুনী*, *বসন্ত*, *শেষ বর্ষণ*, *প্রায়শ্চিত্ত*, *পরিত্রাণ*, *রাজা*, *অরূপরতন*, *অচলায়তন*, *গুরু*, *ডাকঘর*।
৫. *মুক্তধারা* ও *রক্তকরবী*।
৬. শেষপালা (১৯২৪-১৯৩৯)– *চিরকুমার-সভা*, *শেষরক্ষা*, *তপতী*, *শোধবোধ*, *গৃহপ্রবেশ*, *তাসের দেশ*, *নটীর পূজা*, *চণ্ডালিকা*, *বাঁশরী*, *শ্যামা*।

–এই ছয়টি পর্ব আলোচনা করে সুকুমার সেন সংযোজন অংশে বলেছেন :

> নাট্যরচনা বলতে আমি ধরেছি সেইসব রচনা যার মধ্যে অল্পবিস্তর কিছু পরিমাণেও নাট্যরস আছে। রবীন্দ্রনাথ শুধু নাটক প্রহসন নয় তাঁর কাব্য কবিতা ও গানের মধ্যে দিয়েও নাট্যরস প্রকট করেছেন। অনেকভাবে সেইসব রচনা কাল-পর্যায়ে সাজিয়ে দিচ্ছি।[৬]

এ পর্যায়ে তিনি নাটকগুলো যেভাবে সাজালেন তা হলো[৭]:

১. নাট-কাব্য– *রুদ্রচণ্ড*, *প্রকৃতির প্রতিশোধ*।
২. সঙ্গীত-নাট– *বাল্মীকি-প্রতিভা*, *কালমৃগয়া*।
৩. কৌতুক-নাট– *হাস্যকৌতুক*, *ব্যঙ্গকৌতুক*।
৪. নাট কবিতা– *মানসী*তে দেশের উন্নতি, বঙ্গবীর, ধর্মপ্রচার, নব-দম্পতির প্রেমালাপ; *সোনার-তরী*তে বিম্ববতী, হিং টিং ছট, দুই পাখি, গান ভঙ্গ, যেতে নাহি দিব, পুরস্কার।
৫. নাটনাট্য– *নলিনী*, *রাজা ও রানী*, *মুকুট*, *প্রায়শ্চিত্ত*, *তপতী*।
৬. গীতনাট্য– *মায়ার খেলা*।
৭. সরস নাট– *গোড়ায় গলদ*, *বৈকুণ্ঠের খাতা*, *চিরকুমার-সভা*।
৮. কাব্যনাট্য– *চিত্রাঙ্গদা*, *বিদায় অভিশাপ*, *মালিনী*।
৯. সংলাপ নাট্য-কবিতা– *গান্ধারীর আবেদন*, *কর্ণকুন্তী-সংবাদ*, *সতী*।
১০. সংলাপ আখ্যান– *প্রজাপতির নির্বন্ধ*, *বাঁশরী*।
১১. ভাবগর্ভ কাহিনী-নাট্য– *শারদোৎসব*, *রাজা*, *ডাকঘর*।
১২. যাত্রানাট– *মুক্তধারা*।
১৩. রূপক বা সিম্বলিক নাট্য– *ফাল্গুনী*, *রক্তকরবী*।
১৪. নৃত্য-গীত ও নাট্য– *নটীর পূজা*, *তাসের দেশ*।
১৫. নৃত-গীতময় নাট– *চিত্রাঙ্গদা*, *চণ্ডালিকা*, *শ্যামা*।

প্রথম পর্যায়ের বিভক্তিকরণে কোন নির্দিষ্ট অবস্থা অর্থাৎ শুধু রচনাকাল বিচারে অথবা বিষয়ের উপর নির্ভর করে ভাগ করেন নি। দেখা যাচ্ছে, কৌতুকনাট্যের রচনাকাল দিয়েছেন ১৮৮৫ থেকে ১৯০১ সাল। আবার এরই ভিতরে তিনি ১৮৮৯ থেকে ১৮৯৬ সাল পর্যন্ত *ব্যক্তি প্রতিযোগে ব্যক্তি* নামে একটি ভাগ করেছেন। তাছাড়া,

কৌতুকনাট্যের কাল ১৯০১ পর্যন্ত করলেও ১৯০৭ সালে লেখা *বশীকরণ* এবং ১৯২৬ সালে লেখা *শোধবোধও* কৌতুক নাট্যের অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে, *অন্তরের অন্তপুরে* পর্যায় সম্পর্কে সুকুমার সেন বলেছেন :

> রবীন্দ্রনাথের কাব্যচিন্তা যে সময়ে অধ্যাত্মমুখীন হইয়াছিল অর্থাৎ ব্যক্তি ছাড়াইয়া ব্যক্তির বৃহত্তর জীবনের দিকে কবিভাবনা ঝুঁকিয়াছিল তখন স্বভাবতই নাট্যরচনায় তাহার প্রতিফলন হইয়াছিল। এই সময়ের নাট্যরচনায় গানের পরিমাণ এবং নাট্যকাহিনীর মধ্যে গানের তাৎপর্য বাড়িয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের আদর্শ অনুযায়ী উদারচিত্ত ভাবুক অধ্যাত্মরসিক মধ্যস্থ ভূমিকায় দেখা দিল। ব্যক্তিচরিত্রগুলি সাধারণ মানুষ-ব্যক্তিত্ব বর্জন করিয়া কিছু যেন সিম্বলিক সাজ ধরিল।[৮]

– এখানে যে *বৃহত্তর জীবন*, *গানের তাৎপর্য* লক্ষণের কথা তিনি বললেন তা মুক্তধারা এবং রক্তকরবীর ভিতরেও পাওয়া যায়। আবার *শেষপালার তপতী*, *নটীর পূজা*, *তাসের দেশ* নাটকেও ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে বৃহত্তর জীবনের ভাবনা রয়েছে। অর্থাৎ এই চারটি নাটকও *অন্তরের অন্তপুরে* পর্যায়ে এদের নির্ধারণ করা যায়। এ হল প্রথমপর্যায়ের কথা; আবার, দ্বিতীয় পর্যায়ের বিভক্তিকরণে একটি নির্দিষ্ট অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে হয় নি। আঙ্গিকের সঙ্গে বিষয়কে মিলিয়ে ভাগ হয়েছে। যেমন, *কৌতুক-নাট*, *সরস নাট*, *ভাবগর্ভ কাহিনী-নাট্য*, বিষয়ভিত্তিক বিভক্তিকরণ। অন্যগুলি আঙ্গিকবিচারে বিভক্তিকরণ।

প্রমথনাথ বিশী রবীন্দ্রনাট্যের যে বিভক্তি করেছেন তা হলো[৯]–

১. গীতিনাট্য– *বাল্মীকি-প্রতিভা*, *মায়ার খেলা*।
২. কাব্যনাট্য– *বিদায়-অভিশাপ*, *গান্ধারীর আবেদন*, *সতী*, *নরকবাস*, *কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ*, *লক্ষ্মীর পরীক্ষা*, *চিত্রাঙ্গদা*, *মালিনী*।
৩. নৃত্যনাট্য– *শাপমোচন*, *চিত্রাঙ্গদা* ও অন্যান্য।
৪. ঋতুনাট্য– *শেষবর্ষণ*, *বসন্ত*, *নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা*, *নবীন*, *শ্রাবণ-গাথা*।
৫. তত্ত্বনাট্য– *প্রকৃতির প্রতিশোধ*, *শারদোৎসব*, *অচলায়তন*, *রাজা*, *ডাকঘর*, *ফাল্গুনী*, *মুক্তধারা*, *রক্তকরবী*, *রথের রশি*, *তাসের দেশ*, *কবির দীক্ষা*।
৬. প্রহসন– *চিরকুমারসভা*, *শেষরক্ষা*, *শোধবোধ*, *বৈকুণ্ঠের খাতা*, *হাস্যকৌতুক*, *ব্যঙ্গকৌতুক*, *মুক্তির উপায়*।

৭. রূপান্তর ও নামান্তর– *বিদায়-অভিশাপ*, *চিত্রাঙ্গদা*, *গান্ধারীর আবেদন*, *কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ*, *নরকবাস*, *বাল্মীকি-প্রতিভা* ও *কালমৃগয়া*, *মালিনী*, নৃত্যনাট্য *শ্যামা*, *অরূপরতন*, *গুরু*, *রথযাত্রা*, *শিবের ভিক্ষা*, *তাসের দেশ*।

৮. ঋতুচক্র– *অচলায়তন*, *বিসর্জন*, *শারদোৎসব*, *ঋণশোধ*, *ডাকঘর*, *রক্তকরবী*, *রাজা ও রানী*, *রাজা*, *ফাল্গুনী*, *তপতী*।

–এই শ্রেণিবিভাগেও আঙ্গিক এবং অন্তর্নিহিত ভাবকে কেন্দ্র করে এক সঙ্গে বিভক্তিকরণ হয়েছে। তাছাড়া, তত্ত্বনাট্যের ব্যাখ্যাও যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হয় না। তিনি বলেছেন, "কোন নাটক রূপক, প্রতীকী বা সমস্যামূলক যেমনি হোক, তাহা যে তত্ত্বপ্রধান সন্দেহ নাই। ইহাই এই শ্রেণীর নাটকের সামান্য বা সাধারণ লক্ষণ।"[১০] তত্ত্বনাটক সম্পর্কে তিনি আরো বলেছেন, "'তত্ত্বনাট্য' বলিতে তত্ত্বপ্রধান এক শ্রেণীর নাটককে বুঝি, আরও বুঝি যে ইহা কাহিনীপ্রধান নাটক হইতে ভিন্ন গোত্রের রচনা, ...।"[১১]

উপরের দুটি উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায়, কাহিনী অপ্রধান এবং রূপক প্রতীক বা সমস্যামূলক লক্ষণ রয়েছে যে নাটকে প্রমথনাথ বিশী তাকে 'তত্ত্বনাটক' বলেছেন। এ পর্বে তিনি *প্রকৃতির প্রতিশোধ*, *শারদোৎসব*, *অচলায়তন*, *রাজা*, *ডাকঘর*, *ফাল্গুনী*, *মুক্তধারা*, *রক্তকরবী*, *রথের রশি*, *তাসের দেশ*, *কবির দীক্ষা* নাটককে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কিন্তু আমরা দেখতে পাই গদ্যনাট্য *গুরু*,*অরূপরতন* নৃত্য-গীতনাট্য *শাপমোচনে*ও রূপক-সাঙ্কেতিকতার লক্ষণ পাওয়া যায়। আবার কাহিনীপ্রধান কাব্যনাট্য *বিসর্জনে*ও রূপক রয়েছে।

অন্যদিকে, রবীন্দ্র গবেষক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য রবীন্দ্র-নাট্যকে ভাগ করা প্রসঙ্গে বলেছেন :

> আলোচনার সুবিধার জন্য নাটকের প্রকৃতি-অনুসারে সমগ্র রবীন্দ্র-নাট্য-সাহিত্যকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করিয়া লওয়া হইল। প্রকাশ-সময়ের পারস্পর্য অপেক্ষা অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির ঐক্য শ্রেণীবিভাগে সহায়তা করে বলিয়া মনে হয়। তাহাতেই এক এক শ্রেণীর নাটকের রূপবস্তু ও রসবস্তু সম্বন্ধে ধারণা পরিস্ফুট হইয়া উঠা সম্ভব হয়।[১২]

তাঁর বিভাগগুলি হলো[১৩] :

১. গীতিনাট্য (সংগীতপ্রধান)– *বাল্মীকি-প্রতিভা*, *মায়ার খেলা*।

২. কাব্যনাট্য (কাব্যপ্রধান)– *চিত্রাঙ্গদা*, *বিদায়-অভিশাপ*, *গান্ধারীর আবেদন*, *সতী*, *নরকবাস*, *কর্ণকুন্তীসংবাদ*, *লক্ষ্মীর পরীক্ষা*।

৩. রোমান্টিক ট্র্যাজেডি (কাব্য ও নাটকের সমন্বয়)– *রাজা ও রানী*, *বিসর্জন*, *মালিনী*।

৪. রূপক-সাংকেতিক নাটক (ভাব বা তত্ত্বপ্রধান)– *প্রকৃতির প্রতিশোধ*, *শারদোৎসব*, *রাজা*, *অচলায়তন*, *ডাকঘর*, *ফাল্গুনী*, *মুক্তধারা*, *রক্তকরবী*, *কালের যাত্রা*, *তাসের দেশ*।

৫. সামাজিক নাটক (সামাজিক পরিবেশমূলক)– *প্রায়শ্চিত্ত*, *গৃহপ্রবেশ*, *শোধবোধ*, *নটীর পূজা*, *চণ্ডালিকা*, *বাঁশরী*, *মুক্তির উপায়*।

৬. কৌতুকনাট্য (কৌতুকপ্রধান)– *গোড়ায় গলদ*, *বৈকুণ্ঠের খাতা*, *চিরকুমার সভা*, *হাস্যকৌতুক*, *ব্যঙ্গকৌতুক*।

৭. ঋতুনাট্য (ঋতুআশ্রয়ী ও গীতপ্রধান)– *শেষবর্ষণ*, *বসন্ত*, *নবীন*, *নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা*, *শ্রাবণগাথা*।

৮. নৃত্যনাট্য (নৃত্যপ্রধান)– *চিত্রাঙ্গদা*, *চণ্ডালিকা*, *শ্যামা*, *নটীর পূজা*, *শাপমোচন*।

দেখা যাচ্ছে, উপেন্দ্রেনাথ ভট্টচার্যও এ শ্রেণিবিভাগে বিষয় এবং আঙ্গিকের আলাদা বিভক্তিকরণ করেন নি। রবীন্দ্রনাথের নাটকের স্বরূপ দেখাতে গিয়ে ড. অজিতকুমার ঘোষ বলেছেন :

> ‘খেয়া’র পূর্ব পর্যন্ত কবির মন বিশ্বের রূপরস-সম্ভোগে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিল, সেইজন্য এই সময়কার নাটকেও উচ্ছ্বসিত সৌন্দর্য-তরঙ্গের অবারিত লীলা, বিশ্বজগৎ এবং মানবজীবনের অকুণ্ঠিত জয়গান লক্ষ্য করা যায়। তখনকার সদাপ্রফুল্ল চিত্ত হাস্যরসের তরল স্রোতে অতি সহজেই ভাসিয়া বেড়াইতে চাহিত, সেইজন্য তাঁহার প্রহসনগুলিরও জন্ম হয় এই সময়ে। ‘খেয়া’র পরে ‘গীতাঞ্জলি’ যুগ হইতে তাঁহার মন রূপ হইতে অরূপ রাজ্যে, বিশ্ব হইতে বিশ্বাতীতের পানে অগ্রসর হইল। তখন হইতে রূপক তত্ত্বময় নাটকগুলির সূচনা হইল। ‘গীতাঞ্জলি’, ‘গীতালি’, ‘গীতিমাল্য’- এ যেমন বাহ্যজগতের আকূতি ও চাঞ্চল্য অন্তর্জগতের মৌল সাধনায় নিমগ্ন হইল, তেমনি পূর্বেকার নাটকগুলির ক্রিয়াময় ঘটনারাশি রূপক নাটকের অন্তর্গূঢ় ভাবময়তার মধ্যে নির্বাণ লাভ করিল। ইহাই রবীন্দ্রনাথের নাট্যধারার ইতিহাস।[১৪]

অজিতকুমার রবীন্দ্র নাটককে বিভক্ত করেছেন এভাবে[১৫]–

১. গীতিনাট্য– *বাল্মীকিপ্রতিভা*, *মায়ার খেলা*।

২. কাব্যনাট্য– *রুদ্রচণ্ড*, *প্রকৃতির প্রতিশোধ*, *রাজা ও রানী*, *বিসর্জন*, *চিত্রাঙ্গদা*, *মালিনী*।

৩. নাট্যকাব্য– *বিদায়-অভিশাপ*, *কাহিনী* (*গান্ধারীর আবেদন*, *কর্ণকুন্তী সংবাদ*, *নরকবাস*, *সতী*, *লক্ষ্মীর পরীক্ষা*)

৪. প্রহসন– *বৈকুণ্ঠের খাতা*, *চিরকুমার সভা*, *শেষরক্ষা*।

৫. সাঙ্কেতিক নাটক– *শারদোৎসব*, *প্রায়শ্চিত্ত*, *রাজা*, *অচলায়তন*, *ফাল্গুনী*, *রক্তকরবী*, *কালের যাত্রা*, *তাসের দেশ*।

৬. সামাজিক নাটক– *শোধবোধ*, *বাঁশরি*।

৭. নৃত্যনাট্য– *নটীর পূজা*, *চিত্রাঙ্গদা*, *চণ্ডালিকা*, *শ্যামা*।

ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে রবীন্দ্র-নাট্যকে শ্রেণিকরণ করেছেন, তা হলো[১৬]–

১. কাব্যনাট্য ও নাট্যকাব্য– *রুদ্রচণ্ড*, *বাল্মীকি-প্রতিভা*, *প্রকৃতির প্রতিশোধ*, *মায়ার খেলা*, *চিত্রাঙ্গদা*, *বিদায়-অভিশাপ*, *কাহিনী*।

২. নিয়মানুগ নাটক– *রাজা ও রানী*, *বিসর্জন*, *মালিনী*, *মুকুট*, *প্রায়শ্চিত্ত*, *নটীর পূজা*।

৩. রঙ্গনাট্য– *গোড়ায় গলদ*, *বৈকুণ্ঠের খাতা*, *হাস্যকৌতুক*, *ব্যঙ্গকৌতুক*, *চিরকুমার সভা*।

৪. রূপক ও সাঙ্কেতিক তত্ত্বনাটক– *শারদোৎসব*, *রাজা*, *অরূপরতন*, *অচলায়তন*, *ডাকঘর*, *ফাল্গুনী*, *রক্তকরবী*, *মুক্তধারা*, *কালের যাত্রা*।

মঞ্জুশ্রী চৌধুরী তাঁর *রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটক* গ্রন্থে *শারদোৎসব*, *রাজা*, *অচলায়তন*, *ডাকঘর*, *ফাল্গুনী*, *মুক্তধারা*, *রক্তকরবী*, *কালের যাত্রা*, *তাসের দেশ*কে রূপক-সাংকেতিক নাটক বলেছেন। তিনি লিখেছেন :

> নাট্যতত্ত্বকে তাৎপর্যময় এবং পাঠক ও দর্শকদের মানসিক উপলব্ধিগম্য করবার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ চিত্রকল্প নির্মাণ করেছেন, প্রয়োজনবোধে সংগীত এবং নৃত্যের সাহায্যেও তাঁর বক্তব্যকে প্রকাশ করেছেন। শুধু তাই নয়, কবি তাঁর চিত্তের বিশেষ প্রত্যয়, উপলব্ধি এবং অভিজ্ঞতাকে রূপায়িত করবার জন্য নির্মাণ করেছেন নাট্যদৃশ্য, সৃষ্টি করেছেন প্রতীক, যা অন্তরস্থ মর্মবস্তুকে সমর্থন করে।
>
> এই গ্রন্থের সর্বত্র আমরা বলবার চেষ্টা করেছি, উচ্চ দার্শনিক চিন্তাচেতনায় ঋদ্ধ রবীন্দ্রনাথ একান্তভাবে ভাববাদী ও তত্ত্বপ্রবণ। তাই তার রচনায় বাস্তব সমস্যারও তাত্ত্বিক সমাধান সর্বত্র সুলভ। শারদোৎসব, রাজা, অচলায়তন, ডাকঘর, মুক্তধারা, রক্তকরবী, রথের রশি, তাসের দেশ প্রভৃতি নাটক যেখানে সমকালীন সামাজিক সমস্যা নিয়ে শুরু, সেগুলো বাস্তব জীবন ও সমস্যাকে অতিক্রম করে আধ্যাত্মিক ও তত্ত্বলোকে উত্তীর্ণ হয়েছে। ফলে নান্দনিক উপলব্ধির ভোক্তা ও তত্ত্বরসিক কিছু সংখ্যক পাঠকের কাছে এই রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলো সুখপাঠ্য হলেও পরিণামে সবগুলো নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয়ই বাস্তবজীবন নিরপেক্ষ হয়ে সমাপ্তি লাভ করেছে।[১৭]

তিনি এই নাটকের মধ্যেই গীতিনাট্য এবং নৃত্যনাট্যের বিভক্তিও করেছেন–

> রবীন্দ্রনাথের শারদোৎসব (১৯০৯), অচলায়তন (১৯১৫) ফাল্গুনী (১৪১৫) এসব রূপক-সাংকেতিক নাটকের মূলভাব অধিকতর তাৎপর্যময় করে তুলতে গানের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও এক ধরনের গীতিনাট্য আছে, যার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত– সকলের কথাবার্তা সুরে রচিত। রবীন্দ্রনাথের বাল্মীকি প্রতিভা (১৮৮১) কালমৃগয়া (১৮৮২), মায়ারখেলা (১৮৮৩) এ ধরনের গীতিনাট্য। ... হৃদয়াবেগকে সাধারণ সংলাপে যত-না সুন্দর করে অভিব্যক্ত করা যায়, তার চেয়ে বেশী সুন্দর ও প্রাণবন্ত করে তোলা যায় কবিতার ছন্দে, সাংগীতিক ব্যঞ্জনায় তা হয়ে ওঠে অপূর্ব রসাত্মক। নাটকে দেহছন্দের নৃত্যভঙ্গি আরও বেশি চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে। এজন্যই আমাদের দেশে নাচ ও গান গীতিনাট্যের অংশরূপে দেখা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের নটীরপূজা (১৩৩৩), শাপমোচন (১৩৩৮), চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য (১৩৪২) প্রভৃতি এ পর্যায়ের নৃত্যনাট্য।[১৮]

এখানে দেখা যায়, মঞ্জুশ্রী চৌধুরী রবীন্দ্রনাথের সবগুলো নাটক নিয়ে আলোচনা করেন নি। মূলত নয়টি নাটককে তিনি রূপক-সাংকেতিক বলেছেন এবং দেখিয়েছেন, এদের মধ্যে কোনোটি গীতিনাট্য, কোনোটি নৃত্যনাট্য। প্রথমত বলা যায়, তাঁর আলোচনা পূর্ণাঙ্গ নয়, কারণ সার্বিক শ্রেণিকরণ তিনি করেন নি। আবার *শারদোৎসব*, *অচলায়তন*, *ফাল্গুনী*তে গানের প্রাধান্য থাকলেও এগুলো মূলত গদ্যে লেখা, তাই এগুলোকে গীতিনাট্য বলা সংগত নয়।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলতে পারি, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য গীতিনাট্য-কাব্যনাট্য-নৃত্যনাট্যের সঙ্গে রোমান্টিক ট্র্যাজেডি, রূপক-সাংকেতিক, সামাজিক, কৌতুক এবং ঋতুনাট্যের যে শ্রেণিবিভাগ করেছেন তা অসংগত মনে হয়। এরূপ অসংগত মনে হয়, প্রমথনাথ বিশী'র গীতিনাট্য-কাব্যনাট্য-নৃত্যনাট্যের সঙ্গে ঋতুনাট্য-তত্ত্বনাট্য-প্রহসন-রূপান্তর ও নামান্তর-ঋতুচক্র ইত্যাদি বিভাগও। কারণ, গীতিনাট্য-কাব্যনাট্য-নৃত্যনাট্য হলো নাটক উপস্থাপনের রীতি বা আঙ্গিকগত দিক। অন্যদিকে, রোমান্টিক ট্র্যাজেডি, রূপক-সাংকেতিক নাটকের রসনিষ্পত্তির বোধগত আঙ্গিক। আবার, সামাজিক, কৌতুক, ঋতুনাট্য এবং ঋতুনাট্য-তত্ত্বনাট্য-প্রহসন-রূপান্তর-নামান্তর-ঋতুচক্র ইত্যাদি বিভাগ নাটকের অন্তর্নিহিত ভাবকে বা বিষয়কে কেন্দ্র করে বিভক্ত হয়েছে। একইভাবে অসংগত ড. অজিতকুমার ঘোষের শ্রেণিবিভাগ, সুকুমার সেনের দুই পর্যায়ের বিভক্তিবিভাগ এবং ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেণিবিভাগ। মঞ্জুশ্রী চৌধুরীর খণ্ডিত শ্রেণিবিভাগ এবং অসঙ্গতিও আলোচনায় দেখেছি। তাই বলতে পারি নাট্য উপস্থাপনের রীতি বা আঙ্গিকের সঙ্গে নাটকের অন্তর্নিহিত ভাবের একই ধারায় বিভক্তি সম্ভব নয়। বরং এদের আলাদা আলাদা বিভক্তিকরণ করা যেতে পারে। নাটকের আলোচনায় দেখা গেছে, গীতিনাট্য, কাব্যনাট্য বা নৃত্যনাট্যের মধ্যেও কোনোটি রিয়েলিস্টিক, কোনোটি রূপক, কোনোটি প্রহসন, কোনোটি ট্র্যাজিডি,

কোনোটি কৌতুকনাট্য। তাছাড়া, কোনোটিতে রয়েছে ঐতিহাসিক উপাদান, কোনোটিতে সামাজিক, কোনোটিতে রূপকথার উপাদান। আবার কোনোটি বৌদ্ধদর্শনের উপর ভিত্তি করে লেখা, কোনোটি ঋতুভিত্তিক নাটক। যেমন, গীতিনাট্য *বাল্মীকি-প্রতিভা*র মধ্যে সাংকেতিকতার আভাস রয়েছে। তেমনি, গীতিনাট্য *মায়ার খেলা*য় রয়েছে কাহিনির প্রাধান্য এবং ট্র্যাজেডির ছোঁয়া। *প্রকৃতির প্রতিশোধ* কাব্যনাট্য হলেও এর ভেতরে আমরা *রূপক* দেখতে পাই। সুতরাং বলতে পারি, নাটকের শ্রেণিবিভাগে গীতিনাট্য-কাব্যনাট্য-নৃত্যনাট্যের সঙ্গে গদ্যনাট্য এবং গদ্য-পদ্যনাট্য বলাই সংগত। তাই এ কথা স্পষ্ট যে, সাধারণভাবে রবীন্দ্র-নাট্যের দুধরনের শ্রেণিকরণ করা যেতে পারে; বিষয় ও আঙ্গিকভিত্তিক।

নাটকের বিষয়কে কেন্দ্র করে নিম্নলিখিত শ্রেণিকরণ করতে পারি।

এক. ধর্ম ও রাজনীতিচিন্তা

১. রাজা ও রানী
২. বিসর্জন
৩. মালিনী
৪. মুকুট
৫. প্রায়শ্চিত্ত
৬. নটীর পূজা
৭. পরিত্রাণ

দুই. প্রকৃতি প্রধান

১. ফাল্গুনী
২. বসন্ত
৩. সুন্দর
৪. শেষ বর্ষণ
৫. নবীন
৬. শ্রাবণগাথা

৭. নটরাজ

তিন. পারিবারিক-সামাজিক

১. লক্ষ্মীর পরীক্ষা
২. গৃহপ্রবেশ
৩. শোধবোধ
৪. বাঁশরী
৫. মুক্তির উপায়
৬. যোগাযোগ

চার. অস্পৃশ্যতা বিরোধিতা

১. পতিতা
২. সতী
৩. কালের যাত্রা
৪. চণ্ডালিকা

পাঁচ. রূপ-অরূপের প্রতি আগ্রহ

১. প্রকৃতির প্রতিশোধ
২. শারদোৎসব
৩. ডাকঘর
৪. ঋণশোধ
৫. মুক্তধারা
৬. রক্তকরবী

ছয়. নবচিন্তা : পুরাণকাহিনির ভিন্ন রূপায়ণ

১. বাল্মীকি-প্রতিভা

২. চিত্রাঙ্গদা

৩. বিদায় অভিশাপ

৪. গান্ধারীর আবেদন

৫. নরকবাস

৬. কর্ণকুন্তী-সংবাদ

৭. রাজা

৮. অরূপরতন

৯. শাপমোচন

১০. শ্যামা

সাত. কৌতুক প্রধান

১. গোড়ায় গলদ

২. বৈকুণ্ঠের খাতা

৩. চিরকুমার সভা

৪. হাস্যকৌতুক

৫. ব্যঙ্গকৌতুক

৬. শেষরক্ষা

আট. বিবিধ

১. মায়ার খেলা

২. অচলায়তন

৩. কবির দীক্ষা

৪. গুরু

৫. তাসের দেশ

রবীন্দ্র-নাট্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই 'রাজা' এবং 'রাজ্যে'র কাহিনি। তবে তার সবগুলো রাজনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় নি। কিছু নাটক শুধু রাজনীতি আবার কিছু নাটকে রাজনীতির সঙ্গে ধর্ম মিলে ঘটনা তৈরি করেছে। এ ধরনের নাটকগুলোকে 'ধর্ম ও রাজনীতিচিন্তা' শিরোনামের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রকৃতি ঘটনার মূল নিয়ন্ত্রক কিংবা কখনো কখনো প্রকৃতি চরিত্র হয়ে উঠেছে– এ রকম নাটককে 'প্রকৃতি প্রধান' শ্রেণিভুক্ত করেছি। পারিবারিক এবং সামাজিকবোধ যে সব নাটকের মূল কথা তারা 'পারিবারিক-সামাজিক' শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। সামাজিক এবং ধর্মীয় অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন। যাদেরকে অস্পৃশ্য বলে দূরে সরিয়ে রাখা হয়, তারা যে সম্পূর্ণরূপে মানুষ রবীন্দ্রনাথ সরাসরি এই মত প্রকাশ করেছেন *পতিতা*, *সতী*, *রথের রশি*, *চণ্ডালিকায়*। রবীন্দ্রমানসের মূল সুর 'সীমার মধ্যে অসীমের সুর' এবং 'আনন্দ'। রূপ-অরূপের প্রতি দুর্নিবার আগ্রহেই এর প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের সকল নাটকেই এর কমবেশি প্রকাশ রয়েছে, তবে যে নাটকগুলো এর ভিত্তিভূমি সে গুলো 'রূপ-অরূপের প্রতি আগ্রহ' শিরোনামের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রাচীন সাহিত্যের অনেক কাহিনি নিজস্ব চিন্তায় এবং কালোত্তীর্ণবোধে নবরূপায়ণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এই নাটকগুলোকে 'নবচিন্তা : পুরাণকাহিনির ভিন্ন রূপায়ণ' শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে। এ সকল নাটকে রবীন্দ্রনাথ নানাবিধ চিন্তা উপস্থাপন করেছেন। এছাড়া তাঁর হাস্যরসাত্মক নাটকগুলো 'কৌতুক প্রধান' শিরোনামে রেখেছি। এছাড়া আরো কিছু ভিন্ন ভিন্ন নাটক 'বিবিধ' শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে। "নাটকের বিষয় ও আঙ্গিক রচনার দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ এক যুগান্তকারী প্রতিভা। নাট্য মঞ্চায়নের ক্ষেত্রে ইউরোপ আমাদের যে প্রসেনিয়াম রীতি দিয়েছে, তা আমাদের কল্পরা ও মনের ভেতরে তৈরি হওয়া দৃশ্যকল্পকে বাধাগ্রস্ত করে দিয়েছিল। কারণ, নাট্যাভিনয়ে দর্শকের কল্পনার যে অবাধ প্রবাহ তৈরি হয়, অঙ্কিত দৃশ্যপট তা ব্যাহত করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর বাইরে এসে বর্ণনা ও সংলাপের মধ্য দিয়ে নতুন নতুন চিত্রকল্প তৈরির দিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাট্যশৈলী নির্মাণে বাংলা নাটকের হাজার বছরের নৃত্য, গীত ও বর্ণনার ত্রয়ী বন্ধনকে মূল বিবেচনায় রেখেছেন। এভাবে দর্শকের মানসপটে স্বনির্মিত চিত্রকল্পের উদ্ভাসের পথ খুলে দিয়েছেন। এই রীতির সঙ্গে আধুনিক বিশ্বনাটকের গতি-প্রকৃতির চলমানতাকে অঙ্গীকৃত করেছেন রবীন্দ্রনাথ।[১৯]

এখন রবীন্দ্র-নাট্যের আঙ্গিক এবং সংলাপের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে নিম্নলিখিত বিভাগগুলো করতে পারি :

ক. গীতিনাট্য :

১. বাল্মীকি প্রতিভা

২. মায়ার খেলা

৩. শ্রাবণগাথা

৪. সুন্দর

৫. শেষ বর্ষণ

খ. কাব্যনাট্য:

১. চিত্রাঙ্গদা

২. মালিনী

৩. লক্ষ্মীর পরীক্ষা

৪. বিদায় অভিশাপ

৫. কাহিনী (গান্ধারীর আবেদন, সতী, নরকবাস, কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ)

৬. কালের যাত্রা (রথের রশি, কবির দীক্ষা)

গ. গদ্যনাট্য :

১. গোড়ায় গলদ

২. বৈকুণ্ঠের খাতা

৩. হাস্যকৌতুক

৪. ব্যঙ্গকৌতুক

৫. শারদোৎসব

৬. মুকুট

৭. প্রায়শ্চিত্ত

৮. রাজা

৯. অচলায়তন

১০. ডাকঘর

১১. ফাল্গুনী

১২. গুরু

১৩. অরূপরতন

১৪. ঋণশোধ

১৫. মুক্তধারা

১৬. বসন্ত

১৭. রক্তকরবী

১৮. চিরকুমার-সভা

১৯. শোধবোধ

২০. গৃহপ্রবেশ

২১. নটীর পূজা

২২. শেষরক্ষা

২৩. পরিত্রাণ

২৪. তপতী

২৫. নবীন

২৬. কালের যাত্রা (রথযাত্রা)

২৭. চণ্ডালিকা

২৮. তাসের দেশ

২৯. বাঁশরি

৩০. মুক্তির উপায়

৩১. মালঞ্চ

৩২. যোগাযোগ

ঘ. গদ্য-কাব্যনাট্য :

১. প্রকৃতির প্রতিশোধ

২. রাজা ও রানী

৩. বিসর্জন

ঙ. নৃত্য-গীতিনাট্য :

১. চিত্রাঙ্গদা

২. চণ্ডালিকা

৩. শ্যামা

৪. নটরাজ

৫. শাপমোচন

এখানে, গীতিনাট্যে সংগীতপ্রধান সবগুলি নাটককে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। রবীন্দ্র গবেষকগণ শুধুমাত্র *বাল্মীকি-প্রতিভা* এবং *মায়ার খেলা*কে গীতিনাট্য বলেছেন। কিন্তু *শ্রাবণগাথা* নাটকটিতে গানগুলিকে বাধবার জন্যই গদ্য লেখা হয়েছে। এবং গানগলির জন্যই নাটকীয় পরিবেশ রচিত হয়েছে। এরূপ *সুন্দর* ও *শেষ বর্ষণ* নাটকেও গানের প্রাধান্য। রবীন্দ্রনাথ একে নাট্যগীতি বলেছেন। তাই এ নাটক দুটিকে গীতিনাট্যের অন্তর্ভুক্ত করা হলো। শুধু কাব্যাকারে লেখা এবং একমুখী নাটকগুলোকে কাব্যনাট্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। *কালের যাত্রা*য় তিনটি ছোটো নাটক রয়েছে। এদের মধ্যে *রথের রশি* এবং *কবির দীক্ষা* কাব্যাকারে লেখা। তাই এ দুটিকে কাব্যনাট্যের পর্যায়ে ফেলা হয়েছে এবং *রথযাত্রা*কে গদ্যনাট্যের পর্যায়ে নেওয়া হয়েছে। যে সকল নাটকের সংলাপ গদ্যে লেখা এবং তার সঙ্গে কিছু গান সংযুক্ত হয়েছে সেই নাটকগুলো গদ্যনাট্যের অন্তর্ভুক্ত। *তাসের দেশ* নাটকে সংগীতের প্রাধান্য হলেও সংলাপগুলি গদ্যে উপস্থাপিত এবং গদ্যসংলাপই নাটকীয় পরিবেশ তৈরি করেছে তাই এ নাটককে গীতিনাট্যের পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত না করে গদ্যনাট্যেই অন্তর্ভুক্ত করা হল। রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি নাটকে গদ্যসংলাপ এবং কাব্যসংলাপের সংমিশ্রণে নাটক লিখেছেন। এর সঙ্গে রয়েছে গান। এই নাটকগুলিকে গদ্য-কাব্যনাট্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর পরের পর্যায়ে নৃত্য-গীতিনাট্য নাম দেওয়া হয়েছে। কারণ এর ভাষা সংগীতে উপস্থাপিত হয়েছে এবং এর নাট্যক্রিয়া নৃত্যে উপস্থাপনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। নৃত্যই এ সকল নাটকের নাটকীয় পরিবেশ তৈরি করে।

রবীন্দ্র-নাট্যর সংখ্যা যেমন বেশি তেমনি বৈচিত্র্যও বিভিন্ন। দেখাযায়, এই বিভিন্নতা যেমন আঙ্গিকগত বা রসনিষ্পত্তির দিক দিয়ে তেমনি বিষয়গতভাবে।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *জীবনস্মৃতিতে* পাওয়া যায় তিনি ছোটোবেলায় নিজেদের বাড়িতে নাটক দেখতেন। এরপর তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের *অলীকবাবু* নাটকে অভিনয় করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তার নিজের নাটকে সংলাপ লিখতে এবং গান বাঁধতেও রবীন্দ্রনাথকে ডাকতেন। এভাবেই তাঁর নাটক লেখা শুরু হয়। আমরা জানি তিনি শেষজীবনেও নাটক লিখেছেন : ১৯৩৯ সালে লেখেন *শ্যামা*।

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনস্মৃতি, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ৯ম খণ্ড, ১৪১০, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৪৮৩

৩. প্রাগুক্ত, ভূমিকা, প্রকৃতির প্রতিশোধ, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ১ম খণ্ড ১৪১০, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৩৫৯

৪. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, চতুর্থ খণ্ড, ১৯৯৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃষ্ঠা–১৯৬

৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৯১-২৪৭

৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৪৮

৭. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৪৮-২৫০

৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২১০

৯. প্রমথনাথ বিশী, *রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ*, ২০০৪, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, পৃষ্ঠা- সূচীপত্রে দ্রষ্টব্য

১০. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১২২

১১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১২৩

১২. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা*, ১৩৭৯, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৩১

১৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩১

১৪. ড. অজিতকুমার ঘোষ, *বাংলা নাটকের ইতিহাস*, ২০০৫, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা- ২৪১।

১৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৫৪-৩২২

১৬. ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*, ১৯৯৫, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৪৮৩-৪৯০

১৭. মঞ্জুশ্রী চৌধুরী, *রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটক*, ১৯৮৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃষ্ঠা-২২৪-২২৫

১৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৮

১৯. আফসার আহমেদ, আলোচনা, রবীন্দ্রনাথ : তাঁর নাটকের প্রাসঙ্গিকতা, *রবীন্দ্রনাথ, এই সময়ে*, ২০১২, প্রথমা, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১৩৩

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়
রবীন্দ্র-নাট্যে নারীচরিত্র : সৃজন ও বিশ্লেষণ

মানুষ একক এবং স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্যণীয় হয়ে ওঠে তার স্বভাবে এবং কর্মে। মানুষের মর্মমূলে প্রবেশাধিকার সবার থাকে না, বাহ্যিক স্বভাবে অনুসন্ধানীরা শনাক্ত করতে পারেন এক মানুষ থেকে অন্য মানুষের পার্থক্য। রবীন্দ্রনাথ-সৃষ্ট নারীচরিত্রাবলি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ ও উপলব্ধি করলে তাদের আপাতদৃষ্টে স্পষ্ট কয়েকটি ভাগ করা যায়। নিচে তা উল্লেখ করা হলো:

১. সাধারণ গতানুগতিক চরিত্র
২. স্বাধীনচেতা, বিদ্রোহী চরিত্র
৩. তত্ত্বপ্রধান একমুখী চরিত্র
৪. মাতৃত্বপ্রধান চরিত্র
৫. ধর্মের প্রতি সম্যকভাবে সমর্পিত চরিত্র
৬. লোভী চরিত্র
৭. অন্যান্য চরিত্র

১. সাধারণ চরিত্র :

রবীন্দ্রনাটকের চরিত্রগুলোর মধ্যে কয়েকটি নারী চরিত্র রয়েছেন, যারা খুব সাধারণ এবং গতানুগতিক জীবনযাপন করেছেন, মেনে নিয়েছেন পরিস্থিতি। কখনো শিকার হয়েছেন পরিস্থিতির, কখনো উতরে গেছেন ঘটনা থেকে। আবার, কোনো কোনো চরিত্র আছে, যারা সাহস করে নিজেদের কথা বলতে চেয়েছেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনো নির্দিষ্ট বোধে পৌঁছাতে পারেন নি বরং যা চলছিলো তারই প্রতি আসক্ত হয়েছেন। –এ রকম চরিত্রগুলোকে সাধারণ চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত করেছি।

রাজা ও রানী নাটকে ইলা সম্পূর্ণ প্রেমিক চরিত্র, কিন্তু খুব সাধারণ। মানবজীবনের কোনো অসাধারণ বোধ বা অস্বাভাবিক আচরণ তার মধ্যে প্রকাশ পায় নি। সততাই তার প্রেমের স্বরূপ। তিনি ত্রিচূড় রাজকন্যা। জাতিতে

তারা অনার্য। তাদের বিবাহ প্রথায় বিয়ে হওয়ার আগে বরকে পাঁচ বছর কন্যার জন্য সাধনা করতে হয়। কাশ্মীরের রাজপুত্র কুমারসেন ইলার জন্য সেই সাধনায় রত আছেন। তাদের মধ্যে রচিত হয়েছে প্রেমের সেতুবন্ধন। কুমারসেনের রাজ্যে যাওয়ার ক্ষণিক বিচ্ছেদও ইলার কাছে অসহনীয় কষ্টের মনে হয়। তিনি বলেন :

রাজ্যে তুমি চলে গেলে
মনে হয়, আর আমি নেই। যতক্ষণ
তুমি মোরে মনে কর ততক্ষণ আছি,
একাকিনী কেহ নই আমি। রাজ্যে তব
কত লোক, কত চিন্তা, কত কার্যভার,
কত রাজ-আড়ম্বর! আর সব আছে,
শুধু সেথা ক্ষুদ্র ইলা নাই।[১]

– কুমারেরও ইলার প্রতি এমনই ভালোবাসা। পরবর্তী পূর্ণিমায় তাদের বিয়ে হবে। এমনই সময় বোন সুমিত্রার ডাকে কুমারকে যেতে হয় যুদ্ধে। ইলা অপেক্ষায় থাকেন। ইলা জানেন, কুমার আসবেনই। কিন্তু কুমার আসেন না। তবুও ইলা কুমারকে অবিশ্বাস করতে পারেন না। প্রেমিকপুরুষকে তিনি অন্তরে ধারণ করেছেন–

আমারে সে ভুলে যায় যদি
আমিই সে বুঝিব অন্তরে। (১খ,পৃ.৫০৫)

এই সময় তার পিতা তাকে বিক্রমদেবের হাতে সমর্পন করেন। ইলা তা মেনে নিতে পারেন না। কুমারের ভালোবাসার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার চেয়ে মৃত্যুও ভালো। তিনি বিক্রমদেবকে বলেন :

পিতা মোরে দিয়াছেন সঁপি তব হাতে;
আপনারে ভিক্ষা চাহি আমি। ফিরাইয়া
দাও মোরে। কত ধন রত্ন রাজ্য দেশ
আছে তব, ফেলে রেখে যাও মোরে এই
ভূমিতলে। তোমার অভাব কিছু নাই। (১খ,পৃ.৫১৩)

বিক্রমদেবের কাছেই ইলা জানতে পারেন, কুমারকে রাজসৈন্য খুঁজছে। কুমারের বিপদ জেনে ইলা দিশেহারা হন, গৃহ ছেড়ে কুমারের কাছে যেতে চান। বিক্রমদেব ইলাকে কথা দেন, কুমারকে সিংহাসনে বসিয়ে ইলাকে তার হাতে তুলে দেবেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হয় না। কুমার প্রজা রক্ষার্থে জীবন দেন। কুমারের ছিন্ন মাথা দেখে মূর্ছা যান ইলা। ইলা সম্পর্কে বলা যায়, "সে হয়ত আমাদের পূজা ও শ্রদ্ধাকে আকর্ষণ করে না, কিন্তু আমাদের ভালোবাসাকে টানিয়া লয়।"[২] ইলার চরিত্র খুব সাধারণ হলেও তার প্রেম এবং নিষ্ঠা অনন্য।

প্রায়শ্চিত্ত নাটকে বিভা যশোরের রাজকন্যা, চন্দ্রদ্বীপের রাজবধূ। তবে তার বসবাস বাবার বাড়িতেই। তিনি সাধারণ একটি মেয়ে। ভালোবাসা-মান-অভিমান নিয়েই তার জীবন। ভাই উদয়াদিত্য, ভাতৃবধূ সুরমা এবং দাদামশাই বসন্ত রায়ের তিনি ভক্ত। স্বামী রাজা রামচন্দ্রের প্রতি ভালোবাসায় অন্ধ।

বিভার চরিত্রের বড়ো দিক আপনজনদের প্রতি ভালোবাসা। বসন্ত রায়কে মারার জন্য তার পিতা রাজা প্রতাপাদিত্য লোক পাঠিয়েছেন জানতে পেরে বিভা আশংকায় অস্থির হয়ে ওঠেন, আবার বসন্ত রায়কে বাঁচাতে ভাই উদায়াদিত্য নিজে যেতে উদ্যত হলে উদয়াদিত্যের জন্যও তিনি চিন্তিত এবং ভীত হন। লোক পাঠিয়ে বসন্ত রায়কে রক্ষা করতে বলেন। প্রাণে বেঁচে বসন্ত রায় বাড়িতে এলেও বিভার মন শান্ত হয় না। তিনি বলেন :

> আমার এমন একটা ভয় ধরে গেছে, কিছুতে ছাড়ছে না; আমার মনে হচ্ছে কী যেন একটা হবে। মনে হচ্ছে যেন কাকে সাবধান করে দেবার আছে।(৫খ,পৃ.২২২)

বিভা মনের ডাক শুনতে পেয়েছেন। এই উক্তির মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ বিভার মধ্যে দূর দৃষ্টিসম্পন্ন একটি আধ্যাত্মিক শক্তি দেখিয়েছেন বলে মনে হয়। তবে, বিভা আর কখনো এমন বুঝতে পারেন না। তাই বলা যায়, এটা নিছক বিভার ভীত মনের ভীতি। ছোটো-বড়ো সবার প্রতিই তিনি সমান স্নেহশীল। রামচন্দ্রের মল্ল রামমোহনকেও স্নেহ-ভালোবাসায় সিক্ত করেন তিনি। সন্তানের বায়নার মতো বায়না মেটান। সোনার চুরি খুলে রামমোহনের আনা চারগাছি শাঁখা হাতে পরে আনন্দ পান। এ আনন্দ হলো রামমোহনের আনন্দ দেখে আনন্দ পাওয়া।

স্ত্রী-বিভার চরিত্র বেশ জটিল। প্রতাপাদিত্য রামচন্দ্রকে নিমন্ত্রণ করেন না বলে মনে মনে বিভা দুঃখ পান। অভিমান করে এ সম্পর্কে কোনো কথা পিতা-মাতার কাছে বলেন না, এমনকি স্বামীকে আসতে চিঠিও লেখেন না। সুরমাকে তিনি বলেন :

> যেখানে তাঁর আদর নেই সেখানে আসবার জন্যে আমি কেন তাঁকে লিখব? তিনি আমাদের চেয়ে কিসে ছোটো? (৫খ,পৃ.২২২)

স্বামীর প্রতি স্বাভাবিক স্ত্রীত্ববোধ এবং প্রেমবোধই তাকে এ মন্তব্য করায়। বসন্ত রায় নিজে নিমন্ত্রণ জানালেও বিভার মনে হয় স্বামীকে অপমান করা হচ্ছে। তার এই প্রেমস্পদ স্বামী এসে রাজ-অন্তঃপুরে ভাড় এনে রাজ-মহিষীকে অপমান করান। তখন লজ্জায় অপমানে বিভা সংকুচিত হয়ে ওঠেন। সকলের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ান তিনি। নিজের তীব্র যন্ত্রণাকে তিনি প্রকাশ করেছেন এভাবে–

> যেটা হয় সেটা তো সইতেই হয়। (৫খ,পৃ.২৩৯)

অর্থাৎ এক দুর্বিষহ যন্ত্রণাই তিনি সয়েছেন। তবু ভালোবাসা মরে না। তাই স্বামীর পাপের ভার লাঘব করতে তিনি স্বামীর বাড়ি যাওয়া বাদ দিয়ে কারাদণ্ডপ্রাপ্ত উদয়াদিত্যের দেখাশোনার জন্য বাবার বাড়িতেই থাকেন। যেন স্বামীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছেন। এরপর উদায়াদিত্য যখন বিভাকে স্বামীর বাড়ি পৌঁছে দিতে যান তখন দেখা যায় রামচন্দ্র আরেকজনকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন। বিভা আবার সংকুচিত হয়ে ওঠেন এবং দাদার সঙ্গে কাশী যাওয়াই স্থির করেন। এতে বিভার চরিত্রে কোনো কালিমা লেপন হয় না, বরং উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন, "বিভা-চরিত্রের মধুরতর ও সহজতর সমাপ্তি।"[৩] এ কারণেই বিভার কষ্ট পাঠকের মন স্পর্শ করে। খুব সরল-সাধারণ মেয়ে হলেও পারিবারিক এবং রাজনৈতিক নিয়ম বিভাকে সরল-স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে দেয় নি। স্বামীর পাপের প্রায়শ্চিত্তও তাকে করতে হলো। বোঝা যায় জীবন শুধু নিজের ইচ্ছেয় যাপন করা যায় না। সমাজ-সংসারের কুটিলতা মানুষের জীবনকে দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। "রবীন্দ্রনাথের সমকালে যূথবদ্ধ বাঙালি মধ্য ও নিম্নবিত্ত সমাজে যখন ব্যক্তি মুখ্য হয়ে ওঠেনি, তিনি তখনই তাঁর গল্পে ব্যক্তিকে দেখেছেন এক স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে। সামাজিক, পারিবারিক ঘটনাপ্রবাহে লিপ্ত ব্যক্তি বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে তার একান্ত নিজস্ব সুখ-দুঃখ, ক্ষোভ-আকাঙ্ক্ষা, স্বার্থপরতা ও বিচ্ছিন্নতা নিয়ে। ... ব্যক্তিমানুষ ইতিহাসলগ্ন নয়, ইতিহাসে আর জায়গা নেই, সে তার সমূহ সম্ভবনা ও ধ্বংস নিয়ে ঠাঁই খোঁজে শিল্প-সাহিত্যে। এ সত্যটা আজ আমাদের কাছে পরীক্ষিত বলে ব্যক্তির বহুবিচিত্র অবয়বকে খুঁটিয়ে দেখার প্রবণতা সমকালীন সব সাহিত্যেই বেগবান। রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিকে খুঁজেছেন নানাভাবে, নানা ঘাত-প্রতিঘাতে, মনস্তাত্ত্বিক অনির্দেশ্যতায়।"[৪] তাই বিভা ইতিহাসের কোনো চরিত্র নয়, কিন্তু পারিবারিক-সামাজিক জীবনে তার স্থান সম্পূর্ণ যৌক্তিক।

প্রায়শ্চিত্ত নাটকে আরো দুটি চরিত্র অতি সাধারণ। একজন বামী। সে মহিষীর দাসী। দাসী হিসেবে বাধ্যানুগত। কিন্তু তার মধ্যে নিজস্বত্ব এবং মনুষ্যত্ব নেই। এজন্য সুরমাকে বাবার বাড়ি পাঠানোর জন্য মহিষী কড়া ওষুধ খাওয়াতে বললে একটুও দ্বিধা না করে বামী সুরমাকে ওষুধ খাইয়ে মৃত্যু মুখে পতিত করে। আবার সুরমার জীবন-মৃত্যু নিয়েও বামীর কোনো প্রতিক্রিয়াও নেই। কারণ মহিষী সুরমার মৃত্যু-আশঙ্কা করে বাঁচানোর জন্য বিপরীত ওষুধ আনতে বললে বামী ওষুধ আনতে যায়। তাই চরিত্রটি ঠিক রক্তমাংসের চরিত্র হয় নি। রক্তমাংসের মানুষের একটু হলেও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থাকে। পক্ষাবলম্বন থাকে।

আরেকটি চরিত্র ভাগবতের স্ত্রী। একটি মাত্র দৃশ্যে তার আগমন। এবং একটিমাত্র সংলাপ। সুরমার পাঠানো টাকা এবং কাপড় পেয়ে রাজবাড়িতে এসে সুরমাকে সে বলে :

> পৌঁছেছে মা, কিন্তু তাতে আমাদের কতদিন চলবে? তোমরা আমাদের সর্বনাশ করলে। (৫খ,পৃ.২৪১)

তার এই কথায় বোঝা যায় রাজার বিরাগভাজন হয়ে টিকে থাকা কত কঠিন। এবং আরো বোঝা যায় সর্বনাশ কতটাই হয়েছে যে সে সুরমার মুখের সামনে কথা বলতে সাহস করছে। তাঁর অবস্থানে থেকে রাজপুত্রবধূকে এ কথা বলা সত্যিই সাহসের ব্যাপার। অবশ্য সুরমার ভালোবাসা-প্রশ্রয়ও তাকে এ সাহস জুগিয়েছে।

সুদর্শনা *রাজা* নাটকের রানি এবং কেন্দ্রীয় চরিত্র। নাটকে তার মনের ধারাবাহিক বিবর্তন হয়েছে। এই বিবর্তনে তিনটি পর্যায়। প্রথমে রাজাকে দেখার জন্য উতোলা হওয়া এবং তাকে চিনবেন বলে নিশ্চিত হওয়া, তারপর সুবর্ণকে দেখে রাজা মনে করে ভুল করা এবং রাজার ভয়ঙ্কর চেহারা দেখে ভালোবাসার দোদুল্যমানতায় ভোগা, শেষ পর্যায়ে দ্বিধার অবসানে রাজাকে অন্তরে অনুভব এবং রাজার কাছে নিজের দাসত্ব স্বীকার। "রাজা নাটকে রানীর ভ্রান্তি, দুঃখ ও পরমপ্রাপ্তির কাহিনি নাট্যরূপে বিধৃত।"[৫] সুদর্শনার চরিত্র বিশ্লেষণের আগে কুশ জাতকের প্রভাবতীর চরিত্রটি উল্লেখ করবো। কারণ, রবীন্দ্রনাথ কুশজাতকের কাহিনি অবলম্বনেই *রাজা* লিখেছেন এবং প্রভাবতীর ছায়ায় অংকন করেছেন সুদর্শনা চরিত্র। মল্লরাজ্যের রাজকুমার কুরূপা *কুশকুমার*-এর বিয়ের জন্য পীড়াপীড়ি করেন রাজা ইক্ষ্বাকু এবং রানি শীলবতী। কুশ তখন সোনা দিয়ে অপরূপ এক রমণীমূর্তি গড়ে দিয়ে সেই মূর্তির মতো সুন্দরী বউ আনতে বলেন। মন্দ্ররাজের মেয়ে প্রভাবতীকে এ রকম সুন্দর পাওয়া যায়। শীলবতী বুঝতে পারেন যে, কুশকুমারকে দেখলে প্রভাবতীর মন বিগড়ে যেতে পারে। তাই তিনি মিথ্যার আশ্রয় নেন। তাদের বংশীয় প্রথা হিসাবে একবছর স্বামীর মুখ দেখা যাবে না শর্ত দিয়ে কুশের সঙ্গে বিয়ে দেন প্রভাবতীকে। এরপর কুশের রাজা হিসেবে অভিষেক হয়। অন্যদিকে মহাবীর-মহাগুণী স্বামীকে চোখে দেখার জন্য প্রভাবতী শাশুড়িকে অস্থির করে তোলেন। শীলবতী এড়াতে না পেরে গোপনে সব আয়োজন সম্পন্ন করে প্রভাবতীকে নিয়ে দাঁড়ালেন প্রাসাদের বাতায়নে। রাজার শোভাযাত্রা বেরিয়েছে। রাজরথে রাজ পোশাকে ছোটো ভাই জয়সূতি আর পিছনে হাতির পিঠে কুশরাজা। শীলবতী রথ দেখিয়ে বলেন, ওইটা কুশের রথ। প্রভাবতী দেখলেন সুদর্শন জয়সূতিকে। হাতির পিঠ থেকে কুশরাজ প্রভাবতীর দিকে নানা অঙ্গভঙ্গি করতে লাগলেন, এতে রেগে গেলেন প্রভাবতী। কিন্তু একদিন ঘটনাক্রমে জানলেন হাতির পিঠের সেই কদাকার মাহুতই রাজা। রেগে প্রভাবতী বাবার রাজ্যে চলে গেলেন। কুশরাজ মায়ের হাতে রাজ্য দিয়ে প্রভাবতীর পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে ফিরিয়ে আনতে গেলেন। সেখানে গিয়ে কুশরাজ বীণা বাজিয়ে, পুতুল বানিয়ে উপহার পাঠিয়ে মন জয়ের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে পাকশালায় রান্নার কাজ নিলেন। তবু প্রভাবতীর মন গললো না। এরমধ্যে অন্য দেশের রাজারা দূতমুখে শুনেছেন প্রভাবতীর স্বামী ত্যাগের খবর। সাত রাজা এসে প্রভাবতীকে দাবী করলো। কুশরাজাকে ছেড়ে আসা মেয়ের প্রতি রাগান্বিত মদ্ররাজ মেয়েকে সাত টুকরা করে সাতজনকে দিতে চাইলেন, এবার ভয় পেলেন প্রভাবতী। ছদ্মবেশী কুশরাজের

পরিচয় দিলেন মায়ের কাছে। তার মা বাবা তাকে কুশরাজার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতে বললেন। ক্ষমা চাইলেন প্রভাবতী। কুশরাজের কাছে নতি স্বীকার করলো সাত রাজা। প্রভাবতীকে নিয়ে কুশরাজ ফিরলেন নিজ রাজ্যে। এখানেই কাহিনি শেষ।

রাজা নাটকে প্রথম দৃশ্যেই দেখা যায় সুদর্শনা রাজাকে দেখার জন্য উন্মুখ। অবশ্য একজন নারীর জন্য এ চাওয়া অস্বাভাবিক নয়। স্বামীকে আলো-অন্ধকার দুজায়গাতেই দেখার অধিকার সুদর্শনার রয়েছে। কিন্তু রাজা নিজে আলোয় দেখা দেন না। মাটির নিচের এক অন্ধকার ঘরে তাদের মিলন হয়। সেই ঘরে আসা-যাওয়ার পথটিও চেনেন না সুদর্শনা। দাসী সুরঙ্গমার সাহায্য নিতে হয় তাকে। এ অবস্থা কোনো স্ত্রীরই কাম্য নয়। নিজের স্বামীকে না দেখার যন্ত্রণা তাকে সর্বক্ষণ বিদ্ধ করে। সুদর্শনা তাই জেদ ধরেন রাজাকে দেখার। সুদর্শনা ধরেই নিয়েছেন রাজা দেখতে খুব সুন্দর। তিনি কল্পনা করেছেন, রাজা নববর্ষার দিনে জলভরা মেঘে আকাশের শেষ প্রান্তের বনরেখার মতো সুন্দর। কখনো মনে করেন, রাজা হলেন পথিকবন্ধু– তারা এক সঙ্গে চললে দিগন্তে দিগন্তে সোনার সিংহদ্বার খুলে যাবে। আবার কখনো মনে করেন, রাজার কানে কুন্তল, হাতে অঙ্গদ, গায়ে বসন্তী রঙের উত্তরীয়, হাতে অশোকের মঞ্জুরী, তাঁর তানে তানে বীণার সব-কটি সোনার তার উতলা। কল্পনার এই রঙিন জগতে থাকতে থাকতে তিনি রাজাকে দেখার ইচ্ছে দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেন। রাজা তখন বসন্ত উৎসবের দিন দক্ষিণের কুঞ্জবনে দেখা দেবেন বলে কথা দেন। উৎসবের দিন সুদর্শনা প্রাসাদের শিখরের উপড়ে দাঁড়িয়ে নকল রাজা সুশ্রী সুবর্ণকে দেখে রাজা বলে ভুল করেন। এ ভুল করাটাও সুদর্শনার জন্য স্বাভাবিক, কারণ সুদর্শনা বিয়ের পর থেকে শুনে এসেছেন তার স্বামী সুপুরুষের শ্রেষ্ঠ। তার কাছে সুন্দর চেহারা সুপুরুষের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সুপুরুষ মানে সর্বগুণে গুণান্বিত কিন্তু চেহারা খারাপ– এমন নয়। তাই সুন্দর সুবর্ণকে দেখে ভুল হয় তার। এরপর কাঞ্চীরাজ তাকে অপহরণ করার জন্য আগুন লাগান। সেই আগুনের মধ্য থেকে এই অপমানের হাত থেকে স্বয়ং রাজা তাকে উদ্ধার করেন। আগুনের আভায়-ই সুদর্শনা রাজাকে দেখেন। কালো-ভয়ঙ্কর রাজাকে সহ্য করতে পারেন না তিনি। ছোটো বয়সে সুদর্শনার বিয়ে হয়েছিলো। কতো ছোটো বয়সে তা তার মনেও নেই। তাই ভালোবাসার রূপ-রস-গন্ধ সকলই তিনি শিখেছেন রাজার কাছে। সুদর্শনা দাসী রোহিনীর হাত দিয়ে রাজাকে ফুল পাঠালে রাজা রানির ফুল দেখে কিছু বুঝতে পারেন নি। এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই সুদর্শনার বোঝা উচিত ছিল যে, এ আসল রাজা নয়। কারণ রাজা বুদ্ধিদীপ্ত এবং প্রেমিক। সুদর্শনার পুষ্পাঞ্জলি দেখে কিছু না বোঝার মতো মূঢ় তিনি নন। কিন্তু সুদর্শনা নকল রাজার চেহারা দেখে আবেগাপ্লুত, কোনো বুদ্ধির প্রকাশ করতে পারেন নি। তিনি বুঝতে পারেন রাজা যে আচরণ করেছেন তা রানির জন্য অগৌরবের। কিন্তু তার মনে হয় না যে, রাজা রানির সঙ্গে অগৌরবের আচরণ করবেন না। সুদর্শনার ভুল এখানেই। সাধারণ মানুষের মতোই তার মনের দোদুল্যমানতা রয়েছে। রাজার

চেহারা দেখার পর এবং সুবর্ণর প্রতি আসক্ত হওয়ার পর সুদর্শনা নিজের অবস্থা নিজেই যেন বুঝতে পারেন না। তিনি রাজাকে বলেন :

> ভয়ানক, সে ভয়ানক। সে আমার স্মরণ করতেও ভয় হয়। কালো, কালো, তুমি কালো। আমি কেবল মুহূর্তের জন্যে চেয়েছিলুম। তোমার মুখের উপর আগুনের আভা লেগেছিল– আমার মনে হল, ধূমকেতু যে আকাশে উঠেছে সেই আকাশের মতো তুমি কালো। তখনই চোখ বুজে ফেললুম, আর চাইতে পারলুম না– ঝড়ের মেঘের মতো কালো, কূলশূন্য সমুদ্রের মতো কালো– তারই তুফানের উপরে সন্ধ্যার রক্তিমা। (৫খ,পৃ.২৯৮)

রাজা তাকে সান্তনা দিয়ে বলেছেন :

> যেকালো দেখে আজ তোমার বুক কেঁপে গেছে সেই কালোতেই একদিন তোমার হৃদয় স্নিগ্ধ হয়ে যাবে। নইলে আমার ভালোবাসা কিসের। (৫খ,পৃ.২৯৮)

কিন্তু সুদর্শনার মনে দ্বিধা প্রকট। তিনি সৌন্দর্যে মজেছেন। তিনি বলেন :

১. শুধু তোমার ভালোবাসায় কী হবে। আমার ভালোবাসা যে মুখ ফিরিয়েছে। রূপের নেশা আমাকে লেগেছে– সে নেশা আমাকে ছাড়বে না, সে যেন আমার দুই চক্ষে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, আমার স্বপন সুদ্ধ ঝল্‌মল্ করছে। (৫খ,পৃ.২৯৮)
২. তুমি যে কালো, কালো– তোমাকে আমার কখনো ভালো লাগবে না। আমি যা ভালোবাসি তা আমি দেখেছি– তা ননির মতো কোমল, শিরীষ ফুলের মতো সুকুমার, তা প্রজাপতির মতো সুন্দর। (৫খ,পৃ.২৯৯)

তার কেবলই মনে হয় তিনি সুবর্ণকে ভালোবাসেন। নিজের মনের অবস্থা খুলে বলেন রাজাকে, রাজার কাছে শাস্তি চান, কিন্তু রাজা শাস্তি দেন না, সুদর্শনা চলে যেতে চান– রাজা আপত্তি করেন না। আবার সুদর্শনার মনে হয় রাজা তাকে জোর করে ধরে রাখুন, কিংবা সৈন্য দিয়ে আটকে রাখুন। রাজা এর কোনোটাই করেন না। তখন সুদর্শনা প্রাসাদ ছেড়ে চলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে সেখান থেকে বেরিয়ে যান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যেতে পারেন না, আবার ফিরে আসেন। এসে দেখেন রাজা চলে গেছেন– সুদর্শনার জন্য তাঁর কোনো অপেক্ষা নেই। সুদর্শনার তখন অপমান বোধ হয়। অভিমান করে বলেন :

> চলে গেছেন। আচ্ছা বেশ, তা হলে তিনি আমাকে একেবারে ছেড়েই দিলেন। আমি ফিরে এলুম, কিন্তু তিনি অপেক্ষা করলেন না। আচ্ছা, ভালোই হল– তা হলে আমি মুক্ত। (৫খ,পৃ.৩০০)

নিজেকে মুক্ত বলেন ঠিকই, তবু তার মন মানে না। তিনি সুরঙ্গমাকে জিজ্ঞাসা করেন, রাজা তাকে ধরে রাখার জন্য সুরঙ্গমাকে বলেছেন কি-না। জানতে পারেন, রাজা কিছুই বলেন নি। সুদর্শনার অভিমান এবার আরো প্রকট হয়। অসহায়ও হন তিনি। এখানে রাজা থাকলে সুদর্শনার জন্য ভালো হতো। তিনি রাজার প্রতি আস্তে আস্তে অনুরক্ত হতে পারতেন। কিন্তু অভিমানী এবং দোদুল্যমান মন নিয়ে তিনি আবার সুবর্ণের দিকে ঝুকলেন। এভাবে তিনি

একটি নৈতিক সঙ্কটে পতিত হন। "যতই সুদর্শনার নৈতিক সঙ্কট-আবর্ত জটিল হয়েছে। ততই সে সর্বনাশের খাদের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।"[৬]সুদর্শনা চলে গেলেন পিতার রাজ্যে। কিন্তু পিতা তাকে কন্যার মর্যাদা না দিয়ে দাসী বানিয়ে রাখলেন। নাটকে পিতা কান্যকুব্জরাজ সুদর্শনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে নারীকে বিশ্লেষণ করেছেন এভাবে–

> 'নারী যখন আপন প্রতিষ্ঠা থেকে ভ্রষ্ট হয় তখন সংসারে সে ভয়ংকর বিপদ হয়ে দেখা দেয়। তুমি জান না, আমার এই কন্যাকে আমি আজ কী রকম ভয় করছি। সে আমার ঘরের মধ্যে শনিকে সঙ্গে করে নিয়ে আসছে।'(৫খ,পৃ.৩০১)

কান্যকুব্জ তাই মেয়েকে দাসীর মতো রাখেন। আর সুদর্শনা দূরদৃষ্টিহীন আবেগাপ্লুত নারীর মতো অপেক্ষা করেন সুবর্ণের জন্য। কিন্তু সুবর্ণ মেরুদণ্ডহীন, তাসের আড্ডার বখে যাওয়া যুবক। রানিকে নিতে আসার কথা তার মনেও হয় না। অন্যদিকে সুদর্শনা রাজাকেও মন থেকে মুছতে পারেন না। দুইটি পুরুষের টানাপোড়েনে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। মনে মনে চেয়েছিলেন রাজা তাকে আটকে রাখুন। কিন্তু রাজা তা করেন নি। রাজা চান পরিপূর্ণ ভালোবাসায় সুদর্শনা নিজে রাজাকে গ্রহণ করুক। পিত্রালয়ে আসার পরও সুদর্শনা আশা করেন রাজাকে। বোঝা যায়, যে রাজার সঙ্গে সুদর্শনার প্রতিদিনের সখ্যতা ছিল, তাকেই তিনি ভালোবাসেন। অপমানিত সুদর্শনা রাগে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েন। বার বার আশা করেন রাজা এসে তাকে উদ্ধার করবে। ঘুরেফিরে রাজার কথাই বলেন। আবার সুবর্ণের জন্যও অপেক্ষা করেন। কাঞ্চির রাজার সঙ্গে সুবর্ণ এলে তিনি খুশি হন অন্যদিকে রাজাকেও ভোলেন না। এমনিভাবে সাধারণ নারী মনের এক বিপর্যস্থ দ্বান্দ্বিক অবস্থা সুদর্শনার মধ্যে প্রকাশ পায়। তার ব্যথিত মন সুরঙ্গমাকে বলে :

> তোর রাজা কেমন বল তো। এত হীনতা থেকেও আমাকে উদ্ধার করতে এল না? আমার আর দোষ দিতে পারবি নে। আমি এখানে দিনরাত্রি দাসীগিরি করে তার জন্যে চিরজীবন অপেক্ষা করে থাকতে পারব না। (৫খ,পৃ.৩০৩)

এই কথায়ই বোঝা যায় সুদর্শনা রাজার জন্য অপেক্ষা করছেন। এই টানাপোড়নে চলতে চলতে তিনি এক কঠিন পরীক্ষায় পতিত হন। সাত রাজা আসেন তাকে গ্রহণ করতে। এর জন্য শুরু হয় স্বয়ংবর সভা। এ সভায় না গেলে সুদর্শনার পিতার প্রাণরক্ষা হবে না। এই সংবাদও দিয়ে যায় কাঞ্চিরাজের দূত হিসাবে সুবর্ণ। তারপর সভায় সুবর্ণ কাঞ্চিরাজের ছত্রধর হয়ে কাঞ্চিরাজের পিছনে দাঁড়িয়ে ছাতা ধরে থাকে। দুর থেকে ছাতা ধরে রাখা সুবর্ণকে দেখে সুদর্শনার ঘৃণা হয়। তিনি নিজের ভুল বুঝতে পারেন। রাজার প্রতি তার সত্যিকারের প্রেম উন্মোচিত হয়। তিনি বলেন :

> রাজা, আমার রাজা! তুমি আমাকে ত্যাগ করেছ, উচিত বিচারই করেছ। কিন্তু আমার অন্তরের কথা কি তুমি জানবে না। (বুকের বসনের ভিতর হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া) দেহে আমার কলুষ লেগেছে, এ দেহ আজ আমি

> সবার সমক্ষে ধুলোয় লুটিয়ে যাব। কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে আমার দাগ লাগে নি– বুক চিরে সেটা কি তোমাকে আজ জানিয়ে যেতে পারব না। তোমার সেই মিলনের অন্ধকার ঘরটি আমার হৃদয়ের ভিতরে আজ শূন্য হয়ে রয়েছে– সেখানকার দরজা কেউ খোলে নি প্রভু। সে কি খুলতে তুমি আর আসবে না। তবে দ্বারের কাছে তোমার বীণা আর বাজবে না? তবে আসুক মৃত্যু, আসুক– সে তোমার মতোই কালো, তোমার মতোই সুন্দর, তোমার মতোই সে মন হরণ করতে জানে। সে তুমিই, সে তুমি। (৫খ,পৃ.৩০৮)

ঠিক এই রকম সময় রাজার সেনাপতি ঠাকুরদা যোদ্ধাবেশে সভায় হাজির হন। এবং নেপথ্যে রাজা এসে যুদ্ধ করে স্বয়ংবর সভা পণ্ড করে দিয়ে যান। কিন্তু নিজে সুদর্শনাকে নিতে আসেন না। এতে সুদর্শনা আবার আঘাত পান। অভিমানে বসে থাকেন। তারপর রাতের অন্ধকারে রাজার বীণার সুর বাজে। সেই সুরের সঙ্গে সঙ্গে সুদর্শনার অভিমান অনুরাগে পরিণত হয়। তিনি বলেন :

> যে নিষ্ঠুর তার কঠিন হাতে কি অমন মিনতির সুর বাজে। বাইরের লোক আমার অসম্মানটাই দেখে গেল, কিন্তু গোপন রাত্রের সেই সুরটা কেবল আমার হৃদয় ছাড়া আর তো কেউ শুনল না। (৫খ,পৃ.৩১৫)

এরপর সুদর্শনা চিরদিনের জন্য রানির বেশ ছেড়ে দাসীর বেশে নগ্ন পায়ে পথে বের হন রাজার উদ্দেশ্যে। যে পথ দিয়ে তিনি রাজাকে ত্যাগ করে এসেছিলেন, সেই পথের ধূলো মারিয়ে তিনি প্রাসাদে যান। অন্ধকার ঘরে পুনর্মিলনের সময় রাজাকে বলেন :

> প্রভু, যে আদর কেড়ে নিয়েছ সে আদর আর ফিরিয়ে দিয়ো না। আমি তোমার চরণের দাসী, আমাকে সেবার অধিকার দাও। (৫খ,পৃ.৩১৭)

–এই 'দাসী' হওয়াকে রবীন্দ্রনাথ পরমাত্মার প্রতি জীবাত্মার আত্মনিবেদনের রূপক হিসেবে দেখিয়েছেন। তিনি একে বলেছেন 'প্রলয়ের মধ্য দিয়ে সৃষ্টির পথ'। তাঁর আলোচনায় পাওয়া যায়–

> 'রাজা' নাটকে সুদর্শনা আপন অরূপ রাজাকে দেখতে চাইলে, রূপের মোহে মুগ্ধ হয়ে ভুল রাজার গলায় দিলে মালা, তার পরে সেই ভুলের মধ্যে দিয়ে পাপের মধ্যে দিয়ে যে অগ্নিদাহ ঘটালে, যে বিষম যুদ্ধ বাধিয়ে দিলে, অন্তরে বাহিরে যে ঘোর অশান্তি জাগিয়ে তুললে, তাতেই তো তাকে সত্যমিলনে পৌঁছিয়ে দিলে।[৭]

সুদর্শনা সত্যিকার ভালোবাসার পরিচয় পেয়েছেন দুঃসহ দিনযাপনের মধ্য দিয়ে। ভারতীয় সংস্কৃতির মূল কথা দুঃখের মধ্য দিয়ে পরমকে পাওয়া। সুদর্শনা তেমনিভাবেই রাজাকে অর্থাৎ ভালোবাসা সম্পদকে পেয়েছেন। সুদর্শনার পথপরিক্রমা সত্যিকারের প্রেমের স্বরূপ অনুভবের পথপরিক্রমা।

সুদর্শনা কোনো ঐশ্বরিক সত্তা নন, রক্তমাংসের মানুষ। তবে, মানুষ সুদর্শনার কিছু ত্রুটি চোখে পড়ে। কারণ, তিনি একবারও সুরঙ্গমাকে ঈর্ষা করেন না, বরং সমীহ করেন। তার এই আচরণ মানবচরিত্রের মতো নয়। দাসী সুরঙ্গমা

রাজাকে বেশি চেনেন, বেশি বুঝতে পারেন এবং বেশি অধিকার নিয়ে কথা বলেন– এটা রানির জন্য অপমানজনক এবং বিরক্তিকর বিষয় হওয়ার কথা। কিন্তু এ বিষয়ে সুদর্শনার কোনো মাথা ব্যথা নেই। বরং তিনি বলেন :

> তোর কাছে থাকলে আমার বড়ো গ্লানি হবে, সে আমি সইতে পারব না। (৫খ,পৃ-৩০০)

এখানে চরিত্রটি আর রক্তমাংসের মানুষ থাকেন নি। এর চেয়ে *অরূপরতন*– এ সুদর্শনা রক্তমাংসের মানুষ হয়েছেন অনেকাংশে। নিজের অধিকার তিনি জোর করে আদায় করতে বদ্ধ পরিকর। তিনি সুরঙ্গমাকে বলেন :

> আমি অত বেশি নম্র নই, আমি শক্ত আছি। সকলের কাছে তিনি আমাকে স্বীকার করে নেবেন– এ তিনি এড়াতে পারবেন না। (৭খ,পৃ.২৬৬)

রাজার প্রতি এই হলো তার অধিকার আদায়ের চেষ্টা। এ অধিকার স্বামী-স্ত্রীর চিরন্তন অধিকার। সুদর্শনার কাছে রাজা কোনো ঈশ্বর নন। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর স্বাভাবিক অধিকারই তিনি দাবী করেন। আবার ঠিক মানুষের মতোই তিনি সুরঙ্গমার অতি কথনে বিরক্ত হন। তিনি বলেন :

> তোর তো আস্পর্ধা কম নয়! যা এখান থেকে চলে, আমি তোর মুখ দেখবো না। (৭খ,পৃ.২৮০)

এ নাটকে সুদর্শনার কথায় দৃঢ়তা বেশ স্পষ্ট। বিক্রমরাজ তার পিতাকে বন্দি করলে তিনি ভেঙ্গে পড়েন না, বরং পিতার দুরবস্থায় বিচলিত হয়ে দৃপ্ত কণ্ঠে বলেন :

> আমাকে বন্দি করুন তিনি, আমার পিতাকে ছেড়ে দিন। আমি নিজেকে যতদূর নত করতে পারি করব, দেখি কোথায় এসে ঠেকলে তোর রাজার সিংহাসন নড়ে। (৭খ,পৃ.২৮৯)

– অর্থাৎ তিনি রাজাকে নড়াতে চান। এভাবে *অরূপরতন*-এর সুদর্শনা বাস্তব নারী হয়ে ওঠেন। তারপর রাজার কর্ম, বীণার সুর আর অন্তরে জেগে থাকা প্রেমে তিনি রাজার প্রতি সমর্পিত হন। নিজেকে রানি না ভেবে রাজার দাসী ভাবতে শুরু করেন। অন্ধকার ঘরে পুনঃপ্রবেশ করে তিনি রাজাকে বলেন :

> আমার প্রমোদবনে আমার রানীর ঘরে তোমাকে দেখতে চেয়েছিলুম– সেখানে তোমার দাসের অধম দাসকেও তোমার চেয়ে চোখে সুন্দর ঠেকে। তোমাকে তেমন করে দেখবার তৃষ্ণা আমার একেবারে ঘুচে গেছে– তুমি সুন্দর নও প্রভু, সুন্দর নও, তুমি অনুপম। (৭খ,পৃ.২৯৬)

অর্থাৎ দু রকম ব্যক্তিত্বের হলেও শেষ পর্যন্ত সুদর্শনা চরিত্র একই পরিণতিতে পৌঁছেছে। *বহুরূপী* নাট্যদলের *রাজা* মঞ্চস্থ সম্পর্কে শঙ্খ ঘোষ বলেছেন, "রহস্য ও প্রকাশ্যকে তাঁরা শেষ পর্যন্ত সংযুক্ত করে তুলতে পারবেন কি না, মনে সেই সন্দেহ তৈরি হতে থাকে। 'রাজা' রচনার মধ্যেই থেকে গেছে এই দ্বিধা-দুর্বলতা, যে কারণে পরবর্তী প্রয়াসে 'অরূপরতন' পর্যন্ত পৌঁছাতে হলো।"[৮] দুঃখের মধ্য দিয়েই তার প্রেমের স্বরূপ দেখা। সুদর্শনার চরিত্র বিশ্লেষণে আবু সয়ীদ আইয়ুব বলেছেন, "প্রথম নাটকের প্রথম দৃশ্যে সুদর্শনা রানী হতে অভিলাষী; দ্বিতীয় নাটকের শুরুতেই সুদর্শনা রানী।"[৯] – এ কথা মেনে নেওয়া যায় না। কারণ *রাজা* নাটকে সুদর্শনা ঢুকেই বলেন :

'আলো, আলো কই। এ ঘরে কি একদিনও আলো জ্বলবে না। (৫খ,পৃ.২৬৯)

এরপরই সুরঙ্গমা তাকে *রানীমা* সম্বোধন করেছেন এবং বলেছেন রানির সব ঘরে ঘরেই তো আলো জ্বলছে। অন্যদিকে *অরূপরতন*এ সুরঙ্গমা সুদর্শনাকে *রাজকন্যা*, *রাজকুমারী* বলেছেন। আর সুদর্শনা সুরঙ্গমাকে বলেছেন :

আমাকে সেই রাজাধিরাজের কথা বলো সুরঙ্গমা, আমি শুনি। (৭খ,পৃ.২৬৫)

বোঝা যাচ্ছে সুদর্শনা রানির পদ পান নি। নিচের সংলাপগুলোয় এ কথা আরো স্পষ্ট হয়–

সুরঙ্গমা। তিনি বলেছেন, অন্ধকারেই তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে।

সুদর্শনা। চিরদিন?

সুরঙ্গমা। সে-কথা বলতে পারি নে।

সুদর্শনা। আচ্ছা আমি সবই মেনে নিচ্ছি। কিন্তু আমার কাছে তিনি লুকিয়ে থাকতে পারবেন না। দিন যদি স্থির হয়ে থাকে সবাইকে তো জানাতে হবে।

সুরঙ্গমা। জানিয়ে কী করবে। সে অন্ধকারে সকলের তো স্থান নেই।

সুদর্শনা। আমি রাজাধিরাজকে লাভ করেছি সে-কথা কাউকে জানাতে পারব না? (৭খ,পৃ.২৬৬)

– এখানে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, রাজার সঙ্গে সুদর্শনার প্রথম সাক্ষাতের আয়োজন চলছে। এবং সে সাক্ষাৎ-টা যে অন্ধকারে হবে তা-ও সুরঙ্গমাই তাকে খবর দিচ্ছেন। আবার অন্ধকারে রাজার সঙ্গে কথোপোকথন এ রকম–

সুদর্শনা। অন্ধকারে আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছি নে। তুমি এর মধ্যে আছ?

নেপথ্যে। এই তো আমি আছি।

সুদর্শনা। আমি তোমাকে বরণ করব, সে কি না দেখেই? (৭খ,পৃ.২৬৮)

উপরের কথায় বোঝাা যায়, *অরূপরতন*এ সুদর্শনার শুরু এখান থেকেই। এই প্রথম সুদর্শনার সঙ্গে রাজার মিলন এবং এ জন্যই রাজাকে বরণ করার কথা ভেবেছেন সুদর্শনা। কিন্তু *রাজা*র সুদর্শনার শুরু বাল্যকাল থেকে। স্থূলভাবে এর পরের ঘটনার বিষয়বস্তু এক। যদিও সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। তা উপরে আলোচনা করেছি। "ললিতমধুর কল্পনার জগতে যে নিজেকে এতদিন ভুলিয়ে রেখেছে তাকে বাস্তব কঠিন নিষ্ঠুর পৃথিবীতে টেনে নিয়ে আসতে হলে দুঃসহ দুঃখের পথ ছাড়া তো অন্য কোনো পথ নেই। একছুটে পার হয়ে গেলে সে কম দুঃখ পাবে, নাকি ধীর পদক্ষেপে মন্থর গতিতে রোজ একটু-একটু করে হাঁটলে – সে সূক্ষ্ম বিচারে খুব কি আসে যায়? আসল কথাটা হচ্ছে বাসরঘরের সুখশয্যা ছেড়ে তাকে লোকালয়ে পৌঁছাতে হবে– রাজার রূপ যেখানে বজ্রকঠিন, অবিচলিত নিষ্ঠুর।"[১০]– এটাই হলো সুদর্শনা চরিত্রের মূল উত্তরণ: বাস্তবজীবনকে চেনা। সত্যেন্দ্রনাথ রায় বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথ ললিতের, মধুরের বা সুন্দরের সাধক নন, তিনি সত্যের সাধক। সে সত্য নির্মম, কঠিন। তারই নাম রাজা। তার ধ্বজায় কিংশুক আঁকা নেই, আঁকা আছে পদ্মফুলের মাঝখানে বজ্র। সে সুন্দর নয়।

ভীমকান্ত তার রূপ। ইচ্ছা করলে তাকে ঈশ্বর বলতে পারি, ইচ্ছা করলে তাকে রিয়্যালিটি বলতে পারি, ইচ্ছা করলে তাকে জীবনও বলতে পারি।"[১১]

–এই ঈশ্বর রিয়্যালিটি বা জীবনকেই জয় করেন সুদর্শনা। রবীন্দ্রনাথ *রাজা* নাটকের আলোচনায় বলেছেন :

> রানী ভুল করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মুক্তির উপায় তাঁহার নিজের মধ্যেই ছিল। সুবর্ণকে তিনি ভালবাসিয়াছিলেন, সুন্দর বলিয়াই। সুন্দরের প্রতি আসক্তিই তাঁহার রক্ষার বীজমন্ত্র। তিনি যখনই জানিতে পারিলেন, এ সৌন্দর্য প্রকৃত নহে, ইহার সহিত সত্যের যোগ নাই তখন তিনি বিস্মিত হইয়া বলিলেন, 'ভীরু! ভীরু! অমন মনোমোহন রূপ, তার ভিতরে মানুষ নেই। এমন অপদার্থের জন্য নিজেকে এত বড় বঞ্চনা করেছি।' কিন্তু বঞ্চিত যাহা হইয়াছে তাহা রানীর চোখ, হৃদয় নহে। ... এতদিনে রানীর ভুল ভাঙ্গিল, চোখের উপর বিশ্বাস টুটিল, চোখে যাহা সুন্দর লাগে তাহার চেয়ে গভীরতর সৌন্দর্যের জন্য আকাঙ্খা জাগিল, তাঁহার অন্ধকার ঘরের সাধনা পূর্ণ হইল। এইবার তিনি অন্ধকার স্বামীকে আলোকের প্রাসাদে পূঁজো দিতে পথের ধূলোয় বাহির হইলেন।[১২]

রবীন্দ্রনাথ যে স্বামীর উল্লেখ করেছেন, তিনি ঈশ্বর। ড. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় এর সমর্থনে বলেছেন, "ঈশ্বরকে পতিভাবে তিনি পেতে চাইছেন।"[১৩]অজিতকুমার চক্রবর্তী বলেছেন, "সৌন্দর্য হইতে ধর্মনীতিতে এবং ধর্মনীতি হইতে আধ্যাত্মিকতায় এই যে উত্তরণ, ইহা এমন ধাপে ধাপে না ঘটিলে আত্মার পক্ষে অন্ধকার হইতে আলোকে আসা কোনোমতেই সম্ভাবনীয় ছিল না। সুদর্শনার ইতিহাস আত্মার এই অন্তরঙ্গ জীবনের ইতিহাস।"[১৪] তিনি আরো বলেছেন, "তিনি রানীর বা আত্মার একমাত্র স্বামী, একমাত্র প্রণয়ী। আত্মা তাহার 'দ্বিতীয়', আত্মা তাঁহার 'উপমা', আত্মা তাঁহারই 'সুদর্শনা' রূপ।"[১৫] উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেছেন, "অন্ধকার ঘর মানুষের অন্তরের গভীর গোপনতল। এই স্থানেই আত্মার নিভৃত নিকেতন। সেই নিভৃত অন্ধকার গুহার মধ্যে মানবাত্মার সহিত পরমাত্মার নিরন্তর প্রেম-মিলন। এই অন্তরাত্মার নিভৃত নিবাসে চরম সত্যকে, পরম প্রেমময়কে উপলব্ধি করার সাধনাই রবীন্দ্রনাথের মতে মানবের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যাত্মসাধনা।"[১৬] সুকুমার সেন বলেছেন, "রাজা-সুদর্শনার বিরহমিলনের ব্যাপারকে বৈষ্ণব-ভাবনায় কৃষ্ণ-রাধার অভিসারের প্রতিরূপক বলিতে পারি।"[১৭] নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন, "ভাব-কল্পনার দৃষ্টি যোগ করিতে না পারিলে এই নাটকের এবং এই ধরনের সংকেতধর্মী নাটকের সবটা কিছুতেই দেখিতে পাওয়া সম্ভব নয়।"[১৮] প্রমথনাথ বিশী বলেছেন, "ভগবানের সহিত মানুষের যত রকম সম্বন্ধ কল্পনা করা যাইতে পারে তন্মধ্যে আবার মধুর রসের সম্বন্ধটি রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে প্রিয়, তাই রানীরূপে সুদর্শনা এই গ্রন্থের নায়িকা।"[১৯] তিনি আরো বলেছেন, "সকলের চেয়ে রানীর সাধনা কঠিন, কারণ সে সাধনা মধুর রসের সাধনা। যে ব্যক্তি রাজাকে প্রণয়ীরূপে পাইতে ইচ্ছা করে তাহাকে সুকঠিন দুঃখের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।"[২০]– এই মন্তব্যগুলোতে সকলেই রাজাকে রূপক মেনেছেন। আবু সয়ীদ আইয়ুব একে বাস্তবতা বলেছেন, সত্যেন্দ্রনাথ রায় বলেছেন ঈশ্বর রিয়্যালিটি বা জীবন। অন্যরা ঈশ্বরই বলেছেন।– ঈশ্বরের চেয়ে 'বাস্তবতা' বেশি

গ্রহণযোগ্যতার দাবীদার। সুকুমার সেনের 'কৃষ্ণ-রাধার অভিসারের প্রতিরূপক'– ঠিক মেনে নেওয়া যায় না। কারণ রাধা নিজেকে দাসীরূপে সমর্পিত করেন নি, কৃষ্ণ অন্য গোপীদের সঙ্গে নৃত্য করলে রাধা সেটা মেনে নেন নি। সর্বোপরি, রাধা প্রেমের গৌরবে অভিসিক্ত হয়েছেন, কিন্তু সুদর্শনার প্রেম দাসত্বে পরিণত হয়েছে। সুদর্শনা প্রেমিক-পুরুষকে আর পান নি, পেয়েছেন ঈশ্বরকে। আবার প্রমথনাথ বিশী যে 'মধুর রসে'র কথা বলেছেন, তা-ও প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে সম্ভব। সেখানে দাসত্বের কোনো স্থান নেই। তাই 'মধুর রসে'র ব্যাখ্যা সুদর্শনার সম্মানের জন্য অনুকূল হলেও নাটকে তা প্রকাশিত হয় নি। দাসীত্বেই তার পরিণতি ঘটেছে।

রাজা রচনার সময়কাল সম্পর্কে প্রমথনাথ বিশী বলেছেন, "এই সময়টায় রবীন্দ্রনাথ ভগবানের যে স্বরূপ উপলব্ধি করিলেন তাহার কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। তিনি সীমার কোটি হইতে দৃষ্ট হইলেও যেমন সত্য, অসীমের কোটি হইতে দৃষ্ট হইলেও তেমনি সত্য, আবার সীমা ও অসীমের মিলিত কোটি হইতে দৃষ্ট হইলেও তেমনি সত্য।"[২১] আমরা জানি যে, রবীন্দ্রনাথের *রাজা* রচনার কাল হলো *খেয়া-গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালী*র রচনার কাল। এই গান-কবিতা এবং শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন ভাষণে তিনি ঈশ্বরভাবনার কথা নানাভাবে ব্যক্ত করেছেন। এই ঈশ্বরই রাজা। রবীন্দ্রনাথের এই ঈশ্বরভাবনা বিষয়ক কয়েকটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করা যায়–

১. তিনিই প্রেম, যিনি কোনো প্রয়োজন নেই তবু আমাদের জন্য সমস্তই ত্যাগ করেছেন, তিনিই প্রেমস্বরূপ। তিনি নিজের শক্তিকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভিতর দিয়ে নিয়ত আমাদের জন্য উৎসর্জন করছেন– সমস্ত সৃষ্টি তাঁর কৃত উৎসর্গ। ... এই প্রেমস্বরূপের সঙ্গে আমাদের সম্পূর্ণ যোগ হলেই আমাদের সমুদয় ইচ্ছার পরিপূর্ণ চরিতার্থতা হবে। সম্পূর্ণ যোগ হতে গেলেই যার সঙ্গে যার যোগ হবে তার মতন হতে হবে। প্রেমের সঙ্গে প্রেমের দ্বারাই যোগ হবে।[২২]

২. ... এই প্রেমস্বরূপের সঙ্গে আমাদের প্রেম যেখানেই ভালো করে না মিলছে সেইখানে সমস্ত জগতে তার বেসুরটা বাজছে। সেইখানে কত দুঃখ যে জাগছে তার সীমা নেই– চোখের জল বয়ে যাচ্ছে। ওগো প্রেমিক, তুমি যে প্রেম কেড়ে নেবে না, তুমি যে মন ভুলিয়ে নেবে– একদিন সমস্ত মনে প্রানে কাঁদিয়ে তারপরে তোমার প্রেমের ঋণ শোধ করাবে।[২৩]

৩. ... উপনিষৎ তাঁকে বলেছেন– গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং– অর্থাৎ তিনি গুপ্ত, তিনি গভীর। তাঁকে শুধু বাইরে দেখা যায় না, তিনি লুকানো আছেন। বাইরে যা-কিছু প্রকাশিত, তাকে জানবার জন্যে আমাদের ইন্দ্রিয় আছে– তেমনি যা গূঢ়, যা গভীর, তাকে উপলব্ধি করবার জন্যেই আমাদের গভীরতর অন্তরিন্দ্রিয় আছে।[২৪]

৪. মানুষের মধ্যেও একটি সত্তা আছে যেটি গুহাহিত; সেই গভীর সত্তাটিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যিনি গুহাহিত তাঁর সঙ্গেই কারবার করে– সেই তার আকাশ, তার বাতাস, তার আলোক; সেইখানেই তার স্থিতি, তার গতি, সেই গুহালোকেই তার লোক।[২৫]

৫. প্রেমেতেই অসীম সীমার মধ্যে ধরা দিচ্ছেন এবং সীমা অসীমকে আলিঙ্গন করছে– তর্কের দ্বারা এর কোনো মীমাংসা করবার জো নেই।[২৬]

৬. যদি তোমায় ভালোবাসি,
আপনি বেজে উঠবে বাঁশি,
আপনি ফুটে উঠবে কুসুম,
কানন ভরে।[২৭]

৭. দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার
গানের ওপারে।
আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি
পাই নে তোমারে।[২৮]

পরমানন্দময় বিশ্বজগৎ ঈশ্বরের দান। আর প্রেমই ঈশ্বরকে পাওয়ার একমাত্র উপায় এবং প্রেমের পথ খুব সরল নয়। এটাই রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরভাবনা। এই ঈশ্বরভাবনার সমান্তরালে লিখিত হয়েছে *রাজা* নাটক। *রাজা* নাটক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ অ্যানড্রুজকে ১৯১৪ সালে চিঠিতে লিখেছেন–

> 'রাজা' নাটকের অভিনয় শেষে তাহার অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক মধুর রসটি সমগ্র হৃদয়-মন ভাবাবিষ্ট করে। নাট্যকারের চরম সার্থকতা এইখানে।[২৯]

দেখা যাচ্ছে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এবং *রাজা* নাটকের সমালোচকবৃন্দ সকলেই রাজাকে পাওয়া অর্থ পরমেশ্বরকে পাওয়া মেনে নিয়েছেন। তবে, আবু সয়ীদ আইয়ুব বলেছেন, "স্বরচিত নাটকের ব্যাখ্যায় স্বয়ং রচয়িতার ভুল করবার সম্ভাবনা অন্য সহৃদয় পাঠকের চেয়ে একটু যেন বেশিই।"[৩০] তাই বলা যায় রবীন্দ্রনাথও যে ঠিকভাবে *রাজার* বোধকে পর্যালোচনা করেছেন তা পুরোপুরি সত্য না-ও হতে পারে। বিশেষ করে রাজা যখন ঈশ্বর এবং সুদর্শনা যখন মানব। সুদর্শনা সরল বিশ্বাসে রাজার সঙ্গে কথা বলেছেন। বাস্তব পৃথিবীর রুঢ়তা তাকে স্পর্শ করে নি। "সুদর্শনা প্রেমিকা, প্রেমে তার ভেজাল নেই। কিন্তু একটা অভাব ছিল, এবং সেই অভাবমোচনের ইতিবৃত্তই *রাজা* নাটকে বর্ণিত হয়েছে।"[৩১] অন্ধকার ঘরে দীর্ঘদিনের মিলনে রাজার সুন্দর মন এবং স্পর্শ অনুভব করেছেন সুদর্শনা। সেই প্রিয় রাজাকে দেখার জন্য যখন তিনি প্রাসাদের শিখরের চূড়ায় দাঁড়িয়েছেন তখন দেখতে পেয়েছেন সুসজ্জিত-সুদর্শন রাজবেশী সুবর্ণকে। সুদর্শনার ধারণারও বাইরে যে, কেউ রাজা সেজে এভাবে ঘুরতে পারে। তাই সুবর্ণকে রাজা মনে করাটা সুদর্শনার ভুল বা অন্যায় নয়। এরপর যখন তিনি বুঝলেন যে সুবর্ণ *তার রাজা* নয়– নকল, তখন সুদর্শনা সুবর্ণকে ভোলার এবং ভুল সংশোধনের জন্য কোনো চেষ্টা করেন নি, নিজেকে শাসন করেন নি।– এটা সুদর্শনার ভুল এবং অন্যায়। এতোদিন ধরে চেনা রাজার প্রেমকে অনুভব না করে, সুবর্ণর চেহারায় মুগ্ধ

হওয়া প্রেমিক নারীর মতো আচরণ হয় নি। তবে আমরা স্পষ্ট দেখেছি যে, তার মধ্যে দ্বিধা কাজ করেছে। সুবর্ণ এবং রাজাকে নিয়ে তার মানসিক দোদুল্যমানতা ছিল। তারপর বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিনি সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। সুদর্শনার এই সত্য উপলব্ধি, যে কোনো সাধারণ নারীর সত্য এবং প্রেম উপলব্ধি। এ উপলব্ধি আধ্যাত্মিক নয়। রবীন্দ্রনাথ *শেষ লেখায়* লিখেছেন –

সত্য যে কঠিন,
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম,
সে কখনো করে না বঞ্চনা।[৩২]

– সুদর্শনা সেই সত্য উপলব্ধি করেছেন। স্পিনোজা যে সত্যের কথা বলেছেন– 'truth is God'– এ সেই সত্য। প্রেমের সত্য। "রবীন্দ্রনাথ সুদর্শনাকে বিভ্রান্ত আলোর মধ্য দিয়ে ঘুরিয়ে আনেন কেবল আত্মত্রাণের পন্থা রচনার জন্যে, অবশেষে আত্মশুদ্ধির আলোকে যার উত্তরণ।"[৩৩] প্রমথনাথ বিশী রাজাকে দেখতে চাওয়াকে সুদর্শনার ভুল বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন, "মহিষী সুদর্শনাকে সুগভীর দুঃখের মধ্যে ফেলিয়া কবি তাহাকে সিদ্ধির তটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সুদর্শনার দুঃখের মূলে তাহার একটি ভুল– সে তাহার রাজাকে চোখে দেখিতে চাহিয়াছিল। ... সুদর্শনার রাজা চোখে দেখিবার বস্তু নহেন।"[৩৪] – এখানে প্রশ্ন হলো, রাজাকে দেখতে চাওয়া কেন সুদর্শনার ভুল? সুদর্শনা তো জানেন না যে তার স্বামী ঈশ্বর। কারণ তার মায়ের স্বামী ঈশ্বর নন, তার পরিচিত নারীদের স্বামী ঈশ্বর নন। তিনি কেমন করে বুঝবেন তার স্বামী ঈশ্বর! ভগবানের সাথে কী মানবের বিয়ে হয়? বাংলাসাহিত্যে রাধা-কৃষ্ণ প্রেমে জীবাত্মা-পরমাত্মার রূপক রয়েছে। এই রকমভাবে রাজা বা স্বামীকে ঈশ্বর এবং স্ত্রীকে মানবের প্রতীক করা রবীন্দ্রমানসের বোধকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। কারণ নাটকে ঠাকুরদা রাজাকে বন্ধুর মতো করে পেয়েছেন। অন্যদিকে সুরঙ্গমা রাজার দাসী হয়ে রাজাকে পেয়েছেন। সুদর্শনাকেও দাসী হতে হলো। কেন বন্ধু হয়ে প্রেমকে পাওয়া গেলো না? 'প্রেমের সঙ্গে প্রেমের দ্বারাই যোগ হবে।'– প্রেমের যোগে তো বন্ধুত্ব হওয়ার কথা; দাসীত্ব কেন? পুরুষ ঠাকুরদা পরমাত্মার বন্ধু, কিন্তু সুরঙ্গমা-সুদর্শনা দাসী! এখানে রবীন্দ্রনাথের নারী-অস্তিত্বের সীমাবদ্ধতা প্রচণ্ডভাবে প্রকাশিত হয়েছে। বরং সুবর্ণ এবং রাজার ব্যক্তিত্ব-প্রেমবোধ-মানসিক ঐশ্বর্য বিচার করে বাস্তব-রুঢ়ের মুখোমুখি হয়ে রাজাকে ভালোবাসতে পারাই আসল প্রেমের স্বরূপকে অন্তরে অনুভব করা। শেষ পর্যন্ত সুন্দরের ভিতরের ভয়ংকরকে সহ্য করে সত্যকে পাওয়াই সুদর্শনার প্রেমকে পাওয়া। এটাই *সুদর্শনা* চরিত্রের মূল কথা। এতে আধ্যাত্মিকতার রং লাগিয়ে ধোঁয়াসার মধ্যে প্রবেশ করলে বিভ্রান্তি ঘটে।

রাজা নাটকের আভাসে এবং রূপন্তরে রচিত হয়েছে *শাপমোচন* নাটকটি। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ একে বলেছেন 'কথিকা'। এখানে পরিসর কম। চরিত্র মূলত দুটি। গান্ধাররাজ অরুণেশ্বর আর রানী কমলিকা। বাইরের কোনো আলো এখানে পড়ে নি। কমলিকার অন্তরের যন্ত্রণা এবং তা থেকে মুক্তিই নাটক জুড়ে। নাটকের কাহিনী দৃঢ় বলে কমলিকার চরিত্রটিও বিশ্বাসযোগ্য এবং গ্রহণযোগ্য। *রাজা*র সুদর্শনার চেয়ে কমলিকা তাই শক্তিশালী এবং বাস্তব। দেখা যায়, রূপান্তরিত নাটকগুলোতে নারী চরিত্রগুলো অপেক্ষাকৃত বেশি অস্তিত্বশীল। অর্থাৎ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বোধগত পরিবর্তন হয়েছে এবং তিনি সেই বোধ পূর্বের চরিত্রে আরোপ করে নতুন রূপে উপস্থাপন করেছেন।*শাপমোচন* নাটকে কমলিকার জন্ম ইতিহাস পাওয়া যায়। তিনি স্বর্গের দেবী মধুশ্রী। স্বর্গের সুরসভার গীতনায়কদের অগ্রণী সুরসেনের প্রেয়সী। একদিন তিনি সূর্যপ্রদক্ষিণে গেলে সুরসেনের মৃদঙ্গের তাল কেটে যায়। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ইন্দ্রাণী তাদের মর্তে পাটিয়ে দেন। বিকৃত চেহারা নিয়ে সুরসেন জন্ম নেন গান্ধার রাজগৃহে অরুণেশ্বর নামে। আর মন্দার রাজকূলে মধুশ্রী কমলিকা হয়ে জন্ম নেন। কমলিকার একটা ছবি অরুণেশ্বরের হাতে এসে পৌঁছে। ছবি দেখে অরুণেশ্বর একটি চিঠি পাঠান কমলিকাকে। কমলিকা সেই চিঠি দেখে মুগ্ধ হন। বিয়ে হয় তাদের। কিন্তু রাজা অরুনেশ্বর নিজে বিয়েতে উপস্থিত না থেকে তাঁর বীণাটি পাঠিয়ে দেন। সেই বীণের সাথেই হয় কমলিকার মালাবদল। কমলিকা এলেন স্বামীগৃহে। কিন্তু একটি অন্ধকার ঘরে রাজার সঙ্গে তাঁর দেখা হলো। এভাবেই চলতে থাকে দিনের পর দিন। এতে তো কমলিকা সন্তুষ্ট হতে পারেন না। শুধু কমলিকা নয়, যে কোনো নারীই চাইবে নিজের স্বামীকে দেখতে। রাজা দেখা দিতে রাজি নন। রাজা বলেন :

> আমার গানেই তুমি আমাকে দেখো। আগে দেখে নাও অন্তরে, বাইরে দেখবার দিন আসবে তার পরে। নইলে ভুল হবে, ছন্দ যাবে ভেঙে। (১১খ,পৃ.২৩৭)

রানী কমলিকা এতে শান্ত হন না। একদিন উষার প্রথম আলোকে তিনি রাজাকে দেখতে চান। কমলিকা এবার নাছোরবান্দার মতো ধরেন রাজাকে দেখতে : হয় তিনি রাজাকে দেখবেন, নয় তো এই অন্ধকারের বুক থেকে চলে যাবেন। তাঁর মতে অন্ধতার চেয়েও বড়ো এ 'না দেখে থাকা'র অভিশাপ। অবশেষে চৈত্রসংক্রান্তিতে নাগকেশরের বনে সখাদের সাথে নিভৃতে নৃত্যরত রাজাকে দেখার অনুমতি মিলল। কমলিকা দেখলেন সবার মধ্যে একজন কুশ্রী রসভঙ্গ করছে। চৈত্রসংক্রান্তির রাতে আবার মিলন হলো তাদের। কমলিকা অভিযোগ করলেন, একজন কুশ্রী কেন সেখানে প্রবেশের অনুমতি পেলো। রাজা জানালেন, সেই কুশ্রী স্বয়ং রাজা। আলো জ্বলে উঠলো। আবরণ গেলো ঘুচে। কমলিকা সহ্য করতে পারলেন না। ঘর থেকে পালিয়ে চলে গেলেন; গেলেন বহু দূরে। বনের মধ্যে মৃগয়ার জন্যে যে নির্জন রাজগৃহ ছিল সেইখানে। শোকে-দুঃখে-লজ্জায় তিনি আচ্ছন্ন। রাতের পর রাত তিনি রাজার বাজানো বীণাধ্বনির আর্তরাগিণী শোনেন। শুনতে শুনতে আস্তে আস্তে কমলিকার মনে করুণ রসের সৃষ্টি হয়।

সমস্ত হৃদয় জুড়ে বিরহ জেগে ওঠে। প্রতি রাতের বীণাধ্বনি যেন আর বাইরে নেই এসেছে তাঁর তন্তুতে তন্তুতে। এরপর একদিন কমলিকার মনে হলো বাইরের চেহারা কিছু নয়, অন্তরের মানুষটিই আসল। তখন তিনি প্রদীপের আলোয় বরণ করলেন রাজাকে। আর বললেন :

প্রভু আমার, প্রিয় আমার, এ কী সুন্দর রূপ তোমার। (১১খ.পৃ.২৪২)

এখানে কমলিকা রাজাকে প্রথমে প্রভু বলেছেন, তারপর বলেছেন প্রিয়। স্বামী শব্দের মধ্যেই একটা প্রভুত্ব আছে বটে তবে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের মধ্যে প্রভুত্বের চেয়ে বন্ধুত্ব হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কমলিকার বোধে তা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত; তবে, নিজের অস্তিত্ব তিনি রক্ষা করেছেন। রাজার অন্ধকার তিনি ঘুচিয়েছেন। রাজাকে দেখার ইচ্ছা করে, তা সম্পূর্ণ করেছেন এবং নিজেই নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়ী হয়েছেন।

রাজা নাটকে ধোঁয়াশা আছে। রাজাকে কেউ দেখে নি। এমনকি ঠাকুরদাও যে দেখেছেন এমন মনে হয় না। ঠাকুরদার সঙ্গে দেখা হওয়ার কোনো দৃশ্য নেই। শাপমোচনে রাজার মধ্যে কোনো নিষ্ঠুরতা নেই। আছে জয় করার চেষ্টা।

তিনটি নাটকেই দুঃখের পথ পরিক্রমায় রানি সুপুরুষত্বের পরিচয় পেয়েছেন। শেষ পর্যন্ত বাহ্যিক চেহারার চেয়ে অন্তরের মানসবোধ এবং কর্ম বড়ো হয়েছে। "রাজায় আধ্যাত্মিকতার ব্যঞ্জনা আছে, অরূপরতনে আধ্যাত্মিকতা অতি-প্রকট, শাপমোচনে অরুণেশ্বর-কমলিকার সম্পর্ক মানবিক প্রেমের সম্পর্ক। তত্ত্ববিরল মানবিকতার ভিত্তির উপরে শাপমোচনের গল্পের প্রতিষ্ঠা।"[৩৫]এখানে প্রশ্ন থেকে যায়, *রাজা* নাটকে রাজা যদি পরমেশ্বর হন, তবে পুরুষই কি সব সময় পরমেশ্বর? কোনো নারীকে পাবার জন্য কি এরকম কষ্ট ভোগ আছে? নেই। নেই কোনো পথ পরিক্রমাও। তবে, *শাপমোচন*-এ রবীন্দ্রনাথ একটু উদার হয়েছেন। কমলিকাকে পাওয়ার জন্য রাজা দিনের পর দিন চেষ্টা করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত রাজার কালো-ভয়ংকর চেহারা কমলিকার মনকে স্নিগ্ধ করেছে।– এরা তিনজন স্বামীকে দেখার জন্য বিদ্রোহ ঘটালেও শেষ পর্যন্ত নির্দিষ্ট গণ্ডিতেই ফিরে গেছেন। অবশ্য এ কথা বলতেই হবে, স্বামীর ইচ্ছেকে মেনে নিয়ে এরা জীবন যাপন করেন নি, বরং নিজেদের মত প্রকাশ করে নিজের মতে লক্ষ্যে পৌঁছেছেন এবং সামাজিক জীবনে ফিরে গেছেন।

রাজা নাটকে রোহিণী সাধারণ দাসী চরিত্র। তার ভিতরে ঈর্ষাত্মক মন আছে। সে দাসী সুরঙ্গমাকে ঈর্ষা করে। তার মুখেই নাটকের একটি যথার্থ কথা উচ্চারিত হয়েছে। সে সুরঙ্গমা সম্পর্কে কটাক্ষ করে রানিকে বলেছে :

তার ভাগ্য ভালো, রানীর কাছে রাজার পরিচয় সে'ই করিয়ে দেবে। (৫খ,পৃ.২৮৯)

সমাজের এক ঘৃণ্য-নোংড়া অধ্যায়ের প্রতি ইংগিত করেছে রোহিণী। রাজা-বাদশারা মহিষীকে আড়াল করে– কখনো কখনো আড়াল না করেও দাসীদের প্রতি অনুরক্ত হতো। অনেক সময় মহিষীর চেয়ে বেশি অধিকার পেতো দাসী। রানি সুদর্শনা রাজাকে চেনার ব্যাপারে অসহায় হয়ে সুরঙ্গমার অভাব অনুভব করলে রোহিনীর এই কথা রাজঅন্তঃপুরের অনাচারকে প্রকাশিত করে। *রাজা* রূপক নাটক হলেও রোহিনী তো মানুষ। তাই সে মানুষের মতোই চিন্তা করেছে।

রক্তকরবী নাটকে খোদাইকর ফাগুলালের স্ত্রী চন্দ্রা। চন্দ্রা খুব সাধারণ মেয়ে। সাধারণ তার আচরণ এবং ভাবনা-চিন্তা। মদ থেকে সে যেমন তার স্বামীকে বিরত রাখতে চায়, তেমনি সুন্দরী নন্দিনী থেকেও। তার সাধারণ চিন্তায় নন্দিনী সম্পর্কে ভয় জাগে। সে মনে করে ভূবনমোহিনী রূপ নিয়ে নন্দিনী কোনো অনিষ্ট করতে এসেছে। শুধু নিজের স্বামীকে নয়, পাড়ার আর সকল মানুষকে এমকি তার বেয়াই গায়ক বিশুকে পর্যন্ত সাবধান করে সে। শুধু সাবধান করেই ক্ষান্ত হয় না, একটু কটাক্ষ করেও কথা বলে :

> গান শোনাবার লোক এখানেও এক-আধজন মিলতে পারে, নিতান্ত লোকসান হবে না। (৮খ,পৃ.৩৬৪)

এখানে নন্দিনী সম্পর্কে ঈর্ষারও আভাস আছে। এ ঈর্ষাও মানুষের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। চন্দ্রা ঈর্ষা করে নন্দিনীর সৌন্দর্য্যকে এবং জনপ্রিয়তাকে। নন্দিনীর মুখোমুখি হলে নন্দিনীকে কথা শোনাতেও ছাড়ে না। বিশুকে সর্দারের লোকেরা ধরে নিয়ে গেলে সে দিশেহারা হয়ে নন্দিনীকে দোষ দেয়। সে মনে করে নন্দিনী সর্দারের চর, নন্দিনী-ই বিশুকে ধরিয়ে দিয়েছে। সে বলে :

> ওকে ফিরিয়ে যদি না আনতে পারিস মরবি, মরবি। তোর ঐ সুন্দরপানা মুখখানা দেখে আমি ভুলি নে। (৮খ,পৃ.৩৮৭)

চন্দ্রার পরিবেশ অনুযায়ী নন্দিনীকে সন্দেহ করাটা চন্দ্রার পক্ষে অমুলক নয়। কারণ, যক্ষপুরীতে সর্দারদের দৌরাত্ম্য। তাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে কোনো কিছু কেউ করতে পারে না। এ কারণে তারা নিজেদের চরও রাখে গোপন তথ্য পাওয়ার জন্য। হঠাৎ করেই রাজা নন্দিনীকে নিয়ে আসেন যক্ষপুরীতে। নন্দিনী কোনো বাধা-নিষেধ মানেন না। বরং সবাই যেন তার দিকে ঝোকে, রাজা পর্যন্ত। বিশু তো প্রায় সব সময়ই নন্দিনীর সঙ্গে লেগে থাকে। তাই বিশু বন্দি হওয়ায় নন্দিনীকে চর ভাবা চন্দ্রার জন্য খুবই স্বাভাবিক। "চন্দ্রা দোষে-গুণে-গড়া অনেকটা সাধারণ বাস্তব নারী। নন্দিনীর প্রতি স্বাভাবিক নারীজনোচিত ঈর্ষা, সরল ধর্মবিশ্বাস, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি লোভ ও পল্লীজীবনের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ চরিত্রটিকে অনেকখানি জীবন্ত করিয়াছে।"[৩৬] যক্ষপুরীর পরিবেশ চন্দ্রাকে বদলেও দিয়েছে। অবশ্য তা চন্দ্রা নিজে জানেও না। তার মানসিক পরিবর্তনের কারণেই স্বামী ফাগুলাল বারো

ঘণ্টার পরে আরও চার ঘণ্টা যোগ করে খাটে। এ খাটুনি ফাগুলালেরও অস্বাভাবিক মনে হয় না, আবার চন্দ্রারও না। বিশুর কথায় তাদের মানসবৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়েছে। বিশু বলে:

> তোমাদের ফুল গেছে শুকিয়ে, এখন 'সোনা সোনা' করে প্রাণটা খাবি খাচ্ছে। (৮খ,পৃ.৩৬৬)

তবে যক্ষপুরীতে এসেও চন্দ্রার নারীসুলভ বিশ্বাসপ্রবণতা হারিয়ে যায় না। তাই তো সে সর্দারকে বিশ্বাস করে। বাড়ি যাওয়ার জন্য সর্দারের কাছে ছুটি চায়, আবার বিশুকে মুক্ত করতে সর্দারের কাছেই কান্নাকাটি করে।

*চিরকুমার সভা*র নারী চরিত্রগুলো খুব সাধারণ নারী। তাদের কোনো আলাদা বৈশিষ্ট্য নেই, নাটক এগিয়ে নেওয়ার জন্য সহায়ক হয়েছেন মাত্র। এদের মধ্যে একমাত্র শৈলবালা চরিত্রটি-ই আলাদা করে চোখে পড়ে। তিনি বুদ্ধিদীপ্ত, কৌশলী এবং নির্ভীক। চিরকুমার সভার দুজন সভ্য শ্রীশ এবং বিপিনের সঙ্গে নিজের ছোটো দুই বোনের বিয়ে দেওয়ার জন্য কৌশল অবলম্বন করেন। নিজে তিনি বিধবা। কিন্তু পুরুষ সেজে 'চিরকুমার সভার' সভ্য হন। নিজেদের বাড়িতে সভার বৈঠক বসান এবং বোনদের সঙ্গে শ্রীশ এবং বিপিনের যোগাযোগ করিয়ে দেন। এবং সব শেষে তাদের বিয়ে পর্যন্ত ঘটনাকে টেনে নেন। "তার উদ্ভবনী প্রতিভাও অন্যান্য চরিত্রগুলি অপেক্ষা উন্নত।"[৩৭]তবে চরিত্রসৃষ্টি একটি বড়ো ত্রুটি হলো শৈলবালা একবারের জন্যও কোনো ছেলের প্রতি আকৃষ্ট হন নি, শ্রীশ বা বিপিন কাউকে দেখেই তার বুক কেঁপে ওঠেনি, নারী মনের আবেগ উচ্ছ্বসিত হয় নি। পূর্ণযৌবনা শৈলবালার জন্য এ আচরণ সত্যিই মানবীয় হয়ে ওঠে নি। তাই চরিত্রটি মানববৈশিষ্ট্যের বাইরে রয়ে গেছে।

শোধবোধ নাটকে নলিনী আইনজীবী মিস্টার লাহিড়ির মেয়ে। সমাজের উচ্চ শ্রেণিতে তাদের ওঠাবসা হলেও নলিনী পছন্দ করেন সহজ-সরল-সাধারণ জীবন। বিলেতফেরত বরুণ নন্দীকে তাই উপেক্ষা করে অতি সাধারণ হিন্দু পরিবারের সতীশকে তিনি বেশি পছন্দ করেন। বরুণ নন্দীর তোষামোদী কথা আর বড়োলোকি উপহার তার অসহ্য মনে হয়। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য যথার্থই বলেছেন, "সাহেবিয়ানার কৃত্রিম আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হইলেও সে উহার অন্তঃসারশূন্যতা সম্বন্ধে ছিল যথেষ্ট সচেতন।"[৩৮]– এই সচেতনতাই তাকে বাঙালি নারীতে আবদ্ধ রেখেছে। মা-বাবা-বান্ধবীর মতো সময়ের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেন নি। মেকি সভ্যতাকে সম্পূর্ণভাবে অবজ্ঞা করেছেন তিনি। তার মা-বাবা যখন বরুণ নন্দীর চাপরাশির সামনেও আটপৌড়ে কাপড় পরে যেতে লজ্জাবোধ করেন, সেখানে তিনি সমস্ত পরিস্থিতিকে ব্যঙ্গ করে নিজের আটপৌড়ে পোশাক সম্পর্কে বলেন :

> বেহারা হয়ে জন্মেছে বলেই কি এত শাস্তি দিতে হবে। বেচারা মনিববাড়িতে চব্বিশ ঘন্টা যা দেখে, আজ তার থেকে নতুন কিছু দেখে বেঁচে গেল। (৯খ,পৃ.১৩৬)

নলিনী খুব বাস্তববাদী নারী। তাই সতীশ নন্দীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাকে নেকলেস উপহার দিলে তিনি সতীশের উপর সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠেন। বুঝতে পারেন, সতীশের অনেক দেনা হয়েছে। তাই তিনি তা ফিরিয়ে দিতে চান। দেনার দানের চেয়ে অন্তরের দান তার কাছে অনেক বড়ো। তিনি বলেন :

> তোমার এই নেকলেসটা হাতে করে নেওয়ার চেয়ে ঢের বেশি করে নিয়েছি, এই কথাটা তোমাকে বুঝে দেখতে হবে। নইলে কখনোই তোমাকে ফিরিয়ে দিতে পারতুম না। দিলে অপমান করা হত। (৯খ, পৃ.১৫৪)

এরপরও সতীশ বুঝতে না চাইলে তিনি আরো খোলাসা করে এবং যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দেন; বলেন :

> তোমার দান-করাকেই আমি বেশি মান দিয়েছি বলেই তোমার দানের জিনিসকে অনায়াসে ত্যাগ করতে পারি। মনে করো না, এটা হারিয়ে গেছে; সেই হারানোতে তোমার দান তো একটুও হারায় না। (৯খ,পৃ.১৫৪)

নলিনী বারবারই সতীশকে বুঝিয়েছেন, আড়ম্বর তিনি পছন্দ করেন না। তার কাছে মনুষ্যত্বই সবচেয়ে বড়ো। তিনি আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন এবং জেদি। সতীশের হাতে নেকলেস দেখে নন্দী কিছু না জেনেই নেকলেস ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বলে সতীশকে অপমান করে। তখন এই অপমান নলিনীর আত্মসম্মানে বাধে। এ কারণেই তিনি সতীশের নেকলেসটি গলায় পরে নন্দীর ব্রেসলেটটি ফিরিয়ে দেন।

শেষ পর্যন্তও তার প্রেমিক মনের পরিচয় পাওয়া যায়। সতীশের চরম হতাশার সময় তিনি নিজের গহনাগুলো নিয়ে হাজির হন সতীশের বাড়ি; গহনা বিক্রির টাকা দিয়ে সতীশকে চুরির দায় থেকে উদ্ধার করতে। তাই নিঃসঙ্কোচে বলা যায়, "নায়িকা নলিনী ঐশ্বর্যের মধ্যে লালিত, পালিত, বিলাতি সংস্কৃতিতে পরিশীলিত, আপাতদৃষ্টিতে হৃদয়হীন ও কঠোর। কিন্তু বাস্তবে তার হৃদয় স্বর্ণমণ্ডিত, দয়া-মায়া-স্নেহে উজ্জ্বল।"[৩৯]

শোধবোধ নাটকে চারু খুব সাধারণ, গতানুগতিক চরিত্র। জোয়ারে গা-ভাসানো এক নারী। বিলেত ফেরত মানুষের প্রতি তার আগ্রহ এবং তোষামোদের শেষ নেই। বন্ধু নলিনীর রূপমুগ্ধ বিলেত ফেরত বরুণ নন্দীকে সুযোগ বুঝে হাত করে নেয় সে। এদিক দিয়ে সে মূল্যবোধহীন এবং লোভী চরিত্র।

গৃহপ্রবেশ নাটকে হিমি যতীনের বোন। তিনি আই এ পড়েন। যতীন অসুস্থ। অসুস্থ ভাইয়ের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্যশীল বোন হিসেবেই তাকে পাওয়া যায়। দুঃখ জয় করতে শিখেছেন হিমি। তাই ভাইয়ের মৃত্যুশয্যায় ভাইকে আনন্দ দেওয়ার জন্য একের পর এক গান করেন, কষ্ট চেপে রেখে ভাইয়ের সামনে হাসি মুখে থাকেন। বউদিদি মণি সম্পর্কে কোনো মন খারাপ করা কথা বলেন না। আবার অখিল এসে বাড়ি দেনায় বেহাত হয়েছে খবর দিলে তিনি আতঙ্কিত হন ঠিকই কিন্তু তা নিয়ে উচ্চবাচ্য করে যতীনের অসুখ বাড়িয়ে তোলেন না। তার আরেকটি বড়ো দিক হলো তিনি ননদ হিসেবে মণির সঙ্গে কোনো উচ্চবাচ্য করেন নি। মণি কখনো যতীনের ঘরে ঢোকেন না,

যতীনের অসুস্থতার বিষয়ে তার কোনো আগ্রহ নেই, দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করেন না, তবু হিমি ধৈর্য ধরে মণির সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেন। এমনকি প্রতিবেশিনী এসে মণির সম্পর্কে কটু কথা বলতে চাইলেও তিনি প্রতিবেশিনীকে থামিয়ে দেন। নিজের বাড়ির বউয়ের দোষ অন্যের সামনে তুলে ধরেন না। তার মানসিকতাও উদারতায় উত্তীর্ণ। তাই তিনি বলতে পেরেছেন :

> দেখো মাসি, বউদিদির এমন স্বভাব যে চেষ্টা করেও রাগ করতে পারি নে। মনে হয় যেন বিধাতা ওর উপরে কোনো দায় দিয়ে পৃথিবীতে পাঠান নি। ওর কাছে দুঃখকষ্টের কোনো মানেই নেই। (৯খ,পৃ.১৭৫)

এ নাটকে প্রতিবেশিনীর চরিত্রটি কুটিল চরিত্র। সে সুযোগসন্ধানী, স্বার্থপর এবং গায়ে-পড়া স্বভাবের। হিমি এবং মাসির কাছে মণির বদনাম করে, আবার মণির সামনে বেশ মুগ্ধ গদগদ ভাব দেখায়। এখানেই তার কুটিল চরিত্র ধরা পড়ে। আবার ভাব দেখায় যে সে যতীনকে দেখতে আসে, কিন্তু তা নয়, আসলে সে সুযোগ বুঝে যতীনের কাছ থেকে নিজের ছেলের চাকরির জন্য একটি সুপারিশের চিঠি লিখিয়ে নিতে চায়। সমাজে এমন সুযোগসন্ধানী মানুষের অভাব নেই।

নটীর পূজা নাটকে মালতী খুব সাধারণ নারী চরিত্র। তার সঙ্গে যে ছেলের বিয়ে ঠিক হয়েছিল, সেই ছেলে ভিক্ষু হয়েছে। তাই মালতী গ্রাম থেকে চলে আসে ভিক্ষুণী হতে। সে শ্রীমতীর কাছে আশ্রয় নেয়। সে ঠিক করে শ্রীমতির সঙ্গে থেকে গান শিখে, বৌদ্ধ দর্শনে জীবনযাপন করে মুক্তির পথ খুঁজে নেবে। সেই মুক্তির পথেই সে সেই ছেলেটির সঙ্গী হবে। মুক্তি আসার আগেই প্রাচীরের উপরদিয়ে ছেলেটিকে দেখে মালতী; আর থাকতে পারে না। তার প্রেমিক হৃদয় ছুঁটে যায় ছেলেটির কাছে। তাই মুক্তির পথের কাজ অসমাপ্ত রেখে সে মালতীর কাছে বিদায় নিয়ে ছেলেটির কাছে চলে যায়। নাটকে মালতীর মধ্য দিয়ে নারী মনের ভালোবাসার শক্তি প্রকাশ পেয়েছে।

নটীর পূজায় বাসবী রাজকন্যা। তার মনের গতিপথ খুব সাধারণ। গ্রাম্য মেয়ে মালতীকে দেখে তার কৌতুকবোধ হয়। মালতীর মুখের 'হাঁ গা' কথাটি নিয়ে হাসাহাসি করেন। তিনি অন্যের কথায় প্রভাবিত হন। মায়ের মুখে বৌদ্ধ ধর্মের মাহাত্ম শুনে তিনি সেই দিকে ঝোকেন। তিনি বলেন :

> বাহির থেকে সত্যকে যদি সহ্য করতে না পারি তা হলে ভিতর থেকে মিথ্যাকে সহ্য করতে হবে। শ্রীমতী আর-একবার গাও তো তোমার মন্ত্রটি, আমার মনের কাঁটাগুলোর ধার খয়ে যাক। (৯খ,পৃ.২৩০)

এভাবে বাসবী বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরক্ত হয়ে ওঠেন। শ্রীমতীর পূজায় যোগদানের জন্য তৈরি হন। এ সময় তার মা লোকেশ্বরী আবার বৌদ্ধধর্মকে ইতরের ধর্ম বলে গালি দেন এবং ক্ষত্রিয় ধর্মের প্রতি অনুরক্ত হতে বলেন, তখন আবার বাসবী বৌদ্ধ ধর্ম থেকে শ্রদ্ধা তুলে নেন। এবার তিনি শ্রীমতীর নটী-নৃত্যের সময় ওর গায়ে পুরস্কার ছুঁড়ে দেওয়ার জন্য গলায় হীরের হার পরেন। এই সময় মহারাজ বিম্বিসারের মৃত্যু সংবাদ এলে তিনি দিশেহারা হন। বাসবীর চরিত্র বিশ্লেষণ করে দেখা যায় তিনি নিজস্ব মতে বিশ্বাস রেখে চলতে পারেন নি। অন্যের কথা শুনে বার বার তার মতের বদল হয়েছে।

বাঁশরি নাটকে বাঁশরি কেন্দ্রীয় চরিত্র। "এই নাটকের একটিমাত্রই চরিত্র, যে একাই সঞ্চার করিয়াছে নাটকের মধ্যে যাহা-কিছু গতিবেগ, যাহা-কিছু নাটকীয়ত্ব– সে হইতেছে বাঁশরী সরকার।"[৪০] পুরো নাটকে বাঁশরি ভালোবাসা নিয়ে মানসিক দ্বন্দ্বে ভোগেন। তিনি বিলিতি য়ুনিভার্সিটিতে পাশ করা মেয়ে। রূপসী ঠিক নন, তবে আকৃতিতে শান-দেওয়া ইস্পাতের চাকচিক্য। যুবকদেরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করার শক্তি আছে তার। পরাজিত হলেই তিনি দিকবিদ্বিক জ্ঞান শূন্য হন এবং নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠায় শুরু করেন কর্মযজ্ঞ। এই নাটকে সেই রকমই একটি প্রচেষ্টার কথা প্রকাশ পেয়েছে। তার সঙ্গে অনেক দিনের প্রেমের সম্পর্ক রাজাবাহাদুর সোমশংকরের। কিন্তু সন্ন্যাসী পুরন্দরের কথামতো ব্রত পালনের জন্য সোমশংকর বিয়ে করতে চলেছেন সুষমাকে। এই পরাজয় বাঁশরি বিনা প্রতিরোধে মেনে নিতে রাজি নন। তাই সাহিত্যিক ক্ষিতীশকে নিয়ে যান এনগেজমেন্টের অনুষ্ঠানে। উদ্দেশ্য তিনটি। প্রথমতঃ ক্ষিতীশকে দেখে সোমশংকরের মনে ঈর্ষার উদ্যেগ ঘটানো। দ্বিতীয়তঃ তিনি সোমশংকরের দেওয়া উপহারগুলো সোমশংকরকে ফিরিয়ে দেন। এখানেও উদ্দেশ্য আছে, সেটি হলো সোমশংকরের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করে ফেলছে দেখে সোমশংকরের মনে পুরোনো প্রেম জাগ্রত হতে পারে এবং সুষমার সঙ্গে বিয়েটা নাকচ করে দিতে পারে, তৃতীয়তঃ বাঁশরিকে দেখে সুষমার মনে হতে পারে যে, সোমশংকরের প্রেমিকা বাঁশরি, তাই সোমশংকরকে বিয়ে করা ঠিক হচ্ছে না। এ হলো বাঁশরির চরিত্রের কৌশলের দিক। তার চরিত্রের আরেকটা দিক হলো, অকপটে সত্য বলা। যদিও বাঁশরি ক্ষিতীশকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করছেন, তবু তিনি ক্ষিতীসের লেখা সাহিত্য নিয়ে অপ্রিয় সত্যকথা বলতে ছাড়েন না। খুব আঁতে ঘা দিয়েই সত্য উচ্চারণ করেন। ক্ষিতীশকে বলেন :

> বানিয়ে বলতে গেলে আদালতের সাক্ষীর চেয়ে অনেক বেশি জানা দরকার হয়, মশায়। তখন কলেজে পড়া মুখস্ত করতে যখন শিখেছিলে রসাত্মক কাব্যই কাব্য; এখন সাবালক হয়েছ তবু ঐ কথাটা পুরিয়ে নিতে পারলে না যে, সত্যাত্মক বাক্য রসাত্মক হলেই তাকে বলে সাহিত্য। (১২খ,পৃ.২৬১)

এ সংলাপের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ শুধু বাঁশরির চরিত্রই আঁকেন নি, সঙ্গে সঙ্গে সমকালীন নব্য লেখকদের সাহিত্যবোধ সম্পর্কেও তীর্যক বাণী উচ্চারণ করেছেন। আবার রাখ-ঢাক রেখে বাঁশরি কথা বলেন না। নিজেদের সমাজ সম্পর্কে খুব সরাসরিই বলেন :

> দেখো সাহিত্যিক, আমাদের দলেও মানান-বেমানানের একটা নিক্তি আছে। চিটেগুড় মাখিয়ে কথাগুলোকে চটচটে করে তোলা এখানে চলতি নেই। ওটাতে ঘেন্না করে। (১২খ,পৃ.২৬২)

রবীন্দ্র-সাহিত্য এবং তথাকথিত বাস্তববাদী সাহিত্যিকদের সাহিত্যের বাস্তববোধের ইংগিত বাঁশরির সংলাপ দুটিতে স্পষ্টভাবেই পাওয়া যায়।

বাঁশরি মনের দিক দিয়ে খুব শক্ত মেয়ে। প্রেমিক অন্য মেয়েকে বিয়ে করছে দেখে তিনি হতাশ হয়ে ঘরের কোণে লুকিয়ে কাঁদেন নি, বরং নিজের অধিকার পাওয়ার চেষ্টা করেছেন। এখানে তার অনন্যতা। "নিজের দুঃখকে শিল্পবস্তু করিয়া তুলিতে পারিলে দুঃখের লাঘব হয়; তাহা অপরের মুখ দিয়া প্রকাশিত হওয়াতে তাহাকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখা চলে, শিল্পগত বেদনা যেন অপরেরই বেদনা; ব্যক্তিগত পরিচয়ের লজ্জা যেন তাহাতে থাকে না। বাঁশরীর মতো চাপা মেয়ে দুঃখ-প্রকাশের এই শিল্পপন্থাকে স্বীকার করিয়াছিল; তাহাতে মনের ভারও যেন লঘু হয়, আবার ব্যক্তিগত লজ্জাকেও যেন স্বীকার করিতে হয় না।"[৪১] শেষপর্যন্ত বাঁশরি আটকাতে পারলো না সোমশংকর এবং সুষমার এনগেজমেন্ট। তারপরও তিনি দমে গেলেন না। চলে গেলেন সোমশংকরের বাড়ি, সেখানে তখন বিয়ের জন্য গহনা আর কাপড় দেখছেন সোমশংকর। এবারও থামলেন না বাঁশরি– ফিরে এলেন না, বরং সরাসরি তিনি সোমশংকরের সঙ্গে কথা বলতে চাইলেন। সোমশংকরকে জানালেন সুষমা সোমশংকরকে ভালোবাসে না, ভালোবাসা ছাড়া সংসার হয় না। সোমশংকর জানান, তিনি সে কথা জানেন। এরপর তাদের কথোপোকথন এ রকম–

> সোমশংকর। ওর একটি ব্রত আছে। ওর জীবনে সমস্ত দরকার তাই নিয়ে, তাকে সাধ্যমত সার্থক করা আমারও ব্রত।
>
> বাঁশরি। ওর ব্রত আগে, তারই পশ্চাতে তোমার– পুরুষের মতো শোনাচ্ছে না, এ কথা ক্ষত্রিয়ের মতো নয়ই। এতবড়ো পুরুষকে মন্ত্র পড়িয়েছে ঐ সন্ন্যাসী। বুদ্ধিকে দিয়েছে ঘোলা করে, দৃষ্টিকে দিয়েছে চাপা। শুনলুম সব, ভালো হল। গেল আমার শ্রদ্ধা ভেঙ্গে, গেল আমার বন্ধন ছিঁড়ে। বয়স্ক শিশুকে মানুষ করবার কাজ আমার নয়, সে-কাজের ভার সম্পূর্ণ দিলেম ছেড়ে ঐ মেয়ের হাতে। (১২খ,পৃ.২৮২)

এরপর পুরন্দর সন্ন্যাসীকে বাঁশরি বলেন :

> মোহ চাই, চাই; সন্ন্যাসী, মোহ নইলে সৃষ্টি কিসের। তোমার মোহ ব্রত নিয়ে– সেই ব্রতের টানে তুমি মানুষের মনগুলো নিয়ে কেটে ছিঁড়ে জোড়াতাড়া দিতে বসেছ– বুঝতেই পারছ না তারা সজীব পদার্থ, তোমার প্ল্যানের মধ্যে খাপ-খাওয়াবার জন্য তৈরি হয় নি। আমাদের মোহ সুন্দর, আর ভয়ংকর তোমাদের মোহ। (১২খ,পৃ.২৮৩)

সুষমাকে বলেন :

> মরিয়া হয়ে মেয়েরা চিতার আগুনে মরেছে অনেক, ভেবেছে তাতেই পরমার্থ। তেমনি করেই নিজের হাতে নিজের ভাগ্যে আগুন লাগিয়ে দিনে দিনে মরতে চাস জ্বলে জ্বলে? চাস নে তুই ভালোবাসা, কিন্তু যে-মেয়ে চায়, পাষাণ সে করে নি আপন নারীর প্রাণ, কেন কেড়ে নিতে এলি তার চিরজীবনের আনন্দ। এই আমি আজ বলে দিলুম তোকে, ঘোড়ায় চড়িস, শিকার করিস, সন্ন্যাসীর কাছে মন্ত্র নিস, তবু তুই পুরুষ নোস। আইডিয়ার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে তোর দিন কাটবে না গো, তোর রাত বিছিয়ে দেবে কাঁটার শয়ন। (১২খ,পৃ.২৮৩)

এতো কথা বলেও বিয়ে আটকাতে পারেন না বাঁশরি। বরং পূর্বের চেয়ে আরো এগিয়ে আসে বিয়ের তারিখ। এই রকম সময় ক্ষিতীশ এসে বিয়ে করতে চায় বাঁশরিকে। বাঁশরি ঝোঁকের মাথায় রাজি হন। এমন সময় বিয়ের নিমন্ত্রণ দিতে আসেন সোমশংকর। আবার তাদের নিজেদের আবেগ নিয়ে কথোপোকথন হয় –

> বাঁশরি। সত্যি করে বলো, আজও কি আমাকে সেদিনের মতোই ততখানি ভালোবাস।
>
> সোমশংকর। ততখানিই।
>
> বাঁশরি। আর কিছুই চাই নে আমি। সুষমাকে নিয়ে পূর্ণ হোক তোমার ব্রত, তাকে ঈর্ষা করব না। (১২খ,পৃ.২৯১)

এরপর চিঠি দিয়ে ক্ষিতীশকে বিয়ের কথা নিষেধ করে দেন। আর পুরন্দরকে বলেন :

> যে পারে ঐ ক্ষত্রিয়কে শক্তি দিতে এমন কেবল একটি মেয়ে আছে এ-সংসারে। ... আজ অভয় দিচ্ছে সে। আপন অন্তরের মধ্যে সে আপনি পেয়েছে দীক্ষা। তার বন্ধন ঘুচেছে, সে আর বাঁধবে না। (১২খ,পৃ.২৯৩)

আর পুরন্দর বলেন :

> তবে আজ যাবার দিনে নিঃসংকোচে তারই হাতে রেখে গেলেম সোমশংকরের দুর্গম পথের পাথেয়। (১২খ,পৃ.২৯৩)

– এভাবেই শেষ হয় নাটক। ভালোবাসার স্বীকৃতি পেয়েই বাঁশরি সম্পূর্ণরূপে শান্ত হন। *শেষের কবিতার* চেয়ে রবীন্দ্রনাথ একধাপ এগিয়েছেন এখানে। সোমশংকরের সঙ্গে বিয়ে না হলেও সোমশংকরের ভালোবাসা যে বাঁশরির প্রতিই এ কথা জানবার পর বাঁশরি ক্ষিতীশকে আর বিয়ে করেন নি। বরং ভেঙ্গে দিয়েছেন বিয়ের প্রতিশ্রুতি। একা থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এও ভালোবাসার প্রতি এক ব্রত। ক্ষিতীশের প্রতি কি ভালোবাসা নেই? আছে। কিন্তু তা ঘড়ায় তোলা জলেরই মতো। বাঁশরি এই ঘড়ার জলের মোহ ত্যাগ করে ধরাছোঁয়ার বাইরের সমুদ্রের জলরাশিকে অনুভব করার উদারতা অর্জন করেছেন। "বাঁশরী সোমশংকরকে পাইল হৃদয়ের মধ্যে প্রেমের একটি আত্মগত আদর্শের মধ্যে ; পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে প্রতিদিনের প্রেমসঙ্গের কামনা অবলীলায় সে প্রত্যাখ্যান করিল।"[৪২]– এখানে

'পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে প্রেমসঙ্গ' প্রত্যাখান করলেন বাঁশরি। নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন, দাম্পত্য জীবনে পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে প্রেমসঙ্গ সম্ভব। নাটকে পুরন্দর ভালোবাসা আর প্রেমের যে কাল্পনিক সূক্ষ্ম পার্থক্য দেখিয়েছেন, তারই উপর নাটকের পরিণতি ঘটেছে। পুরন্দের মতে–

> কবিরা যাকে বলে ভালোবাসা সেইটাতেই বন্ধন। তাতে একজন মানুষকেই আসক্তির দ্বারা ঘিরে নিবিড় স্বাতন্ত্র্যে অতিকৃত করে। প্রকৃতি রঙিন মদ ঢেলে দেয় দেহের পাত্রে, তাতে যে মাতলামি তীব্র হয়ে ওঠে তাতে অপ্রমত্ত সত্যবোধের চেয়ে বেশি সত্য বলে ভুল হয়। খাঁচাকে পাখি ভালোবাসে যদি তাকে আফিমের নেশার বশ করা যায়। সংসারের যত দুঃখ, যত বিরোধ, যত বিকৃতি সেই মায়া নিয়ে যাতে শিকলকে করে লোভনীয়। ... প্রেমে মুক্তি, ভালোবাসায় বন্ধন। (১২খ,পৃ.২৭৮)

অর্থাৎ দাম্পত্য জীবনের ভালোবাসায় মহৎ আদর্শ থাকে না বলে পুরন্দর মনে করেছেন। এ জন্য ভালোবাসা নেই এমন দুটি নারী-পুরুষের মধ্যে বিয়ে ঘটিয়েছেন তিনি। ড. সাধনকুমার ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন, "এই নাটকে রবীন্দ্রনাথ ভালোবাসাকে প্রেমের বীর্যের মধ্যে মুক্তি দিয়েছেন এবং কর্তব্যের 'আইডিয়া'কে প্রেমের আনন্দে পূর্ণ করে মধুর করে তুলেছেন। দেখিয়েছেন– কর্তব্যবিমুখ স্বার্থপর ভালোবাসা যেমন অসম্পূর্ণ, তেমনি প্রেমহীন কর্তব্যও অপূর্ণ।"[৪৩] প্রভাতকুমারের মতে, এ হলো উচ্চ আদর্শবাদ। তিনি বলেছেন, "বাঁশরীর আখ্যান তীব্র বিদ্বেষ ও ঘাত প্রতিঘাত দিয়া আরম্ভ, ও উচ্চ আদর্শবাদের মধ্যে তাহার সমাপ্তি।"[৪৪]– এর বিরোধীতা করেছেন উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। তিনি বলেছেন, "ব্যক্তিগত দাম্পত্য-প্রেমকে প্রবৃত্তি-পঙ্কিল মনে করা ও প্রেমহীন বিবাহের আদর্শ খাড়া করা নিতান্তই কাল্পনিক ও অবান্তর। বিবাহবন্ধনের মধ্যে আসিলেই প্রেমের জাতিচ্যুতি ঘটিল আর বাহিরে থাকিলেই তাহার কৌলিন্য বজায় রহিল– ইহা যুক্তিহীন ও অর্থহীন।"[৪৫] উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের এ মন্তব্য গ্রহণযোগ্য। বিবাহিত জীবনের ভালোবাসা কেন বিশ্বপ্রেমের অন্তরায় হবে তার কোনো যুক্তি নাটকে নেই। দাম্পত্য-ভালোবাসায় প্রেমের মুক্তি নেই কেন তা-ও বোঝা যায় না। সংসারের সীমার মধ্যে অসীমকে ধারণ করাই তো আধুনিক জীবন বোধ। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন–

> আমার তো মনে হয়, আমার কাব্যরচনার এই একটিমাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে, সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন-সাধনের পালা।[৪৬]

–তাই বিবাহে প্রেম থাকবে না এ বোধ অবশ্যই ভিত্তিহীন। প্রেমের জন্য বাঁশরি নিজের জীবনে ত্যাগ স্বীকার করেছেন। প্রেমিক মানুষ হিসেবে এই মানস প্রশংসার দাবীদার কিন্তু রক্তমাংসের বাস্তব মানুষের পক্ষে এ ত্যাগ প্রশ্নের সম্মুখীন করে। বাঁশরি যাকে ভালোবাসলেন তার সঙ্গে সংসার করতে পারলেন না– এতো সাংসারিক পরাজয়ই। তবে সংসারের সীমার বাইরে এক আধ্যাত্মিক জয়ে জয়ী হয়েছেন তিনি। "ত্যাগের মধ্য দিয়াই বাঁশরির ভালোবাসা উন্নীত হইল প্রেমে।"[৪৭] – এ হলো পুরন্দরের উল্লিখিত প্রেম। কিন্তু বিশ্বজনীন প্রেমে সত্যিই

কি তিনি উন্নীত হয়েছেন? ক্ষিতীশের সঙ্গে তিনি যে আচরণ করেছেন, তা স্বার্থপরোচিত এবং নিষ্ঠুর। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ক্ষিতীশকে বাঁশরির "মনের দোসর"[৪৮] বলেছেন। কিন্তু বাঁশরি কখনোই বন্ধুর মতো করে ক্ষিতীশের সঙ্গে মনের কথা বলেন নি, বরং নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করেছেন ক্ষিতীশকে। ক্ষিতীশকে অবলম্বন করে বাঁশরি নিজের মানস-দীপ্তি প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ক্ষিতীশের আবেগ নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছেন তিনি। ক্ষিতীশকে বিয়ে করবেন বলে কথা দিয়েছেন, এরপর আবার বিয়ে করবেন না বলে চিঠি দিয়েছেন– এতে ক্ষিতীশের মনের অবস্থা কী হবে একবারও ভেবে দেখেন নি। একজন মানুষের প্রেম নিয়ে ধনীঘরের মেয়ের এ এক নিষ্ঠুর বিলাসিতা। তাই নিজের প্রেমের ব্যাপারে তাকে খুব উদার মনে হলেও, আদর্শবাদী মনে হলেও তাকে ঠিক 'প্রেমিক-মানব' বলা যায় না। তবে এ কথা ঠিক যে যেহেতু বাঁশরি ক্ষিতীশকে ভালোবাসেন না, তাই তাকে বিয়ে না করে সততার পরিচয়ই দিয়েছেন। এ কারণে বাঁশরির উৎকর্ষ এখানেই যে, তিনি যাকে ভালোবাসেন না, তাকে বিয়ে করে ফাঁকির সংসার গড়েন নি। বরং যাকে ভালোবাসেন, সংসার না গড়লেও তার ব্রতের দায়িত্ব নিতে চেয়েছেন। এবং ভালোবাসার স্মৃতিকে অন্তরে লালন করে জীবন কাটাতে চেয়েছেন।

জীবনযাপনে এবং সিদ্ধান্তে আধুনিক বোধ সম্পন্ন হলেও বাঁশরির মধ্যে কিছু সীমাবদ্ধতা দেখা যায়। তিনি মনে করেন, আর্টিস্টের কাজ মেয়েদের দিয়ে হয় না। ক্ষিতীশ যখন বলেছেন, বাঁশরির প্রকাশ করার ক্ষমতা আছে, সেও আর্টিস্ট, তার উপমা-উৎপ্রেক্ষা হীরেমুক্তোর মতো, কথায় কথায় শক্তির ছড়াছড়ি। উত্তরে বাঁশরি বলেছেন :

> আমি যে মেয়ে, আমার প্রকাশ ব্যক্তিগত। বলবার লোককে প্রত্যক্ষ পেলে তবেই বলতে পারি। কেউ নেই তবু বলা– সেই তো চিরকালের। আমাদের বলা নগদ বিদায়, হাতে হাতে, দিনে দিনে। ঘরে ঘরে মুহূর্তে মুহূর্তে সেগুলো ওঠে আর মেলায়। (১২খ,পৃ.২৭৭)

এখানে শুধু নিজের কথা বলেন নি, 'আমাদের' শব্দটি প্রয়োগ করে সমস্ত মেয়েজাতিকেই সৃষ্টি-শক্তিহীন বলেছেন। এছাড়া আরেক জায়গায় সুষমাকে বলেছেন, 'তবু তুই পুরুষ নোস।'– তারমানে পুরুষ হলে ভালোবাসাহীন আইডিয়ার সঙ্গে সংসার করতে পারতো, কিন্তু মেয়ে আদর্শকে আকড়ে থাকতে পারে না, তার ভালোবাসা দরকার হয়, সে নির্ভরশীল। অর্থাৎ তার মতে, মেয়েরা পুরুষের মতো শক্ত মনের নয়– আদর্শে জীবন চলবে না। নারীর মানসিক দিক সম্পর্কে এই সীমাবদ্ধতা তাকে 'আধুনিক নারী'তে পরিণত করতে পারে নি। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের নিজের এ সম্পর্কে নির্দিষ্ট ধারণা ছিলো। তিনি শ্রীমতী নির্ঝরিণী সরকারকে চিঠিতে লিখেছেন–

> আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের কবিত্বশক্তি থাকিলেও তাহার পূর্ণ বিকাশ ঘটিতে পারে না। তাঁহারা অন্তঃপুরে যে পারিবারিক গণ্ডিটুকুর মধ্যে বদ্ধ থাকেন সেখানে জীবনের অভিজ্ঞতা সঙ্কীর্ণ এবং সেখানে কল্পনাবৃত্তি প্রসারতা লাভ করিতে পারেনা। তাহা ছাড়া নানা উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যরচনার সহিত পরিচয়ের

> দ্বারা চিত্তবৃত্তির যে স্ফূর্তি ঘটে আমাদের মেয়েদের সেসুযোগও অতি অল্প। এই জন্য আমাদের লেখিকাদের কবিতা সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে দুর্ব্বলভাবে বিচরণ করে– তাহার মধ্যে সরলতা ও কোমলতা থাকে কিন্তু যথেষ্ট শক্তি থাকেনা। এই জন্য সাহিত্যে এইরূপ কবিতা কোনোমতেই নিত্যস্থান লাভ করে না। ... কবির কবিত্বশক্তির অভাবে এরূপ ঘটে তাহা নহে– জগতের সঙ্গে মানবজীবনের সঙ্গে তাঁহাদের যোগ অতি সামান্য বলিয়াই তাঁহাদের কবিত্ব কিছুদূর পর্য্যন্ত অঙ্কুরিত হইয়া আর বেশি বাড়িতে পায় না।[৪৯]

তবে শেষ পর্যন্ত বাঁশরি আদর্শে স্থির হতে পেরেছেন। অবশ্য তাকে জানতে হয়েছে যে, তার প্রেমপুরুষ সোমশংকর সম্পূর্ণরূপে তাকে ভালোবাসেন। বলা সংগত যে, তিনি ভালোবাসায় বিশ্বাস স্থাপন করে স্থির হয়েছেন। নাটকের নাম প্রথমে রবীন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন *ললাটের লিখন*। সবগুলো চরিত্রের ললাটের লিখনকে মেনে নেওয়ার বিষয়টি নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথ চিন্তা করেছিলেন, এরপর তিনি নিজেই ভাবনার পরিবর্তন ঘটিয়েছেন নাটকের নাম দিয়েছেন *বাঁশরি*। বাঁশরি চরিত্রটি শেষ পর্যন্ত কিছু নির্দিষ্ট বোধকে ধারণ করেছে। প্রথমত, তার প্রেম দেহাতীত হয়েছে, সোমশংকরের সঙ্গে বিয়ে না হলেও তারা একে-অপরের প্রতি প্রেমাসক্ত এবং এ প্রেমে কেউ কাউকে বন্ধনযুক্ত করবে না। দ্বিতীয়ত, তিনি নিজের এবং মানুষের প্রতি কর্তব্যনিষ্ঠ হয়েছেন। এ জন্য ভালোবাসাহীন সংসার বাধা থেকে মুক্তি দিয়েছেন ক্ষিতীশকে, ব্রত পালনের জন্য মুক্তি দিয়েছেন সোমশংকরকে, পুরন্দরের দেওয়া গুরুভারও মাথায় তুলে নিয়েছেন। সর্বোপরি বলা যায় বাঁশরি অনেক সংগ্রাম করে শেষ পর্যন্ত ত্যাগেই সুখ খুজে নিয়েছেন। যে বোধ বাঙালি নারীর চিরন্তন বোধ। বলা সংগত যে, বাঁশরি বাঙালি নারীর ত্যাগত্ব থেকে মুক্ত হতে পারলেন না। গন্ডীবদ্ধ বাঙালি নারীই হলেন।

শ্যামা নাটকে শ্যামা পুরসুন্দরী। উত্তীয় অনেক দিন আগে থেকে তাকে ভালোবাসে। কিন্তু শ্যামার ভালো লাগে না উত্তীয়কে। একদিন নিরাপরাধ বিদেশি বণিক বজ্রসেনকে প্রহরীরা অন্যায়ভাবে কারাগারে নিয়ে যায় শ্যামার সামনে দিয়ে। কারণ রাজকোষ চুরি হয়েছে, একজনকে অবশ্যই ধরতে হবে। প্রহরীরা খুঁজতে খুঁজতে বজ্রসেনকে পেয়েছে। এক দেখাতেই বজ্রসেনকে শ্যামার ভালোলাগে। বজ্রসেনকে বাঁচানোর জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেন তিনি। অন্য কোনো মানুষকে চোর হিসেবে ধরিয়ে দিলে বজ্রসেন বেঁচে যান। তাই তিনি একজন মানুষ খুঁজতে থাকেন। শ্যামার অন্তরের হাহাকার দেখে উত্তীয়র প্রেমপূর্ণ হৃদয়ও যন্ত্রণাবিদ্ধ হয়। তাই উত্তীয় নিজে চোর হিসেবে ধরা দিয়ে বজ্রসেনকে বাঁচানোর প্রস্তাব দেন শ্যামার কাছে। এতে শ্যামার মন উত্তীয়র জন্য একটুও কষ্ট পায় না, বরং বলেন:

> রাজ-অঙ্গুরী মম করিলাম দান,
> তোমারে দিলাম মোর শেষ সম্মান। (১২খ,পৃ.১৯৪)

একজনের রূপে মুগ্ধ হয়ে, তাকে ভালোবেসে অন্যজনকে ফাঁসিতে ঝুলালেন শ্যামা। এটা মানুষের প্রকৃত প্রেমার্ত মন নয়, বরং স্বার্থপরতা এবং নিষ্ঠুরতা। শ্যামার রূপজমোহ তাকে পাপকাজে ঠেলে দিলো। এছাড়া শ্যামা উত্তীয়ের ভালোবাসার অন্যায় সুযোগও নিয়েছেন। একজনের জীবনের বিনিময়ে অন্যজনের জীবন রক্ষা চরম অন্যায়। এই অন্যায় খণ্ডনের জন্য শেষ মুহূর্তে অবশ্য শ্যামা ছুটে যান কারাগারে, ছেড়ে দিতে বলেন উত্তীয়কে কিন্তু তখন আর তার কথা কেউ শোনে না। এরপর বজ্রসেনের মুক্তির পর তিনি বজ্রসেনের সঙ্গে প্রেমের স্রোতে ভাসেন। "পাপের পথে প্রেমের সাফল্য চেয়েছিল এই দুর্ভাগ্যবতী সাধিকা।"[৫০] কিন্তু বজ্রসেন উত্তীয়ের মৃত্যুর কথা জানার পর শ্যামাকে ধিক্কার দিয়ে দূরে সরিয়ে দেন। প্রেমার্ত শ্যামা আর্তি জানান তাকে দয়া করার জন্য। বলেন :

তোমার কাছে দোষ করি নাই,
দোষ করি নাই।
দোষী আমি বিধাতার পায়ে,
তিনি করিবেন রোষ–
সহিব নীরবে।
তুমি যদি না করো দয়া
সবে না, সবে না, সবে না।। (১২খ,পৃ.২০০)

প্রেমের স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে ওঠেন শ্যামা। বজ্রসেনের শারীরিক আঘাতেও তার প্রেম অবিচল থাকে। "রবীন্দ্রনাথ তাকে নিষ্পাপ করে আঁকতে চাননি; চাইলে নাটক অর্থহীন হয়ে যেত। তিনি শুধু দেখাতে চেয়েছেন শ্যামার পাপ যত বড়োই হোক, তার প্রেম আরো বড়ো।"[৫১] কিন্তু বজ্রসেন তাকে ক্ষমা করতে পারেন না। শেষ পর্যন্ত শ্যামা বজ্রসেনকে প্রণাম করে দূরে চলে যান। এভাবে তার বিরহী জীবনে পদার্পণ ঘটে। এভাবেই ভুল এবং নিষ্ঠুরতার প্রায়শ্চিত্ত করেন তিনি। "এখানে কোন আধ্যাত্মিক প্রভা এসে মানব-অস্তিত্বের মালিন্যকে ধৌত করে নি– পাপপুণ্য, ভালো ও মন্দ নিয়ে মানুষের যে নিয়তিতাড়িত বিবেকনিয়ন্ত্রিত অমোঘ ট্র্যাজিক ভাগ্য তাই শ্যামায় রূপায়িত হয়েছে।"[৫২]

রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত *নেপালের সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্য* থেকে *শ্যামার* কাহিনি নিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তবে পরিবর্তন ঘটেছে অনেক। বৌদ্ধকাহিনিতে বজ্রসেন তক্ষশীলার বণিকপুত্র। কাশীতে ঘোড়া বিক্রি করতে যাচ্ছেন, পথে দস্যু দ্বারা আক্রান্ত হন। সেখান থেকে পালিয়ে একটি ভগ্নমন্দিরে আশ্রয় নেন। সেই রাতে রাজপ্রাসাদে চুরি হয়। সন্দেহবশত প্রহরীরা বজ্রসেনকে গ্রেফতার করে এবং মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হলে তাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হয়। নিয়ে যাওয়ার সময় বারাঙ্গনা শ্যামা তাকে দেখেন এবং সহচরীকে দিয়ে কোটালের কাছে বলে পাঠান বজ্রসেনের পরিবর্তে অন্য ব্যক্তির প্রাণ নাশ করা হোক বিনিময়ে স্বর্ণমুদ্র দেবে। প্রহরী এবং কোটাল সম্মত হয়।

এদিকে উত্তীয় শ্যামার রূপমুগ্ধ। খাদ্যসামগ্রী দিয়ে শ্যামা তাকেই পাঠালেন বজ্রসেনের কাছে। শ্যামার নির্দেশে বজ্রসেনকে মুক্তি দিয়ে উত্তীয়ের প্রাণনাশ করলো কোটাল। এরপর শ্যামা আর বজ্রসেন সুখে বাস করতে শুরু করলো। কিন্তু বজ্রসেনের মনে সংশয় হলো শ্যামা কোনো দিন তাকেও প্রাণদণ্ড দিতে পারে, তাই সে শ্যামাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে মৃতদেহ জলাশয়ে নিক্ষেপ করলো এবং ফিরে গেলো তক্ষশীলায়। এরপর শ্যামার সহচরী শ্যামাকে তুলে এনে সেবাদ্বারা বাঁচিয়ে তুললো। শ্যামা আবার বজ্রসেনের কাছে প্রেমের বার্তা পাঠালেন। বজ্রসেন তখন দূরদেশে পলায়ন করলো। – বৌদ্ধ কাহিনি এখানেই শেষ। বৌদ্ধকাহিনিতে শ্যামা উত্তীয়ের সঙ্গে ছলনা করে এবং প্রতারিত করে উত্তীয়ের প্রাণদণ্ড দেয়। নাটকে উত্তীয় নিজে প্রাণবিসর্জনের কথা শ্যামাকে বলে। বৌদ্ধ কাহিনিতে শ্যামার কোনো অনুশোচনা ঘটে না, নাটকে শ্যামার অনুশোচনা হয় এবং তিনি উত্তীয়কে বাঁচানোর জন্য কারাগারে ছুঁটে যান। অর্থাৎ নাটকে রবীন্দ্রনাথ শ্যামাকে মানবিক রূপ দিয়েছেন। "উত্তীয়ের প্রেম কামগন্ধহীন না-হলেও তা পারিজাগতগন্ধবহ। এই প্রেমের আলোয় আমরা শুধু উত্তীয়কে চিনি না, শ্যামাকেও চিনি। উত্তীয়ের হৃদয়ে এ অপূর্ব, প্রায় অপার্থিব সুন্দর প্রেম তা নিরালম্বভাবে জাগেনি, শ্যামাই জাগিয়েছিল। এমন প্রেম কোনো নারী শুধু রূপ দিয়ে জাগাতে পারে না, সমগ্র ব্যক্তিস্বরূপ দিয়েই পারে। সে-ব্যক্তিস্বরূপ জাতকের শ্যামার ছিল না, রবীন্দ্রনাথের শ্যামার ছিল।"[৫৩] এই ব্যক্তিত্বময়ী নারী প্রেমের কারণে ভুল করলেন। তাকে আমরা ক্ষমা করতে পারি না, তবে তার জন্য আমাদের দুঃখ হয়।

মুক্তির উপায় নাটকে পুষ্প কেন্দ্রীয় চরিত্র। তিনি এম.এ. পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হওয়া মেয়ে; সংস্কারমুক্ত শিক্ষিত এবং বুদ্ধিমতী। তার দূরসম্পর্কীয় বোন হৈমবতীর স্বামী ফকিরের সংসারে বৈরাগ্য এসেছে। সে গুরুর শিষ্য হয়ে ঘরের সমস্ত সোনা-দানা টাকা-পয়সা গুরুর পায়ে ঢালছে, অন্যদিকে স্ত্রী-সন্তানকেও পর করে দিচ্ছে। এই রকম সময়ে ফকিরকে সংসারমুখী করার জন্য হাল ধরেন পুষ্প। গুরুর শিষ্য হওয়ার ছল করে ফকিরের সঙ্গে যান গুরুধামে। সেখানে গুরু তার ঝোলায় সকল শিষ্যদের দেওয়া সোনা ছাই বানানোর জন্য নিয়েছে। গুরুচরণে দেওয়ার জন্য পুষ্প সঙ্গে নিয়ে এসেছে সোনার হার। বেশ ওজনদার হারগাছা নিয়ে গুরু বেশ তৃপ্ত হয়। ফকির বলে, প্রকারন্তরে এ দান তারই। তখন এ সম্পর্কে পুষ্প বলেন, ফকিরের বাবা বিশ্বেশ্বরবাবু পুলিসে খবর দিয়েছেন, তাঁর হার চুরি গেছে। খানাতল্লাসি করতে এখনই আসছে মখলুগঞ্জের বড়ো দারোগা। এ কথা শুনে গুরু ভীত হয়ে ওঠে। পুষ্প এবার বলেন :

> কোনো ভয় নেই, এখখনি সোনাগুলোকে ভস্ম করে ফেলুন, পুলিশের উপর সেটা প্রকাণ্ড একটা কানমলা হবে। (১৩খ,পৃ.২২৬)

– এবার বোঝা যায় গুরু সোনা ভস্ম বানাতে পারে না, বরং যে সোনাগুলো সে প্রতিদিন নিয়েছে, সেগুলো সব তারই কাছে আছে। গুরু তখন পুলিশের ভয়ে সোনা রেখে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। আর পুষ্প যার যার সোনা তাকে তাকে দিয়ে দেন। "সে বিদুষী, ভ্রান্তধারণামুক্ত, বাস্তবদৃষ্টিসম্পন্ন, তাই সে জালিয়াতির মুখোশ খুলে দিতে সক্ষম হয়েছে।"[৫৪] কিন্তু ফকিরের বিশ্বাস তখনো ভঙ্গ হয় না, সে গুরুর পথেই চলার জন্য রাস্তায় বেড়িয়ে যায়। পুষ্প এবারও দমে যান না। নতুন করে কৌশল অবলম্বন করেন। তার কাজের সঙ্গে যোগ হয় ষষ্ঠীচরণের নাতি মাখনকেও সংসারে ফিরিয়ে আনা। মাখন সংসারে দুই স্ত্রী আর ছেলেমেয়ে রেখে পলাতক হয়েছে সাত বছর। এদের দুজনকে ধরার জন্য পুষ্প একটা মিথ্যা বিজ্ঞাপন দেন কাগজে। বিজ্ঞাপনে প্রাইভেট সিনেমায় সেতুবন্ধ নাটকের জন্য লোক চাই, হনুমানের পার্ট অভিনয় করবে। হনুমানের পার্ট করার জন্য মাখন এসে উপস্থিত হয়। মাখনের কাছেই পুষ্প খবর পান একজন ব্রহ্মচারী উপোস করতে করতে মৃতপ্রায় হয়ে আছে। এবার মাখনকে দিয়ে কলা পাঠিয়ে দেন ব্রহ্মচারী বেশী ফকিরকে। মাখনকে সেখান থেকে সরিয়ে মাখনের দুই স্ত্রীকে পাঠিয়ে দেন ফকিরের কাছে এবং বলে দেন ওইটিই মাখন, চেহারা পরিবর্তন করে এসেছে। দুই স্ত্রী এসে নাস্তানাবুদ করে ফকিরকে। ঠিক তখনই মাখনকে নিয়ে হাজির হন পুষ্প। স্ত্রীরা মাখনকে চিনতে পেরে ফকিরকে ছেড়ে দেয়। পুষ্প বুঝিয়ে দেয় এতো নাকাল হওয়ার চেয়ে নিজের স্ত্রী হৈমই নিরাপদ। ফকিরও সে কথা বুঝতে পারে এবং ঘরে ফিরে আসে। এভাবে পুষ্প কুসংস্কারের ভিতর থেকে দুটি ছেলেকে উদ্ধার করেন। দেখা যায়, পুষ্প চরিত্রটি আধুনিক-বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন-দৃঢ়চেতা। শেষজীবনে রবীন্দ্রনাথ মেয়েদের চরিত্রে যে আধুনিকতা চিন্তা করেছেন, তারই মানস-প্রতিমা পুষ্পমালা। "পুষ্পমালা হইতেছে লাবণ্য, কেতকী, সরলাদের সমগোষ্ঠীগত নব্যশিক্ষিতা নারী– এমন কি ইহারা গোরা-র নারীও নহে। কবিজীবনের পরিবেশের পরিবর্তন হইয়াছে– এখনকার নায়িকাদের অনেকেই ধনীকন্যা, ড্রয়িংরুম-বিহারিণী, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারিণী এমন কি বিলাৎফেরত রমণী।"[৫৫] – এই রকম নারী পুষ্পমালাকে গ্রামীণ জীবনে ঠিক খাপখাওয়ানো যায় না, তবু গ্রামীনজীবনের কুসংস্কারকে ভাঙ্গার জন্য পুষ্পমালাকেই প্রয়োজন।

মুক্তির উপায় নাটকে হৈমবতীও অতি সাধারণ চরিত্র। বাবার আদরের মেয়ে। বিয়েও হয় অবস্থাপন্ন শিক্ষিত ফকিরের সঙ্গে। ফকির সংসারে থেকেও সংসারবিবাগী। গুরুর শিষ্য হয়ে গুরুর পায়ে টাকা ঢালে। সে টাকা জোর করে নেয় স্ত্রী হৈমবতীর কাছ থেকে। হৈমবতী বুঝতে পারেন যে এ টাকা একেবারে জলে যাচ্ছে, কিন্তু স্বামীকে কাছে পাওয়ার জন্য এবং শান্ত রাখার জন্য বিনাবাক্যব্যয়েই টাকা দিয়ে দেন। তবে, স্বামীকে ফেরানোর জন্য নিজে কোনো উদ্যোগ নেন না। ভাগ্যকে দোষ দেন। বাঙালি সাধারণ স্ত্রী চরিত্রের বৈশিষ্ট্যই হৈমবতীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

যোগাযোগ নাটকের মোতির মা সমাজের অতি সাধারণ শ্রেণিভূক্ত নারী। প্রতিদিনের ঘরকন্নার নিয়ম তার কাছে স্বাভাবিকবোধক। নিজেকে স্বামীর দাসী ভাবতে তার কোনো কুণ্ঠা নেই, বরং নারীজন্মের নিয়তি বলেই মেনে নেন। তবে তার ভিতরে আশ্চর্য রকম বুদ্ধিদীপ্ততা আছে। তাই ভাসুর মধুসূদন সম্পর্কে কুমুদিনীকে বলেছেন :

> কাঠুরে গাছকে কাটতেই জানে, পায় শুধু চ্যালা কাঠ। মালী গাছকে রাখতে জানে, পায় সে ফুল। তুমি পড়েছ কাঠুরের হাতে, ও ব্যাবসাদার। (১৮খ,পৃ.১৭৭)

সাংসারিক বুদ্ধিতেও তার বুদ্ধিমত্তা সূক্ষ্ম। ভাসুর মধুসূদন যতই তাদের ভয় দেখান না কেন, তিনি মধুসূদনের ব্যবসায়ী বুদ্ধির খোঁজ ভালোভাবেই রাখেন। এজন্যই জানেন যে, সংসার থেকে মধুসূদন তাকে সরাবে না, কারণ তিনি খুব সস্তায় সংসার আগলে রেখেছেন। আর এ জন্যই তিনি সংসারে বিভিন্ন অধিকার আদায় করে নিতে পারেন কৌশলে। শুধু সাংসারিক বুদ্ধি নয়, মনোস্তাত্বিক বুদ্ধিও তার প্রবল। মধুসূদনের কুমুদিনীর মন পাওয়া সম্পর্কে তার মতামত প্রশংসনীয়। তিনি বলেন :

> ঐশ্বর্য পেতে বড়োঠাকুরের কতদিন সময় লাগল, মন পেতে দুদিন সবুর সইবে না? ধনলক্ষ্মীর দ্বারে হাঁটাহাঁটি করে মরতে হয়েছে, এ লক্ষ্মীর কাছে হাত পাততে হবে না? এ কি লুঠ করা সম্পত্তি যে গায়ের জোর দেখালেই কেড়ে নেওয়া যাবে?(১৮খ,পৃ.১৮৮)

এখানে তার একটি সহানুভূতিপূর্ণ মনেরও পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি উদার মনের মানুষ। কুমুদিনী সংসারের কর্ত্রী হয়ে এলেও তিনি কুমুদিনীকে ঈর্ষা করেন নি। নিজের যেটুকু অধিকার তাই তার কাছে প্রয়োজনীয়, অন্যের অধিকার নিজের আয়ত্তে আনার কোনো দূরাভিসন্ধি তার মধ্যে নেই। এতোদিনের কর্তৃত্বভার কুমুদিনীর হাতে চলে যাবে বলেও তিনি কষ্ট পান নি, বরং নির্দ্বির্ধায় বলেছেন :

> সংসার-খরচের যে টাকা আমার কাছে থাকে সে তো তোমারই টাকা। আজ থেকে আমি যে তোমারই নিমক খাচ্ছি। (১৮খ,পৃ.১৮৫)

এদিক দিয়ে তিনি কিছুটা অতিমানবীয় নারীতে পরিণত হয়েছেন। কারণ, মানুষের ভিতরে শুধুমাত্র সৎ গুণ থাকে না, কিছু দোষও থাকে। স্বামীর ঘরে কুমুদিনীর মন বসানোর জন্য মোতির মা দোষহীনভাবেই চেষ্টা করেছেন। তবে, তিনি একবার কুমুদিনীর উপর রাগ করেন, কুমুদিনী যখন বাপের বাড়ি থাকার জন্য পাকাপাকি সিদ্ধান্ত নেন। তখন মোতির মার মনে হয়, এটা কুমুদিনীর বাড়াবাড়ি। বংশের দেমাকে কুমুদিনীরা অন্যদেরকে মেনে নিতে পারেন না, তাই আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি করেন। তবে, এ পর্যন্তই তার রাগ। এরপর তিনি আবার কুমুদিনীকে তার নিজের সম্মান পাইয়ে দিতে কাজ শুরু করেন।

২.স্বাধীনচেতা, বিদ্রোহী চরিত্র :

যুগে যুগে সমাজ নারীকে তার নিজস্ব অধিকার থেকে দূরে রেখেছে– কখনো সৌন্দর্যের প্রতীক বানিয়ে, কখনো প্রেমের প্রতিমা বানিয়ে, কখনো কোমলমতী অবলা বলে। এই বেড়াজালের মধ্য থেকেই কোনো কোনো নারী নিজের অস্তিত্বকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন, নিজের মানব-সত্তার জন্য সংগ্রাম করেছেন। তারা চেষ্টা করেছেন উপমা, প্রেম, সৌন্দর্যের নামে দাসীর দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন জীবন যাপন করতে। আবার কেউ স্বাধীনতার প্রত্যাশী হয়েছেন, কিন্তু লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেন নি। তাদের এ সংগ্রাম যতোটা বা যেমনই হোক সমাজে তাদের অবদান অবহেলা করার মতো নয়। রবীন্দ্র-নাট্যে নারীর এই স্বাধীনচেতা মনোভাব এবং ক্ষেত্রবিশেষে বিদ্রোহ প্রকাশ পেয়েছে নানা মাত্রায়।

রানি সুমিত্রা *রাজা ও রানী* নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র। নাটকটি নারী কেন্দ্রিক। সুমিত্রা কাশ্মীরের রাজকুমারী, জালন্ধরের মহিষী। নাটকে সুমিত্রার মহিষী জীবনই চিত্রিত হয়েছে কিন্তু কুমারী জীবনের আভাস রয়েছে পুরো নাটকেই। তৃতীয় দৃশ্যে সুমিত্রার আগমন। প্রথম কয়েকটি সংলাপেই রাজ্যের প্রতি কর্তব্যনিষ্ঠা দেখা যায়। তিনি রাজাকে বলেন :

> আমারে বেসো না ভালো রাজশ্রীর চেয়ে। (১খ,পৃ.৪৫৬)

সে সময়ে এই কথা বলাই স্পর্ধা। যুগ যুগ ধরে নারীর ইতিহাস সহ্যকারীর ইতিহাস। অত্যাচার হোক কিংবা ভালোবাসা হোক সবই নীরবে সহ্য করতে হয় তাকে। পুরুষের আচরণের উপর কথা বলার সাহস তার নেই, রাজার উপর তো নয়ই। তাই এই সংলাপেই বোঝা যায় সুমিত্রা সাধারণ নারীর চেয়ে একটু আলাদা। তার নিজস্বতা আছে, আছে স্বাধীন মতামত দেওয়ার ক্ষমতা ও সাহস। নিজের স্বার্থের চেয়ে সে প্রজার প্রতি দরদি। রানি সুমিত্রা নিজের প্রতি ভালোবাসার চেয়ে রাজ্যর প্রতি কর্তব্যপরায়ণতাই বেশি পছন্দ করেন। তাঁর মতে, রাজ্যের ভাগ্যলক্ষ্মীকে ভালোবাসাই একজন রাজার প্রথম দায়িত্ব। এদিক দিয়ে বলা যায়, রাজাকে দায়িত্বসচেতন করার মতো সাহসিকতার ভূমিকাও পালন করেছেন সুমিত্রা। স্ত্রী হিসেবেই হোক আর রানি হিসেবেই হোক– এ রীতিমতো বিদ্রোহ। তবে এ বিদ্রোহ সশস্ত্র নয়, রাজার মানসিকবোধে আঘাত করার জন্য আবেগমূলক বিদ্রোহ। এই দৃশ্যটি রাজা এবং রানির দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে। এ দ্বন্দ্ব হলো ভালোবাসার দ্বন্দ্ব। রাজা চান রাজকাজ না করে শুধু সুমিত্রাকে ভালোবাসতে– অন্তঃপুরে থাকতে। কিন্তু সুমিত্রা চান পরিমিত ভালোবাসা– অন্য সবটুকু ভালোবাসা রাজ্যকে দেওয়া উচিত। রাজা এ কথায় কান দেন না। তিনি রানি সুমিত্রার হৃদয়লগ্ন হয়ে থাকতে চান।

তিনি আরো বেশি করে সুমিত্রাকে জয় করার চেষ্টা করেন। সুমিত্রা জানেন রাজার জন্য এটা অপরাধ আর প্রজার জন্য অমঙ্গল। তাই তিনি বলতে বাধ্য হন–

এখন সময় নয়– আসিয়ো না কাছে,
এই মুছিয়াছি অশ্রু, যাও রাজ-কাজে। (১খ,পৃ.৪৫৭)

কিন্তু সুমিত্রার এ চেষ্টা ব্যর্থ হয়। বিক্রমদেবের কাছে সুমিত্রা রাজ্যের অবস্থা কিছুই জানতে পারেন না। বিক্রমদেব শুধু ভালোবাসার প্রলাপ বকেন। অবশেষ সুমিত্রা ব্রাহ্মণ দেবদত্তের কাছে জানতে পারেন রাজ্যের ভয়াবহতম অবস্থা। কাশ্মীর থেকে আসা সুমিত্রার নিজের আত্মীয় জয়সেন শিলাদিত্য যুধাজিৎ রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ পদে থেকে প্রজাদের অত্যাচার করে চলেছেন। রাজকুমারী সুমিত্রার কাছে এ ঘটনা পিতৃভূমির লজ্জা-অপযশ আর মহিষী সুমিত্রার কাছে ক্ষোভ। এর বিহিত করতে তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন। তিনি রাজাকে বলেন :

আমার সন্তান চেয়ে
নহে তারা অধিক আত্মীয়। এ রাজ্যের
অনাথ আতুর যত তাড়িত ক্ষুধিত
তারাই আমার আপনার। (১খ,পৃ.৪৬৩)

বিক্রমাদিত্য সুমিত্রাকে বোঝানোর চেষ্টা করেন জয়সেন শিলাদিত্য যুধাজিৎ যুদ্ধ ছাড়া যাবে না। তিনি যখন রাজার কাছে সুবিচার পেতে ব্যর্থ হন, তখনই তার ভিতরে বিদ্রোহ বোধ জেগে ওঠে। তিনি মন্ত্রীকে বলেন জয়সেন শিলাদিত্য যুধাজিৎ'কে পূজোৎসবে নিমন্ত্রণ করে এনে বন্দি করতে। কিন্তু নিমন্ত্রণে না এসে তারা বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হয়। এ সংবাদ শুনে সুমিত্রা রাগান্বিত হন। রাজাকে সসৈন্য গিয়ে শত্রু বিনাশ করতে বলেন। কিন্তু রাজা ভীত। তিনি সন্ধির প্রস্তাব পাঠাতে চান। লজ্জিত সুমিত্রা বলেন :

ধিক্ এ অভাগা রাজ্য, হতভাগ্য প্রজা!
ধিক্ আমি, এ রাজ্যের রানী!(১খ,পৃ,-৪৭০)

রাজার মাধ্যমে প্রজার মঙ্গল হবে না জেনে সুমিত্রা নিজে এর প্রতিকারের উপায় চিন্তা করেন। "রাণী সুমিত্রা তার রাণী-সত্তাকে ভুলে গিয়ে কেবলমাত্র কামিনী সত্তার মধ্যে নিজেকে সঙ্কুচিত করে আনতে পারেননি। প্রজার সঙ্গে তথা দশের কল্যাণের সঙ্গে যে যোগে তাঁর ব্যক্তিত্বের পূর্ণতা ও মহিমা, সেই যোগ নষ্ট করে, সেই মহিমাকে খর্ব করে, সুমিত্রা রাজার মতো নিজেকে জৈবিক কামনার গোপন অন্তঃপুরে আবদ্ধ করে রাখেননি। তিনি 'অন্তরে প্রেয়সী' এবং 'বাহিরে মহিষী' হয়েই আপন সমগ্রতা ও মর্যাদা উপলব্ধি করতে চেয়েছেন।"[৫৬]– এই চিন্তা থেকেই দেশ-প্রজা রক্ষায় পুরুষবেশে বেরিয়ে পড়েন সুদর্শনা। মন্দিরে পূজা দিয়ে তিনি রাজ্য ছেড়ে চলে যান। তবে

যাওয়ার আগে পূজা দিতে আসা একজন নিঃস্ব স্ত্রীলোকের মুখে শুনতে পান রানিকেই তারা দায়ী করছে রাজ্যর দুর্যোগের জন্য। স্ত্রীলোকটি পুরুষবেশী সুমিত্রাকে বলে :

> বিদেশ থেকে এক রানী এসেছে, সে আপন কুটুম্বদের রাজ্য জুড়ে বসিয়েছে। প্রজার বুকের রক্ত শুষে খাচ্ছে গো! (১খ,পৃ.৪৭৩)

এ কথা শুনে সুমিত্রার রাগ হয় না বরং কষ্টে বুক ফেটে যায়। বুঝতে পারেন প্রজার মনে কত কষ্ট জমেছে। নিজের সাধ্যমতো কিছু দিয়ে তিনি চলে যান রাজ্য থেকে। এরপর ভাই কুমারের নেতৃত্বে কাশ্মীরের সৈন্যসাহায্য নিয়ে তিনি বন্দি করেন শত্রুদের। এতে রাজা বিক্রমদেব খুশি হতে পারেন না। তাই পরের পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ হয়ে ওঠে। রাজার অনুরাগ রাগে পরিণত হয়। তিনি কুমারকে বন্দি করার জন্য কাশ্মীর ধ্বংসে মেতে ওঠেন। প্রজা রক্ষার জন্য কুমার অন্য কোনো উপায় না দেখে নিজের ছিন্ন মাথা সুমিত্রার মাধ্যমে পাঠিয়ে দিতে চান বিক্রমদেবের কাছে। সুমিত্রাও প্রজাদরদী। এতো হিংসা, এতো মৃত্যু তারও অসহ্য হয়ে উঠেছে। তাদের ভাইবোনের মৃত্যু দিয়ে এই মৃত্যুর বিভৎস্যতা বন্ধ করতে চান তিনিও। তাই প্রজার প্রতি জুলুম বন্ধ করতে কুমারের ছিন্ন মাথা নিয়ে আসেন নিজেদেরই রাজদরবারে, এক সময় যে দরবারের রাজা ছিলেন সুমিত্রার পিতা। বর্তমানে তার খুড়ো সে সিংহাসন দখল করে ছিলেন, যা কিনা বিক্রমদেব অধিকার করেছেন। কুমারের ছিন্ন মাথা উপহার দিয়ে সুমিত্রা নিজেও মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নেন, তবু বিক্রমদেব বা খুড়ো কারো সঙ্গে আপোস করেন না।

সুমিত্রার চরিত্রে যদি শুধুমাত্র এই সংগ্রামপ্রিয়তাই থাকতো, তবে তিনি বাস্তব চরিত্রের পর্যায়ে পৌঁছাতে পারতেন না। কিন্তু দেখা যায় ভালোবাসার জন্য তাঁর মন কেঁদেছে। পুরুষবেশে যখন কাশ্মীরে যাওয়ার ইচ্ছায় তিনি মন্দিরে প্রণাম করতে গেছেন, তখন বারবার রাজা বিক্রমদেবের কথাই মনে করছেন, বিক্রমদেবের মুখ, প্রেমপূর্ণ চোখ, কণ্ঠস্বর মনে পড়ে। তবু তিনি কর্তব্যের খাতিরে পতিসত্যপালনের জন্য চলে যান। আবার বিক্রমদেবের সঙ্গে কুমারসেনের যুদ্ধ যখন অনিবার্য, তখন ভাইয়ের কাছে স্বামীর জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করেন। ভাইয়ের বীরত্বে অপমান লেপন করে হলেও স্বামীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে দেন না। সুমিত্রার চরিত্রে স্ত্রীত্ব এখানে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হয়েছে। সুমিত্রার সমগ্র চরিত্রবিশ্লেষণে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "সুমিত্রার চরিত্র শ্রেণী-প্রতিনিধিত্ব হইতে ব্যক্তিত্ব-ভাস্বরতায় উন্নীত হয় নাই।"[৫৭]– আমাদের বিবেচনায় এ কথা পুরোপুরি ঠিক নয়। সুমিত্রা শ্রেণি-প্রতিনিধিত্ব থেকে উর্ধ্বে উঠেছেন ঠিকই, কিন্তু ব্যক্তিত্ব-ভাস্বরতায় পৌঁছাতে পারেন নি। মাঝামাঝি একটি জায়গায় থেমে গেছেন। জালন্ধরে অবস্থান কালে যে উদ্দীপনা তার মধ্যে ছিলো, তা সুবিবেচক রাজনৈতিজ্ঞ এবং প্রজাদরদী মহিষীর মতোই আচরণ করেছেন। তিনি স্বামীগৃহ ত্যাগ করেন প্রজাদের উপর রাজ-অন্যায়ের প্রতিকারের জন্যই। কিন্তু ভাইয়ের সাহায্যে শত্রুদের বন্দি করায় রাজা নিজেকে ছোটো মনে করেছেন। এ জন্য ফল উল্টো হয়েছে। এ

ক্ষেত্রে তিনি দূরদর্শীতার পরিচয় দিতে পারেন নি। অবশ্য পরিবেশ-পরিস্থিতি তাকে কোনো সুপথের ইঙ্গিত দিতে পারে নি। তাই একের পর এক ঘটনা পরিস্থিতির কারণেই ঘটেছে। তবে সুমিত্রা শুধুমাত্র আত্মগোপন করেও রাজার বোধকে জাগিয়ে দিতে পারতেন, এতে দু'কূল রক্ষা পেতো। হয়তো রাজা নিজেই কাশ্মীরের কাছে সাহায্যের আবেদন করতেন। সুকুমার সেন উল্লেখ করেছেন, "সহধর্মিণী রূপে স্বামীর কর্তব্যে ত্রুটি শুধরাইবার ভার নিজের হাতে লইয়া সুমিত্রা ভবিতব্যতার জট আরও পাকাইয়া ফেলিয়াছিল।"[৫৮] এই জটই নাটকীয় পরিবেশ তৈরি করেছে এবং তাকে ব্যক্তিত্বভাস্বরতায় পৌঁছাতে দেয় নি। তবে তিনি সাধারণ নারীও নন। প্রজার অধিকারের জন্য জীবন দিয়েছেন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন– "সুমিত্রার মহৎ সঙ্কল্প ভ্রান্ত আচরণের জন্য শূন্যগর্ভ আদর্শবিলাসে পর্যবসিত হইয়াছে। সে প্রজাজননী হইতে চাহিয়াছে, কিন্তু তাহার চরিত্রের দুর্বলতা তাহাকে কুমারের আত্মহত্যার প্রশ্রয়দাত্রীর অবজ্ঞেয় অংশে অবতীর্ণ করাইয়াছে।"[৫৯] –এ মন্তব্য সুচিন্তিত বলে মনে হয় না। তিনি প্রকৃত পক্ষেই প্রজাদরদী, এ জন্যই তিনি নারীর সাংসারিক সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে মানুষের পর্যায়ে উপনীত হয়েছেন। অন্যদিকে, নাট্য-পটভূমির সময়ে কুমার এবং সুমিত্রার এই পরিণতি অনিবার্য না হলেও স্বাভাবিক। ভারতবর্ষীয় ঐতিহ্যে নিরুপায় মানুষের আত্মহনন বেশ জনপ্রিয় ব্যাপার। কুমার আর সুমিত্রার জন্য অসহায় প্রজারা মারা যাচ্ছে প্রজাদরদী হিসেবে এই অবস্থা তারা মেনে নিতে পারেন না। আবার রাজ্যে ফেরা মানেও আত্মসমর্পন করা– তাও সম্ভব নয়। তাই স্বাভাবিকভাবেই আত্মহুতি দিয়েছেন দুইভাইবোন। বরং সার্বিক বিবেচনায়, সুমিত্রার চিন্তাধারা এবং সংগ্রাম সময়ের চেয়ে এগিয়ে।

একটি চরিত্র প্রথম থেকেই সংগ্রামী থাকে না। কোনো ঘটনা তাকে সেই দিকে ঠেলে দেয়। সুমিত্রাও এর ব্যতিক্রম নন। রানি সুমিত্রা সংসার এবং ভালোবাসার বেড়াকে অতিক্রম করে রাজনৈতিক কর্তব্যে পদার্পন করেন। শুধুমাত্র প্রজার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় নিজের জীবনে বিপর্যয় আনেন। তবে এ সত্য যে এ তার মনের ডাক। তার অস্তিত্বে তিনি প্রজাদরদী। তাই নিজের চেতনা রক্ষার জন্যই তিনি এ বিদ্রোহে অবতীর্ণ হন। সুমিত্রা প্রজা এবং পাঠকের কাছে মহান।

তপতী নাটক *রাজা ও রানী*র রূপান্তরিতরূপ। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ একে একেবারে ঢেলে সাজিয়েছেন। তিনি *তপতী* নাটকের ভূমিকায় বলেছেন, "স্থির করেছিলুম আগাগোড়া নতুন করে না লিখলে এর সদগতি হতে পারে না। লিখে এই বইটার সম্বন্ধে আমার সাধ্যমত দায়িত্ব শোধ করেছি।"[৬০]এ নাটকে সুমিত্রা আরো প্রবল চরিত্র। *রাজা ও রানী*তে যা ছিলো স্বাভাবিক, *তপতী*তে তা অসম্ভব। রাজা বিক্রমদেবের মনোভাব সম্পর্কে নরেশ এবং যুবরাজ কুমারসেনের কথোপোকথন–

নরেশ। ... উনি মনে মনে সন্দেহ করেন মহারানী সুমিত্রা তোমার প্রশ্রয় পেয়েছেন বা তোমার প্রশ্রয় প্রার্থনা করতে এসেছেন।

কুমারসেন। এতদিনেও কি জানেন না সুমিত্রার পক্ষে তা অসম্ভব। (১১খ,পৃ.১৯৪)

এই একটি কথায়-ই বোঝা যায় *তপতী*র সুমিত্রা শক্তিশালী। এ সুমিত্রা *রাজা ও রানী*র সুমিত্রা নয়। এই সুমিত্রা নিজের মানুষ সত্তার প্রতি দৃঢ়চেতা। এ নাটকে সুমিত্রার বিয়ের ইতিহাসটি জানা যায়। জালন্ধররাজ বিক্রম কাশ্মীরে যুদ্ধ করতে গিয়ে প্রহসনমূলক যুদ্ধ করে জয়ী হন। কারণ সে সময় সুমিত্রার ভাই যুবরাজ কুমার সেন মানস-সরোবর থেকে অভিষেকের জল আনতে গিয়েছিলেন। আর তাঁদের পিত্রব্য চন্দ্রসেন যুদ্ধের ভান করে হেরে যান। এই পরিস্থিতিতে সুমিত্রা আগুন জ্বালিয়ে ঝাঁপ দিয়ে মরতে গিয়েছিলেন। কিন্তু পুরবৃদ্ধরা তাকে বললেন :

মা, রক্ষা করো, যে পাণি মৃত্যুবর্ষণ করছে তোমার পাণি দিয়ে তাকে অধিকার করো– শান্তি হোক। (১১খ,পৃ.১৬৬)

এর পর প্রজারক্ষার জন্য সুমিত্রা কৈলাসনাথের মন্দিরে তিনদিন ধরে তপস্যা করে নিজেকে প্রস্তুত করেন। সেদিন তিনি তপস্যা করে শক্তি চান। সে শক্তি হলো :

রুদ্রের প্রসাদে আমার বিবাহ যেন ভোগের না হয়। জালন্ধরের রাজগৃহে আমি কোনোদিন কিছুর জন্যই যেন লোভ না করি; তবেই আমাকে অপমান স্পর্শ করতে পারবে না। (১১খ,পৃ.১৬৮)

– এইভাবে এক কঠিন যজ্ঞের মধ্য দিয়ে তাঁকে আসতে হয়েছে। স্বদেশভূমির এক যন্ত্রণার সময়ে তিনি দেশকে রক্ষা করেছেন। আবার জালন্ধরে যখন তিনি রানী, তখন প্রজাদের প্রতিও তাঁর কর্তব্য রয়েছে। প্রজাদের প্রতি অবিচার তিনি কোনোভাবেই মেনে নিতে চান না, এমনকি প্রজার হয়ে তিনি রাজার কাছে সুবিচার চান। সুমিত্রা সব সময়ই প্রজাদরদী তাই জালন্ধরের প্রজারও কল্যাণ চান তিনি। ফটকের বাইরের প্রজাদের আর্তনাদ তাকে বিচলিত করে। ফটকের বাইরের সংবাদ শুনবার জন্য তিনি উদ্গ্রীব হয়ে ওঠেন। যখন শোনেন তীর্থদ্বারে কর সংগ্রহের জন্যে রাজার অনুচর নিযুক্ত, সুন্দরী মেয়েদের বিপদ ঘটছে, তখন তিনি বিচলিত হয়ে পড়েন। তাঁর আত্মীয় শিলাদিত্যের আদেশেই রাজ্যে এই অনাচার ঘটছে জেনে তিনি বলেন:

শিলাদিত্যের বিচার যদি না হয় তা হলে এ রাজত্বে রানী হবার লজ্জা আমি সইব না। (১১খ,পৃ.১৭২)

সুমিত্রার বেঁচে থাকাটাও একটা সংগ্রাম। কারণ তিনি সর্বোচ্চ দুঃখ নিয়ে বেঁচে থাকেন। প্রজা রত্নেশ্বরের সাথে কথোপোকথনে সে কথা বোঝা যায় :

রত্নেশ্বর। ... না খেয়ে মরার দুঃখ কম নয় কিন্তু এমন অবস্থা আছে যখন বেঁচে থাকার মতো দুঃখ আর নেই।

সুমিত্রা। সে কথা আমিও বুঝি। (১১খ,পৃ.১৭১)

– এই কথাতেই বোঝা যায়, সুমিত্রার ভিতরের দুঃখ। একদিকে তিনি মাতৃভূমি এবং পিতৃসিংহাসনের অপমানে মর্মাহত, অন্যদিকে রানির পদও পুরোপুরি পান নি। কারণ, তাঁর কাছে রানির পদ মানে রাজার বিলাসসঙ্গিনী নয়, রাজধর্মের অংশীদার হওয়া। সুমিত্রার কাছে তাই রাজকোষ লোভনীয় নয়, যতটা লোভনীয় প্রজারক্ষা। তাই তিনি রাজাকে বলেন :

> অন্যায়ের হাত থেকে প্রজারক্ষায় যদি মহিষীর অধিকার আমার না থাকে তবে এ-সব তো বন্দিনীর বেশভূষা – এ বইতে পারব না। মহিষীকে যদি গ্রহণ কর সেবিকাকেও পাবে, নইলে শুধু দাসী! সে আমি নই। (১১খ,পৃ.১৬৫)

এখানে বোঝা যায় সুমিত্রার আত্ম-অধিকার ও আত্ম-সচেতনমূলক মনোভাব। ড. সাধনকুমার ভট্টাচার্য বলেন,"'তপতী'-নাটকে সুমিত্রা 'জালন্ধরের রানী' হতে চান কাশ্মীরের গৌরব রক্ষার জন্যই।"[৬১] পুরো নাটক জুড়ে *তপতী*র সুমিত্রার এই চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। তবে তার প্রজাদরদী মন মিথ্যে নয়। তিনি নিজে রুদ্ধ দ্বারের কাছে যান প্রজাদের দুঃখের কথা শুনতে। কিন্তু কোনো প্রতিকার করতে পারেন না। তাঁর মনে হয় প্রজারা দ্বার ভেঙ্গে ফেলুক, নিজেদের অধিকার ছিনিয়ে নিক। ঠিক যত বড়ো জোড়ের সঙ্গে রাজা ওদের কাছে কর দাবি করে, তত বড়ো জোরের সঙ্গে ওরা বিচার দাবি করুক। তিনি যেতে চান প্রজাদের মাঝখানে। কিন্তু যাওয়ার উপায় নেই তাঁর। তাই এর প্রতিবাদস্বরূপ তিনি মকরকেতুর পূজা অস্বীকার করে ভৈরবের পূজা করে শক্তি পাওয়ার জন্য প্রত্যয়ী হন। তিনি মনে করেন রাজ্যের পাপ যে মুহূর্তে রাজাকে স্পর্শ করে সেই মুহূর্তে তাঁকেও স্পর্শ করে। তাই পাপ মোচনের জন্য চেষ্টা করেন। সতীধর্মের অবমাননাকারীর কঠিন বিচার চান। সুমিত্রার ভিতরে রাজনৈতিক চেতনা এবং দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলেন –

> ভীষণতা অন্যায়ের ছদ্মবেশ; ভয় ক'রে তাকে যেন সম্মান না করি। অন্যায়কারীকে ক্ষুদ্র বলেই জানতে হবে, অতি ক্ষুদ্র, তার হাতে যত বড়ো দণ্ড থাক। (১১খ,পৃ.১৭১)

এ সংলাপ সাধারণ নারীর নয়। বিচক্ষণ নারীরই কথা। এরপর সুমিত্রা কোনো উপায় না পেয়ে ঘোড়া নিয়ে একা চলে যান কাশ্মীরে মার্তণ্ডদেবের মন্দিরে নিজেকে নিবেদন করতে। তার এ সিদ্ধান্তে রাজা আরো ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠেন। শপথ নেন সুমিত্রার কাশ্মীরের আশ্রয় চূর্ণ চূর্ণ করবেন। মন্দির আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। মন্দির পুরোহিত মন্দিরের চারপাশে বিদেশিদের যাতায়াত রোধ করে দিতে চাইলে সুমিত্রা তা করতে দেন না। কারণ, তাতে দেবতার অমর্যাদা হয়। জালন্ধরের পুরোহিত দেবদত্ত এসে তাঁকে খবর দেন গ্রাম থেকে গ্রাম, নগর থেকে নগরে অগ্নিকাণ্ড দুর্ভিক্ষ রক্তপাত নারীনির্যাতনের কথা। একমাত্র সুমিত্রা ছাড়া রাজাকে বাধা দেওয়ার আর কেউ নেই। কিন্তু দেবতার কাছে যিনি নিবেদিত তাঁর তো যাওয়া যাবে না। এ মন্তব্য কুমারসেনেরও–

... সুমিত্রা কাশ্মীরের দেবতাকে অপমান করে এখান থেকে চলে যাবে সে আমি ঘটতে দেব না। দেবতার ধন হরণ করে তাকে মানুষের ভোগের ভাণ্ডারে নিয়ে যাবে আমাদের বংশের কন্যা! (১১খ,পৃ,-২০২)

সুমিত্রা তখন রাজাকে মন্দিরে আহ্বান করেন। তিনি বলেন, এটাই তাঁর শেষ কাজ– রাজাকে বাঁচানো। অগ্নিশয্যায় নিজেকে সমর্পন করে সুমিত্রা তাঁর কর্তব্য পালন করেন। দেবতা সম্পর্কে সংস্কার একটি বড়ো ঘটনা এ নাটকে। সুমিত্রা দেবতায় সমর্পিত বলে দেবালয় থেকে বাইরে যেতে পারলেন না। তাই রাজাকে রক্ষা করবার-প্রজাদরদী করবার শেষ চেষ্টা হিসেবে তিনি মৃত্যুকেই বেছে নিলেন। আবার এতো দিন যে তিনি সংসারে থেকেছেন সে সম্পর্কেও তাঁর কুণ্ঠা ছিল, তিনি মনে করেছেন দেবতার কাছে এসে নিজেকে সমর্পন না করে সংসারে ফিরে গিয়ে তিনি অশুচি হয়েছিলেন। তাই দেবমন্দিরেই নাটকের পরিণতি ঘটেছে। শেষপর্যন্ত, অগ্নিশয্যায় নিজেকে সমর্পণ করে সুমিত্রা তার কর্তব্য পালন করে গেলেন।

তপতী নাটকের আরেকটি স্বাধীনচেতা অস্তিত্ববাদী এবং বিদ্রোহী চরিত্র বিপাশা। এই অস্তিত্ব-স্বাধীনতা-বিদ্রোহ প্রকাশ পেয়েছে তার মনুষ্যত্ব এবং দেশপ্রেমের কারণে। তার আগমনের প্রথম দৃশ্যেই দেখা যায় রাজনৈতিক বিচক্ষণতা এবং অপমানের যন্ত্রণা। তিনি কাশ্মীরের মেয়ে। জালন্ধররাজ অন্যায় যুদ্ধে সুমিত্রাকে বিয়ে করে আনার সময় পুরনারী হিসেবে বিপাশাকেও নিয়ে এসেছেন। যখন যুদ্ধের এবং বিজয়ের এই প্রহসন হয়, তখন বিপাশা ছিলেন নিতান্তই বালিকা। কিন্তু দেশপ্রেমের ঔজ্জ্বল্য তার মনে ধ্রুবতারার মতো সত্য। জালন্ধররাজ কাশ্মীর জয় করেছে, এ কথা তিনি বিশ্বাস করেন না। কারণ সে সময় কাশ্মীরের যুবরাজ সেখানে ছিলেন না। যুদ্ধ হয় নি। তাই নাটকে তার প্রথম সংলাপই রাজভ্রাতা নরেশকে ধিক্কার–

মানব না ও কথা। কাশ্মীর জয় করেছ তোমরা! (১১খ,পৃ.১৬৫)

তিনি আরো স্পষ্ট করে বলে দেন, এই যুদ্ধ ছিল ফাঁকি। জালন্ধরের ইতিহাস ফাঁকির ইতিহাস। এই ফাঁকির রাজত্বে নিখাদ প্রেমকেও বিশ্বাস করে না বিপাশা। এদের বর্বতা হৃদয়জয়ের পথকে বন্ধ করে দিয়েছে বলেই বিপাশার বিশ্বাস। কাশ্মীরের ফুল জালন্ধরের মাটিতে ফুটেছে দেখে তিনি ফুলকে পর্যন্ত বলেন :

তুমি কাশ্মীরের ফুল, এখানেও তোমার মুখ প্রসন্ন কেন। অপমান এত সহজেই ভুলেছ? (১১খ,পৃ.–১৬৭)

অর্থাৎ বিপাশা অপমান ভুলতে পারেন নি। তাই তিনি সুমিত্রাকেও প্রশ্ন করতে ছাড়েন না যে, কাশ্মীরের প্রতি যে অন্যায় হয়েছে, সে কি তাঁর মনে পড়ে না? কিংবা, মকরকেতনের পূজায় সুমিত্রার উৎসাহ আছে কি না? এরপর তিনি সুমিত্রাকে স্পর্ধা করেই জানান, তিনি যদি কৈলাশমন্দিরে তপস্যা করতেন, তবে 'জালন্ধরের বিনিপাতের জন্যে তপস্যা' করতেন। রাজ-মহিষীর সামনে দাঁড়িয়ে তাঁকেই কটাক্ষ করে কথা বলার ঔদ্ধত্য দেখানো

দেশপ্রেমের জোরেই সম্ভব। বিপাশা এও বিশ্বাস করেন যে, একদিন না একদিন কাশ্মীরের কাছে জালন্ধরের পরাজয় হবে। তিনি নরেশকে বলেন:

ছলনাকে গৌরব বলে অহংকার করছ, সেইটে চূর্ণ হবে তবেই ধর্ম আছেন এ কথা মানব। (১১খ,পৃ.১৭২)

এখানে বিপাশা ধর্মের প্রতিও সন্দিহান হয়েছেন বোঝা যায়। কারণ তার মনে প্রশ্ন জাগে, ধর্ম থাকলে অধর্মের জয় হলো কীভাবে। এবং এরপরই মনে করেন যে, নিশ্চয়ই ধর্মের জয় হবে। উপরের সংলাপে বিপাশার মনের এই আড়ালের সত্য প্রকাশিত হয়েছে। নরেশের সঙ্গে কথোপোকথনের সময় বোঝা যায় বিপাশা শিক্ষিত এবং জ্ঞান সমৃদ্ধ। অলঙ্কার-শাস্ত্রের ছাত্রদের সম্পর্কেও তার বেশ জানাশোনা আছে। অলঙ্কার-শাস্ত্র সম্পর্কেও তার ধারণা সমুন্নত। তবে এখানে একটু খটকা লাগে, কারণ, খুব ছোট বয়সে বিপাশা জালন্ধরে রাজকন্যার সঙ্গে চলে এসেছেন, রাজ-অন্তঃপুরে তার লেখাপড়ার ব্যবস্থা কি এতোটাই করা সঙ্গত? – এক্ষেত্রে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ বাস্তবতার চেয়ে রোমান্টিকতার আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি যে কোনো অবস্থাতেই বিপাশাকে বেশ একটু বড়োমাপের মানুষ করে তুলতে চেয়েছেন। যিনি কি-না শিক্ষা সংস্কৃতি দেশপ্রেমে সমৃদ্ধ। এ কারণেই নরেশ যখন সুমিত্রার মাহাত্ম স্বীকার করে কাশ্মীর জয়ের ধূর্ততা মেনে নেন, তখন বিপাশা নরেশের প্রতি প্রসন্ন হন। গান গেয়ে সেই প্রসন্নতার পুরস্কার দেন। এর পরের ঘটনা আরো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং চমকপদ। বিপাশা একের পর এক অব্যক্ত আড়ালের সত্যকে বলতে শুরু করেন। যে কথা ভিতরে ভিতরে সবাই জানে, কিন্তু বলতে পারে না। বিপাশা তা অবলীলায় বলে দেন। রাজা বিক্রমাদিত্য সম্পর্কে বলেন :

মহারানীর সঙ্গে মহারাজের সম্বন্ধ অন্যায় দিয়ে আরম্ভ হয়েছে সেই পাপের ছিদ্র দিয়েই কলির প্রবেশ। (১১খ,পৃ.১৭৭)

শুধু তাই নয়, রাজার জীবনবোধ পর্যন্ত বলে দেন তিনি। তার মতে রাজা নির্বুদ্ধিতার ধিক্কারে সকলের উপর রেগে উঠেছেন। এ নির্বুদ্ধিতা হলো রাজ্যটাকে খণ্ড খণ্ড করে কাশ্মীরী কুটুম্বদের হাতে দেওয়া। রাজা মনে করেছিলেন, এই কুটুম্বদের রাজ্য দিলে রানী সুমিত্রা প্রসন্ন হয়ে রাজার কাছে ধরা দেবেন। কিন্তু তাঁর ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো। এই ভুল শোধরানোর কোনো উপায় আর রাজার রইল না। রানী মানসিকভাবে মুক্তই রইলেন, কিন্তু রাজা মানসিক এবং রাষ্ট্রীয় সব দিক দিয়ে হয়ে পড়লেন বন্দি। বিপাশার কথার ভিতর দিয়ে এই সূক্ষ্ম পরিস্থিতি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। রানী সুমিত্রা যখন কাউকে কিছু না বলে চলে যান মার্তণ্ডমন্দিরে, তখন বিপাশা উল্লাসিত-গর্বিত হয়ে ওঠেন। সুমিত্রা সম্পর্কে তার মনে হয় :

ভাঙ্গা-উৎসবের ভিতর দিয়ে তিনি ছাড়া পেলেন পাষাণের বুকফাটা নির্ঝরের মতো। (১১খ,পৃ.১৮৬)

সুমিত্রার চলে যাওয়ার এর চেয়ে সঙ্গত ব্যাখ্যা পুরো নাটকে আর কারো মুখে উচ্চারিত হয় নি। তারপর নরেশ সত্য এবং ন্যায় ধর্মের পক্ষে দাঁড়ালে বিপাশা ফুলের মালা দিয়ে নরেশকে বরণ করে নেন। সুমিত্রা জালন্ধর থেকে চলে গেলে তিনি নরেশকে সঙ্গী করে পথে বের হন। শেষ পর্যন্ত কুমারসেনের অভিষেকের অনুষ্ঠানে নরেশকে নিয়ে গান করেন। তারপর চলে যান মার্তণ্ডদেবের মন্দিরে সুমিত্রার কাছে। সেখানেই নরেশ আর বিপাশার মনের মিল হয়। বিপাশা বলেন :

প্রিয়তম, তোমার আনন্দে আজ আমি আনন্দিত, তার চেয়ে বেশি কিছু বলতে পারি নে। (১১খ,পৃ.২০১)

বিদ্রোহী বিপাশার মনের বিদ্রোহ দমন হয় সুমিত্রা এবং নরেশকে জালন্ধরের অন্যায় থেকে দূরে সরিয়ে। রবীন্দ্রনাথ বিপাশার চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন রাজতান্ত্রিককালে রাজপরিবার বহির্ভূত একটি মেয়ের মনেও দেশপ্রেমের আগুন জ্বল জ্বল করে জ্বলছে। দেশপ্রেমের কারণে তিনি ধর্ম এবং প্রেমপ্রত্যাশী রাজভ্রাতা নরেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছেন।

তপতী নাটকে ছোটো বড়ো সবগুলো চরিত্রই স্বাধীনচেতা এবং ঔদ্ধত্য আচরণযুক্ত। একটিদৃশ্যে গৌরী নামের একজন নারীকে দেখা যায়। সেও কাশ্মীর থেকে ধৃত হয়ে অনিচ্ছায় এসেছে জালন্ধরে। একটি মাত্র কথায় সে বুঝিয়ে দেয় জালন্ধররা বর্বর জাতি। সে পুরোহিত ত্রিবেদীঠাকুরকে বলে :

এও বুঝি তোমাদের জালন্ধরের সৃষ্টিছাড়া কীর্তি? মীনকেতুর উৎসবে রক্তপাতের পালা। (১১খ,পৃ.১৭৫)

জালন্ধরে বাস করে, জালন্ধর সম্পর্কে জালন্ধরেরই পুরোহিতকে এমন অপমানজনক এবং খোঁচা দেওয়া কথা বলার সাহস দেখিয়ে গৌরী নিজস্ববোধের স্বাধীনতা এবং জালন্ধরের প্রতি ঘৃণার পরিচয়ই দিয়েছে। এরপর আরো একজন নারী চরিত্রের কথা একজন পুরুষ চরিত্রের মুখে শোনা যায়। সে কাশ্মীরের একজন প্রহরীর স্ত্রী। এই নারী ধন উপেক্ষা করে মান চায়। খুড়োরাজা বিশ্বাসঘাতকতা করে সিংহাসন আকড়ে রয়েছে বলে তার চাকরি করাও বিশ্বাসঘাতকতা। এ কারণে এই নারী স্বামীর মাইনের টাকা দিয়ে গড়া গয়না গায়ে দিয়ে ইঁদারায় জল আনতে যাওয়াকে লজ্জা মনে করে, এবং এক পর্যায়ে সে জল আনতে যাওয়াই বন্ধ করে দেয়। এই নারীর বোনও একই রকম চরিত্রের। বোনের জামাই খুড়োরাজার প্রহরীর চাকরি করে বলে সে বোনজামাইয়ের সঙ্গে কথা না বলে বাঁ পা দিয়ে মাটিতে লাথি মেরে চলে যায়। – এই দুই বোনই অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করেছে।

রবীন্দ্র-নাট্যে স্বাধীনচেতা নারীদের মধ্যে চিত্রাঙ্গদা অন্যতম বলিষ্ঠ চরিত্র। রবীন্দ্রনাথ *চিত্রাঙ্গদা*র ভূমিকা অংশে বলেছেন, "সুন্দরী যুবতী যদি অনুভব করে যে সে তার যৌবনের মায়া দিয়ে প্রেমিকের হৃদয় ভুলিয়েছে তাহলে সে

তার সুরূপকেই আপন সৌভাগ্যের মুখ্য অংশে ভাগ বসাবার অভিযোগে সতিন বলে ধিক্কার দিতে পারে।"[৬২]এই বোধেই তিনি অঙ্কন করেছেন চিত্রাঙ্গদা। দেব উমাপতির অমোঘ বাক্য 'কভু পুত্রী জন্মিবে না' – কে মিথ্যা প্রমাণ করে চিত্রাঙ্গদার জন্ম। তিনি 'এমনই কঠিন নারী' যে দৈব তেজ তাকে পুরুষ করতে পারে নি। তাঁর পিতা তাঁকে ধনুর্বিদ্যা রাজনীতিদণ্ড শিখিয়ে, পুরুষবেশে পুত্রের সমান করে পালন করেন। প্রজারা তাঁর সম্পর্কে বলে :

এক দেহে
তিনি পিতামাতা অনুরক্ত প্রজাদের।
স্নেহে তিনি রাজমাতা, বীর্যে যুবরাজ। (২খ,পৃ.২৩৪)

চিত্রাঙ্গদার নারীসুলভ ভয়-লজ্জা নেই, তিনি অন্তঃপুরবাস করেন না, যুবরাজরূপে রাজকাজ করেন, স্বেচ্ছামতে চলেন। শুধু জানেন না চোখের কোণে পুষ্পধনু কীভাবে বাঁকাতে হয়। পুরুষের সঙ্গে চলাফেরা করে তাদের কখনো নিজের চেয়ে আলাদা কেউ মনে হয় নি, আবার নিজেকেও মনে হয় নি আলাদা প্রাণী। মানুষই মনে হয়েছে। অর্থাৎ নারী-পুরুষ বিভেদটা তার কাছে দৃশ্যমান হয় নি– সবাইকে-ই এক রকম মানুষ মনে করেছেন। তার এই চলার ছন্দে হঠাৎ পতন ঘটে। অর্জুনকে দেখে তার নারীসত্তা জেগে ওঠে। এই প্রথম মনে হয় তাঁর সামনে কোনো পুরুষ দাঁড়িয়ে আছে। নিজের বীরত্ব অসার মনে হয়। এরপর তিনি বীরবেশ ছেড়ে রক্তাম্বর পরে সাজ-সজ্জা করেন, অর্জুনের কাছে সমর্পণ করতে চান নিজেকে। কিন্তু অর্জুন ব্রহ্মচারীব্রতধারী, তাই ফিরিয়ে দেন চিত্রাঙ্গদাকে। চিত্রাঙ্গদা বুঝতে পারেন, নিজের কুরূপতার জন্যই তাকে ফিরে আসতে হলো। মাথায় লজ্জা বজ্ররূপে ভেঙ্গে পড়ে, কিন্তু তাকে শতধা করতে পারে না। তিনি বলেছেন :

নারী হয়ে এমনই পুরুষপ্রাণ মোর। (২খ,পৃ.২১৬)

– এখানে 'পুরুষপ্রাণ' মানে কঠোর প্রাণ। এই 'পুরুষপ্রাণ' নিয়ে তিনি কখনো কষ্ট পান নি। কিন্তু এবার তার উপলব্ধি হয়, অবলার কোমল বাহুর শক্তি তার এই শক্তিশালী বাহুর চেয়ে শতগুণ বেশি। এ শক্তি শুধু পুরুষকে পাওয়ার ক্ষেত্রে, যৌনক্ষুধা নিবৃতিতে। চিত্রাঙ্গদা প্রজার মন, শত্রুর দৌরাত্ম– সমস্ত জয় করতে পারেন, অথচ প্রেম পেলেন না। তার ভিতরে প্রেমের আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর হয়, কিন্তু ধীরে ধীরে জয় করার মতো সময় হাতে নেই। তাই মদনদেবের কাছে তিনি এবার বিদ্যা শিখতে চান। মদনদেব অভয় দেন তাকে। ঋতুরাজ বসন্ত এক বছরের জন্য তাকে অপূর্ব সুন্দরী করে দেন। সুন্দরী চিত্রঙ্গদাকে দেখে এবার মুগ্ধ হন অর্জুন। অর্জুনের মনে হয় ওই সৌন্দর্যের কাছে আর সব কিছু অর্থহীন। বলেন:

কত যুদ্ধ, কত হিংসা, কত আড়ম্বর,
পুরুষের পৌরুষ গৌরব, বীরত্বের
নিত্য কীর্তিতৃষা, শান্ত হয়ে লুটাইয়া

পড়ে ভূমে, ওই পূর্ণ সৌন্দর্যের কাছে। (২খ,পৃ.২২০)

চিত্রাঙ্গদার মাধ্যমে পরীক্ষিত হলো যে, পুরুষ যত শিক্ষিত-বীর্যবান-ঐতিহ্যবান-ধর্মনিষ্ঠই হোক না কেন, কুরূপা নারীকে ফিরিয়ে দিলেও রূপবতী নারীকে উপেক্ষা করতে পারে না, বরং মোহে আচ্ছন্ন হয়ে নিজের উপাস্য পথ পর্যন্ত বিসর্জন দেয়। অর্জুন চিত্রাঙ্গদার পায়ে লুটিয়ে পড়লেন ঠিকই, কিন্তু চিত্রাঙ্গদার মনে হয়–

কোথা গেল
প্রেমের মর্যাদা? কোথায় রহিল পড়ে
নারীর সম্মান? হায়, আমারে করিল
অতিক্রম আমার এ তুচ্ছ দেহখানা। (২খ,পৃ.২২২)

সত্যিই তো, যে রূপজমোহ অর্জুনের মনে সৃষ্টি হয়েছে, সে রূপ তো চিত্রাঙ্গদার নয়। অর্জুন চিত্রাঙ্গদাকে তো ভালোবাসেন নি, চিত্রাঙ্গদার প্রতি অনুরক্ত হন নি। এ প্রসঙ্গে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেছেন, "অর্জুনের চুম্বন, আলিঙ্গন, আদর-সোহাগ, সে-সব তো প্রকৃতপক্ষে চিত্রাঙ্গদার দেহের সঙ্গেই জড়িত– তাহারই দেহে অর্পিত। প্রথম মিলনে যে জীবন-মরণ-বিস্মরণকারী 'অসহ্য পুলক', তাহা তো চিত্রঙ্গদারই।"[৬৩] – এই মতের সঙ্গে একমত হওয়া যায় না। কারণ, এই 'অসহ্য পুলক' চিত্রাঙ্গদারই বটে, তবে এই সুন্দর রূপ চিত্রাঙ্গদার নিজের নয়। অর্জুনের 'আদর-সোহাগ' তাই চিত্রঙ্গদার উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয় নি, বরং বাইরের আরোপিত সুরূপকে দিয়েছেন। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য আরো বলেছেন, "প্রেম তো প্রিয়তমের তৃপ্তির জন্য সকল আত্মবিসর্জনের সম্মুখীন হয়। তবে কি অর্জুনের প্রতি চিত্রাঙ্গদার প্রেম কৃত্রিম, অসত্য? তাহার গগনচুম্বী বিরাট *আমি*র প্রতিষ্ঠাই কি তাহার আসল উদ্দেশ্য? যাহার জন্য সে অর্জুনকেও পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত?"[৬৪] – এ সম্পর্কে বলতে পারি, 'আমি'র প্রতিষ্ঠার জন্য চিত্রাঙ্গদার অর্জুনকে দরকার হয় নি। নিজের স্থানে তিনি অনন্য। কিন্তু নারী-পুরুষের চিরন্তন যৌনাকাঙ্ক্ষার জন্য তার অর্জুনকে প্রয়োজন হয়েছে। এটা অবশ্য তার তাৎক্ষনিক আবেগজাত। কারণ আবেগের বশে সঙ্গে সঙ্গে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে প্রশ্রয় না দিয়ে ধৈর্য ধরে নিজের ব্যক্তিত্বে অবিচল থাকলে বাইরের সৌন্দর্যের কাছে মাথানত করতে হতো না। নিজস্বতায় অবিচল থেকেই কাঙ্ক্ষিতকে জয় করা যেত। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রশ্ন তুলেছেন, 'আমিত্বের' জন্য চিত্রাঙ্গদা অর্জুনকেও পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত কি-না। মানুষের উদ্দেশ্য তো 'আমিত্ব'ই হওয়া উচিত। চিত্রাঙ্গদা চরিত্রের বিশিষ্টতাই এখানে যে তিনি 'আমিত্বের' জন্য অর্জুনকেও ত্যাগ করতে প্রস্তুত। সুকুমার সেন বলেছেন, "তাহার চরিত্রে বেশ একটু পুরুষাংশ ছিল– অধৈর্য ও স্বেচ্ছাচারিতা।"[৬৫] চিত্রাঙ্গদার মানসিক দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে এই অধৈর্য এবং স্বেচ্ছাচারিতার জন্যই। সুবিবেচক চিত্রাঙ্গদা হঠাৎই কোনো বিবেচনা না করে মদন এবং বসন্তের বর গ্রহণ করেছেন এবং তার ফলস্বরূপ লাভ করেছন অর্জুনকে। এরপরই চিত্রাঙ্গদার মনে দ্বন্দ্ব

উপস্থিত হয়। কোমল নারী আর বীর নারীর দ্বন্দ্ব। সৌন্দর্য তাঁর কাছে অভিসম্পাত মনে হয়। "সৌন্দর্যহীন সত্য, মিথ্যা সৌন্দর্যের চেয়ে অনেক গুণে বরণীয়; বাস্তব আমাদের যতই আঘাত করুক শেষ পর্যন্ত তাহাই শেষ নির্ভর।"[৬৬] তাই অর্জুনের প্রেমের স্তুতিবাক্য, সৌন্দর্য বর্ণনা, এমনকি মিলনেও চিত্রাঙ্গদা সন্তুষ্ট হতে পারেন না, নিজেকে বঞ্চিত মনে হয়। এবং এ মনে হওয়াটা অমূলক নয়; কারণ, নিজের রূপে তিনি অর্জুনের কাছে নিগৃহীত হয়েছিলেন। মানুষটির ভিতরের মনুষ্যত্ব-ব্যক্তিত্ব-বীরত্ব-মূল্যবোধ কোনো কিছুই নয়, কেবলমাত্র বাহ্যিক সৌন্দর্য অর্জুনকে মুগ্ধ করেছে। দেহের সোহাগে তাই তার অন্তর জ্বলে হিংসানলে। তিনি মদনদেবকে বর ফিরিয়ে নিতে বলেন। নিজের নিজস্বতা তার কাছে ছদ্মরূপিণীর চেয়ে শতগুণে শ্রেষ্ঠ। চিত্রাঙ্গদার শ্রেষ্ঠত্বও এখানে। কিন্তু মদন-বসন্ত কেউ-ই এ প্রস্তাবে রাজি হন না। সুতরাং চিত্রাঙ্গদা আর অর্জুনের প্রেম চলতেই থাকে। চিত্রাঙ্গদা তার মনের অবস্থা বলে যান অকপটে, অর্জুন বুঝতে পারেন না কিছু, কিন্তু রহস্যের আবরণে তার প্রেম আরো বেড়ে ওঠে। চিত্রাঙ্গদার স্বভাবে কোনো বন্ধন ছিলো না। তাই, ক্ষণিকের খেলা তার সহে– চিরদিবসের পাশ বইতে পারেন না। তরঙ্গের মতো তার গতি। বীর্য তার অভ্রভেদী। বসন্তের বরে ছদ্মবেশে থাকা অবস্থায়ও মাঝে মাঝে অর্জুনের চোখে ধরা পড়ে তার তেজস্বিনী রূপ। এ জন্য অর্জুন ধোঁয়াশার মধ্যে থাকেন– কিছু বুঝে উঠতে পারেন না। অর্জুনের কথায় সে পরিস্থিতি প্রকাশ পায় :

> তেজস্বিনী, পরিচয়
> পাই তব মাঝে মাঝে কথায়।
> তার কাছে এ সৌন্দর্যরাশি মনে হয়
> মৃত্তিকার মূর্তি শুধু, নিপুণচিত্রিত
> শিল্পযবনিকা। (২খ,পৃ.২৩৮)

বছর শেষে চিত্রাঙ্গদা নিজেই বলেন, তার শোভা নেই, আছে 'অক্ষয় অমর এক রমণী-হৃদয়'। এ যেন যৌনশক্তির অবসান ঘটে। তার বেঁচে থাকা কেবল ছলাকলা নয়, সমগ্র জীবনবোধে তার দৃপ্তপদচারণা। রাজনীতিতে তিনি বুদ্ধিদীপ্ত-বিচক্ষণ। তাই অর্জুনের সঙ্গে বনে অবস্থানের সময় শত্রু আসতে পারে আশঙ্কায় আগেই তিনি বিচার-বিবেচনা করে বিপদের সমস্ত পথ বন্ধ করে দিয়েছেন, স্থাপন করেছেন সতর্ক প্রহরী। তিনি জানেন, অর্জুনও এমনি বিচক্ষণ, কিন্তু নারীর বেলায় সেই বিচক্ষণতা দেখা যায় না। তাই তিনি স্পষ্টবাদীর মতোই অর্জুনের সমালোচনা করেন। পুরুষের চোখ কত ভয়ঙ্কর তা তিনি জেনেছেন অর্জুনের আচরণেই। বীর অর্জুনও বীর নারীতে আনন্দিত নন, সৌন্দর্যের কাছে নতজানু। স্বরূপে 'পুরুষ প্রথা'য় যেদিন তিনি অর্জুনের আরাধনা করেছিলেন, সেদিন তিনি পান নি অর্জুনকে। তাই অর্জুনকেও সত্য বলতে ছাড়েন না চিত্রাঙ্গদা। তিনি বলেন :

কামিনীর

ছলাকলা মায়ামন্ত্র দূর করে দিয়ে

উঠিয়া দাঁড়াই যদি সরল উন্নত

বীর্যমন্ত অন্তরের বলে, পর্বতের

তেজস্বী তরুণ তরুসম, বায়ুভরে

আনম্র সুন্দর, কিন্তু লতিকার মতো

নহে নিত্য কুণ্ঠিত লুণ্ঠিত – সে কি ভালো

লাগিবে পুরুষ-চোখে। (২খ,পৃ.২৩৭)

এখানে 'পুরুষ-চোখ' মানে পুরুষের মনোভাব। চিত্রাঙ্গদা বুঝতে পেরেছেন পুরুষেরা কোমল লতিকাকেই পছন্দ করেন। বীর্যমন্ত নারীকে করেন ঘৃণা। আর পুরুষের এই মনোভাবকে ঘৃণা করেন চিত্রাঙ্গদা। যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষে চলে আসছে সুন্দরী নারী ভোগের ইতিহাস। রূপকথার গল্পে সুন্দরী রাজকন্যাকে বিয়ে করতে রাজপুত্রদের ভিড়, যুদ্ধ কত কি! অর্জুনও এর ব্যতিক্রম নন। অর্জুনকেও তার কাছে সাধারণ পুরুষের মতো যৌন-পীড়িত অসারই মনে হয়। রাজনীতিজ্ঞ-বিচক্ষণ-সর্বগুণত মানুষ মনে হয় না। নাটকে প্রেমরই এক পর্যায়ে বাস্তবতার মুখোমুখি হন চিত্রাঙ্গদা। নারীর রূপের মোহের ক্ষণস্থায়ীতার বাস্তবতা। কিছুদিন পরই ব্যক্তি-মানুষের বাইরে পরিচয়ের প্রসঙ্গ আসে– নাম-গৃহ-পরিবার পরিজন-বংশ-গোত্র। চিত্রাঙ্গদার কাছে প্রমাণিত হয় বাইরের রূপ শুধু মোহ। এ মোহ কাটতে সময় লাগে না। তিনি বলেন :

এখনো যে বর্ষ যায় নাই, শ্রান্তি এরি

মাঝে? হায় হায়, এখন বুঝিনু পুষ্প

স্বল্পপরমায়ু দেবতার আশীর্বাদে। (২খ,পৃ.২৩৩)

রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, দেহজরূপসৌন্দর্য মানুষকে ক্লান্ত করে। এরপর বনচরের মুখে অর্জুন শোনেন বীর চিত্রাঙ্গদার কথা, উৎসুক হয়ে ওঠেন তিনি। সৌন্দর্যের মোহ তাঁর কমে আসে। চিত্রাঙ্গদার সম্পর্কে 'শ্রবণলালসা' বেড়ে যায়। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথ চিত্রাঙ্গদার রূপ-মোহকে বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের ভাবস্তরে উন্নীত করিয়া ও উহার আকূতি-কামনার উপর কাব্যানুভূতির এক অতি সূক্ষ্ম, পেলব আবরণ বিস্তৃত করিয়া উহাকে পরিশ্রুত করিয়াছেন।"[৬৭] শেষ পর্যন্ত নাটকের পরিণতি তা-ই ঘটেছে। তবে, এতে অর্জুনের মনের কতটা পরিবর্তন হয় তা বোঝা যায় না। চিত্রাঙ্গদার পরিচয় পেয়ে তিনি বলেন, 'প্রিয়ে আজ ধন্য আমি।'– ততক্ষণে চিত্রাঙ্গদার রূপজমোহে পরিশ্রান্ত তিনি, আবার বীর চিত্রাঙ্গদার কথা শুনে আগ্রহান্বিতও ছিলেন। এই সময় দেখেন এই রূপবতীই আসলে রূপহীন চিত্রাঙ্গদা। নতুন খেলায় মেতে ওঠা তাই অমূলক নয়। সঙ্গত কারণেই বলা যায়, পুরুষ-

স্বভাবেই এ কথা তিনি বলেছেন। তবে, বলাই বাহুল্য, চিত্রাঙ্গদার ক্ষেত্রে রূপ-মোহ সৌন্দর্যের ভাবস্তরে উন্নীত হয়েছে। চিত্রাঙ্গদা শেষ পর্যন্ত নিজের সত্তায়ই তিনি স্থির হন এবং বলেন :

আমি চিত্রাঙ্গদা

দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী। (২খ,পৃ.২৪১)

তার দেবী হওয়ার বাসনা নেই, তিনি পূজা পছন্দ করেন না, অবহেলা পছন্দ করেন না, সংকটের পথে, দুরূহ চিন্তার অংশ ধারণ করে পাশে থাকতে চান – সহচরী হতে চান। এই 'সহচরী' বিষয়টি নিয়ে হুমায়ুন আজাদ তীব্র সমালোচনা করেছেন। বলেছেন, "ছক-ভাঙা নারীকে ছকের মধ্যে পুনর্বিন্যস্ত করার সফল উদাহরণ *চিত্রাঙ্গদা*। *চিত্রাঙ্গদা* ভিক্টোরীয় *ঘরেবাইরে* বা *পৃথক এলাকা* বা *সহচরীতত্ত্বের* এক নিরীক্ষা, যাতে প্রমাণ করা হয়েছে যে নারী স্বাধীন স্বায়ত্তশাসিত হওয়ার অযোগ্য; সে হ'তে পারে বড়োজোর পুরুষের সহচরী। ভিক্টোরীয়রা নারীকে ততোটুকু শিক্ষা দিতে রাজি হয়েছিলো, যতোটুকুতে তারা হ'তে পারে স্বামীর যোগ্য সহচরী;– নারী নিজে প্রধান হয়ে উঠবে না, পুরুষই থকিবে প্রধান, নারী পালন করবে সহকারী সহচরীর ভূমিকা। ... *চিত্রাঙ্গদা*র কাঠামো অভিন্ন, একটি বিদ্রোহী নারী স্বাধীন রাজকন্যাকে এতে কামের সহযোগিতায় রূপান্তরিত করা হয় পুরুষের সহচরীতে। চিত্রাঙ্গদার শুরু ছক-ভাঙা নারীরূপে, আর তার বিলুপ্তি ঘটে ছকবদ্ধ নারীতে।"[৬৮] আমার ধারণা এখানে 'সহচরী' বলতে রবীন্দ্রনাথ 'সহযোদ্ধা'ই বুঝিয়েছেন। কারণ 'চিত্রাঙ্গদা'র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে 'সহযোদ্ধা' হওয়াই যুক্তিযুক্ত। তাই স্বীকার করতে হয় নারীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য প্রকাশে তার দৃঢ়তা বিস্ময়কর। "চিত্রাঙ্গদা কাহিনীকে অবলম্বন করে কবি একটি বিশেষ তত্ত্বকথা প্রকাশ করেছেন এবং সে তত্ত্ব বিশেষভাবে আধুনিক মনের সৃষ্টি।"[৬৯] আধুনিক বোধ মানে সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলা। চিত্রাঙ্গদা যা চেয়েছেন, বর্তমান যুগের নারীরাও তা অর্জন করতে পারেন নি, বরং সংগ্রাম করে চলেছেন। তাই পম্পা মজুমদার যা আধুনিক বলেছেন, তা আধুনিক-ই নয় বরং আধুনিকের চেয়ে এগিয়ে। এ ক্ষেত্রে সৌমিত্র শেখরের মত যুক্তিযুক্ত। তিনি বলেছেন : "*চিত্রাঙ্গদা*'য় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নারীচেতনা থেকে মানবিকচেতনায় উত্তরণ। আধুনিক তাত্ত্বিক প্রণোদনায় যে নারীমুক্তির কথা বলা হয়, *চিত্রাঙ্গদা*'য় প্রকাশিত নারীর আত্মমুক্তিসাধনা তার চেয়েও একধাপ এগিয়ে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদেই একবিংশ শতাব্দীর এই ভাবনায় যেন নিজের মত প্রকাশ করে গেছেন রবীন্দ্রনাথ।"[৭০]

মহাভারতে চিত্রাঙ্গদা ছিলেন পরমাসুন্দরী। তাকে দেখেই অর্জুন রাজার কাছে গিয়ে বলেন :

রাজন! আমি ক্ষত্রিয়, এই কন্যা আমাকে সম্প্রদান করুন।[৭১]

এরপর রাজা অর্জুনকে বলেন যে, ভগবান ভবানীপতির বরে তাদের বংশে কোনো কন্যা জন্মগ্রহণ করে নি। কিন্তু চিত্রাঙ্গদা সেই বরকে অগ্রাহ্য করে কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাই রাজা চিত্রাঙ্গদাকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ

করেছেন। যাতে করে চিত্রাঙ্গদার গর্ভজাত সন্তান তার নিজের বংশধর হয়। এই নিয়মে সম্মত হলে অর্জুন তাঁর কন্যার পাণিপীড়ন করতে পারবে। অর্জুন নিয়মানুরূপ প্রতিজ্ঞা করে চিত্রাঙ্গদার পাণিগ্রহণ করেন এবং সেখানে তিন বছর বাস করেন। এরপর পুত্র জন্মগ্রহণ করলে তাকে রেখে সেখান থেকে বিদায় নেন। – এ কাহিনি থেকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়েছে নাটকের কাহিনি। নাটকে চিত্রাঙ্গদা স্বয়ং সম্পূর্ণ। পিতার মধ্যস্থতার দরকার হয় নি। তবে কুরূপা চিত্রাঙ্গদাকে অর্জুন গ্রহণ করেন নি, মহাভারতের চিত্রাঙ্গদা কুরূপা ছিলেন না। নাটকের চিত্রাঙ্গদা নিজের বীর্যে গর্বিত- মহাভারতের চিত্রাঙ্গদার বীরত্বের সন্ধান পাওয়া যায় না। বরং বহু বছর পর তার ছেলে যখন অর্জুনকে যুদ্ধে পরাজিত করে, তখন তিনি সাধারণ নারীর মতো বিলাপ করেতে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য নাটকে সেই পর্যন্ত কাহিনি নেন নি। তবে মনে হয় রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা বীর পুত্রের গর্বে গর্বিত হতেন।

বিদায়-অভিশাপ নাটকে দেবযানী একমাত্র নারী চরিত্র। সহস্রবর্ষের সাধনায় আচার্যের কাছে বিদ্যা লাভ করে কচ স্বর্গে যাচ্ছেন। এই সহস্র বছর যে দেবযানীর প্রেমেও সিক্ত হয়েছেন, সে কথা উল্লেখ করছেন না কচ। কিন্তু দেবযানী স্বর্গের দেবতা নন মর্তের মানুষ। তাই তিনি ভালোবাসা ভুলতে পারেন না। কচকে জিজ্ঞাসা করেন মনের ক্ষুদ্র কোণে যা কুশের অঙ্কুরসম 'আর কিছু কামনা' আছে কি-না। বার বার প্রশ্নেও কচ এর আশানুরূপ উত্তর দেন না। বরং বলেন :

আজি পূর্ণ কৃতার্থ জীবন। কোনো ঠাঁই
মোর মাঝে কোনো দৈন্য কোনো শূন্য নাই। (২খ,পৃ.৩০১)

এরপর দেবযানী কচকে ব্যঙ্গ করে অন্তর্জ্বালা মিটিয়েছেন। প্রথমে চেষ্টা ছিল কচের মুখ দিয়ে প্রেমের কথা প্রকাশ করতে। এ চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর তিনি বললেন :

তুমি সুখী ত্রিজগৎ মাঝে। (২খ,পৃ.৩০১)

স্বর্গের দেবতাদের আবেগ নেই, দুঃখ নেই। তাই তারা মর্তে এসে মানুষকে দুঃখ দিয়ে যান নির্লিপ্তভাবে। কচ স্বর্গে উপস্থিত হলে, স্বর্গে যখন আনন্দধ্বনি উঠবে, মনোহর সুরে মঙ্গলশঙ্খ বাজবে, সুরাঙ্গনাগণ কচের মাথায় পুষ্প বর্ষণ করবে, তখন দেবযানীর হৃদয় ধরায় লুটিত হবে। এখানে ঘটবে সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটনা। দেবযানী ব্যঙ্গ করে বলেন :

যথাসাধ্য পূজিয়াছি দরিদ্রকুটিরে
যাহা ছিল দিয়ে। তাই ব'লে স্বর্গসুখ
কোথা পাব। (২খ,পৃ.৩০২)

দেবযানী সর্বস্ব দিয়ে পূজা করেছেন। কিন্তু স্বর্গসুখ দিতে পারেন নি। এমনকি সুরললনার কোনো অনিন্দিত মুখও নেই এখানে। এই অপরাধের ক্ষমা চান দেবযানী। ভালোবাসার মানুষকে এর চেয়ে বড়ো ব্যঙ্গ বাংলাসাহিত্যে কমই আছে। দেবযানী দুঃখ-যন্ত্রণায় কাতর হয়ে ভেঙে পড়েন নি, অভিমানে বাক্যহীন-নির্লিপ্ত থাকেন নি কিংবা আত্মহননের পথ বেছে নেন নি। চেষ্টা করেছেন কচকে ফিরিয়ে নিজের কাছে রাখতে। এ কথা বলবার জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেছেন তিনি। সুন্দরী অরণ্যভূমি, পাখির কূজন, তরুরাজি, বটতল, দুগ্ধদায়িনী গাভী, কলস্বনা স্রোতস্বিনী বেনুমতী – এরা যারা কচের সেবা করেছে তাদের কথা বলেছেন। এদের সবার ঋণ উচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে স্বীকার করেন কচ। অবশেষে দেবযানী নিজের কথা বলেন :

হায় বন্ধু, এ প্রবাসে
আরো কোনো সহচরী ছিল তব পাশে,
পরগৃহবাসদুঃখ ভুলাবার তরে
যত্ন তার ছিল মনে রাত্রিদিন ধরে–(২খ,পৃ.৩০৪)

কচ জানান চিরদিনের জন্য সে নাম গাঁথা হয়েছে। দেবযানী-ই তার পিতাকে বলে পিতার কাছে কচের বিদ্যা শেখার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। দৈত্যরা ঈর্ষাভরে কচকে বধ করেছে দেবযানী দয়া করে প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছেন। এসব কারণে কচ দেবযানীকে কৃতজ্ঞতা জানান। এ কৃতজ্ঞতায় দেবযানীর কষ্ট আরো বেড়ে যায়। প্রেম-সুখ নয় কৃতজ্ঞতা। কৃতজ্ঞতার কথায় তার নিজেকে অপমানিত মনে হয়। মনে হয় তার সঙ্গে প্রয়োজনীয়তার সম্পর্ক ছিলো। কারণ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে প্রয়োজনের সম্পর্ক, আর সুখের সঙ্গে মনের আবেগের সম্পর্ক। কোনো উপায় না পেয়ে দেবযানী সরাসরিই কচকে বলেন স্বর্গে ফিরে না যেতে। এইখানেই দুজনে অভিনব স্বর্গলোক রচনা করতে চান। কারণ, প্রতিদিনের জীবনযাপনে সুখের বেষ্ঠনী রচনা করতেন। এতোদিনের সেই গড়ে ওঠা প্রেম তার কাছে অনেক বড়ো। একে কিছুতেই ছাড়তে চান না। তার যুক্তি হলো জগতে শুধু বিদ্যার জন্যই দুঃখ সহে না, রমণীর জন্যও 'মহাতপ' সহ্য করে পুরুষ। "প্রেমস্পর্ধায় দেবযানী এমন মহীয়সী হইয়া উঠিয়াছে যে, সে নিজেকে সঞ্জীবনীবিদ্যার প্রতিদ্বন্দ্বিনীরূপে কচের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছে।"[৭২] কিন্তু কচ প্রেমকে সেভাবে কামনা করেন না। এ কথা শুনেও দেবযানী ভেঙে পড়েন না। কৃত কর্মের কৈফিয়ত চান। কেন অধ্যায়নশালা ছেড়ে বন বনান্তর খুঁজে ফুলের মালা গেঁথে এনে দিতো, প্রভাতে গ্রন্থপাঠ রেখে শিশিরসিক্ত কুসুমরাশিতে করতো পূজা, অপরাহ্নে জলসেকের জন্য তুলে দিতো জল, পালন করতো দেবযানীর মৃগশিশুটিকে, স্বর্গের সঙ্গীত শুনাতো। তবে কি এ সব করেছে শুধু দেবযানীকে বশ করে তার পিতার কাছে বিদ্যা শেখার জন্য? এরপর কচ স্বীকার করেছেন তাঁর প্রেমের কথা। বলেছেন :

চিরতৃষ্ণা লেগে থাকে দগ্ধ প্রাণে মম
সর্বকার্য-মাঝে– তবু চলে যেতে হবে
সুখশূন্য সেই স্বর্গধামে। (২খ,পৃ.৩০৯)

কর্তব্যের কাছে কচের প্রেম পরাজয় স্বীকার করেছে। এ কর্তব্য স্বর্গের দেবতাদের প্রতি। তবে এ শুধু কর্তব্যই নয় কচের প্রাণের সার্থকতাও বটে। দেবযানীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কের মর্যাদা না দিলে সেটা প্রতারণা। কচ এই প্রতারণা করতে উদ্যত হয়েছে। যদি এ সম্পর্ক স্বীকার করে নীড় বাঁধতে না পারে, তবে গড়ে তোলাই উচিত হয় নি। স্পষ্টভাষী দেবযানীর পরিস্কার কথা :

তুমি চলে যাবে স্বর্গলোকে
সগৌরবে, আপনার কর্তব্যপুলকে
...
আমার এ প্রতিহত নিষ্ফল জীবনে
কী রহিল, কিসের গৌরব? (২খ,পৃ.৩০৯)

সর্বশেষে অপমানে-দুঃখে-যন্ত্রণায়- রাগে দেবযানী কচকে অভিশাপ দেন :

যে বিদ্যার তরে
মোরে কর অবহেলা, সে বিদ্যা তোমার
সম্পূর্ণ হবে না বশ – তুমি শুধু তার
ভারবাহী হয়ে রবে, করিবে না ভোগ;
শিখাইবে, পারিবে না করিতে প্রয়োগ। (২খ,পৃ.৩০৯)

যুক্তির দিক দিয়ে দেবযানী কোনো ভুল করেন নি। নিজের প্রাপ্য বুঝে চেয়েছেন। যুগে যুগে দেবতারা নিজের প্রয়োজনের সময় নারীদের সঙ্গ লাভ করে সুখী হয়েছেন। এরপর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে সেই নারীকেই দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে চলে গেছেন নিজের কাজে। ফিরে দেখেন নি, মেয়েটির কী হলো। কৃষ্ণও রাধাকে রেখে চলে গেছেন, অথচ একদিন রাধাকে পাওয়ার জন্য নিজে উপজাচক হয়ে প্রেম নিবেদন করেছিলেন। দেবতাদের সেই প্রতারণা প্রথার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ দেবযানীকে দিয়ে প্রতিবাদ করিয়েছেন। দেবযানীর নারীজীবনের অভিনবত্ব এবং সার্থকতা এখানেই। দেবযানীর কাছে প্রেম মহৎ এবং দুর্লভ। তিনি বলেছেন:

হায়
বিদ্যাই দুর্লভ শুধু, প্রেম কি হেথায়
এতই সুলভ? (২খ,পৃ.৩০৭)

অন্য কারো প্রেম হলে তিনি কী বলতেন, তা জানা যায় না। এ তাঁর নিজের প্রেম– নিজের মনের আবেগ। এ আবেগকে তিনি আড়াল করতে বা শেষ করতে চান নি। অকপটে সরাসরিভাবে এর আবেদন জানিয়েছেন। এক্ষেত্রে চরিত্রটি সর্বাঙ্গীণ আধুনিক। পুরাণযুগে দেবতার সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে নারীরা কষ্ট পেয়েছেন, বর্তমান কালেও মেয়েরা ভাগ্যকে মেনে নেন অনেক সময় কোনো রকম প্রতিবাদ ছাড়াই। কিন্তু দেবযানী দেবতার নির্ধারিত কর্তব্যকে অস্বীকার করে নিজের অধিকারের কথা বলেছেন। বলেছেন :

রমণীর মন

সহস্রবর্ষেরই, সখা, সাধনার ধন। (২খ,পৃ.৩০৭)

এ অধিকার বোধ নিজের অস্তিত্ব, সম্মান, আমিত্ব প্রকাশের ঘোষণা। 'মেনে নেওয়া'র যুগে মেনে না নিয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ করা এবং নিজের অধিকারের কথা বলা দুঃসাহসের। দেবযানী তা-ই করেছেন।

মহাভারতের কাহিনী প্রায় অবিকৃত রেখেছেন রবীন্দ্রনাথ। মহাভারেতে রয়েছে কচ সরাসরি শুক্রাচার্যের কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে শিষ্য হতে চেয়েছেন, আর নাটকে দেবযানীর মাধ্যমে শুক্রাচার্যের কাছে পৌঁছেছেন। কারণ, নাটকে কচের মনে শঙ্কা ছিলো দানবের গুরু স্বর্গের ব্রাহ্মাণকে ফিরিয়ে দিতে পারেন। দেবযানী পিতার কাছে কচের শিষ্যত্ব ভিক্ষা চেয়ে কচকে শিষ্য হতে সাহায্য করে। এছাড়া, মহাভারতে কচের দেবলোকে ফিরে যাওয়ার সময় দেবযানী কচকে অভিশাপ দিলে কচও দেবযানীকে অভিশাপ দিয়েছেন। বলেছেন :

> আমি তোমাকে প্রতিশাপ প্রদান করিতেছি, তুমি যাহা অভিলাষ করিতেছ, তাহা নিষ্ফল হইবে এবং অন্য কোন ঋষিকুমারও তোমার পাণিগ্রহণ করিবেন না। আর তুমি আমাকে অভিসম্পাত করিলে যে, তোমার অধীত বিদ্যা সিদ্ধ হইবে না; ভাল, তাহা আমি স্বীকার করিলাম; কিন্তু আমি যাহাকে ঐ বিদ্যা অধ্যায়ন করাইব, সে তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে।[৭৩]

এখানে কচই বলেন যে যদিও তিনি প্রয়োগ করতে পারবেন না কিন্তু শিখাতে পারবেন। অন্যদিকে নাটকে দেবযানী নিজেই বলেন :

শিখাইবে, পারিবে না করিতে প্রয়োগ। (২খ,পৃ.৩০৯)

রবীন্দ্রনাথ কচকে দিয়ে 'প্রতিশাপ'-এর পরিবর্তে 'বর' দেওয়ান। তাই রবীন্দ্রনাথের কচ মহান হয়েছেন। কচ বলেছেন:

আমি বর দিনু, দেবী, তুমি সুখী হবে।

ভুলে যাবে সর্বগ্লানি বিপুল গৌরবে। (২খ,পৃ.৩০৯)

মহাভারতে দেবযানীর প্রতি কচের কোনো প্রেমানুভব প্রকাশ পায় নি। নাটকে প্রেম বিদ্যমান। বিক্ষত প্রেমিকের মতোই তিনি বলেন :

আর যাহা আছে তাহা প্রকাশের নয়
সখী। বহে যাহা মর্মমাঝে রক্তময়
বাহিরে তা কেমনে দেখাব। (২খ,পৃ.৩০৬)

'কাব্যের তাৎপর্য' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ দেবযানী এবং কচকে দেহ এবং আত্মার রূপক উল্লেখ করেছেন–

১. জীব স্বর্গ হইতে এই সংসারাশ্রমে আসিয়াছে। সে এখানকার সুখদুঃখ বিপদ-সম্পদ হইতে শিক্ষা লাভ করে। যতদিন ছাত্র-অবস্থায় থাকে ততদিন তাহাকে এই আশ্রমকন্যা দেহটার মন জোগাইয়া চলিতে হয়।[৭৪]

২. আমরা একবার করিয়া আপনাকে বাঁধি, আবার পরক্ষণেই সেই বন্ধন ছেদন করি। আমাদিগকে ভালোবাসিতেও হইবে এবং সে ভালোবাসা কাটিতেও হইবে– সংসারের এই মহত্তম দুঃখ, এবং এই মহৎ দুঃখের মধ্য দিয়াই আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হয়।[৭৫]

তা যদি হয়, তাহলেও আত্মার প্রতি দেহের এই অধিকারবোধ দেহের নিজস্ব অস্তিত্ববোধেরই পরিচয়। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "কচ কামুকী দেবযানীর অভিশাপ নীরবে বহন করিয়া 'মহাসঞ্জীবনী বিদ্যা করে উপার্জন' দেবলোকে প্রত্যাগমন করিল। অর্থাৎ নারীর কামনার ইন্দন না হইয়া, সে আদর্শকে বড় করিয়া দেখিল। দেবযানীর ন্যায় সাধারণ নারীর পক্ষে তাহা অসহ্য।"[৭৬] – এ সম্পর্কে বলা যায়, কচ আদর্শকে বড়ো করে দেখেছেন ঠিকই, কিন্তু দেবযানীর সঙ্গে যে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন করেছেন, তাকেও তিনি অস্বীকার করতে পারেন না। তিনি প্রথম থেকেই জানতেন যে তাকে ফিরে যেতে হবে দেবালয়ে। তাহলে কেন তিনি দেবযানীর সঙ্গে প্রেমময় সময় কাটালেন। এর অর্থ কি এই নয় যে, কচ নিজের প্রয়োজনে স্বার্থপরের মতো দেবযানীর প্রেম গ্রহণ করেছেন, এবং প্রয়োজন শেষ হলে তিনি আর দেবযানীর কথা চিন্তা না করে নিজের কর্তব্যে চলে গেছেন। এ ক্ষেত্রে নিজের অধিকার পাওয়ার জন্য দেবযানীর যে চেষ্টা তাকে কামুকী বলা যুক্তিযুক্ত নয়। প্রায় একই কথা রণেন্দ্র নারায়ণ রায় বলেছেন– "নারীই শিকারী, পুরুষ শিকার। এই নাটকেও দেবযানী কচের অনুসরণকারিণী, কচকে চাতুরী ও ছলনায় শেষ পর্যন্ত অভিযুক্ত করে, অভিসম্পাত দেয়।"[৭৭]– এ মন্তব্য যুক্তিনিষ্ঠ বলে মনে হয় না। দেবযানী কচের কাছে যান নি, কচই নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য দেবযানীকে অবলম্বন করেছেন। বরং সুকুমার সেনের মন্তব্য দেবযানীর যন্ত্রণাদগ্ধ মনকে শান্ত করে। তিনি মন্তব্য করেছেন, "নিষ্ফল প্রণয়ের শূন্য বেদনামাত্র নয়, প্রত্যাখ্যানের দুর্বিসহ লজ্জাই তাহার জীবনের শান্তি এবং সংসারের মর্যাদা নষ্ট করিয়া দিবে। সুতরাং কচকে সে ক্ষমা করিতে পারে না।"[৭৮] প্রমথনাথ বিশী বলেছেন, "দেবযানী প্রাচীনতম মডার্ন উওম্যান।"[৭৯]– সত্যিই দেবযানী অধিকার আদায়ের আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে 'মডার্ন উওম্যান' হয়ে উঠেছেন।

*মালিনী*তে মালিনী নিজের লক্ষ্যে অবিচল চরিত্র। বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি নিষ্ঠাবান হওয়াই তার লক্ষ্য। সমাজবাস্তবতায় একটি মেয়ের পক্ষে একা তার মতাদর্শ প্রচার করা দূরের কথা পালন করাও কঠিন। কারণ প্রাচীন থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ইতিহাস খুবই ক্ষীণধারায় প্রবাহিত। সে সময় নিজের মতে জীবনযাপন করা দুঃসাধ্য। শুধু মেয়ের ক্ষেত্রেই নয়, ছেলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যে, নতুন ধর্মমত প্রতিষ্ঠা খুব সাধারণ কথা নয়; পারিবারিক সামাজিক ধর্মীয় বাধা তো আসবেই, রক্তক্ষরণও খুব সাধারণ ব্যাপার। তাই একটি মেয়ের জন্য নতুন ধর্ম প্রতিষ্ঠা কল্পনাতীত। সুতরাং বলা যায় মালিনী চরিত্র রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট এক সাহসী চরিত্র। মালিনী অস্তিত্বশীল-দূরদৃষ্টিসম্পন্ন-জীবপ্রেমিক। একগুয়েও বটেন। নারী মনের স্বাভাবিক আবেগও তার ভিতরে দেখা যায়। ধর্মের গোঁড়ামী বা অহংকার তাকে আবদ্ধ করে নি। বরং উদার হয়েছেন তিনি। সবচেয়ে বড়ো কথা তিনি সংগ্রামী এবং প্রতিবাদী চরিত্র। কারণ তিনি নিজের মতে জীবনযাপন করেন। নিজের মত সমাজে প্রতিষ্ঠার জন্য রাজকীয়তা ত্যাগ করে সাধারণ নিয়মের প্রতিবাদী এবং নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সংগ্রামী হয়েছেন।

রাজকন্যা হয়েও তিনি মোহ-শোক ত্যাগী। নিরাভরণ- দরিদ্রসদৃশ। 'সর্বজীবে দয়া' তার একমাত্র ব্রত। বৌদ্ধভিক্ষু এসে তাকে শাস্ত্র শিক্ষা দেন। কাশ্যপ তাকে আশীর্বাদ করেন 'বিভাবরী'র অবসান হবে। কাশ্যপ বলেন :

> ত্যাগ করো, বৎসে, ত্যাগ করো সুখ-আশা
> দুঃখভয়; দূর করো বিষয়পিপাসা;
> ছিন্ন করো সংসারবন্ধন; পরিহরো
> প্রমোদপ্রলাপ চঞ্চলতা; চিত্তে ধরো
> ধ্রুবশান্ত সুনির্মল প্রজ্ঞার আলোক
> রাত্রিদিন– মোহশোক পরাভূত হোক। (২খ,পৃ.৩১৭)

মালিনী রাজ-ঐশ্বর্য ছেড়ে তাই ভিখারির বেশ ধরেন। মা-বাবা-ভাই কারো কাতর প্রার্থনাই তাকে তার পথ থেকে সরাতে পারে না। মালিনী রাজকন্যা। ঘরের বাইরে যান নি, সুখের প্রাচীরেই তিনি বেড়ে উঠেছেন। কিন্তু তিনি অন্তরে মানবমুক্তির ডাক অনুভব করেন। তার মনে হয়, জগতে গৃহহীন যাত্রীরা নিরাশ্বাস বসে আছে, আর তিনি নিজে তাদের কর্ণধার। তিনিই পারেন অসহায় যাত্রীদের তীরের সন্ধান দিতে। মালিনী নিজে জানেন না কোথা থেকে তার এই বিশ্বাস এসেছে। অথচ, এ কথা তার মনে সারাক্ষণ আলোড়িত হচ্ছে। কিছু না বুঝেই তার হৃদয় কেঁদেছে। তিনি তাই পিতামাতার কাছে আকুলভাবে বলেন :

> বন্ধ কেটে দাও মহারাজ,
> ওগো, ছেড়ে দে মা, কন্যা আমি নহি আজ,
> নহি রাজসুতা – যে মোর অন্তরযামী

অগ্নিময়ী মহাবাণী, সেই শুধু আমি। (২খ,পৃ.৩২০)

রাজপুত্র সিদ্ধার্থ বা গৌতম যেভাবে গৌতমবুদ্ধ হয়েছেন, মানবমুক্তির দূত হয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ মালিনীকে তেমনি করে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। সুখের প্রাচীরের ভিতরে প্রবেশ করেছে সাধারণ মানুষের যন্ত্রণাবিদ্ধ অনুভব। বেড়িয়ে এসেছেন রাজপ্রাসাদ থেকে। সকলের ঘরকে নিজের করে নিয়েছেন। সকলকে জিজ্ঞাসা করেছেন তাদের কী প্রয়োজন- কী কাজ তিনি করে দিতে পারেন সকলের জন্য। সর্বসাধারণের সঙ্গে এক হয়ে যান। প্রজাদের দুঃখের পরিচয় প্রজাদের সঙ্গে এক হয়ে নিতে চান। তিনি একা সকলের দুঃখ দূর করতে নিজ হৃদয় থেকে সান্তনা-সুধার অনন্ত প্রবাহ প্রবাহিত করতে চান। তিনি সর্বসাধারণকে জ্যোৎস্নালোকের স্নিগ্ধতার সাথে তুলনা করেন। মালিনীর কথায় বিদ্রোহী ব্রাহ্মণ প্রজারা অভিভূত হয়ে পরেন। তারা তাঁকে 'বিশ্বদেবী' নামে আখ্যায়িত করেন। এবং মুক্তির দূত মনে করে বলেন :

মা গো, শুন,
আমাদের ভুলিয়ো না আর। মাঝে মাঝে
শুনি যেন শ্রীমুখের বাণী, শুভকাজে
পাই আশীর্বাদ, তা হলে পরান-তরী
পথ পাবে পারাবারে – ধ্রুবতারা ধরি
যাবে মুক্তিপারে। (২খ,পৃ.৩৩০)

প্রজাদের উল্লাসে মালিনী নিজেও উল্লাসিত হয়ে ওঠেন। সকল প্রজার অন্তরে স্থান করে নিয়ে তিনি মুক্তি পান। তিনি নিজের মাকে বলেন :

তব অন্তঃপুরে আমি আনিয়াছি সাথে
সর্বলোক – দেহ নাই মোর, বাধা নাই,
আমি যেন এ বিশ্বের প্রাণ! (২খ,পৃ.৩৩১)

রাজা তাকে 'লোকলক্ষ্মী মাতা' বলে সম্বোধন করেছেন। আর মহিষী তাকে বলেছেন 'বিশ্বপ্রাণ'। মালিনী সত্যিই বিশ্বপ্রাণ হয়ে ওঠেন। তাই বিদ্রোহী ক্ষেমংকরকে রাজা প্রাণদণ্ড দিতে চাইলে মালিনী ক্ষেমংকরকে ক্ষমা করতে বলেন। এমনকি ক্রাধান্বিত হয়ে যখন ক্ষেমংকর নিজের হাতের শৃঙ্খল দিয়ে সুপ্রিয়র মাথায় আঘাত করে খুন করেন, তখনও মালিনী ক্ষেমংকরকে ক্ষমা করতে বলেন। এভাবেই তিনি হয়ে ওঠেন জগৎজননী। প্রকাশিত হয় 'দয়াই পরম ধর্ম' তত্ত্বের বাস্তবিক রূপ। "মালিনী ধর্মের পরীক্ষা দিয়েছে প্রাণাধিকপ্রিয় সুপ্রিয়ের হত্যাকারী ক্ষেমাঙ্করকে ক্ষমা করে।"[৮০]– প্রশ্ন হলো, মালিনী ধর্মগতভাবে এতো উর্ধ্বে সত্যি উঠতে পেরেছেন কি-না। নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন, "মালিনী সারাটি দৃশ্য সেখানে দাঁড়াইয়া– তাহার সম্মুখ দিয়া একটি ভয়কম্পিত দণ্ড

কাটিয়া গিয়াছে; তাহার শেষে তাহারই সম্মুখে হঠাৎ সুপ্রিয় হতপ্রাণ হইয়া ভূমিলগ্ন হইয়াছে, ক্ষেমাংকর সেই মৃতদেহের উপর পড়িয়া ঘাতককে ডাকিয়াছে, রাজা খড়্গ আনিতে আদেশ দিয়াছেন,– সকলের ভূমিকাই ত শেষ হইল, কিন্তু মালিনী করিবে কি? এমন কি সে করিবে, যাহাতে নাটকের রসবোধ ক্ষুণ্ন হইবে না, যাহাতে তাহার চরিত্রের সংগতি রক্ষা পাইবে, নাটকের শেষ পরিণতিটি রক্ষা পাইবে। ক্ষেমাংকরের ক্ষমা প্রার্থনা ছাড়া সে কি করিতে পারে, কি সে বলিতে পারে– আর সেখানে তাহার উপস্থিতি না থাকিলেই বা সে দৃশ্যের সম্পূর্ণতা কোথায়? এই সর্বশেষে ক্ষমাভিক্ষা শুধু যে নাট্য-কৌশলের দিক হইতে সুন্দর ও সম্পূর্ণ তাহা নয়; মালিনীর সমগ্র চরিত্রটিকেও এই কথা কয়টি একটি নূতন মাধুর্যে মণ্ডিত করিয়াছে।"[৮১] প্রমথনাথ বিশী বলেছেন, "এমনও হইতে পারে যে, ক্ষেমঙ্করকে দণ্ডদানের আশাতেই মালিনী তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে অনুরোধ করিয়াছে। ষড়যন্ত্রভেদের ফলে ক্ষেমঙ্করের জীবনের সমস্ত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া গেল। তখন তাহার একমাত্র সান্তনা ছিল মৃত্যু। ... মালিনী খুব সম্ভবত তাহাকে সেই শেষসান্তনা হইতেও বঞ্চিত করিবার জন্যই জীবনদান করিতে রাজাকে অনুরোধ করিয়াছে।"[৮২]– আমার মনে হয়, মালিনী এতো কিছু ভাবেন নি, বরং এই শেষ দৃশ্যে ক্ষেমাংকরকে ক্ষমা করাই তার বৌদ্ধধর্মের সমস্ত উজ্জ্বলতা এবং প্রেম প্রকাশ পেয়েছে। আর লেখক তো এই দৃশ্যটি এমন উজ্জ্বল করবেন বলেই সমস্ত নাটক জুড়ে প্রস্তুতি নিয়েছেন।

মূলের থেকে এ কাহিনি প্রায় সম্পূর্ণ আলাদা। মূল কাহিনি রাজেন্দ্রলাল মিত্র-সম্পাদিত *দি স্যানস্ক্রিটবুদ্ধিস্ট লিটারেচার অব্ নেপাল* গ্রন্থের 'মহাবস্তুবদান' অধ্যায়ের অন্তর্গত। এখানে একটি বালিকা প্রত্যেক-বুদ্ধকে সেবার দ্বারা খুশি করে এবং প্রত্যেক-বুদ্ধের মৃত্যুর পর সে তার সমাধির উপর স্তুপ তৈরি করে তাতে মালা ও সুগন্ধ দিয়ে সজ্জিত করে রাখে। এরপর বালিকা পরবর্তী জন্মে বারাণসীর রাজা কৃকির কন্যারূপে মাল্যচিহ্ন ধারণ করে জন্মগ্রহন করলো। তার নাম হলো মালিনী। মালিনী কাশ্যপ ও তাঁর শিষ্যগণকে নিমন্ত্রণ করে তাঁদের তৃপ্তিসাধন করলো। এতে ব্রাহ্মণরা ক্রুদ্ধ হয়ে রাজাকে মালিনীর নির্বাসনদণ্ড-দানের আদেশ দিতে বাধ্য করলো। তখন মালিনী এক সপ্তাহের অবকাশ চেয়ে নিলো। এই সময়ের মধ্যে তার পাঁচশত ভাই, রাজ-অমাত্যগণ, সেনাপতিগণ ও নাগরিকগণ সকলেই আর্যধর্মে দীক্ষা নিলো। এবং সকলেই মালিনীকে নিজেদের আধ্যাত্মিক ত্রাতারূপে স্বীকার করলো। এরপর কাশ্যপকে বধ করার জন্য ব্রাহ্মণরা দশজন করে সৈন্য পাঠালো, কিন্তু তারা কাশ্যপর কাছে দীক্ষা নিলো। তখন ব্রাহ্মণরা নিজেরাই কাশ্যপের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো। কাশ্যপ তখন পৃথ্বী দেবীকে এর ব্যবস্থা করতে বললে, পৃথ্বীদেবী একটি তালগাছ নিক্ষেপ করে তাদের মেরে ফেললেন। মূল কাহিনি এখানেই শেষ।

নাটকে দেখা যায় প্রথম থেকেই মালিনী চরিত্রে আত্মসত্তা প্রকট। নিজের কাঙ্ক্ষিত পথেই তার নিষ্ঠা। প্রথম দৃশ্যেই দেখা যায় তার নতুন ধর্মমত নিয়ে রাজ্যের ব্রাহ্মণরা হইচই করছেন, সে সংবাদ এসেছে রাজপুরীতে। তাই নিয়ে

রাজা শংকিত হয়েছেন। তিনি মালিনীকে ধর্মের কথা প্রকাশ্যে না বলে মনে মনে রাখতে বলেন। অর্থাৎ ভীত রাজা দুইকূল রক্ষা করতে চান। কিন্তু মালিনী প্রজাদের প্রার্থনা পূরণ করতে বলেন। কারণ তিনি মনে করেন, 'মহাক্ষণ' এসেছে। যে ক্ষণে তিনি তার নতুন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করবেন। একেই কাজে লাগাতে চান মালিনী। পিতাকে তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে, তিনি নরপতি – রাজকর্তব্য পালন করাই তাঁর ধর্ম। আর মাতাকে বলেন তাঁর অন্য সন্তানদের নিয়ে ঘরসংসার করতে। তাকে স্নেহপাশে না বাঁধতে। অর্থাৎ তিনি নির্বাসনেই যেতে চান। মহিষীর কণ্ঠে ধ্বনিত হয় মালিনী সম্পর্কে মূল কথা। মহিষী অনুযোগ করেছেন এভাবে–

তুই কি জগৎলক্ষ্মী, জগতের ভার
পড়েছে কি তোরি 'পরে? নিখিলসংসার
তুই বিনা মাতৃহীনা, ...। (২খ,পৃ.৩১৯)

রাজপরিবারের চিন্তিত অবস্থায় পরিবারের কাউকে কিছু না বলে মালিনী নিজে প্রজাদের কাছে চলে যান। বিক্ষুব্ধ প্রজাদের সামনে যাওয়াটা সত্যিই সাহসের ঘটনা। আবার নিজের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্যও এ ঘটনা গুরুত্বপূর্ণ। এখানে গেলে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। মালিনীর বেশভূষা এবং চেহারা দেখে প্রজারা মুগ্ধ হয়। প্রজারা তখন তাদের দেবীকে ডাকছিলো। মালিনী বলেন, 'আমি এসেছি'। মুগ্ধ প্রজারা তাকে দেবী বলেই মেনে নেন– প্রণাম করেন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় একে ঐন্দ্রজালিক আকর্ষণ বলেছেন : "নাটকে আমরা পাই মালিনী-চরিত্রের ঐন্দ্রজালিক আকর্ষণ, সর্বসাধারণের সহিত তাহার সহজ, অমোঘ সহানুভূতি ও একাত্মতা। সে যেন মন্ত্রবলে সমস্ত বিরোধ জয় করিয়াছে, সেনাদের বিদ্রোহোন্মুখতা ও ব্রাহ্মণমণ্ডলীর বদ্ধমূল বিরাগ তাহার ব্যক্তিসত্তার ইন্দ্রজাল প্রভাবে যেন অকস্মাৎ বিপরীত স্রোতে বহিয়াছে। এইখানেই নাটকটির দুর্বলতা।"[৮৩] এ কথা ঠিক যে, এখানে নাটকের দুর্বলতা আছে। তবে নাটকের সময়কাল কাশ্যপের সময়। সে সময় মানুষ ব্যক্তির চেহারা-আভিজাত্য-লালিত্ব-ব্যক্তিত্বতে প্রণত ছিলো। অভিজাত রাজকন্যা আভরণহীন-জ্যোতির্ময়ীরূপে প্রজাদের সামনে গেলে সাধারণ মানুষ অভিভূত হবে, এটাই স্বাভাবিক। সে জন্য ঐন্দ্রজালিক আকর্ষণও স্বাভাবিক ঘটনা। এ কারণেই মালিনীকে দেখে সাধারণরা অভিভূত হয়েছে, সাধারণের বাইরে শুধুমাত্র ক্ষেমাংকর এবং সুপ্রিয় তাকে দেবী বলে মেনে নেন নি। কিন্তু সুপ্রিয় মুগ্ধ হয়েছেন। আর মালিনী বিনা ওজোরে পৌঁছেছেন নিজের লক্ষ্যে। এই ঘটনায় নাটক নাটকীয়তা হারিয়ে বাস্তবমুখী হয়েছে। মালিনীর কোনো মানসিক দ্বন্দ্ব নাটকে দেখা যায় না। আবার সাধারণ মানুষের মতো কোনো অন্তর্দ্বন্দ্বও নেই। খুব সাধারণভাবে এগিয়েছে নাটকের কাহিনি। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আরো বলেছেন, "মালিনীর যে চরিত্রমাধুর্য কাব্যরসসঞ্চারে ফুটিয়াছে, তাহার কোন নাটকীয় বস্তুঘনতা বা বিশ্লেষণযোগ্যতা নাই। কাজেই নাটকীয় পরিণতির হেতুরূপে ইহা অনেকটা অনির্ণীতই থাকিয়া যায়।"[৮৪] –সত্যিই

তাই। নাটকে কোনো ঘটনাই গভীরভাবে কোনো চিন্তা বা কোনো আকর্ষণের সৃষ্টি করতে পারে নি। আবার মালিনী চরিত্রেও কোনো আত্মদ্বন্দ্ব বা বহির্দ্বন্দ্ব নেই। একটির পর একটি ঘটনা অবলীলায় ঘটে গেছে শুধু। মালিনীর মনে অহিংসা বোধের বিকাশ বা গভীরতাও গভীরভাবে পাওয়া যায় না। তবু সাধারণের কাছে তিনি দেবীরূপে প্রকাশিত হন। তিনি আর শুধু রাজকন্যা থাকেন না – হয়ে ওঠেন সবার। বৃহৎ সংসারকে নিয়ে তিনি রাজ-অন্তপুরে ঢেকেন। এ যেন বিশ্বজনীন বোধ। এখানেই মালিনীর স্বাতন্ত্র্য।

মালিনীর দূরদৃষ্টি এবং বিচক্ষণতা রাজনৈতিক বিচক্ষণ রাজার চেয়েও বেশি। বন্দি ক্ষেমংকরকে মালিনীর সামনে আনলে ক্ষেমংকরের চেহারায় খুনির ছায়া দেখেন মালিনী। তিনি ভীত হন এবং সুপ্রিয়কে ক্ষেমংকরের সামনে আনতে নিষেধ করেন। কিন্তু রাজা নিজের রাজা-সুলভ বিবেচনায় বলেন :

> কেন, মা, শঙ্কিত
>
> অকারণে? কোনো ভয় নাই। (২খ,পৃ.৩৪০)

শেষ পর্যন্ত সত্যিই শংকিত হওয়ার মতো ঘটনা ঘটলো। ক্ষেমংকর সুপ্রিয়কে খুন করলো।

সমস্ত সমাজ-সংসারে একা দাঁড়িয়ে একটি নতুন ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করা কেবলমাত্র দুঃসাহসিকতার কাজই নয়, দূরূহও বটে। একজন সাধারণ মেয়ের পক্ষে তা কখনোই সম্ভব নয়। আত্মপ্রত্যয়ী এবং সংগ্রামী মানুষের পক্ষেই তা সম্ভব। প্রথমতঃ পুরোনো ধর্মকে অস্বীকার করতে হয়েছে, তারপর নতুন ধর্মের কথা তাকে বলতে হয়েছে। অর্থাৎ সাধারণ এবং গতানুগতিককে 'না' বলবার মতো বোধ তার মধ্যে আছে। নিজের মত এবং বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি কোনো আপোষ করেন নি। যা তার অস্তিত্বশীলতার বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মালিনীকে দেবী করে তোলেন নি। শেষ পর্যন্ত রক্তমাংসের মানুষই রেখেছেন। সুপ্রিয়র সঙ্গে কথা বলার সময় মালিনী নিজেকে হারিয়ে ফেলেন। তিনি বলেন :

> হে ব্রাহ্মণ, চলে যায় সকল ক্ষমতা
>
> তুমি যবে প্রশ্ন কর, নাহি পাই কথা। (২খ,পৃ.৩৩৩)

শুধু তাই নয়, সুপ্রিয়র সঙ্গে কথা বলবার সময় প্রজারা তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাইলে তিনি প্রজাদেরকেও ফিরিয়ে দেন। তাঁর মনে হয় তিনি রিক্ত অবস্থায় আছেন। এর মাধ্যমে বোঝা যায়, সুপ্রিয়র সান্নিধ্য মালিনীকে বিচলিত করে এবং অন্য একটি জগতে নিয়ে যায়। এ জন্যই সুপ্রিয়ের সান্নিধ্যে মালিনী লাজরাঙ্গা হয়েছেন। যা রাজার চোখও এড়ায় না। এখানে মালিনীর প্রেমিক সত্তা প্রকাশিত হয়েছে। মালিনী সম্পূর্ণরূপে একজন রক্তমাংসের নারী। কিন্তু গতানুগতিক-সাধারণ নন। ধীর-স্থীর কিন্তু অগ্নীময়ী চরিত্র। "... কল্যাণধর্মের প্রতীকরূপে মালিনী চরিত্র কল্পনা করা হলেও তা মানবিক চেতনায় রূপায়িত। সাধারণ মানবমনের অনুভূতিগুলি তার চিত্তের বিকাশে

খ্যাতি লাভ করেছে। মালিনীর জীবনের আদর্শ ও আচরণ কবির নাটকে মানবীয় মহিমা লাভ করেছে। তার কুমারী হৃদয়ে সুপ্রিয়র যে সান্নিধ্য মূল আখ্যানে তা অনুপস্থিত।"[৮৫]

নিজের অস্তিত্ব উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ করেছে*কাহিনী*(১৮৯৯) গ্রন্থের অন্তর্গত*পতিতা* নাটকের অন্যতম নারীচরিত্র পতিতা। এ চরিত্রের মধ্য দিয়ে আশ্চর্যরকমভাবে রবীন্দ্রনাথ একটি নারীর বিবর্তন দেখিয়েছেন। বারাঙ্গনার ছলনাময়ী জীবন থেকে স্নিগ্ধ জীবনে তার পদার্পণ ঘটেছে। তিনি একা মন্ত্রীর সামনে দাঁড়িয়ে রাজনীতি-সমাজনীতির অন্যায় আচারের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। রাজমন্ত্রী কয়েকজন বারাঙ্গনাকে ঋষির তপস্যা ভঙ্গ করার জন্য বনে পাঠিয়েছেন। এই নারী সেই বারাঙ্গনাদের একজন। কবে সে বারাঙ্গনা হয়েছিল, কেনই বা হয়েছিল তার কোনো ইতিহাস পাওয়া যায় না। তবে তার রুদ্ধ বাড়িতে প্রদীপের আলো জ্বলতো, বাতাস ছিলো বদ্ধ। সাজসজ্জাময় ছিল তার বাড়ি এবং নিজের শরীর। অলকপাশে তার মুকুতা ঝলকাতো। এই নারী আরো বেশি ভূষণে-রতনে সেজে বনে এসেছেন। আসার পর এখানকার স্বচ্ছ বাতাস সুনীল শৈলমালা পুণ্য তটিনী দেখে তার মন থমকে যায়। এ নগরীর নাট্যশালা নয়, প্রকৃতির অকৃত্রিমতা। তিনি নিজেকে চিনতে পারেন। অন্তরগ্লানি এসে উপস্থিত হয়। প্রকৃতির কাছেই তিনি আশ্রয় প্রার্থনা করেন। পতিতা জীবনের ছলনাময়তা থেকে মুক্তি নিয়ে সরল জীবনে পদার্পনের ইচ্ছা তার মনে দৃঢ় হয়। অর্থাৎ প্রকৃতির সান্নিধ্যে সহজ-স্বাভাবিক জীবনবোধ প্রকাশিত হয়। এর পর তিনি দেখেন ঋষিকে। সূর্য ওঠার মতো ধীরে ঋষি আসেন। বারাঙ্গনা নারীরা ঘিরে ধরে তাঁকে। ঋষি অসহায় বোধ করেন। ঋষির এই অসহায় অবস্থা দেখে এই নারী ঋষির পাশে দাঁড়ান। বারাঙ্গনার কৃত্রিম জীবনে প্রেমের জন্ম হয়। তবে ঋষির অসহায়তা প্রেম না এসে করুণা জন্ম দিতে পারতো। কিন্তু প্রেমেরই জন্ম হয়। এ প্রেম বিভিন্নমুখী। তিনি বলেন :

জননীর স্নেহ রমণীর দয়া
কুমারীর নব নীরব প্রীতি। (৩খ,পৃ.৯৬)

এই প্রেমের জোরেই তিনি ঋষির দিকে মুখ তুলে তাকান। ঋষি পতিতাকে দেবী বলে ভুল করেন। কিন্তু ঋষির দেব সম্ভাষণে নারীটির অস্তিত্ব আমূল পরিবর্তিত হয়। কারণ বারাঙ্গনারা চাটু বাক্য শুনে অভ্যস্ত – সেখানে সত্য থাকে না। ঋষির বাক্য পুরোপুরি সত্য। তিনি বিশ্বাস করেন ঋষির চোখ মিথ্যা বলে না। এ জন্য তার ভিতরে দেবতার এক নির্মল সত্তা জাগরিত হয়। এতে শুধু নারী জীবনের জননী রমণী বা কুমারীরই প্রকাশ ঘটে না। এর বাইরে নারীর আরো কিছু আছে। সে হলো নিজস্বতা। এ জন্যই বারাঙ্গনা রাজমন্ত্রীর সামনে দাঁড়িয়ে নিজের অস্তিত্ব প্রকাশ করার ধৃষ্টতা দেখান। তিনি নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন। তার নারী মনের বিকাশ ঘটে এবং

তিনি পরিপূর্ণ মানুষে পরিণত হন। সত্য কথা বলবার সাহস অর্জন করেন। তাই রাজদরবারে রাজমন্ত্রীর সামনে মন্ত্রীর কুকীর্তির কথা বলতে ভয় পান না। রাজসভাসদদের ব্যবসা যে ঘৃণ্যতর, সিংহাসনের আড়ালে বসে মানুষের ফাঁদে মানুষ ধরে তারা। এ যতই প্রকাশিত সত্য হোক, প্রকাশ্যে বলবার মতো সাহস পতিতা নারীর পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু এই নারী নিজের ভিতরে সত্যকে উপলব্ধি করতে শিখেছে। তাই তিনি এবার দুয়ার রুদ্ধ করে দিবেন। সেখানে আর কোনো কলুষতা স্পর্শ করতে পারবে না। নিজের ভিতরের সত্যই তাকে দুঃসাহসী করে তোলে। তাই তিনি রাজমন্ত্রীর স্বর্ণমুদ্রা-পুরস্কার ফিরিয়ে দিতে আসেন এবং বলেন :

আমি কি তোমার গুপ্ত অস্ত্র?
হৃদয় বলিয়া কিছু কি নেই? (৩খ,পৃ.৯৩)

পতিতা নারী নিজেই উপলব্ধি করেন রাজা-মন্ত্রী-সমাজ-সংসার সকলেই নারীকে ব্যবহার করে নিজের স্বার্থে। সেখানে নারীর কোনো হৃদয়ের চাওয়া-পাওয়া নেই। কিন্তু তিনি নিজের মনে ডাক শুনতে পেয়েছেন। এ এক সাহসী বিদ্রোহ। রাজ আদেশের বিরুদ্ধে। এই নারী কোনো প্রতিবাদ করে নি, শুধু নিজের মনের আকুতি প্রকাশ করেছে। আর এরই মধ্য দিয়ে বের হয়ে এসেছে তার বিদ্রোহী সত্তা : রাজ দরবারে এসে পুরস্কার ফিরিয়ে দেবার স্পর্ধা এবং নিজের বারাঙ্গনা জীবনের অবসান করার ঘোষণা করা। শেষ কথায় তিনি আরো দৃঢ়ভাবে বলেছেন :

বুদ্ধির বলে সকলই বুঝেছ
দু-একটি বাকি রয়েছে তবু,
দৈবে যাহারে সহসা বুঝায়
সে ছাড়া সে কেহ বোঝে না কভু। (৩খ,পৃ.১০০)

তিনি নিজের বোধের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিজের নিয়ন্ত্রণের কথা বলেন। নাটকে এই একজন বারাঙ্গনারই কেবল পরিবর্তন ঘটেছে। অন্য বারাঙ্গনাদের পরিবর্তন ঘটে নি। অথচ তারা সকলে একই ভাবে একই কাজে একই জায়গায় গিয়েছেন। তবে কি রবীন্দ্রনাথ একজনকে মহৎ করতে গিয়ে অন্যদের ম্লান করেছেন? এমনটি হতে পারে। তবে আমরা এই সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, মানুষের চরিত্রই এই – একজনের যে মানসিক পরিবর্তন হয়, অন্যরা তা চিন্তাও করতে পারেন না।

সতী নাটকে হৃদয়ধর্মের পক্ষে এবং প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদী কণ্ঠ অমাবাইয়ের। অমাবাইয়ের চরিত্রে আছে কন্যাত্ব স্ত্রীত্ব মাতৃত্ব আর আছে নিজস্বতা। তারই মাধ্যমে ধর্মত্ব ও সতীত্বের আলাদা সংজ্ঞা নিরূপিত

হয়েছে। অমাবাই একদিকে যবনবধূ অন্যদিকে ব্রাহ্মণ কন্যা। পিতা বিনায়ক রাও তাকে কুলকলঙ্কিনী এবং মাতা রমাবাই অসতী বলেছেন। কিন্তু অমাবাই নিজে নিজের সম্পর্কে বলেছেন :

মোরে করে ঘৃণা
এমন কে সতী আছে? নহি আমি হীনা
জননী তোমার চেয়ে। – হবে মোর গতি
সতীস্বর্গলোকে। (৩খ,পৃ.১০৬)

অমাবাই আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান। নিজের বিশ্বাসে নিজে ধর্ম এবং সতীত্বের মান নির্ধারণ করেছেন। তার কাছে লোকধর্মের চেয়ে হৃদয় ধর্মের মূল্য অনেক বেশী। তার জীবনের চরম ঘটনা তাকে বিচলিত করে নি। বিয়ের রাতে বরযাত্রী পৌঁছাবার আগেই একজন যবন অমাবাইকে অপহরণ করেছিলো। কিন্তু তাকে জোর করে বিয়ে করেন নি। অমাবাই বীর যবনের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়েই তাকে বিয়ে করেন এবং ভালোবাসা-সন্তানের জন্ম দেন। বাইরে থেকে তার পিতা দূতীর কাছে চিঠি লিখে পাঠান যবনকে হত্যা করতে, মাতা লিখে পাঠান নিজে বিষপানে আত্মহত্যা করতে। কিন্তু অমাবাই কোনোটাই করেন না। কারণ স্বামী-সন্তান নিয়ে অমাবাইয়ের সুখের সংসার। অমাবাই ধর্ম-সমাজ-পিতা-মাতা বা স্বামী কারো দ্বারাই চালিত হন নি। তার পথ সম্পূর্ণ নিজস্ব। নিজের মনের চাওয়াই তার চালনাশক্তি। "মানবিক ধর্ম তথা মানুষের প্রাণের দাবি যে কোনো সামাজিক ধর্মের ঊর্ধ্বে, এ কথাটাই সবচেয়ে বড় সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে কবির সমগ্র সাহিত্যে, প্রধানত কাব্যে। তাই হিন্দু সমাজের দৃষ্টিতে 'ম্লেচ্ছ মুসলমান'কেও তিনি ব্রাহ্মণকন্যা অমাবাই-এর পতিত্বে বরণ করিয়েছেন এবং তার মুখ দিয়ে নিজের অনুভূত পরম সত্য কথাটাই উচ্চারণ করিয়েছেন, ... হিন্দু সমাজের চোখে এই নারী পতিতা; কিন্তু হৃদয়ধর্মের মূল্যে কবি তাকে পরম সতী বলে স্বীকার করেছেন।"[৮৬]

অমাবাইয়ের জীবনসংকট এবং মানসিক দ্বন্দ্ব খুব কঠিন। একদিকে কন্যাত্ব, অন্যদিকে স্ত্রীত্ব অর্থাৎ একদিকে জন্মপরিচয়, অন্যদিকে আত্মসুখ-আত্মতৃপ্তি-হৃদয়ের অনুভূতি। যুদ্ধে অন্যায়ভাবে অমাবাইয়ের স্বামীকে হত্যা করে অমাবাইয়ের পিতা বিনায়ক রাও। বিধবার অশ্রুপাতে পিতার ভাগ্যে মহা অভিশাপ লাগে সেই ভয়ে অমাবাই স্বামী হারানোর দুঃসহ সন্তাপ রুদ্ধ করে রাখেন। স্বামী হন্তারক হলেও বিনায়ক রাও তার পিতা এর চেয়ে বড়ো সত্য আর নেই। অন্যদিকে মুসলিমকে বিয়ে করে সংসার করার অপরাধে পিতাও তাকে ক্ষমা করেন নি। অমাবাইকে বিধবা করার পরও বিনায়ক রাও তাকে ক্ষমা করতে পারেন না। তখন অমাবাই-ই পিতার জন্য বিধাতার ক্ষমা ভিক্ষা করেন। এই হলো পিতা-কন্যা সম্পর্ক। আবার পতিশোকে বিশ্ব তার কাছে ছায়াসম। পিতার স্নেহডোর তাই

তার কাছে অসহ্য। পিতা এবং পিতার ধর্ম-সমাজের কথা অমাবাইয়ের কাছে দূরের কিছু – হৃদয়ের কিছু নয়। হৃদয় তার স্বামী-সন্তানের ভালোবাসায় গাঁথা। তিনি বলেন :

তোমাদের কথা
দূর হতে আনে কানে ক্ষীণ অস্ফুটতা,
পশে না হৃদয়মাঝে। ছেড়ে দাও মোরে,
ছেড়ে দাও। পতিরক্তসিক্ত স্নেহডোরে
বেঁধো না আমায়। (৩খ,পৃ.১০৪)

এই হলো অমাবাইয়ের স্ত্রীত্ব – তার স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো কথা হলো কেউ-ই তার 'পর' নয়। তাই তার হৃদয়ের যন্ত্রণা অনেক বেশি।

অমাবাই পিতাকে বলেছেন যবন ব্রাহ্মণ ধর্মের ভেদ নয়, বরং সমাজের। অন্তরে এরা সমান। এ জন্যই পবিত্র অন্তরে তিনি যবনের স্ত্রী হয়েছেন। তাই তিনি পতিতা রমণী নন, সতী স্ত্রী। এখানে হৃদয়ধর্মই তার কাছে সবচেয়ে বড়ো। তিনি মনে করেন, সংসার ছেড়ে পিতার সঙ্গে গেলে পতিধর্মের অবমাননা হবে এবং ধর্মান্তরের অপরাধী হবেন তিনি। অর্থাৎ হৃদয়ধর্মই তার কাছে একমাত্র সত্য। মাতাকে তিনি বলেছেন :

পরপুরুষের সনে
মাতা হয়ে বাঁধ যদি মৃত্যুর মিলনে
নির্দোষ কন্যারে, লোকে তোরে ধন্য কবে,
কিন্তু, মাতঃ, নিত্যকাল অপরাধী রবে
শ্মশানের অধীশ্বর-পদে। (৩খ,পৃ.১০৮)

মৃত্যুর মুহূর্তেও তিনি দেবতার কাছে প্রার্থনা করেছেন ক্ষুদ্র শত্রুর ক্ষুদ্র ধর্মকে বজ্রাঘাত করে নিত্যধর্মকে জয়ী করতে–

শ্মশানের অধীশ্বর, জাগো তুমি আজ।
হেরো তব মহারাজ্যে করিছে উৎপাত
ক্ষুদ্র শত্রু– জাগো, তারে করো বজ্রাঘাত
দেবদেব! তব নিত্যধর্মে করো জয়ী
ক্ষুদ্র ধর্ম হতে। (৩খ,পৃ.১০৯)

তার এই উক্তি সম্পর্কে প্রমথনাথ বিশী বলেছেন, "অমাবাই-এর এই আর্ত-আবেদন ব্যক্তিগত সুখদুঃখের ক্ষুদ্র গণ্ডীকে বিদীর্ণ করিয়া বিশ্ববেদনায় পরিণত হইয়াছে; জগতের ধর্মব্যবস্থায় আঘাত লাগিয়াছে বলিয়া আজ সে

পীড়িত; সে যেন এখন বিশ্ব-ব্যবস্থার অঙ্গীভূত, নিজের ক্ষুদ্র সত্তা কোন্ পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে।"[৮৭] জটিল-দ্বন্দ্বময় অমাবাইয়ের জীবন। কিন্তু শেষ পর্যন্তও তিনি নিজস্বতায় অটুট থেকেছেন। এখানে তার চরিত্রের বিশিষ্ঠতা। "অপরিবর্তনীয়, অনমনীয় ন্যায়বুদ্ধি ও নিষ্পাপ বিবেক-চেতনা তাহার চরিত্রে আগাগোড়া একটা অসাধারণ দীপ্তি দান করিয়াছে।"[৮৮] মানবধর্ম এবং হৃদয়ধর্মের জন্য একটি নারী চরিত্রের এই অর্জন এবং আত্মত্যাগ তথা প্রাণবিসর্জন অমাবাই চরিত্রকে রবীন্দ্রসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ চরিত্রে পরিণত করেছে।

প্রায়শ্চিত্ত নাটকে যশোরের যুবরাজ উদয়দিত্যের স্ত্রী সুরমা। তিনি শ্রীপুরের রাজকন্যা। শ্রীপুররাজ যশোররাজ প্রতাপাদিত্যের অধীনতা মানেন নি বলে শ্বশুরের রাগের মুখে পড়েছেন সুরমা। আবার উদয়াদিত্যও প্রজাদরদী, তাই রাজা তাকেও পছন্দ করেন না। এই কারণে সুরমা এবং উদয়াদিত্য রাজপুরীতে কোণঠাসা। তবে তাদের স্বামী-স্ত্রীর ভালোাসার সম্পর্ক। সুখে-দুঃখে একে অন্যের ভরসা। সুরমার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য তিনি প্রেমময়। সকলের প্রতি তার দ্বিধাহীন প্রেম। স্বামী-ননদ-প্রজা সর্বোপরি মানুষের প্রতি তার সীমাহীন ভালোবাসা। প্রথম দৃশ্যের প্রথমেই সুরমার চরিত্রের বিশিষ্টতা দেখা যায়। সুরমা নিজের গহনা বিক্রি করে প্রজাদের খাজনা শোধ করতে চাইছেন। সাধারণত, প্রজার খাজনার টাকা দিয়ে রাজবাড়ির মেয়ে-বউরা গহনা তৈরি করে। আর এখানে সুরমা করছেন উল্টোটি। আবার উদায়াদিত্য পরগনা ছেড়ে এলে প্রজারা মৃত্যু-মুখে পড়বে আশংকায় তিনি উদায়াদিত্যকে শাসনভার হাতে না থাকলেও প্রজাদের মাঝে থাকতে বলেন। এখানে বোঝা যায় স্বামী সঙ্গের চেয়ে প্রজামঙ্গল তার কাছে বেশি বড়ো। এ কারণেই বিপদের আশংকা থাকলেও যে কোনো মহৎ এবং প্রয়োজনীয় কাজে স্বামীকে পাঠাতে তিনি দ্বিধান্বিত হন না। এ জন্যই বসন্ত রায়কে বাঁচাতে যাওয়ার সময় উদয়াদিত্যকে বাঁধা দেন না, বরং যাওয়াটা কর্তব্য মনে করেন। এমনি কর্তব্য মনে করেন, সীতারাম-ভাগবতকে সাহায্য করা। যদিও এই দুই প্রহরীর উপর রাজা ক্ষীপ্ত। কিন্তু প্রহরীদ্বয় বিভার স্বামীর প্রাণ রক্ষায় সাহায্য করেছে। তাই সুরমা তাদের দুঃখে চুপ করে থাকেন নি। এছাড়া তার চরিত্রের আরেকটি উজ্জ্বল দিক হলো তার স্বামীপ্রেম ভক্তি বা ভয়ের পর্যায়ে নয়, বন্ধুত্বের। বিয়ের অনেক বছর পরও তিনি পরগনা থেকে স্বামীর আগমনে ফুলের মালা দিয়ে ঘর সাজান। রাজা উদায়াদিত্যকে অবজ্ঞা করেন বলে সুরমা নিজের ভালোবাসা দিয়ে সেই অবজ্ঞার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার চেষ্টা করেন। যেন উদয়াদিত্যের মনে কোনো কষ্ট না থাকে। আবার সুরমার প্রতি যে অবিচার হয়, তার প্রতিকার করতে পারেন না বলেও উদয়াদিত্য হীনমন্যতায় ভোগেন। সেই হীনমন্যতা দূর করারও চেষ্টা করেন সুরমা। তিনি বলেন :

> আমার সব সম্মান যে তোমার প্রেমে, সে তো কেউ কাড়তে পারে নি। (৫খ,পৃ.২১৬)

শুধু তাই নয়, উদয়াদিত্যের প্রতিটি কাজে মানসিক শক্তি জুগিয়ে এবং প্রত্যক্ষ সাহায্য করে সুরমা যোগ্য বন্ধুত্বের কাজ করেছেন। অবশ্য এটা সম্ভব হয়েছে উদয়াদিত্য আর সুরমার চিন্তা চাওয়া এবং লক্ষ্যবস্তু এক বলেই। তার কাছে মান-অভিমানের চেয়ে ভালোবাসা বড়ো। তাই তিনি বিভাকে অকুণ্ঠ চিত্তে বলেছেন :

মানটাই কি সংসারে সকলের চেয়ে বড়ো হল? সেটা কি বিসর্জন করবার কোনো জায়গা নেই। (৫খ,পৃ.২২২)

ভালোবাসার অন্য পিঠ সম্পর্কেও সুরমা সচেতন। তাই বিভার স্বামীর নীচ আচরণে তিনি শঙ্কিত হয়ে বলেন :

স্বামীর গর্ব যে স্ত্রীলোকের ভেঙেছে জীবন তার পক্ষে বোঝা। (৫খ,পৃ.২৪১)

সুরমার মধ্যে দার্শনিক-বুদ্ধিদীপ্ততা এবং রাজনৈতিক বিচক্ষণতা দেখা যায়। বিপদ সম্পর্কে তিনি বলেন :

বিপদের মুখের উপর তেড়ে এলে বিপদ ছুটে পালায়। (৫খ,পৃ.২২২)

এ কোনো সাধারণ নারীর কথা নয়। সাহসী দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের পক্ষেই এ কথা বলা সম্ভব। সুরমার মানসিক শক্তি প্রবল। এই শক্তিতেই তিনি শ্বশুরবাড়িতে টিকে থাকতে পেরেছেন।

ননদ-বউদির সম্পর্ককে বন্ধুত্বের পর্যায়ে নিয়ে গেছেন সুরমা। বিভার স্বামীকে কতদিন বিভা দেখেন না, সেই ব্যথায় সুরমাও সমব্যথী হন। বিভার চিঠি পাঠানোর ব্যবস্থা করতে চান, বসন্ত রায় এলে তাকে দিয়েও বিভাকে স্বামীগৃহে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে চান। আবার স্বামীর খারাপ আচরণে যখন বিভা পাথরের মতো শক্ত হন, তখন সুরমা আরো বিচলিত হয়ে ওঠেন। সুরমার মনে হয় বিভার হয়ে নিজে কেঁদে বিভার মনটা হালকা করে দিতে।

সুরমা আশ্চর্যজনক সংগ্রামী-প্রতিবাদী-বিদ্রোহী চরিত্র। তিনি যুবরাজবধূ। তাকে রাজার অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হয়েছে। তা-ও আবার রাজপুরীর ভিতরে অবস্থান করে। অন্যদিকে যুবরাজ উদয়াদিত্যকেও রাজা অপছন্দ করেন। এ জন্য কোনোভাবেই তিনি সহানুভূতি পান নি। কিন্তু নিরবে প্রজাদের উপকার করেছেন। এ ঘটনা অত্যাচারি রাজার বিরুদ্ধে প্রতিবাদই বটে। মূলত তাঁর এ সকল কাজের জন্যই তার প্রতি রাজর বিদ্বেষ হলো এবং নিজেকে প্রাণ দিতে হলো। উদয়াদিত্য বলেছেন মৃত্যুর পর প্রথম সুরমা রাজবাড়িতে শান্তি পায়। সুরমার মৃত্যুতে স্পষ্ট হয়েছে রাজনৈতিক ঈর্ষা, রাজনৈতিক বিরোধ একটি নিষ্পাপ জীবনকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দিতে পারে। অন্যদিকে, বাঙালি সমাজের পারিবারিক ঈর্ষাপরায়ণতা-রেষারেষিও সুরমার পরিণতির অন্যতম কারণ। তবে পরিণতি মৃত্যু হলেও সুরমার জীবন বীরের, মৃত্যু গৌরবের। রাজার দেওয়া অশান্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তিনি স্বামী ননদ এবং দাদাশ্বশুরের স্নেহ-ভালোবাসার মানুষ হয়ে ওঠেন, প্রজাদের অন্তরের ধন হয়েছেন, অত্যাচারিতদের আশ্রয় হয়েছেন।

রক্তকরবী নাটকে নন্দিনী প্রাণসঞ্চারক নারী। যক্ষপুরীতে সকলেই নিজ নিজ কাজ করে। রাজা এখানে নন্দিনীকে নিয়ে আসেন। কিন্তু নন্দিনীকে কোনো কাজ দেন না। নন্দিনী নিজের খুশি মতো ঘুরে বেড়ান। যক্ষপুরীর একঘেয়ে জীবনে তিনি এক ঝলক আলো। তিনি সকলের মঙ্গল কামনা করেন। সকলকে আনন্দে রাখতে চান। তাকে দেখে যক্ষপুরীতে আনন্দের দোলা লাগে।শ্রমিকদের দু-একজন তাকে সন্দেহ করে, শ্রমিকের স্ত্রী চন্দ্রা তাকে ঈর্ষা করে, সর্দার মোড়ল গোঁসাই তাকে দেখে আতঙ্কিত হয়। কিন্তু অন্যরা তার আনন্দ দেখে বিস্মিত হয়। খোদাইকরের দলের মনে চমক লাগে, তারা চঞ্চল হয়ে ওঠে। কিন্তু অভ্যাস ত্যাগ করতে পারে না। নন্দিনী যক্ষপুরীর সবাইকে উদ্ধার করতে চান। তিনি বলেন :

> তোমাদের ঐ সুড়ঙ্গের অন্ধকার ডালাটা খুলে ফেলে তার মধ্যে আলো ঢেলে দিতে ইচ্ছে করে, তেমনি ইচ্ছে করে ঐ বিশ্রী জালটাকে ছিঁড়ে ফেলে মানুষটাকে উদ্ধার করি। (৮খ,পৃ.৩৫৮)

এই উদ্ধারের জন্যই তিনি তার সঙ্গী রঞ্জনের জন্য অপেক্ষা করেন। রঞ্জন এসে যক্ষপুরীর যান্ত্রিক মানুষদেরকে সত্যিকরের মানুষ বানাবে। যক্ষপুরী জীবনের উল্টো পীঠ। জীবন্ত মানুষগুলো মৃতের আকার ধরে রয়েছে। সেই মৃতের পাঁজরে প্রাণের সঞ্চার করতে চান নন্দিনী। প্রকৃতির সহজ ছন্দ নন্দিনীর প্রাণের গান। তাই ভয়ংকর রাজাকে তিনি নির্ভীকভাবে বলতে পারেন –

> সোনার পিণ্ড কি তোমার ঐ হাতের আশ্চর্য ছন্দে সাড়া দেয়, যেমন সাড়া দিতে পারে ধানের খেত। (৮খ,পৃ.৩৬১)

নন্দিনীকে দেখে মুগ্ধ হয় যেমন কিশোর তেমনি অধ্যাপক। আর তার সাথে আনন্দে মেতে ওঠে বিশু। কারো প্রতিই নন্দিনীর রাগ-ক্ষোভ নেই, রাজার একলা প্রাণটাকে তাই খুশিটুকু তার দিতে ইচ্ছে করে। আবার সর্দারকেও কুন্দ ফুলের মালা দেন। এ সবের মাধ্যমে নন্দিনী নীরবে সকলের মধ্যে আনন্দ সঞ্চার করেন। সর্দারদের মেজো সর্দারও নন্দিনীকে দেখে খারাপ কাজ করতে দ্বিধান্বিত হয়ে ওঠে। নন্দিনীর হাসি দেখে নিজের দৈন্যতা বুঝতে পারে। নন্দিনী আনন্দের প্রতীক। তাই রাজা তাকে বাঁধতে পারেন না। আক্ষেপ করে বলেন :

> হায় রে, আর-সব বাঁধা পড়ে, কেবল আনন্দ বাঁধা পড়ে না। (৮খ,পৃ.৩৬২)

নন্দিনীর স্বরূপের এইটেই হলো মূল কথা যে, নন্দিনী 'আনন্দ'। এ সম্পর্কে সুকুমার সেনের মন্তব্য সুচিন্তিত। তিনি বলেছেন, "নন্দিনী "প্রাণভরা খুশি" বা হর্ষ, প্রাণের সহজ ভালোবাসা, জীবনের সরল সৌন্দর্য, সৃষ্টির শেষ অর্থ– আনন্দ। যাহার চিত্তে সজীবতা নিঃশেষিত নয় সে তাহাকে দেখিয়া আনন্দিত হয়। কিন্তু তাহাকে পাইতে গেলে দুঃখবেদনার, মৃত্যুর মধ্য দিয়া আসিতে হয়।"[৮৯] আনন্দকে পেতে মানুষকে কষ্টের পথপরিক্রমার মধ্য দিয়েই যেতে হয়। কিন্তু আনন্দ নিজে প্রাণবন্ত-উচ্ছ্বসিত। নন্দিনী নটবালকের মতো আকাশে আকাশে নেচে বেড়ান। সহজ তার সুর। বিশ্বের বাঁশিতে নাচের যে ছন্দ বাজে সেই ছন্দই তার গতি। তার এই ছন্দে বিপুল ভার হালকা হয়ে যায়।

রাজা প্রচণ্ডপ্রতাপশালী হয়েও তাই নন্দিনীর মতো ছোট্ট ঘাসকে ঈর্ষা করেন। রবীন্দ্রনাথ এখানে নন্দিনীকে ঘাসের সঙ্গে তুলনা করেছেন। ঘাস সবচেয়ে জীবন্ত উদ্ভিদ। শত প্রতিকূলতার পরও সে জীবন্ত থাকে। তাই ঘাস জীবনের সবচেয়ে বড়ো আশ্রয়স্থল। আনন্দের এমনি বিপুল অথচ স্নিগ্ধ শক্তি। নন্দিনী এই শক্তিতেই ভয়ংকর রাজার সামনে ভয়হীনভাবে রাজার আচরণ সম্পর্কে সমালোচনা করেন এবং নেতিবাচক মন্তব্য করেন। তিনি রাজাকে বলেন :

> লোকে তোমাকে ভয় করে এইটেই দেখতে ভালোবাস? আমাদের গাঁয়ের শ্রীকণ্ঠ যাত্রায় রাক্ষস সাজে– সে যখন আসরে নামে তখন ছেলেরা আঁতকে উঠলে সে ভারি খুশি হয়। তোমারও যে সেই দশা। (৮খ,পৃ.৩৭৪)

তিনি আরো বলেন :

> ভয় দেখাবার ব্যাবসা এখানকার মানুষের। তোমাকে তাই তারা জাল দিয়ে ঘিরে অদ্ভুত সাজিয়ে রেখেছে। এই জুজুর পুতুল সেজে থাকতে লজ্জা করে না! (৮খ,পৃ.৩৭৪)

প্রতাপশালী নিষ্ঠুর রাজাকে এ ধরনের কথা বলা দুঃসাহসের ব্যাপার। এখানে আর নন্দিনী নীরব নন, সরব। যদিও তার কথা ঠিক প্রতিবাদ বা বিদ্রোহাত্মক নয়, তবু স্পর্ধা বটে। তিনি আরো স্পর্ধা করে বলেন তার রঞ্জন থাকলে রাজার মুখের উপর তুড়ি মেরে মরত, তবু ভয় পেত না। এ তার প্রাণোচ্ছল আনন্দের শক্তি। সেই শক্তিতেই তিনি বলে ওঠেন :

> এই রইলুম দাঁড়িয়ে। কী করতে পার করো। অমন বিশ্রী করে গর্জন করছ কেন। (৮খ,পৃ.৩৭৪)

এভাবে নন্দিনী আস্তে আস্তে সরব হন। তার মতে মানুষ হয়ে থাকার জন্য মরাও দোষের নয়। পালোয়ানকে নির্যাতনের পর নন্দিনী রাজা-সর্দার সকলের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে পালোয়ানকে সাহায্য করতে চান। তিনি সর্দারকে বলেন :

> আমি নারী বলে আমাকে ভয় কর না? বিদ্যুৎশিখার হাত দিয়ে ইন্দ্র তাঁর বজ্র পাঠিয়ে দেন। আমি সেই বজ্র বয়ে এনেছি, ভাঙবে তোমার সর্দারির সোনার চূড়া। (৮খ,পৃ.৩৮২)

রাজ-প্রতাপশীলতার বিরুদ্ধে এভাবেই নন্দিনীর মধ্যে বিদ্রোহ জেগে ওঠে। মানবসভ্যতার মূল কথা অধ্যাপক নন্দিনীকে বুঝিয়েছেন। তিনি বলেন :

> শিকড়ের মুঠো মেলে গাছ মাটির নীচে হরণশোষণের কাজ করে, সেখানে ফুল ফোটায় না। ফুল ফোটে উপরের ডালে, আকাশের দিকে। (৮খ,পৃ.৩৮১)

যক্ষপুরীর অবস্থাও তাই। নিচু শ্রেণির মানুষকে পিষে উঁচু শ্রেনির যাত্রা। মানুষকে বাঁচিয়ে রাখারও পরিমাণবিচার করে তারা। কিন্তু নন্দিনী তা মেনে নেন না। তিনি মানবমুক্তির প্রত্যাশী। তাই সকলের অন্তরের গোপন বাসনাকে ভালোবাসেন। সবাইকে মানসিকশান্তি ফিরিয়ে দিতে চান। যক্ষপুরীতে বিশুর দম বন্ধ হয়ে আসছে দেখে তিনি সোনার শিকল ভেঙ্গে বিশুকে বের করে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেন। আবার বিশুকে যখন প্রহরীরা হাতকড়ি পরিয়ে

নিয়ে যায়, সেই কষ্ট তার মনে চিরস্থায়ী হয়ে থাকে। রঞ্জনের সঙ্গে মিলনাকাঙ্ক্ষা পর্যন্ত ম্লান হয়ে ওঠে। অন্যদিকে, তিনি আশাহীন শ্রমিকদের মধ্যে জীবন সঞ্চার করেন। সব মেনে নেওয়া শ্রমিকদের জাগিয়ে তোলেন। শ্রমিকরা শেষ পর্যন্ত রাজার বন্দিশালা ভেঙ্গে বন্দিদের মুক্ত করতে বন্দিশালার দিকে এগিয়ে যায়।

রাজা রঞ্জনকে মেরে ফেললে নন্দিনী মরিয়া হয়ে ওঠেন রাজার সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য। কিন্তু ততক্ষণে রাজারও মানসিক পরিবর্তন হয়েছে। রাজাও নন্দিনীর সঙ্গে যোগ দেন নিজেরই সমস্ত নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে। নন্দিনী বিদ্রোহী। "এই রাজ্যে বিদ্রোহিনী একজনই। নন্দিনী। ঘটা করে বিদ্রোহ করে না, তার বিদ্রোহ বেরিয়ে আসে স্বতঃস্ফূর্তরূপে। কেননা সে নারী। নন্দিনী হচ্ছে সৃষ্টির, ফসলের, স্বাভাবিকতার। তার আছে প্রাণ। কখনো সে বিদ্যুৎশিখা যে ভেঙে ফেলে, কখনো সে গানের ছন্দ যে সহজে বহন করে বিপুল বোঝাকে; এবং সর্বক্ষনই সে বিদ্রোহী। শেষ পর্যন্ত তারই জয় হয়। ধ্বনি ওঠে তারই নামে। ... নারী যে পুরুষ থেকে স্বতন্ত্র রবীন্দ্রনাথ সেটা খুবই মানেন। তারা যে পরস্পরের পরিপূরক এও অস্বীকার করেন না। কিন্তু যা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ তা হলো নারী ও পুরুষের মধ্যে একটি দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক তিনি সর্বদাই লক্ষ্য করেছেন, তা সে-নারী মাতাই হোক কি প্রেমিকাই হোক, কিম্বা হোক দু'য়ের সংমিশ্রণ। এই দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে দেখা গেছে পুরুষই আধিপত্য করে– স্বামী, প্রেমিক, পিতা, ভ্রাতা, বন্ধু নানা ভূমিকায়; কিন্তু পুরুষ জেতে না, শেষ পর্যন্ত জয়ী হয় নারীই। আর ওই দ্বন্দ্বের ভেতর দিয়ে পুরুষ নিজেও যে বন্দী নানা ব্যবস্থার হাতে সে-সত্যটা উন্মোচিত হয়ে যায়। মেয়েরা জয়ী হয়, কেননা তারা প্রতিনিধিত্ব করে সৃষ্টির, প্রকৃতির ও স্বাভাবিকতার।"[৯০] অর্থাৎ নন্দিনীর বিদ্রোহ প্রথমে নিরব, তারপর সরব। যক্ষপুরীর জীবন কৃত্রিম জীবন। এরা যেন বিধাতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে মেতেছে। হাসি নেই, খুশি নেই। এই নিরানন্দ জীবনের বিরুদ্ধে একা সংগ্রাম করেন নন্দিনী। নিজের গান দিয়ে, আনন্দ নিয়ে সাজসজ্জা দিয়ে বেঁচে থাকার অর্থ সকলের সামনে তুলে ধরেন। তবে, নন্দিনী রঞ্জনের দ্বারা প্রভাবিত। নন্দিনী যেন রঞ্জন ছাড়া সম্পূর্ণ নয়। এখানে নারীকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে গড়েন নি রবীন্দ্রনাথ। রঞ্জন নন্দিনীকে 'রক্তকরবী' নামে ডাকে, তাই তিনি রক্তকরবীর আভরণ পরেন। রঞ্জনের ভালোবাসার রং রাঙা, সেই রাঙা-ই নন্দিনীর সাজ-সজ্জা। বিশুর মতো রঞ্জন নন্দিনীর সঙ্গী নয়, বরং ত্রাণকর্তা বা অভিভাবক। রঞ্জন সম্পর্কে নন্দিনী বলেছেন :

> দুই হাতে দুই দাঁড় ধরে সে আমাকে তুফানের নদী পার করে দেয়; বুনো ঘোড়ার কেশর ধরে আমাকে বনের ভিতর দিয়ে ছুটিয়ে নিয়ে যায়; লাফ-দেওয়া বাঘের দুই ভুরুর মাঝখানে তীর মেরে সে আমার ভয়কে উড়িয়ে দিয়ে হা হা করে হাসে। আমাদের নাগাই নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে স্রোতটাকে যেমন সে তোলপাড় করে, আমাকে নিয়ে তেমনি সে তোলপাড় করতে থাকে। প্রাণ নিয়ে সর্বস্ব পণ করে সে হারজিতের খেলা খেলে। সেই খেলাতেই আমাকে জিতে নিয়েছে। (৮খ,পৃ.৩৭১)

তারপরও এ কথা সত্য যে, নন্দিনীর বিদ্রোহ যক্ষপুরীর মূল ধরে টান দিয়েছে। উপড়ে ফেলেছে রাজা, সর্দার আর খোদাইকরদের যান্ত্রিক জীবনের দুঃসহ বোধ। রাজা প্রজা সকলকেই উদ্ধার করেছেন নন্দিনী। রবীন্দ্রনাথ নিজে বলেছেন :

> যক্ষপুরে পুরুষের প্রবল শক্তি মাটির তলা থেকে সোনার সম্পদ ছিন্ন করে আনছে। নিষ্ঠুর সংগ্রহের লুব্ধ চেষ্টার তাড়নায় প্রাণের মাধুর্য সেখান থেকে নির্বাসিত। সেখানে জটিলতার জালে আপনাকে আপনি জড়িত করে মানুষ বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই সে ভুলেছে সোনার চেয়ে আনন্দের দাম বেশি; ভুলেছে, প্রতাপের মধ্যে পূর্ণতা নেই, প্রেমের মধ্যেই পূর্ণতা। সেখানে মানুষকে দাস করে রাখবার প্রকাণ্ড আয়োজনে মানুষ নিজেকেই নিজে বন্দী করেছে।
>
> এমন সময়ে সেখানে নারী এল, নন্দিনী এল; প্রাণের বেগ এসে পড়ল যন্ত্রের উপর; প্রেমের আবেগ আঘাত করতে লাগল লুব্ধ দুশ্চেষ্টার বন্ধনজালকে। তখন সেই নারীশক্তির নিগূঢ় প্রবর্তনায় কী করে পুরুষ নিজের রচিত কারাগারকে ভেঙে ফেলে প্রাণের প্রবাহকে বাধামুক্ত করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হল, এই নাটকে তাই বর্ণিত আছে।[৯১]

নারীতো যক্ষপুরীতে আগেও ছিলো, কিন্তু তারা নন্দিনীর মতো প্রাণের সঞ্চার করে নি। তাই বলতেই হবে যে, নন্দিনী সাধারণ নারী নন। প্রানোচ্ছলের প্রতীকী রূপ। "নাটকে নন্দিনীর মুখে একটাই গান– 'ভালোবাসি ভালোবাসি।' বস্তুত এই ভালোবাসার টানেই নন্দিনী যক্ষপুরীর রাজা-অধ্যাপক-কিশোর-বিশু-রঞ্জন সকলকে আকর্ষণ করেছে। সেই ভালোবাসার নিশ্চয়ই মাত্রাভেদ আছে, আছে তার নানা প্রকাশভঙ্গি। কিন্তু মূলত তা ভালোবাসাই। নাটকে যে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে, তারও মূলে এই ভালোবাসার অনুপ্রেরণা।"[৯২] রবীন্দ্রনাথ *রক্তকরবী*র 'নাট্যপরিচয়' অংশে বলেছেন, "এই নাটকটি সত্যমূলক। ... একে রূপকও বলা যায় না।"[৯৩] আবার *রক্তকরবী*র অভিভাষণে বলেছেন :

> রক্তকরবীর সমস্ত পালাটি 'নন্দিনী' বলে একটি মানবীর ছবি।... কৃষী-যে দানবীর লোভের টানেই আত্মবিস্মৃত হচ্ছে, ত্রেতাযুগে তারই বৃত্তান্তটি গা-ঢাকা দিয়ে বলবার জন্যেই সোনার মায়ামৃগের বর্ণনা আছে। আজকের দিনের রাক্ষসের মায়ামৃগের লোভেই তো আজকের দিনের সীতা তার হাতে ধরা পড়েছে। নইলে গ্রামের পঞ্চবটচ্ছায়াশীতল কুটির ছেড়ে চাষীরা টিটাগড়ের চটকলে মরতে আসবে কেন।[৯৪]

সুতরাং রবীন্দ্রনাথ নিজেই নন্দিনীকে রূপক বলে স্বীকার করেছেন। নাটকের ভূমিকায় 'রূপক' স্বীকার না করা এবং অভিভাষণে রূপকের ইংগীত দেওয়া পাঠককে দ্বিধায় ফেলে, কিন্তু যুক্তির দিক দিয়ে নন্দিনী প্রতীকীই বটে। ড. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "নন্দিনী প্রতীক চরিত্র হলেও তাকে অনেকখানি মানবিক রূপ-দান করা হয়েছে। নাটকে মানবিক নারীরূপে বাস্তবজগতের নারীর আচরণ যেমন সম্পূর্ণভাবে তার মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না, তেমনি সম্পূর্ণরূপে তাকে সাংকেতিক মনে করাও যায় না। দুয়ের মিশ্রণে এ চরিত্র রচিত।"[৯৫] অন্যদিকে উপেন্দ্রনাথ

ভট্টাচার্য বলেছেন, "নন্দিনী একটি সম্পূর্ণ সংকেত-চরিত্র, বাস্তব নারীমূর্তি সে নয়। ... রক্তকরবী নাটকে সংকেত ও রূপকের সঙ্গে একটা বাস্তবতার অনুভূতিও হৃদয়ে জাগ্রত হয়।"[৯৬] প্রমথনাথ বিশী নাটকের সামগ্রিক মূল্যায়ণে নন্দিনীর চরিত্রের বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেছেন, "পুরুষ শক্তি সেখানে প্রবল হইয়া উঠিয়া দুর্ভেদ্য যন্ত্রে আপনাকে দুর্জয় করিবার চেষ্টায় নিযুক্ত। তাই সেখানে নারী শক্তিরূপিণী, প্রাণের প্রতীক, প্রেমের প্রতীক, আনন্দের প্রতীক রূপে নন্দিনী আবির্ভূত।"[৯৭] তার মানে, কোনো সমালোচকই নন্দিনীকে সম্পূর্ণ বাস্তব চরিত্র হিসেবে দেখেন নি। আনন্দের প্রতীক হিসাবেই দেখেছেন। যক্ষপুরীতে যখন শোষক এবং শোষিত দু'পক্ষই আনন্দ হারিয়েছে, তখন নন্দিনী এদের জাগিয়ে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ নাটকটিকে নিজেই সত্যমূলক বলেছেন, আবার নিজেই কর্ষণজীবী এবং আকর্ষণজীবী সভ্যতার দ্বন্দ্বের কথা বলেছেন। তাই নন্দিনী চরিত্র প্রতীকী– এতে সন্দেহ নেই। এ সম্পর্কে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মন্তব্য সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য। তিনি বলেছেন, "নন্দিনী ব্যক্তি মানুষও নয়, শ্রেণী-মানুষও নয়, সে নারী প্রকৃতির কবি-কল্পিত ভাবমূর্তি।"[৯৮]শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী নন্দিনীকে দুর্গার প্রতীক বলেছেন। তিনি নাটকের বিভিন্ন অনুষঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সেই আভাসকে তুলে ধরেছেন। তাঁর মতামত : "অশুভ শক্তিকে বিনাশ করার কাজে কবি ব্যবহার করেছেন নারী-শক্তিকে। ... যক্ষপুরীতে আসার আগে নন্দিনীর নিবাস ছিল ঈশানী পাড়ায়। ... ঈশানী শব্দের অন্যতম অর্থ দুর্গা। ... বজ্র বয়ে আনার সূত্রে বা অশুভ শক্তিকে বিনাশের এষণার সূত্রে নন্দিনীর মধ্যে আমরা অনেকখানিই পেয়ে যাই দুর্গা-ভাবনার প্রকাশ। ... যোগিনীতন্ত্রে দেখি বিশেষ করে করবী ও জবা ফুলকে স্বয়ং দেবী বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। ... দুর্গা-কল্পননাতেও আছে ললিত ও কঠোরের, ভীষণ ও সুন্দরের যুগনদ্ধ রূপ। ... আপাত বিপ্রতীপতার গভীরে রবীন্দ্রদর্শন যে পূর্ণতা খুঁজে পায়, বা যে বৈপরীত্যের সমন্বয়কে সৃষ্টির পরম কারণ হিসেবে জানে– তা যেমন আছে দুর্গায় তেমনি নন্দিনীতে। ... নীলকণ্ঠ পাখি কৈলাশে মহাদেবকে দুর্গার ফিরে যাওয়ার সংবাদ দেয়। ... নন্দিনীর বুকের মধ্যে রঞ্জনের আগমনীর সুর ধ্বনিত হয় এই নীলকণ্ঠ পাখির পালকের অনুষঙ্গে। 'আগমনী' শব্দটি বিশেষ দ্যোতনা বহন করে বাঙালীর দুর্গোৎসবকে ঘিরে। ... নাটকের পরিণতির নিরিখে আমরা জানি, সেই আগমনীর লগ্নে বোধন ঘটবে রাজার মনুষ্যত্ববোধের, তার হৃদয়ে অধিবাস হবে সহজ প্রাণ ও সহজ প্রেমে।"[৯৯]শ্রুতিনাথ চক্রবর্তীর এই মন্তব্য তাঁর একান্ত নিজের। তবে এ কথা ঠিক যে রবীন্দ্রনাথ নন্দিনীকে শক্তিরূপে কল্পনা করেছেন। "ভারতীয় জীবনদর্শনে, চিন্তায়, বিশেষ করে প্রাচীন ঋষিদের কল্পনায় রূপকই ছিল প্রকাশের উপায়, চিন্তাকে রূপ দেওয়ার পদ্ধতিবিশেষ।"[১০০] রবীন্দ্রনাথও এখানে সেই রীতি অনুসরণ করেছেন। আমরা জানি যে, দুর্গা-ও শক্তিরই প্রতীক। এ মন্তব্যের আলোকে একইভাবে বলতে পারি নন্দিনীর একটি রূপ 'শক্তি'। আমার বিবেচনায়, রবীন্দ্রনাথ যে কথা বলেন নি, কিন্তু যা এই নাটকে স্পষ্ট, তা হলো, রবীন্দ্র-মানসের চাওয়ার কাল্পনিক রূপ নন্দিনী। ব্রিটিশ রাজের

শাসনে ভারতবর্ষ যক্ষপুরীতে পরিণত হয়েছিলো। ভারতবাসী ইংরেজদের দৃষ্টিতে মানুষ ছিলো না, ছিলো দাস। এই শাসকের মনে প্রেমের সঞ্চার করার জন্য, অহিংসরীতিতে তাদের মনে মনুষ্যত্ব জাগানোর জন্য একটি শক্তির কল্পনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। সেই শক্তি আনন্দ-প্রেম-গান-ফুল। অর্থাৎ ভারতবর্ষের স্নিগ্ধতা। এই সমস্ত স্নিগ্ধতা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ নন্দিনীকে তৈরি করেছেন। এই নন্দিনী নিষ্ঠুর রাজার মনে প্রেমের সঞ্চার করে, যে কিনা নিজের নিষ্ঠুরতাকে নিজেই ভেঙ্গে ফেলে। অর্থাৎ নন্দিনী আত্মার মুক্তি দেন। রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই চিন্তা করেছিলেন, এই রকম একজন নন্দিনী ভারতভাগ্যে উদিত হয়ে সমস্ত অন্যায় থেকে ভারতবাসীকে মুক্তি দেবে। রবীন্দ্রনাথের রূপ-অরূপের প্রতি আগ্রহই নন্দিনী সৃষ্টির মূলকথা।

চণ্ডালিকা নাটকে প্রকৃতি চণ্ডালকন্যা। অস্পৃস্য চণ্ডালিকার মনে রয়েছে 'মানুষ' হওয়ার তৃষ্ণা। সমাজে তাদেরকে মানুষ মনে করা হয় না। তাদের ছোঁয়ায় জাত যায়। এরা যেন চির কালের জন্মাপরাধী। এ জন্য এদের মন সব সময় নিচু হয়ে থাকে। এই 'নিচু হয়ে থাকা' মনেরই মেয়ে প্রকৃতি। নিজের জন্মবোধের হীনমন্যতা নিয়ে তিনি নিজেরই গণ্ডির মধ্যে চলাফেরা করেন। মানুষের স্তরে যাওয়ার চিন্তাও তার জন্য দুঃসাহস করা। জীবনের এই অভ্যস্ত তালের মধ্যে বৌদ্ধভিক্ষু আনন্দ এসে তার কাছে জল চান। আনন্দ প্রকৃতিকে বলেন :

> যে-মানুষ আমি তুমিও সেই মানুষ; সব জলই তীর্থজল যা তাপিতকে স্নিগ্ধ করে, তৃপ্ত করে তৃষিতকে। (১২খ,পৃ.২১৬)

এ কথা শুনে চণ্ডালিকা প্রকৃতির নবজন্ম হয়। মনের নিচত্ব থেকে বেড়িয়ে আসেন তিনি। 'মানুষ' স্বীকৃতিতে বিহ্বল হন। তিনি স্পর্ধাভরে নিজের মা-কে বলেন :

> রাজার বংশে কত দাসী জন্মায় ঘরে ঘরে, আমি দাসী নই। ব্রাহ্মণের ঘরে কত চণ্ডাল জন্মায় দেশে দেশে, আমি নই চণ্ডাল। (১২খ,পৃ.২১৮)

এখানে প্রকৃতি 'চণ্ডাল' বলতে জন্মচণ্ডাল নয় বরং মানসিকচণ্ডালবোধের কথা বলেছেন। অর্থাৎ দাসত্ব এবং চণ্ডালত্ব মানুষের মানসিক ব্যাপার, কোনো জন্মগত উত্তরাধিকার নয়। আনন্দর কাছে তিনি শুনেছেন, শ্রাবণের কালো মেঘকে চণ্ডাল নাম দিলেই তার জাত বদলায় না, জলের গুণ ঘোচে না। নিজেকে চণ্ডাল বলে আত্মনিন্দা করতে নেই– আত্মনিন্দা আত্মহত্যার চেয়ে বেশি। তাছাড়া বনবাসের গোড়াতেই জানকী যে জলে স্নান করেছিলেন সে জল তুলে দিয়েছিল গুহক চণ্ডাল। – এসব কথা শুনে প্রকৃতির মন থেকে নিজের জন্মের অশুচিতা ঘুচে যায়। অন্যদিকে, আনন্দকে এক গণ্ডূষ জল দিয়ে তিনি নতুন করে মানুষজন্ম লাভ করেন। তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেন :

> কেবল একটি গণ্ডূষ জল নিলেন আমার হাত থেকে, অগাধ অসীম হল সেই জল। সাত সমুদ্র এক হয়ে গেল সেই জলে, ডুবে গেল আমার কূল, ধুয়ে গেল আমার জন্ম। (১২খ,পৃ.২১৬)

প্রকৃতি জানলেন, তিনিও মানুষ, তার সেবাও বিধাতার সংসারে চলবে। অস্পৃশ্য বলে গণ্ডির বাইরে থাকতে হবে না। ধূলোর থেকে তিনি উঠে দাঁড়ালেন মানুষের সারিতে।

প্রকৃতি বুদ্ধিমতী। তার বোধ সংসারের অনেক মেয়ের চেয়েই বেশি। কারণ ভিক্ষু আনন্দের আগে এক রাজপুত্র এসেছিল মৃগয়ায়। প্রকৃতির রূপে মুগ্ধ হয়েছিল রাজপুত্র। কিন্তু প্রকৃতি রাজপুত্রকে বিশ্বাস করেন নি। প্রকৃতির মনে হয়েছে পশু শিকার করতে বেড়িয়ে পশুকেই চোখে পড়ে, পশুকেই সোনার শিকলে বাঁধতে চায়– মানুষের প্রতি হৃদয় উদ্বেলিত হয় নি। কিন্তু এবার প্রকৃতির মনে প্রেমের জন্ম হয়। তার কোনো কিছুতে খেয়াল থাকে না। প্রচণ্ড তপ্ত কাঠফাটা রোদ, কাক পর্যন্ত ঠোঁট মেলে ধুঁকছে, অথচ প্রকৃতির কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। যেন উমার মতো তপ করছেন তিনি। দিনের পর দিন চলে যায়, তিনি ভিক্ষু আনন্দের জন্য অপেক্ষা করেন। আনন্দ আসবেন বলে কথা দেন নি, কিন্তু প্রকৃতির মনে হয়, আনন্দ আসবেন। তার মন মরুভূমির মতো ধূ ধূ করে, হু হু করে তপ্ত হাওয়া, কেবলই মনে হয় আনন্দ এসে তার কাছে জল চাইবেন। প্রকৃতির মা ব্যথিত হন, তাই তিনি নিজে আনন্দকে পায়ে ধরে বলতে চান যেন আনন্দ এক গণ্ডূষ জল নিতে প্রকৃতির কাছে আসে। কিন্তু ততক্ষণে প্রকৃতির মনে প্রেমিকসত্তার অভিমানবোধও সৃষ্টি হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, অস্পৃশ্য নারী আর স্পৃশ্য নারীর মানসিক বোধ একই। সমাজসৃষ্ট বড়োঘরের মেয়ের যেমন আত্ম-অহংকার থাকে, চণ্ডালকন্যা প্রকৃতিরও একই অহংকার– অহংকার নারীত্বের। তাই প্রকৃতি নিঃশঙ্কোচে বলতে পেরেছেন –

> ডাকব না, ডাকব না অমন করে বাইরে থেকে।
> পারি যদি অন্তরে তার ডাক পাঠাব, আনব ডেকে। (১২খ,পৃ.২১৮)

এই হলো প্রকৃতির প্রেমবোধ। যে কোনো যুক্তিবোধসম্পন্ন শিক্ষিত নারীর মতোই তার এ মানসিক অবস্থা। তবে, শেষ পর্যন্ত তার আর ধৈর্য থাকে না। মাকে দিয়ে মন্ত্র পড়িয়ে আনন্দকে আনতে চান নিজের কাছে। মা তাকে ধর্মের ভয় দেখালে তিনি বলেন :

> যে-ধর্ম অপমান করে সে-ধর্ম মিথ্যে। অন্ধ ক'রে, মুখ বন্ধ ক'রে সবাই মিলে সেই ধর্ম আমাকে মানিয়েছে। কিন্তু সে দিন থেকে এই ধর্ম মানা আমার বারণ। কোনো ভয় আর নেই আমার– পড়ু তোর মন্তর, ভিক্ষুকে নিয়ে আয় চণ্ডালের মেয়ের পাশে। আমিই দেব তাকে সম্মান। এত বড়ো সম্মান আর কেউ দিতে পারবে না। (১২খ,পৃ.২১৯)

অর্থাৎ প্রকৃতি আবেগে বিহ্বল হয়েছেন। তার আবেগ দ্বিমুখী, প্রথমত নিজের মানুষবোধ, দ্বিতীয়ত নারী হৃদয়। আর প্রেমের আবেগ তো ভীত; হারানোর ভয়ে সন্ত্রস্ত। তাই মন্ত্র পড়ে হলেও আনন্দকে পেতে চান প্রকৃতি। বলেন:

> কিসের ভয় তোমার মা! মন্ত্র আমিই পড়ছি মায়ের মুখ দিয়ে। আমার বেদনা যদি আনে তাঁকে টেনে, আর তাই যদি হয় অপরাধ, তবে করবই অপরাধ, করবই। (১২খ,পৃ.২২০)

তাই প্রশ্ন থেকে যায়, রবীন্দ্রনাথ কি মন্ত্রের জোরেই প্রকৃতির কাছে আনন্দকে এনেছেন, না-কি প্রকৃতির মনে যে প্রেম-বেদনার জন্ম হয় সেই বেদনার স্পর্শ লাগে আনন্দর বুকেও। সেই বেদনাতেই তিনি চলে আসেন প্রকৃতির কাছে। কারণ, আনন্দও তো মানুষ। ভিক্ষুর নিয়ম থেকে চ্যুত হতেই পারেন। এ প্রসঙ্গে সুকুমার সেন বলেছেন, "আনন্দকে রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধশিষ্য ভিক্ষুপ্রধান করিয়াছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে তাহাকে রক্তমাংসের মানুষ করিতে ভোলেন নি। প্রকৃতির ভালোবাসার টান মানুষ-আনন্দকে টানিয়াছিল। আনন্দের মনের দ্বন্দ্ব রবীন্দ্রনাথ অভিচারক্রিয়ার উপলক্ষে স্পষ্টভাবে রূপায়িত করিয়াছেন।"[১০১] –এখানে 'প্রকৃতির ভালোবাসার টান মানুষ-আনন্দকে টানিয়াছিল' কথাটি সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত, আবার, 'আনন্দের মনের দ্বন্দ্বে অভিচারক্রিয়ার উপলক্ষ' কথাটি ভালোবাসার টানকে অস্বীকার করে। কারণ 'হৃদয়ের টান', 'অভিচারক্রিয়া' নয়। অন্যদিকে ড. সাধনকুমার ভট্টাচার্য বলেছেন, "যেমন চণ্ডালিকা তেমনি তার মা দুজনেই 'ভাবে ভরা ফানুস' হয়েছে। রক্তমাংসের মানুষ হতে পারেনি।"[১০২] এ কথার সঙ্গে একমত হতে পারি না। উপরের আলোচনায় দেখিয়েছি দুজনেই রক্তমাংসের মানুষ। মানুষ বলেই নিচু জাত হয়েও প্রকৃতির নারী হৃদয় আনন্দকে পেতে উদ্বেলিত হয়। আবার মা, মা বলেই অন্যায় জেনেও মেয়ের দুঃখ দূর করতে মন্ত্র পড়ে আনন্দকে মেয়ের কাছে আনেন। তারা যদি মানুষ না হয়ে 'ভাবের ফানুস' হতেন তাহলে এমন উদ্ধ্যত আচরণ না করে বিরহের গান গেয়ে জীবন কাটাতেন। যে সময়ের পটভূমিকায় নাটকটি দাঁড়িয়ে তখন মন্ত্র খুব সাধারণ বিষয়। মানুষের জৈবিক চাওয়াকেও তারা মন্ত্রের ভাব বলে ভুল করতো। তাই প্রকৃতিকে দেখে আনন্দর প্রেম একটুও অমূলক নয় এবং সেই প্রেমের জন্য বহু ক্লেশ সহ্য করে প্রকৃতির দ্বারে আসাটাও আনন্দর জন্য অস্বাভাবিক নয়। কারণ ভিক্ষুর জন্য নারী-আসক্তি ক্লেশেরই বিষয়। আবার আনন্দ আসার পর প্রকৃতি এবং মায়ের মনে অনুশোচনা উপস্থিত হওয়াও রক্তমাংসের মানুষের বৈশিষ্ট্যই প্রকাশ করে। প্রকৃতির চরিত্রের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট বিশ্লেষণ করেছেন উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। তিনি বলেছেন, "চণ্ডাল-কন্যা শুধু স্থূল লালসার তাড়নায় আনন্দকে পাইতে চাহে নাই; চাহিয়াছে তাহার নবজন্মদাতার, তাহার নুতন মনুষ্যত্বচেতনার উদ্বোধকের পদপ্রান্তে নিজেকে সমর্পণ করিয়া তাঁহার সেবার অধিকার লাভ করিতে– তাহার জীবনকে সার্থক করিতে।"[১০৩] মন্ত্রের এক পর্যায়ে মায়াদর্পণে প্রকৃতি আনন্দর দুঃখক্লিষ্ট চেহারা দেখতে পান, আৎকে ওঠেন তিনি। কিন্তু মন্ত্র থামাতে পারেন না,

নিজের অন্তরের প্রেমবোধের কাছে তিনি পরাজিত হন, কাছে চান আনন্দকে। দর্পণে যে দুঃখের রূপ দেখেছেন, তা তো কেবল আনন্দর একার নয়, নিজেরও। প্রেমের নতুন সংজ্ঞা ধরা পড়ে প্রকৃতির কথায়। প্রেম মানে দুজনের একটি বিন্দুতে স্থির হওয়া। প্রকৃতি মাকে বলেন:

> আশ্চর্য হয়ে গেলুম। আমি, এই আমি, এই তোমার মেয়ে, কোথাকার কে তার ঠিকানা নেই– তাঁর দুঃখ আর এর দুঃখ আজ এক। কোন সৃষ্টির যজ্ঞে এমন ঘটে– এত বড়ো কথা কেউ কোনোদিন ভাবতে পারত! (১২খ,পৃ.২২৪)

এ হলো সম্পূর্ণরূপে মানবীক প্রেম। এখানে কোনো ধর্মীয় ব্যাপার নেই। অন্তরের অন্তঃস্থলের চাওয়া। তাই প্রকৃতি শুক্লাদ্বিতীয়ার রাতে গম্ভীরায় অবগাহন স্নান করেন, শরীরে পরেন ধানের অঙ্কুর রঙের কাপড় আর চাঁপার রঙের ওড়না, ষোলোটি সোনালি সুতোয় ষোলোটি গ্রন্থি দিয়ে রাখী পরেন বা হাতে, পুব দিকে আসন করে সমস্ত রাত ধ্যান করেন আনন্দর মূর্তি, চাল দাড়িমের ফুল সিঁদুর সাতটি রত্ন দিয়ে চক্র আঁকেন আঙিনায়, হলদে কাপড়ের ধ্বজা পোতেন, থালায় রাখেন মালাচন্দন, এরপর বাতি জ্বালিয়ে দেন। অপেক্ষা করেন আনন্দর জন্য। এ তার অভিসারের সাজানো বাসর। এই সময় হঠাৎই প্রকৃতির অনুভব হয়, তিনি অন্যায় করেছেন। ভিক্ষুর বৃহৎ জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ক্ষুদ্রতম নিজের কাছে তাকে এনে রাখা অপরাধ। আনন্দ এলে তিনি বলেন :

> প্রভু, এসেছ আমাকে উদ্ধার করতে– তাই এত দুঃখই পেলে– ক্ষমা করো, ক্ষমা করো। অসীম গ্লানি পদাঘাতে দূর করে দাও। টেনে এনেছি তোমাকে মাটিতে, নইলে কেমন করে আমাকে তুলে নিয়ে যাবে তোমার পুণ্যলোকে! ওগো নির্মল, পায়ে তোমার ধুলো লেগেছে, সার্থক হবে সেই ধুলো-লাগা। আমার মায়া-আবরণ পড়বে খসে তোমার পায়ে, ধুলো সব নেবে মুছে। (১২খ,পৃ.২২৭)

শেষ পর্যন্ত এভাবেই অস্পৃশ্যকে উদ্ধার করেন রবীন্দ্রনাথ, একদিকে চণ্ডাল পায় মানুষের মর্যাদা, অন্যদিকে নারী পায় তার নিজস্ব অধিকার। প্রকৃতি ধর্ম এবং সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নিজের অধিকার ছিনিয়ে নেন। "প্রকৃতির প্রেম বিশুদ্ধ ও স্বার্থলেশহীন। মানসিক সংঘাতের এক অপূর্ব মনস্তত্বমূলক কাহিনীতে রূপান্তরিত হয়েছে। নাটকে বর্ণিত প্রকৃতি চরিত্রটি আদৌ লালসাতাড়িত কোন নারী চরিত্র নয়, সে অতীব স্পর্শকাতর। নিছক ভাগ্য বিড়ম্বনায় সে চণ্ডালিকা, সকলেই তাকে ঘৃণা করে। কিন্তু সে এক নবজন্ম লাভ করেছে, অন্য যে কোন মানব সন্তানের যেটুকু অধিকার ও মর্যাদা সে শুধু তাইই চায়।"[১০৪]

এ নাটকে প্রকৃতি বাইরের ডাকে অর্থাৎ আনন্দের কথায় নিজের পরিচয় পান। এরপর রবীন্দ্রনাথ *চণ্ডালিকার* নৃত্যনাট্যরূপ দেন। সেখানে আনন্দ আসার আগেই প্রকৃতির বোধ জন্মে যে, অন্যদের মতো তিনিও মানুষ। যে দেবতা তাকে নিচু করে রেখেছেন, সে দেবতাকে তিনি পূজা দিতে অস্বীকার করেন। বলেন :

> যে আমারে পাঠাল এই
>
> অপমানের অন্ধকারে

পূজিব না, পূজিব না সেই দেবতারে, পূজিব না।
কেন দিব ফুল, কেন দিব ফুল
কেন দিব ফুল আমি তারে–
যে আমারে চিরজীবন
রেখে দিল এই ধিককারে। (১৩খ,পৃ.১৭১)

অর্থাৎ মানুষ-বোধকে তিনি বাইরে থেকে কিংবা প্রেমের কারণে বিকশিত করেন নি, একেবারে ভিতরেই যে জেগে থাকে– তাই দেখিয়েছেন। সেদিক থেকে 'নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা'র প্রকৃতি আরো বেশি প্রতিবাদী এবং শক্তিশালী।

নেপালী বৌদ্ধসাহিত্যে দিব্যাবদানের অন্তর্গত শার্দুলকর্ণাবদানের কাহিনী অবলম্বনে 'চণ্ডালিকা' নাটক রচিত। "... বৌদ্ধ কাহিনীর চণ্ডালিকার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চণ্ডালিকার আনুষঙ্গিকতায় বহুবিধ পরিবর্তন ঘটেছে। এক কথায় বলতে গেলে, বৌদ্ধ কাহিনীর চণ্ডালিকা চরিত্রকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকে বঙ্গীকরণ করে নিয়েছেন। সমকালীন বাংলাদেশের সমাজবিন্যাস ও সেই সমাজে স্থিত অস্পৃশ্যতার উপসর্গগুলো চণ্ডালিকা চরিত্রে এমনভাবে আরোপ করা হয়েছে, যাতে মনেই হয় না যে, দুই হাজার বছর আগেকার কোনো কাহিনী এই নাটকের উৎস। বাংলাদেশের নিম্নবর্ণীয় বা নিম্নবিত্তের কোনো সম্প্রদায়ের কন্যা হিসেবে চণ্ডালিকা চরিত্র এই নাটকে সমকালীন সমাজবাস্তবতারই প্রতিচ্ছবি।"[১০৫]

মূল কাহিনীর অনেকখানিই বর্জন করেছেন রবীন্দ্রনাথ। আনন্দ প্রকৃতির ঘরে এলে নাটক শেষ হয়েছে। কিন্তু মূল কাহিনিতে রয়েছে, আনন্দ প্রকৃতির ঘরে এলে প্রকৃতি বাসরশয্যা রচনা করার সময় আনন্দর মন্ত্রঘোর কেটে যায়। তখন তিনি মনে মনে বুদ্ধের শরণাপন্ন হন। তখন বুদ্ধও তা বুঝতে পেরে মন্ত্র পড়ে প্রকৃতির মায়ের বশীকরণ মন্ত্র কাটিয়ে দেন। অপাপবিদ্ধ আনন্দ বিহারে ফিরে যান। কিন্তু প্রকৃতি আনন্দর আশা ছাড়েন না। আনন্দের পিছু পিছু চলেন। শহরে ও বিহারে কানাঘুষা চলতে থাকে। বুদ্ধ তখন প্রকৃতিকে ডেকে বলেন, আনন্দকে বিয়ে করতে হলে বাবা-মায়ের মত আনতে হবে। প্রকৃতি তা-ও আনলেন। বুদ্ধ তখন প্রকৃতিকে আনন্দের মতো বেশ ধারণ করতে বললেন। প্রকৃতি মাথা মুড়িয়ে চিবর বস্ত্র পরলেন। এরপর ভিক্ষুণী হয়ে তিনি সর্বদুর্গতিশোধন ধারিণীমন্ত্র জপ করলে তার চিত্তের মলিনতা দূর হলো।– আপাত দৃষ্টিতে এই প্রকৃতি *চণ্ডালিকা*র প্রকৃতির চেয়ে অনেক শক্তিশালী। তিনি আনন্দকে পাওয়ার জন্য নিজে দিনের পর দিন চেষ্টা করেছেন এবং সংসার ধর্ম ছেড়ে ভিক্ষুণী হয়েছেন। এবং আনন্দকে পেয়েছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে প্রকৃতিকে সৃষ্টি করেছেন সে প্রকৃতি আনন্দর পদস্খলন সইতে পারেন নি, আনন্দর ম্লান চেহারা তাকে যন্ত্রণা দিয়েছে। আনন্দ আসার আগেই তাই মন্ত্রের উপকরণ পা দিয়ে ভেঙ্গে ছড়িয়ে ফেলেন। আর আনন্দ এলে ক্ষমা চান। অর্থাৎ প্রকৃতি অন্তরে মিলন অনুভব করেন, তার প্রেম দেহোত্তীর্ণ প্রেমে

উত্তীর্ণ হয়। চণ্ডালকন্যা নারীর পর্যায় থেকে মানুষের পর্যায়ভুক্ত হন। নিজের অস্তিত্বের স্বীকৃতি নিয়ে নিজের চণ্ডালত্ব ঘুচান। আনন্দকে পেতে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিকে ভিক্ষুণী হতে হয় নি, মানুষ হতে হয়েছে। বৌদ্ধ কাহিনির চেয়ে এখানেই *চণ্ডালিকার* বিশেষত্ব।

*তাসের দেশ*এ রাজপুত্র এবং সদাগর পুত্রের আগমনে দেশের নিয়মে ভাঙ্গন ঘটায় প্রথমে মেয়েরাই। হরতনীর মুখে শোনা যায় বিদ্রোহের সুর–

> আজ আর-একবার উঠে দাঁড়াও, ভাঙতে হবে এখানে এই অলসের বেড়া, এই নির্জীবের গণ্ডি, ঠেলে ফেলতে হবে এই-সব নিরর্থকের আবর্জনা। (১২খ,পৃ-২৫১)

এমনকি রানীও এ পরিবর্তন থেকে বাদ পড়েন না। বরং রানি-ই বলেন :

> আমাদের তাসের দেশের ভাষায় শিকলকে বলে অলংকার, এ ভাষা ভোলবার সময় এসেছে। (১২খ,পৃ.২৫৬)

রাজার কথা কেউ আর শোনেন না, শোনেন না পুরোহিত দহলা পণ্ডিতের কথাও। সব শেষে রাজাও রানীর পথ অনুসরণ করেন। আবার পণ্ডিতও পুঁথিগুলো ভাসিয়ে দিতে চান জলে। মূলত রাজ-নিয়ম এবং ধর্ম-নিয়মের বিরুদ্ধে প্রথমে মেয়েরাই দাঁড়ান তাদের মুক্তির জন্য। তারপর পুরো দেশ মুক্ত হয়ে মানবজন্ম লাভ করে। "... 'তাসের দেশ' জড়তামুক্ত হয়, প্রাণচাঞ্চল্য পায় এর মানুষগুলো। কিন্তু এর সূচনা করে নারীরা। নারীরাও যে সমাজ-রাজনীতির বন্ধ্যাত্ব কাটানোর কাজে প্রথম এগিয়ে আসতে পারে এ নাটকে তা দেখানো হয়েছে।"[১০৬]

যোগাযোগ নাটকে কুমুদিনী কেন্দ্রীয় চরিত্র। তিনি সকল সময় সম্পূর্ণ নিজের মনের চাওয়া অনুযায়ী চলেছেন। অবশ্য অনেক সময়ই তার সিদ্ধান্ত বুদ্ধিদীপ্ত হয় নি, হয়েছে আবেগতাড়িত এবং ধর্মনির্ভর। কুমুদিনী শিক্ষিত-ঐতিহ্যবাহী জমিদার পরিবারের মেয়ে। নিঃশেষিত জমিদারীর উত্তরাধিকার। বড়ো ভাই বিপ্রদাসের উদার মানসিকতা এবং শিক্ষা-দীক্ষায় লালিত তিনি। মা-বাবা দুজনেরই অভাব পূরণ করেছেন বিপ্রদাস। কুমুদিনীর সমস্ত অস্তিত্বে বিপ্রদাসের বোধ প্রজ্জ্বলিত। আবার বিপ্রদাসের প্রতিই কুমুদিনীর সমস্ত ভালোবাসা। প্রথম দৃশ্যেই এর পরিচয় পাওয়া যায়। কুমুদিনী বিপ্রদাসকে বলেছেন:

> আমাকে তুমি ছেলেমানুষ বলেই ঠিক করেছ। সত্যিই ছিলুম ছেলেমানুষ, নুরনগরে যতদিন পূর্বপুরুষের জীর্ণ ঐশ্বর্যের আওতায় ছিলুম। তার ভিত ভাঙতেই আজ একদিনেই যেন আমার বয়স বেড়ে গেছে। আর আমাকে স্নেহের আড়ালে ভুলিয়ে রেখো না, আজ তোমার দুঃখের অংশ আমাকে দাও, তাতেই আমার ভালো হবে। (১৮খ,পৃ.১৬২)

বিপ্রদাসের থেকে আলাদা বলতে কুমুদিনীর শুধু ধর্মবিশ্বাস। আর এই ধর্মবিশ্বাসের আবেগেই মধুসূদনকে বিয়ে করতে রাজি হন কুমুদিনী। একদিন তিনি বিপ্রদাসের মুখ শুকনো দেখে বিশ্বাস নিয়ে ঠাকুরঘরে ঢোকেন। এবং মনে মনে ঠাকুরকে বলেন–

> আমাদের দুঃখের দিন শেষ হল এই কথাটি বলো তুমি, প্রসন্ন যদি হয়ে থাক তবে তোমার পায়ে যেন আজ অপরাজিতার একটি ফুল দিয়ে প্রমাণ করতে পারি। (১৮খ,পৃ.১৬৪)

এরপর কুমুদিনী চোখ বন্ধ করে অনেক ফুলের ভিতর থেকে একটি ফুল তোলেন। চোখ খুলে দেখেন সেইটি অপরাজিতা। তাই তিনি বিশ্বাস করেন যে, তাকে দিয়ে তার দাদার ভাগ্য রক্ষা হবে। এ রকম সময়ই মধুসূদনের পক্ষ থেকে কুমুদিনীকে বিয়ে করার প্রস্তাব আসে। বয়স-শিক্ষা-ঐতিহ্য-আভিজাত্যের পার্থক্য সত্ত্বেও এ বিয়েতে তিনি রাজি হন। তার কাছে এ এক দৈব ইঙ্গিত মনে হয়। কিন্তু এ বিয়ে সুখের হয় না। বিয়ের আগেই মধুসূদনের অভদ্রতা এবং প্রতিশোধপরায়ণতা শুরু হয়। মধুসূদনের পূর্বপুরুষ কুমুদিনীর পূর্বপুরুষের কাছে হেরে গিয়েছিলেন। মধুসূদন শুরু করে সেই পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়া। পূর্বপুরুষের ভিটে নূরনগরে গিয়ে নিজের ঐশ্বর্য জাহির করতে শুরু করেন। ইংরেজ বন্ধু, মদ, পাখি শিকার ইত্যাদি করে একদিকে বিপ্রদাসদের ছোটো করতে চেষ্টা করেন, অন্যদিকে গ্রামের লোকদের অতিষ্ট করে তোলেন। গ্রামের লোক বিপ্রদাসের কাছে অনুমতি চায় এর প্রতিকারের। কিন্তু উদারমনা বিপ্রদাস সে অনুমতি দেন না। তবে সুবিবেচকের মতো কুমুদিনীকে বলেন, কুমুদিনী অনুমতি দিলে মধুসূদনের সঙ্গে বিয়ে ভেঙ্গে দিবেন। কিন্তু ধর্মবিশ্বাসী কুমুদিনী মনে করেন এ বিয়ে তার ভাইয়ের মঙ্গল বয়ে আনবে। কিন্তু বিয়ের পরও মধুসূদনের আচরণ পরিবর্তন হয় না। ভেঙ্গে যায় কুমুদিনীর বিশ্বাস। তিনি বলেন :

> আমি তো মন দিতে সম্পূর্ণ তৈরি হয়েই এসেছিলুম এঁদের ঘরে, কিন্তু সে মন কি এমনি করেই নিতে হয়– এত অশ্রদ্ধা ক'রে, ছি ছি, এমন অপমান ক'রে! যে ভালোবাসা আমি ওঁকে দিতে এলুম, সে যে আমার ঠাকুরের প্রসাদ থেকে নেওয়া, বিয়ের আগে থেকেই পদে পদে তার অসম্মান ঘটেছে। এমন ব্যবহার যে কোথাও হতে পারে সে আমি মনে করতেও পারি নি, এ আমার একটুও জানা ছিল না, তাই আমি এত নির্ভয়ে বিশ্বাস নিয়েই এসেছিলেম। (১৮খ,পৃ.১৭২)

কুমুদিনীর ব্যক্তিত্ববোধ তাই কোনো সময়ই মধুসূদনকে ভালোবাসতে পারে না। নিজের অস্তিত্ববোধের কারণে সংসারের সাধারণ নারীধর্মের বিরুদ্ধে অবলীলায় বিদ্রোহ করেছেন তিনি। তার এ বিদ্রোহ সম্পূর্ণ মানসিক। তা কখনো নীরব কখনো সরব। তার এই বিদ্রোহ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ শিশিরকুমারকে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "ওর সমস্ত বিশ্বাসকে ধূলিসাৎ করে জীবনের নাড়ীতে এসেছে বিদ্রোহ। এ তোমার সস্তার বিদ্রোহিনী নয়।"[১০৭] সত্যিই কুমুদিনীর বিদ্রোহ সাধারণ সংসারী নারীর বিদ্রোহ নয়। আত্মমর্যাদা এবং বংশমর্যাদার প্রশ্নে স্বামীর সঙ্গে

বিদ্রোহ। মধুসূদনের সঙ্গে শীতল যুদ্ধে অবতীর্ণ হন কুমুদিনী। এ যুদ্ধ শুধুমাত্র ব্যক্তিত্বের : কথা বা অস্ত্রের নয়। বিপ্রদাসের প্রতি কুমুদিনীর ভালোবাসা মধুসূদন সহ্য করতে পারে না, বিপ্রদাসকে অপমান করাই তার জেদ হয়ে দাঁড়ায়। আবার মধুসূদন যত বিপ্রদাসকে অপমান করে, কুমুদিনীর মন তত মধুসূদনের প্রতি বিরূপ হয়। বিপ্রদাস কুমুকে নীলার আংটি দিয়েছিলেন সে আংটি গোপনে মধুসূদন নিয়ে যায়। কুমুদিনী বুঝতে পারেন তার আর নিজের বলে কিছু নেই। তিনি মোতির মাকে জিজ্ঞাসা করেন:

আজ থেকে আমার নিজের বলে কিছুই রইল না? (১৮খ,পৃ.১৭৬)

কুমুদিনীর এই কথা যেন, সমস্ত বিবাহিত নারীর আর্তনাদ হয়ে প্রকাশ পায়। এছাড়া নিজস্বতা এবং অস্তিত্বের প্রশ্নে তিনি স্বামী মধুসূদনকে বলেন :

তোমার জিনিস তুমি রাখতে পারবে– আর আমার জিনিস আমি রাখতে পারব না? (১৮খ,পৃ.১৮১)

সত্যধর্ম আর মানুষের বানানো ধর্ম সম্পর্কে তাই কুমুদিনীর ক্ষোভ প্রকাশ পায়। তিনি বলেছেন :

রাজা অজ ইন্দুমতীর পরিচয়ে তাঁকে গৃহিনী বলেছেন, মন্ত্রী বলেছেন, সখী বলেছেন, প্রিয়শিষ্যা বলেছেন, এই ফর্দের মধ্যে কোথাও তো দাসীর উল্লেখ নেই। স্ত্রী যাদের দাসী তারা কোন দাসের জাতের মানুষ? (১৮খ,পৃ.১৭৬)

এই জাতকে কুমুদিনী ঘৃণা করেন। তাই তার কষ্ট দু রকম। মধুসূদনকে ভালোবাসতে না পারার কষ্ট এবং মধুসূদনের প্রতি ঘৃনা আসছে সেই কষ্ট। সংসারটা তার কাছে ঘরদুয়োর, জিনিসপত্র, লোকজন নয়। সাধারণ কোনো মেয়ে সম্পদ আর মহারাণীর পদ নিয়ে সন্তুষ্ট হতো, কিন্তু কুমুদিনীর কাছে নির্ভেজাল ভালোবাসা-সম্মান-আমিত্ব অনেক বড়ো। আমিত্বহীনভাবে কোনো সংসারে থাকতে তার ব্যক্তিত্বে বাঁধে। তাই মধুসূদনের সংসারের কোনো কিছুকেই নিজের মনে করেন না। এমনকি দাদাকে টেলিগ্রাফ পাঠানোর টাকাটি পর্যন্ত নিতে নারাজ। সমাজের আর দশটা নারীর মতো স্বামীর সঙ্গে তিনি একাত্ম হতে পারেন নি, নিজের আলাদা সত্তার প্রতি সচেতন থেকেছেন। "... 'যোগাযোগ'-এর চিরন্তন সত্য এবং কুমুর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের সংঘাতের ক্ষেত্রে মূল্যের এবং মূল্যবোধের যুক্তিশীলতার ওপর জোর বার-বার ঘুরে ফিরে এসেছে। দ্বন্দ্ব এবং সংঘাত তিনি ধরেছেন এবং বুঝতে চেষ্টা করেছেন, মূল্যবোধের মাধ্যমে। এই মূল্যবোধের একটা পশ্চাৎপট হচ্ছে উপনিষদের চিরন্তনতা, অন্য পশ্চাৎপট চচ্ছে উপযোগবাদ নির্মিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। একটা পশ্চাৎপট হচ্ছে ভারতবর্ষের অতীত, অন্য পশ্চাৎপট হচ্ছে পশ্চিম ইউরোপের আধুনিকতা, কিন্তু এই অতীত এবং এই আধুনিকতার মাধ্যম হচ্ছে কলোনীয়াল মুহূর্ত যার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ জীবনযাপন করেছেন। সেজন্য তাঁর মধ্যে একটা ক্ষান্তিহীন প্রয়াস হচ্ছে অতীত ভারতবর্ষের একটা অন্তঃসার তৈরি করার এবং ইউরোপীয় আধুনিকতার একটা নির্যাস তৈরি করার : এই হচ্ছে তাঁর কাছে দুই

সভ্যতার সত্যবোধ, এই সত্যবোধ তাঁর বিশ্বাসের কেন্দ্রে এবং সত্যবোধ তিনি শোধন করতে চেয়েছেন কলোনীয়াল তথ্য দিয়ে এবং উপনীত হতে চেয়েছেন চিরন্তন মূল্যবোধে।"[১০৮]

কুমুদিনীর ব্যক্তিত্ববোধ দৃঢ়-কঠিন। অন্যায়কে তিনি মেনে নিতে পারেন না। তার দাদার চিঠি তাকে না দিয়ে মধুসূদন অন্যায় করেছে। এ অন্যায়ের প্রতিবাদে মধুসূদনের সামনে চিঠিটি না পড়েই তিনি ছিঁড়ে ফেলেন। অন্যদিকে, মধুসূদনকে ভালোবাসতে না পেরে কষ্ট পেলেও ব্যক্তিত্বের সংঘাতের কারণে মধুসূদনের অনেক সরল ভালোবাসাও কুমুদিনী দেখতে পান না। সমস্ত মুছে সরলভাবে ডাকলেও সহজভাবে মধুসূদনের কাছে নিজেকে নিবেদন করতে পারেন না। বরং পূর্বের কথা মনে করে ব্যবহার রুঢ় করেন। তখন পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে ওঠে। "'যোগাযোগে'র মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে দ্বন্দ্বের উত্থাপন করেছেন তা এ যুগের বৈশিষ্ট্য। নবজাগরণের আলোকপ্রাপ্ত আত্মসচেতন মেয়ে কুমুদিনী স্বামী মধুসূদনকে ভালোবাসতে পারেনি। এ তার কোনো ইচ্ছাকৃত ব্যাপার নয়, অপরাধও নয়। মধুসূদনও সমাজের চোখে তথাকথিত কৃতী পুরুষ। কিন্তু তবুও অন্তরের সূক্ষ্ম প্রেমানুভূতির ক্ষেত্রে ব্যর্থ। স্ত্রীর অনুভূতিপ্রবণ নারীহৃদয়কে সে জয় করতে পারেনি।"[১০৯]

কুমুদিনীর মন আবেগাপ্লুত। মধুসূদনের সঙ্গে বিয়ে হলে জীবনে কত বড়ো ক্ষতি হতে পারে তা তার ধারনাতীত ছিলো। কারণ সমাজের মোটাদরের মানুষদের সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই ছিলো না। তার সমস্ত কল্পনা নিজের বেড়ে-ওঠার পরিবেশ-ঐতিহ্য-মানবিকবোধ-ভদ্রতা-ধর্মীয়বোধকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। বিয়ের পর আবেগের বাইরে বাস্তবজীবনে এসে তাই অবাক হয়ে বলেন :

> সূর্য ওঠবার আগে যেমন করে আলো হয়, আমার সমস্ত আকাশ ভরে ভালোবাসা তেমনি করেই জেগেছিল। তুমি দময়ন্তীর কথা পড়েছ। শুভক্ষণে তাঁর বাঁ চোখ নেচেছিল, কিন্তু আগে তো জানতেন না যে নল রাজাকেই তিনি পাবেন; তবু যাঁকে পাবেন তাঁর জন্যেই সর্বান্তঃকরণের অর্ঘ্য সাজিয়ে রাখলেন। তার পর যখন নল রাজাকে পেলেন তখন মনে হল এইজন্যেই বুঝি তাঁর বাঁ চোখ নেচেছিল। কিন্তু আমার এ কী হল দিদি?(১৮খ,পৃ.১৮৯)

নিজেরই ভুলে নিজে অনুতপ্ত হন তিনি। কিন্তু প্রতিকারের পথ পান না। "কুমুকে রবীন্দ্রনাথ তৈরি করেছেন তাঁর সবটুকু রোমান্টিক পক্ষপাতিত্ব দিয়ে। দুর্বৃত্ত মধুসূদনও কুমুর মহত্ত্বকে মনে মনে স্বীকার করে নিজে হীনমন্যতায় ভুগেছে।"[১১০] কুমুদিনী শেষ পর্যন্ত ঠাকুরকেও আর বিশ্বাস করতে পারেন না। ঈশ্বরের পরে বিপ্রদাসের উপরই কুমুদিনীর সমস্ত ভরসা। এমনকি ঈশ্বরের উপর থেকে বিশ্বাস উঠে গেলেও বিপ্রদাসের উপর থেকে বিশ্বাস যায় না। দাদাই তখন হয়ে ওঠেন তার একমাত্র ভরসার স্থল। তিনি শেষ পর্যন্ত মনে মনে ভাবেন, 'দেবতার চেয়ে দাদার বিচারের উপর ভর করলে এত বিপদ ঘটত না।' তারপরও মনের দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে পারেন না। এভাবে পুরো নাটক জুড়েই দেখা যায়, কুমুদিনীর নিজের মনে দ্বন্দ্ব। "... তার ভাই তাকে মুক্তি দিতে পারছে না; আর তার স্বামী

তাকে গ্রাস করে ফেলতে চাচ্ছে। একদিকে স্বামী মধুসূদনের আগ্রাসী ও পুঁজিবাদী কর্তৃত্ব, অন্যদিকে ভাই বিপ্রদাসের দুর্বলতার মধ্যে পড়ে কুমু আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। এখানে আমরা যে সত্যটা দেখছি, সেটা হলো পুরুষের ব্যর্থতা। এটাই নারীর দুর্দশার কারণ।"[১১১] কুমুদিনী সবচেয়ে বেশি করে ভেবেছেন নিজের পারিবারিক কথা– দাদার দুঃশ্চিন্তাহীন জীবনে প্রত্যাবর্তনের কথা। এই একটি কারণেই নাটকে তার সমস্ত পথপরিক্রমা। নিজের বংশমর্যাদাকে নিচু করতে পারেন নি বলেই মধুসূদনের সঙ্গে মিলতে পারলেন না। সন্তানসম্ভবা হয়ে স্বামীগৃহে ফিরে যাওয়ার সময়ও তিনি বিপ্রদাসকে বলেন :

> ... চলে আসবই– এ তুমি দেখে নিয়ো। মিথ্যে হয়ে মিথ্যের মধ্যে থাকতে পারব না। আমি ওদের বড়োবউ, তার কি কোনো মানে আছে যদি আমি কুমু না হই?(১৮খ,পৃ.২২৭)

তিনি আরো বলেন–

> এমন কিছু আছে যা ছেলের জন্যেও খোওয়ানো যায় না। (১৮খ,পৃ.২২৭)

শেষ পর্যন্ত কুমুদিনী আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি বুঝতে পেরেছেন, তার নিজস্বতা। বন্দিশালার মধ্যেও তাকে কেউ বন্দি করতে পারবে না। "গর্ভবতী কুমু যাওয়া সাব্যস্ত করে। কিন্তু এই কুমু ইতিমধ্যে জেনেছে, সে মেয়েমানুষ নয়, মানুষ; কারাগারে তাকে আর বন্দি করা যাবে না।"[১১২] তবে কুমুদিনী সিদ্ধান্ত নেন, যে সন্তান তার গর্ভে এসেছে তাকে ঘোষালদের হাতে দিয়ে তিনি নিজের মুক্তি নেবেন। এই সিদ্ধান্তে কুমুদিনী চরিত্রের সাধারণ সীমাবদ্ধতা প্রকাশিত হয়েছে। নিজের সন্তানকে তিনি নিজের বংশের উত্তরাধিকার ভাবতে পারেন নি। স্বামীর উত্তরাধিকার ভেবেছেন। অথচ সন্তানের প্রতি তার অধিকার সমান। এ কথা তিনি মনে করেন নি। এই সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে পারলে তিনি যুগোত্তীর্ণ হতে পারতেন, কিন্তু তিনি যুগের বিদ্রোহী সত্তা হয়েই রইলেন।

৩. তত্ত্বপ্রধান একমুখী চরিত্র

রবীন্দ্র-নাট্যের কয়েকটি নারী চরিত্র আইডিয়াকে অবলম্বন করে জীবন যাপন করেছেন। এ কারণে তারা হয়ে উঠেছেন তত্ত্বসর্বস্ব। একমুখী তাদের পদচারণা। এ চরিত্রগুলো এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত।

সুরঙ্গমা দাসী। রাজার নিযুক্ত সুদর্শনার দাসী। দাসী হলেও তারই মধ্য দিয়ে সুদর্শনা রাজাকে চিনেছেন। "সুরঙ্গমা রাজাকে চেনে– হাট হইতে কিনিয়া আনা দাসী যেমন পরে অনুরাগিণী উপাসক হইয়া প্রভুকে ভক্তি করে, দাস্যরসিক ভক্ত যেমন ভগবানকে দেখে তেমনি।"[১১৩] তিনি রাজার সৌন্দর্য সম্পর্কে সুদর্শনাকে বলেন :

সুন্দর বললে তাঁকে ছোটো করে বলা হবে। (৫খ,পৃ.২৭০)

এরপর আরো বলেন,

সুন্দর নয় ব'লেই এমন অদ্ভূত, এমন আশ্চর্য। ... যখন সকালবেলায় তাঁকে প্রণাম করি তখন কেবল তাঁর পায়ের তলায় মাটির দিকেই তাকাই, আর মনে হয়– এই আমার ঢের, আমার নয়ন সার্থক হয়ে গেছে। (৫খ,পৃ.২৭০)

সুরঙ্গনার মধ্যে দার্শনিক বোধ রয়েছে। সুরঙ্গমার অতীত ইতিহাসে জানা যায়, তিনি বিবর্তনের মাধ্যমে এই মানসিক স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। 'নষ্ট হবার পথে' যাওয়া সুরঙ্গমাকে রাজা সেখান থেকে নিয়ে এসে কাজে লাগিয়ে দিয়েছিলেন, প্রথম দিকে রাজাকে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর মনে হয়েছিল। তার বাবাকে নির্বাসন দিয়ে রাজা তাকে যখন কুপথ থেকে নিজের কাছে আনলেন, তখন তিনি শুধু খাঁচায়-পোরা বুনো জন্তুর মতো গর্জে বেড়িয়েছেন এবং সবাইকে কামড়ে ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করেছে তার। তার চলে যাওয়ার কোনো উপায় ছিল না বলেই তিনি রাজার কাছে থাকতে বাধ্য হয়েছেন। আস্তে আস্তে সুরঙ্গমার সমস্ত দুরন্তপনা হার মেনে রাজার ভক্ত হয়ে উঠল। দুর্বিসহ যন্ত্রনা এবং অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সুরঙ্গমার নতুন জন্ম হয়েছে। রাজার নিঃশ্বাস পায়ের শব্দ শরীরের গন্ধ এমনকি সমস্ত কর্মকাণ্ডই তাই সে বুকের ভিতর থেকে শুনতে পায়। রাজা সম্পর্কে তার একটি বোধ তৈরি হয়েছে। সুরঙ্গমা যখন সুদর্শনার দাসী তখন তিনি সুদর্শনাকে প্রস্তুত করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন :

তুমি দেখব দেখব করে যে অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে রয়েছ সেইজন্যে কেবল দেখবার দিকেই তোমার সমস্ত মন পড়ে রয়েছে। সেইটে যখন ছেড়ে দেবে তখন সব আপনি সহজ হয়ে যাবে। (৫খ,পৃ-২৭১)

এ ঠিক সাধারণ দাসীর মুখের কথা নয়। মনে হয় দার্শনিক তত্ত্ব। নাটকে তিনি-ই আলো-অন্ধকারের পরিচয় দিয়েছেন। আলোকে চেনার জন্য অন্ধকার দরকার– এ-ও তারই কথা। এমন কি রানি সুদর্শনা যখন বসন্ত উৎসবের রাতে দক্ষিণের কুঞ্জবনে উতলা হওয়ায় রাজাকে চিনে নেওয়ার কথা বলেছেন, তখন সুরঙ্গমা ভবিষ্যৎবাণী করেছেন–

কৌতূহলের জিনিস হাজার হাজার আছে– তুমি কি তাদের সঙ্গে মিলে কৌতূহল মেটাবে। তুমি আমার তেমন রাজা নও। রানী, তোমার কৌতূহলকে শেষকালে কেঁদে ফিরে আসতে হবে। (৫খ,পৃ.২৪৭)

– এরকমভাবে সমস্ত নাটক জুড়েই সুরঙ্গমার বুদ্ধিদীপ্ত এবং তাত্ত্বিক কথা প্রকাশ পেয়েছে। অর্থাৎ রাজার কথাই সুরঙ্গমার মুখ থেকে শোনা গেছে। এ ক্ষেত্রে এ চরিত্রটি দাসীর পর্যায়ে না থেকে অনেকটা শিক্ষাগুরুর পর্যায়ে উঠেছে। *কুশজাতক* কাহিনী অবলম্বনে *রাজা* নাটকটি রচিত। এই জাতকের কাহিনীতে কুশরাজার মা ছিলেন শীলবতী। শীলবতীর ছায়া অবলম্বনে সুরঙ্গমা চরিত্রটি রচিত। কুশরাজা দেখতে খুব কুৎসিত বলে শীলবতী বুঝতে পারেন, তার পুত্রবধূ অসমান্যা রূপবতী প্রভাবতী কুৎসিৎ কুশকে দেখলে বিগড়ে যেতে পারে, তাই তিনি বিয়ের সময় বানিয়ে বলেন, তাদের বংশের প্রথা হলো এক বছর স্ত্রী স্বামীর মুখ দেখতে পারবে না। এভাবে বিয়ে হওয়ার

পরও তিনি খুব সাবধানে থাকেন এবং প্রভাবতীর সঙ্গে ছায়ার মতো লেগে থাকেন যেন কুশরাজার সঙ্গে প্রভাবতীর দেখা না হয়। 'মা' চরিত্রটিকে রবীন্দ্রনাথ 'দাসী' করেছেন। নাটকেও রবীন্দ্রনাথ সুরঙ্গমাকে রাজার 'মা' অথবা প্রতিনিধি করলে ভালো হতো। চরিত্রটি সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন থাকতো না, রানিকে শিখানো বা উপদেশ দেওয়াকে স্পর্ধা মনে হতো না। সুকুমার সেন বলেছেন, "সুরঙ্গমা সুদর্শনার গুরু নয়,– উত্তরসাধিকা, কল্যাণমিত্র। এ পথে গুরু নাই।"[১১৪] – উত্তরসাধিকা হলেও শিক্ষা এবং উপদেশ পুরোমাত্রায়ই রয়েছে। এছাড়াও সুরঙ্গমা যে সুদর্শনার চেয়ে রাজাকে বেশি চেনেন সে দাম্ভিকতাও প্রকাশ পায় বিভিন্ন কথায়। উপরের সংলাপটিতেও এর স্পষ্টতা দৃশ্যমান। দাসী চরিত্র হিসেবে তা খাপছাড়া বটে। তবে, ভগবানের কাছে দাসী-রানি ভেদ নেই– সবাই মানুষ। তাই এই খাপছাড়া বিষয়টি সামঞ্জস্যপূর্ণভাবেই এগিয়ে গেছে। অবশ্য *অরূপরতন* নাটকে 'সুরঙ্গমা'কে একবারও দাসী উল্লেখ করা হয় নি, সেখানে রাজার প্রতিনিধি বা রানির সহচরী হিসেবে দেখানো হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ *অরূপরতনের* ভূমিকায় সুরঙ্গমাকে 'সঙ্গিনী' বলেছেন। তিনি বলেছেন :

> তাহার সঙ্গিনী সুরঙ্গমা তাহাকে বলিয়াছিল, অন্তরের নিভৃত কক্ষে যেখানে প্রভু স্বয়ং আসিয়া আহ্বান করেন সেখানে তাঁহাকে চিনিয়া লইলে তবেই বাহিরে সর্বত্র তাঁহাকে চিনিয়া লইতে ভুল হইবে না।[১১৫]

এখানে চরিত্রটি আরো শক্তিশালী। *রাজায়* যে সব কথা রাজার মুখে উচ্চারিত হয়েছে এখানে তার বেশিরভাগই সুরঙ্গমার মুখে উচ্চারিত হয়েছে। আবার সুবর্ণকে সুদর্শনা মালা পাঠিয়ে দিলে স্পষ্টভাবেই তিনি বলেন :

> সে মালা সাপ হয়ে তোমাকে দংশন করবে। (৭খ,পৃ.২৮০)

আবার সুদর্শনাকে স্বান্তনাও দেন স্নিগ্ধভাবে। বলেন :

> যে কালো দেখে আজ তোমার বুক কেঁপে গেছে সেই কালোতেই একদিন তোমার হৃদয় স্নিগ্ধ হয়ে যাবে। নইলে ভালোবাসা কিসের?(৭খ,পৃ.২৮৪)

অর্থাৎ তার মনে রাজা সম্পর্কে কোনো রকম সংশয় নেই। "নিষ্ঠাবতী অনুরাগিণী ভক্তরূপে সে আমাদের কাছে দেখা দিয়েছে।"[১১৬] সুরঙ্গমা রাজা সম্পর্কে বলেন :

> আমি যাঁর দাসী তিনি আমাকে নিরাভরণ করেই সাজিয়েছেন। সেই আমার অলংকার। লোকের গর্ব করতে পারি এমন কিছুই তিনি আমাকে দেন নি। (৫খ,পৃ.৩০০)

রাজার এই সাজানোই সুরঙ্গমার গর্ব। আবার সুরঙ্গমা রাজাকে পুরোপুরি বোঝেন। এবং মনে হয় রাজার প্রতি তার পূর্ণ অধিকার– জীবাত্মার মধ্যে পরমাত্মার অংশ। "সুরঙ্গমার আছে স্থির ভক্তির আনন্দ।"[১১৭] এ জন্য সুরঙ্গমা গাইতে পেরেছেন–

> ওগো আমার প্রানের ঠাকুর,
>
> তোমার লাগি দুঃখ আমার

হয় যেন মধুর। (৭খ,পৃ.২৮৬)

প্রমথনাথ বিশী বলেছেন, "দাসী সুরঙ্গমার গভীরতর দৃষ্টি আছে। রাজা তাহাকে কৃপা করিয়াছেন। সে জানে রাজাকে বাহিরে দেখিবার নয়– দেখিলে ভুল হইবে, সে জানে রাজাকে অন্ধকার ঘরের মধ্যে দেখিতে হয়।"[১১৮]– বাইরে দেখলে কেন ভুল হবে, সে ব্যাখ্যা সুরঙ্গমা দেন নি। তিনি নিজেই তো রাজাকে বাইরে দেখেন। বাইরে দেখতে দেখতেই তিনি রাজার ভক্ত হয়েছেন। তাহলে সুদর্শনার ক্ষেত্রে তিনি তা মনে করলেন কেন? এ কথা প্রমথনাথ বিশীও স্পষ্ট করেন নি। হতে পারে রাজাকে তিনি চেনেন সেই বড়াই করছেন। সুরঙ্গমা সম্পর্কে প্রমথনাথ বিশী আরো বলেছেন, "সুরঙ্গমার দৃষ্টিও চূড়ান্ত দৃষ্টি নয়– ইহা ভক্তির দৃষ্টি, সে রাজার পায়ের তলাকার মাটির দিকেই তাকায়, মুখের দিকে নয়; ইহা প্রেমের দৃষ্টি নয় এবং প্রেমের দৃষ্টি নয় বলিয়াই সে রাজাকে যথার্থতম ভাবে বুঝিতে পারে নাই।"[১১৯]– সুরঙ্গমা রাজাকে বুঝতে পারেন নি– এ কথা নাট্যঘটনার সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি করে। *রাজা* নাটকে আগাগোড়াই দেখানো হয়েছে সুরঙ্গমা রাজার প্রতিটি পদক্ষেপ বোঝেন। এ জন্যই পায়ের শব্দে-বাতাসের গন্ধে তিনি রাজাকে উপলব্ধি করেন।

এখানে সুরঙ্গমাকে নিয়ে প্রশ্ন জাগে, রাজার প্রতি এ কি শুধু ভক্তের ভক্তি? তার মধ্যে কি নারী সত্তা নেই? সেই নারী কি রাজার প্রতি মানবিক প্রেমে উদ্বেলিত হয় না? রাজা সম্পর্কে সুরঙ্গমার কথাগুলো হেঁয়ালিপূর্ণ। কখনো মনে হয় স্রষ্টার প্রতি ভক্তের প্রেম আবার কখনো মনে হয় প্রেমিকের প্রতি প্রেমিকার আসক্তি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বোঝা যায় এ শুধুই ভক্তের ভক্তি। সুরঙ্গমা রক্তমাংসের মানব চরিত্র নন, একমুখী ভক্তিবাদী চরিত্র। তাই রানিকে অবলীলায় বলতে পেরেছেন–

আমি কেবল তোমার দাসী।
কেমন করে আনব মুখে তোমায় ভালোবাসি!
গুণ যদি মোর থাকত তবে
অনেক আদর মিলত ভবে,
বিনামূল্যের কেনা আমি শ্রীচরণপ্রয়াসী। (৫খ,পৃ.৩০৩)

রক্তমাংসের মানুষের পক্ষে রানির সামনে রাজার সম্পর্কে এ কথা বলবার স্পর্ধা তিনি পেতেন না। দ্বিধা-দ্বন্দ্বহীন রাজা অনুগতপ্রাণ সুরঙ্গমা তত্ত্বপ্রধান চরিত্রের প্রতিনিধি-ই হয়েছেন।

ভিক্ষুণী উৎপলপর্ণার জন্ম নিচু জাতে, তিনি ক্ষেত্রপালের মেয়ে। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম জাতিভেদ মানে না। তাদের কাছে সবাই সমান। উৎপলপর্ণা মানসিকভাবেও নিচু থাকেন না। তার বোধ-বুদ্ধি-মনন ভিক্ষুণীর নিজস্ব পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়। বৌদ্ধ অনুসারী হয়ে দার্শনিক জ্ঞানসম্পন্ন হন। তিনি বলেন :

> সংসারের মূল্যে ধর্মের মূল্য নয় মহারানী। সোনার দাম আর আলোর দাম কি এক?(৯খ,পৃ.২২৩)

মহারানি লোকেশ্বরীর পুত্রের ভিক্ষু হওয়া সম্পর্কে এ কথা বলেন তিনি। এ কথা বললেও ভিক্ষুণী লোকেশ্বরীর কষ্ট বুঝতে পারেন। তিনি মা না হলেও মেয়ে বটে। তাই তিনি লোকেশ্বরীর সঙ্গে তার পুত্রের দেখা করানোর কথা বলেন। কিন্তু ফল উল্টো হয়। মায়ের মাতৃত্বে আঘাত লাগে। কটু কথা শোনেন তিনি। তারপরও তিনিই ব্যবস্থা করে দেন লোকেশ্বরীর কাছে তার পুত্রের আসার। উৎপলপর্ণা ধর্মের প্রতি নিষ্ঠাবান। সংঘের আদেশ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন। তার বিশ্বাস দৃঢ়। তিনি মনে করেন, ধর্মের পথে বাধা আসলে তা চিরস্থায়ী হয় না, বরং বাধা নিজেই পথ করে দেয়। শেষ পর্যন্ত ধর্মের জন্য জীবন দেন তিনি।

নটীর পূজা নাটকে শ্রীমতী রাজবাড়ির নটী। তিনি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে ভিক্ষুণী হয়েছেন। ছেড়ে দিয়েছেন তার আগের পেশা। ভিক্ষুণীর কাজই তার একমাত্র কাজ। বুদ্ধের পূজা দেন, গানের মাধ্যমে অর্ঘ নিবেদন করেন। ভিতরে বাইরে তিনি হন প্রকৃত ভিক্ষুণী। গ্রামের মেয়ে মালতীর দুঃখ তাকে কষ্ট দেয়। রাজকন্যাদের বিদ্রুপের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য মালতীর কথার মাঝখানেই তাকে থামিয়ে দেন স্পর্ধাভরে। শুধু মালতীই নয় ঘরে ঘরে যে মেয়েরা আপনজনের টানে ভিক্ষুণী হচ্ছে তাদের শান্তি কামনা করেন দিনরাত্রি। রাজবাড়িতে অশোকতলায় এসে বুদ্ধ বসেছিলেন, সেখানেই পুজার বেদী। একদিন সংঘ থেকে শ্রীমতীর উপর আদেশ আসে বুদ্ধের জন্মোৎসবে পূজা নিবেদন করার। এতে ক্ষীপ্ত হয়ে ওঠেন রাজকন্যা রত্নাবলী এবং মল্লিকা। রাজকন্যাদের বাদ দিয়ে নটীকে দিয়ে পূজা করানো তাদের সম্মানে বাধে। তারা প্রতিজ্ঞা করেন শ্রীমতীকে কিছুতেই পূজা করতে দেবেন না, বরং পূজার বেদীতে 'নটীর নতিনৃত্য' করাবেন। স্তূপমূলে পূজা দিতে যাওয়ার সময় রক্ষিণীরা শ্রীমতীকে বাধা দেয়। এই বাধাকে তিনি বাধা মনে করেন না। তিনি বলেন :

> আমি ভয় করি নে। জানি প্রথম থেকেই কেউ মন্দিরে দ্বার খোলা পায় না। ক্রমে যায় আগল খুলে। তবু আমার বলতে সংকোচ নেই যে, প্রভু আহ্বান করেছেন আমাকে। বাধা কেটে যাবে। (৯খ,পৃ.২৩৭)

শ্রীমতী বুদ্ধিমতী এবং কর্তব্যের প্রতি অবিচল। পূজার মন্ত্র পড়লে তার মৃত্যুদণ্ড দেবেন রাজা। তবু ভয় পান না শ্রীমতী, যতদিন বেঁচে আছেন, ততদিন অপেক্ষা করতে চান পূজা করার জন্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর *ধম্মপদ*প্রবন্ধে

বলেছেন, "মুক্তির উদ্দেশ্যে কর্ম করাই ধর্ম।"[১২০]শ্রীমতীর সমস্ত কর্মই তাই ধর্মের কর্ম হয়ে ওঠে। তার কণ্ঠের 'পথে যেতে ডেকেছিলে মোরে'-গানটি সম্পর্কে সন্‌জীদা খাতুন বলেছেন, "'নটীর পুজা'র শ্রীমতীর এই গানের সুর আন্দোলিত মন্দ গতি পেয়েছে। এ গানের পথচলা বুদ্ধিদীপ্ত জ্ঞানের আলোকে স্পষ্ট দেখে চলা নয়। বোধের গভীরে আত্মার সঞ্চারণ অনুভব করে তার অনুসরণ।"[১২১] শ্রীমতীকে ধর্মভ্রষ্টা করার জন্য পূজার আসনে তার ডাক পড়ে নৃত্যের জন্য। শ্রীমতী পরিত্রাণের পথ বের করেন। সুসজ্জিত হয়ে নাচ শুরু করেন। গেয়ে ওঠেন নিবেদনের গান। গানের সঙ্গে তার নৃত্যও পূজার অর্ঘ। তার নিবেদননৃত্য দেখে রত্নাবলী রেগে যান। কিন্তু শ্রীমতী থামেন না। গহনা নিক্ষেপ করেন আবর্জনার স্তূপে, নাচের পোশাক খুলে ফেলেন, ভিতর থেকে বের হয় ভিক্ষুণীর পীতবস্ত্র। তারপর তিনি জানু পেতে 'বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি' শুরু করেন। অভিভূত রক্ষিণীরা তাকে থামতে বলেন, কারণ মন্ত্র উচ্চারণ করলে তাকে মেরে ফেলার রাজ-আদেশ আছে। কিন্তু নিজের নিষ্ঠা থেকে সরেন না শ্রীমতী। রত্নাবলীর আদেশে শ্রীমতীকে অস্ত্রাঘাতে মেরে ফেলতে বাধ্য হয় রক্ষিণীরা। শ্রীমতীর মৃত্যুতে মহিষী লোকেশ্বরীর মনের সমস্ত দ্বিধা ঘুচে যায়। তিনি ভিক্ষুণীর বস্ত্র মাথায় তুলে নেন। অন্যদিকে এমন ধর্মনিষ্ঠা দেখে ভীত হন রাজকন্যা রত্নাবলী। শ্রীমতীর পা স্পর্শ করে তিনি বৌদ্ধ মন্ত্র পড়েন। এভাবে শ্রীমতীর মৃত্যু বৌদ্ধধর্মের বাধা অতিক্রম করিয়ে দেয়। "নটীর পূজার মধ্যে দিয়েই প্রেম ধর্মের শিখাকে উজ্জ্বলতর প্রভায় জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই পূজায় সব অবিশ্বাসীর অবিশ্বাস সত্যধর্মের পায়ে মাথা লুটিয়ে দিয়েছে।"[১২২] রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

> প্রেরণা অনুসারে প্রত্যেক মানুষের পথের মূল্যগৌরব স্বতন্ত্র। 'নটীর পূজা' নাটিকায় এই কথাটাই বলবার চেষ্টা করেছি। বুদ্ধদেবকে নটী যে অর্ঘ্য দান করতে চেয়েছিল সে তার নৃত্য। অন্য সাধকেরা তাঁকে দিয়েছিল যা ছিল তাদেরই অন্তরতর সত্য, নটী দিয়েছে তার সমস্ত জীবনের অভিব্যক্ত সত্যকে। মৃত্যু দিয়ে সেই সত্যের চরম মূল্য প্রমাণ করেছে। এই নৃত্যকে পরিপূর্ণ করে জাগিয়ে তুলেছিল তার প্রাণমনের মধ্যে তার প্রাণের প্রাণ।[১২৩]

শ্রীমতির মধ্যে কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই। একমুখী তার চরিত্র। অভিষ্ঠ লক্ষের দিকে তার যাত্রা। এ কারণে তার চরিত্র নাটকীয় হতে পারে নি, হয়েছে ধর্মনিষ্ঠ-তাত্ত্বিক চরিত্র। নীহাররঞ্জন রায় তার সম্পর্কে সঙ্গত কারণেই বলেছেন, "শ্রীমতীর দীপ্তি ব্যক্তিগত, তাঁহার নিজস্ব জীবনাদর্শগত।"[১২৪] শ্রীমতী নাটকের কেন্দ্রবিন্দু। সমাজের নিচু স্তরের মানুষ তিনি। সাম্যবাদী বুদ্ধের মতে পূজা করার অধিকার তার আছে। ভিক্ষুণী হওয়ার পর তার নিজের মধ্যেও কোনো সংশয় দেখা দেয় না। তাই চরিত্রটি সর্বাঙ্গিণ স্বচ্ছ ও সুন্দর হয়েও মানবিক হতে পারে নি– একমুখী তত্ত্বপ্রধান চরিত্রে পরিণত হয়েছে।

৪. মাতৃত্বপ্রধান চরিত্র :

মাতৃত্বপ্রধানচরিত্রগুলো মানুষ হিসেবে বিভিন্ন হলেও প্রধানত তিনি মা।রবীন্দ্রনাথ 'মা'কে মনে করেছেন জীবনের কেন্দ্রবিন্দু।'মা' থাকলে জীবন তাঁর কাছে পরিপূর্ণ। *অচলায়তন* নাটকে পঞ্চককে বলা দাদাঠাকুরের সংলাপে রবীন্দ্র-মাতৃবোধ স্পষ্ট হয়েছে। দাদাঠাকুর বলেছেন :

> যে ছেলের ভরসা নেই সে অন্ধকারে বিছানায় মাকে না দেখতে পেলেই কাঁদে, আর যার ভরসা আছে সে হাত বাড়ালেই মাকে তখনই বুক ভরে পায়। তখন ভয়ের অন্ধকারটাই আরো নিবিড় মিষ্টি হয়ে ওঠে। মা তখন যদি জিজ্ঞাসা করে, 'আলো চাই?' ছেলে বলে, 'তুমি থাকলে আমার আলোও যেমন অন্ধকারও তেমনি।' (৬খ, পৃ.৩২৬)

– এই মা-ও একেক নাটকে একেক রকম ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। *রাজা ও রানী* নাটকে রেবতী সুমিত্রার পিতৃব্য চন্দ্রসেনের স্ত্রী। নিজের সন্তানের সিংহাসন লাভের জন্য তিনি নিজ পিতার সিংহাসন থেকে কুমারসেনকে বঞ্চিত করেন। এবং এই বঞ্চনার জন্য সমস্ত কূটবুদ্ধি দিয়ে রাজা চন্দ্রসেনকে চালিত করেন। আবার নাটকে এও ইংগীত আছে যে চন্দ্রসেনের অভিপ্রায়ই রেবতীর আশায় সাহস যুগিয়েছে। এই সাহসেই সে সরবে চন্দ্রসেনকে লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করেছেন। তবে ভাইয়ের সন্তানের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে চন্দ্রসেনের দ্বিধা ছিল, ইতস্ততঃ ভাব ছিল, রেবতীর তা ছিল না। রেবতী নির্দ্বিধায় স্বার্থ উদ্ধারের পথে এগিয়ে গেছেন। সে দিক দিয়ে রেবতী সম্পূর্ণ অসৎ চরিত্র। অনেক সময় পিশাচ হয়ে উঠেছেন। মায়া মমতা নৈতিকতা কোনোটিই নেই। শুধু নিজের স্বার্থের চিন্তা করেন। "রেবতী অত্যন্ত হিংস্রপ্রকৃতির নারী।"[১২৫] যখন বিক্রমদেব প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য কাশ্মীর আক্রমণ করতে মনস্থ করলেন, তখন কুমারসেন পিতৃব্যের কাছে সৈন্য চাইলেন। রেবতী সে সময় রুষে উঠে বলেন :

> তোমারে করিয়া বন্দী অপরাধীভাবে
> জালন্ধর-রাজকরে করিব অর্পণ।
> মার্জনা করেন ভালো, নতুবা যেমন
> বিধান করেন শাস্তি নিয়ো নতশিরে। (১খ,পৃ.৫০০)

শুধুমাত্র কুমারকে কটূকথা বলেই ক্ষান্ত হন না রেবতী। কুমার-সুমিত্রাকে দেশবাসী লুকিয়ে রাখলে, তাদেরকে খুঁজে বের করার জন্য বিক্রমদেবকে কুপরামর্শও দেন। বলেন :

> প্রজাগণ
> লুকায়ে রেখেছে তারে। আগুন জ্বালাও
> ঘরে ঘরে তাহাদের। শস্যক্ষেত্র করো

ছারখার। ক্ষুধা-রাক্ষসীর হাতে সঁপি
দাও দেশ, তবে তারে করিবে বাহির। (১খ,পৃ.৫০৮)

যে দেশের মহিষী তিনি, যে দেশের সিংহাসনে সন্তানকে বসানোর জন্য স্বপ্ন দেখছেন সেই দেশের প্রজার প্রতি কোনো মমতা তার নেই। এতো নিষ্ঠুর তিনি। শেষ দৃশ্যে কুমার এবং সুমিত্রার মৃত্যুতেও তার কিছুমাত্র নিষ্ঠুরতা কমে নি। চন্দ্রসেন মুকুট ফেলে দিয়ে সিংহাসনে পদাঘাত করেছেন অথচ রেবতী নিজের বিশ্বাসে অটল থেকেছেন। কুমার বা সুমিত্রার প্রতি কোনো সহানুভূতি অনুভব করে নি। বরং চন্দ্রসেন তাকে 'রাক্ষসী, পিশাচী, দূর হ' বললেও তিনি দৃঢ় মনোবলে বলেছেন :

এ রোষ রবে না চিরদিন। (১খ,পৃ.৫২৬)

–এতোই নিষ্ঠুর এবং একপেশে চরিত্রটি। ঠিক মানব চরিত্র হয়ে ওঠে নি। সব মানুষের ভিতরেই ভালো-খারাপ দুদিকই থাকবে, কিন্তু এই চরিত্রটিতে কোনো ভালো দিক দেখা যায় না। সন্তানের জন্য স্বার্থপরতা আছে। তার মাতৃত্ব শুধু স্বার্থপর মাতৃত্বই নয়, বিভৎসও।

বিসর্জন নাটক শুরু হয়েছে মহিষী গুণবতীর সন্তান-হাহাকার দিয়ে। তিনি মাতৃত্বকে বলেছেন 'মাতৃস্বর্গ'। তিনি মন্দিরের পুরোহিত রঘুপতিকে বলেছেন :

প্রভু,
চিরদিন মা'র পূজা করি। জেনে শুনে
কিছু তো করি নি দোষ। পুণ্যের শরীর
মোর স্বামী মহাদেবসম– তবে কোন্
দোষ দেখে আমারে করিল মহামায়া
নিঃসন্তানশ্মশানচারিণী? (১খ,পৃ.৫৩৭)

– এই সংলাপেই বোঝা যায়, গুণবতী বিশ্বাস করেন যে, অজ্ঞাত কোনো পাপের ফলে দেবী তার প্রতি অপ্রসন্ন হয়েছেন, আর এ জন্যই তাকে সন্তান দিচ্ছেন না। দেবীকে প্রসন্ন করতে তিনি রঘুপতির সামনে মানত করেন এ বছর পূজোর বলি তিনি দিবেন এবং তার সন্তান জন্মালে প্রতি বছর একশো মহিষ তিন শো ছাগল দিবেন। অন্যদিকে রাজা গোবিন্দমাণিক্য অপর্ণার কষ্টে প্রভাবিত হয়ে অহিংস নীতির রক্ষক হয়ে ওঠেন। তাই মন্দিরে জীবহত্যা নিষিদ্ধ করে দেন। রানির বলির পশু মন্দিরের দ্বার থেকে ফিরে আসে। প্রথমে গুণবতী রাজাকে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে রাজার আদেশ মন্দিরে চলে না। এরপর তিনি পূজোর আদেশ পূনর্বহালের জন্য গোবিন্দমালিক্যের কাছে ভিক্ষা চান। বলেন:

ভিক্ষা, ভিক্ষা চাই! একান্ত মিনতি করি
চরণে তোমার প্রভু! চিরাগত প্রথা
চিরপ্রবাহিত মুক্ত সমীরণ-সম,
নহে তা রাজার ধন– তাও জোড়করে
সমস্ত প্রজার নামে ভিক্ষা মাগিতেছি
মহিষী তোমার। (১খ,পৃ.৫৪৯)

এই মিনতিও রাজা ফিরিয়ে দেন; বরং গুণবতীকে বোঝান প্রেমের পথ রক্তাক্ত নয়। কিন্তু গুণবতী তা মানতে রাজি নন। তারপর রঘুপতির সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। এমনকি গোবিন্দমাণিক্যের দত্তকপুত্র ছোট্ট ধ্রুবকে পর্যন্ত ঈর্ষা করেন। নিজের যে সন্তান আসেই নি তার সঙ্গে স্নেহের তুলনা করে রুষে ওঠেন–

ওরে শিশু, চুরি করে নিয়েছিস তুই
আমার সন্তানতরে যে আসন ছিল।
না আসিতে আমার বাছারা, তাহাদের
পিতৃস্নেহ-'পরে তুই বসাইলি ভাগ!
রাজহৃদয়ের সুধাপাত্র হতে, তুই
নিলি প্রথম অঞ্জলি– রাজপুত্র এসে
তোরি কি প্রসাদ পাবে ওরে রাজদ্রোহী! (১খ,পৃ.৫৭৯)

এই মনোভাব তার মনে দৃঢ় হয়ে ওঠে। অনাগত-কাল্পনিক সন্তানের মঙ্গল কামনায় রাজভ্রাতা যুবরাজ নক্ষত্ররায়কে 'মিথ্যা' বোঝাতে সক্ষম হন যে, নক্ষত্ররায়কে বাদ দিয়ে ধ্রুবকে রাজা বানানোর ইচ্ছা রাজা গোবিন্দমাণিক্যের। এবং চূড়ান্ত কথা বলেন :

অর্ধরাত্রে আজি
গোপনে লইয়া তারে দেবীর চরণে
মোর নামে কোরো নিবেদন। তার রক্তে
নিয়ে যাবে দেবরোষানল, স্থায়ী হবে
সিংহাসন এই রাজবংশে– পিতৃলোক
গাহিবেন কল্যাণ তোমার। বুঝেছ কি? (১খ,পৃ.৫৮০)

এবারেও সক্ষম না হলে গুণবতীর ভিতরে বিকার উপস্থিত হয়। এ বিকার এক দিকে সন্তানের জন্য, অন্যদিকে মহিষীর দম্ভ। মহিষীর বলির পশু ফিরে এসেছে– এ অবস্থা নিজের জন্য অসম্মানের; এ অসম্মমানও তিনি ঘোচাতে

চান। তাই গোবিন্দমাণিক্যকে ত্যাগ করে কঙ্কণ-হীরের কণ্ঠী দাসদাসীকে দিয়ে তাদের মাধ্যমে পূজোর বলি নিয়ে উপস্থিত হন মন্দিরে। ততক্ষণে রঘুপতি প্রতিমাকে চিরতরে নিক্ষেপ করেছেন গোমতীর জলে। তিনি গুনবতীকে বলেন, দেবী কোথাও ছিলো না, দেবী কোথাও নাই। শুধু এই কথায়ই গুণবতীর বিশ্বাস হয় দেবী নাই। তখন তিনি গোবিন্দমাণিক্যের সন্ধান করেন এবং দুজনের মনের মিলন ঘটে। "যে নারী এইরূপ নৃশংস কাজ করিতে প্রবৃত্ত হয় তাহার মনের যথাযোগ্য বিশ্লেষণ হইয়াছে কিনা, এবং তাহার শান্ত বিরূদ্বেগ পরিণতি সঙ্গত কিনা এই প্রশ্ন আমাদের মনে জাগ্রত হয়।"[১২৬]– সত্যিকার অর্থেই গুণবতীর পরিণতি বা বোধোদয় আকস্মিকভাবে হয়েছে। রানির মনে বদ্ধমূল ধারণা যে, পশুবলি দিলে তিনি সন্তানবতী হবেন। শুধুমাত্র রঘুপতির মুখের কথায় এক মুহূর্তে তার বিশ্বাস ভেঙ্গে যাবে তা যুক্তিযুক্ত নয়। তাছাড়া দেবী নাই জানার পর তার মুখে আর সন্তান-কামনার কথাও শোনা যায় না। এটাও বিস্ময়ের ব্যাপার। এক সময় তিনি সন্তানাকাঙ্ক্ষায় স্বামীকে ত্যাগ করতে দ্বিধা করলেন না, আবার সন্তান সম্ভবনা নাই বলে সন্তানের আকাঙ্ক্ষা বাদ দিয়ে স্বামীর খোঁজ করলেন। অর্থাৎ তার চরিত্রে এই দুটি দিকই খুব প্রবল এবং নৃশংসভাবে ফুটে রইল।

গুণবতীর চরিত্র বিশ্লেষণে বলা যায়, ভিতরে কোনো সংশয় বা দ্বন্দ্ব দেখা যায় না। মন্দিরে বলি দেওয়ার বিষয়ে তিনি স্থির-অবিচল। তেমনি তার অবিচল বিশ্বাস মন্দিরে বলি দিলে দেবী তাকে সন্তান দান করবেন। গুণবতী একরোখা জেদি চরিত্র। নিঃসন্তান নারী– সন্তানের জন্য হাহাকার করেছেন। এই কষ্ট রূপ নিয়েছে বিভৎসতায়। কারো জন্য কোনো দয়ামায়া নেই, নৈতিকতা নেই, শুধু মাত্র সন্তানের প্রত্যাশা। শুধুমাত্র সন্তানের প্রত্যাশায় তিনি স্বামীর সঙ্গে বিরোধ করেছেন, স্বামীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছেন, নিরপরাধ শিশু ধ্রুবকে মেরে ফেলার জন্য নক্ষত্ররায়কে প্ররোচিত করেছেন।– যে সন্তান জন্মে নি, সেই সন্তানের জন্য তার মাতৃত্ব বিকৃত মাতৃত্বে পরিণত হয়েছে।

মালিনী নাটকে মহিষী মাতৃত্বপ্রধান চরিত্র। তিনি রানি হিসেবে গতানুগতিক, কিন্তু মা হিসেবে অনন্য। তার সমস্ত কর্মকাণ্ড এবং সংলাপের মধ্য দিয়ে সন্তান রক্ষা করার তাগিদ এবং দৃঢ়তা প্রকাশিত হয়েছে, তবে তা কোনো অসৎ পথে নয়। এইটি যে কোনো মায়েরই সাধারণ বৈশিষ্ট্য। কিন্তু কিছু কারণে সাধারণকে ছাড়িয়ে তিনি অসাধারণ হয়ে উঠেছেন। মহিষীর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য নিজস্বতা। রাজা-রাজনীতি বা ধর্ম কোনোটারই বশবর্তী নন তিনি। নিজের অন্তরের বোধকেই তিনি মূল্য দিয়েছেন। নাটকের ঘটনা আবর্তিত হয়েছে মালিনীর নতুন ধর্ম প্রবর্তনের জটিলতার মধ্য দিয়ে। এই জটিল অবস্থায় কোনো পক্ষ দ্বারাই প্রভবিত হন নি তিনি। নিজস্ব বোধ তাকে পরিচালিত করেছে। প্রথমত মেয়ে মালিনীর প্রতি একক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন তিনি। অন্য কারো

এমনকি রাজার খবরদারি বা পরামর্শ কোনোটিই তিনি সহ্য করেন নি। মেয়ের কিছু আচরণ তিনি নিজে বিশ্বাস করেন–

সাধুসন্ন্যাসীরকাছে উপদেশ লয়,
শুনে পুণ্যকথা, করে সজ্জনের সেবা–
আমি তো বুঝি না তাহে দোষ দিবে কেবা,
ভয় বা কাহারে। (২খ,পৃ.৩১৮)

প্রমথনাথ বিশী বলেছেন, "এই অনুষ্ঠানগুলি বিশেষ করিয়া বৌদ্ধধর্মের নয়, হিন্দুধর্মেরও বটে, যে কোন ধর্মেরই হইতে পারে; ভক্তি ইহার মূলে; ইহা মানবধর্ম, বিশেষ করিয়া নারীর ধর্ম, কাজেই মনে করা যাইতে পারে কন্যার এইসব অনুষ্ঠানে মাতার অনুমোদন ছিল।"[১২৭] নিজে তিনি মালিনীকে শিব পূজা করতে বলেন। শিবের মতো পতি পাওয়ার জন্য। যে পতিই হবে সমস্ত দেবতা, পতির বাক্যই হবে শাস্ত্র। তিনি বলেন :

রমণীর
ধর্ম থাকে বক্ষে কোলে চিরদিন স্থির
পতিপুত্ররূপে। (২খ,পৃ.৩১৭)

এই মহিষী সাধারণ বাঙালি নারী। ধর্মে বিশ্বাসী তাঁর মন। এর চেয়ে বেশি কিছু নয়। মেয়েকে বোঝানোর প্রক্রিয়াটিও তিনি ধর্মীয়ভাবেই অবলম্বন করেছেন। সেখানে কোনো আধুনিক মনোভাব আনেন নি। তিনি বলেছেন, সত্য-ধর্ম-কর্মক্রিয়া নিয়ে শাস্ত্রজ্ঞানী পণ্ডিতরা ভাববে, পুরুষেরা শাস্ত্র নিয়ে কাটাকাটি করবে – মেয়েদের কাজ এটা নয়। এই বোধ সম্পূর্ণ সাধারণ-গতানুগতিক নারী চরিত্র। চলে আসা ধর্মীয়বোধই তার বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এর উল্টো পিঠেই রয়েছে অন্য এক মহিষী। রাজা যখন মেয়েকে নিয়ে চিন্তিত হন এবং প্রজাবিদ্রোহের কারণে কিছুদিনের জন্য বৌদ্ধধর্মের বোধ থেকে লৌকিকভাবে দূরে থাকতে বলেন, তখন মহিষী এর প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন :

কী শিক্ষা শিখাতে এলে আজ,
পাপ রাষ্ট্রনীতি? লুকায়ে করিবে কাজ,
ধর্ম দিবে চাপা! সে মেয়ে আমার নয়। (২খ,পৃ.৩১৮)

রাষ্ট্রনীতি নিয়ে এমন সত্যবাক্য সাধারণ নারী উচ্চারণ করতে পারে না। তার রাষ্ট্রনৈতিক জ্ঞান থাকতে হবে। এরপর তিনি ধর্মীয় বোধ নিয়েও কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন :

ধর্ম জানে ব্রাহ্মণে কেবল?
আর ধর্ম নাই?
...

ব্রাহ্মণেরা কোথা আছে
ডেকে নিয়ে এসো। আমার মেয়ের কাছে
শিখে নিক ধর্ম কারে বলে। (২খ,পৃ.৩১৮)

ব্রাহ্মণের ধর্ম নিয়ে কথা বলা সত্যিই স্পর্ধা। স্নেহান্ধ মাতৃত্বের কারণেই মহিষী এ স্পর্ধা দেখান। এবং নিজে মেয়ের নবমন্ত্রে দীক্ষা নিতে প্রস্তুত হন। তাছাড়া, তার প্রতিবাদ কোনো দুর্বল নারী চরিত্রের মতো মনে হয় না। রাজনীতি-বিচক্ষণ রানির মতোই মনে হয়। এমনকি তিনি যখন বলেন, 'কেবল ব্রাহ্মণ্যই ধর্ম আর কি কোনো ধর্ম নেই' তখন তিনি আর সাধারণ থাকেন না ধর্মীয়বোধসম্পন্ন দার্শনিক মতানুসারী হয়ে ওঠেন। মহিষী এভাবে আধুনিক-সত্যপথিক- বিদ্রোহী নারী হয়ে উঠেছেন। আবার মালিনী যখন প্রজাদের সঙ্গে নিয়ে প্রাসাদে আসেন তখন তিনি নিজেও সকলের মা হয়ে ওঠেন। নির্দ্বিধায় সকলের সেবা করতে চান। তবে, নতুন ধর্মের প্রতি তার কোনো মমতা নেই। কিন্তু মেয়ের প্রতি আছে। এ সব তার নিজের বোধ নয়, মেয়ের প্রতি স্নেহবশত এবং মেয়েকে অকল্যাণ থেকে রক্ষা করতেই তার চেষ্টা। তাই রাজনৈতিক এবং দার্শনিক চরিত্রের চেয়ে মাতৃত্বই তাঁর চরিত্রের প্রধান বোধ হয়েছে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, "রাণী নিজ কন্যার এই অকল্পিত শক্তির পরিচয়ে যেমন অভিভূত, তেমনি ইহার পরিণাম চিন্তায় শঙ্কিত।"[১২৮] তাই শেষ পর্যন্ত তিনি মেয়েকে দেবী রূপে দেখার চেয়ে নারীরূপে দেখতে বেশি পছন্দ করেছেন। রাজাকে বলেন :

স্বয়ম্বরসভা আনো ডেকে
মালিনীর তরে। মনোমত বর দেখে
খেলা ভেঙে যোগ্য কণ্ঠে দিক বরমালা–
দূর হবে নবধর্ম, জুড়াইবে জ্বালা। (২খ,পৃ.৩৩২)

এখানে বোঝা যায় মহিষী সর্বাঙ্গীণভাবেই মা। তবে গতানুগতিক মা নন। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহিষীর চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন এভাবে– "রাণীর নিকট গতানুগতিক ধর্ম বা নবধর্ম কোনোটাই গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি চাহেন মালিনীকে গৃহধর্মে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে। মালিনী তাঁহার কাছে একেবারে দেবী নয়, নবধর্মের বিগ্রহ-স্বরূপিণীও নয়, আবার অতি-সাধারণ একটি মানবকন্যাও নয়, মালিনীর যে-চিত্র তাঁহার মনে বিরাজিত, তাহা সরল ভক্তিমতী, উন্নত হৃদয়সম্পদে দেবী-স্বরূপিণী পতি-পুত্র-শোভিতা এক রাজকুমারী।"[১২৯] অর্থাৎ মহিষীর একমাত্র বৈশিষ্ট্য মাতৃত্ব। তাঁর মাতৃত্বের ধরন আলাদা। এ চরিত্রে মাতৃত্বের বিভিন্নমুখীণতা দেখানো হয়েছে। প্রথমত, তিনি নিজে মালিনীকে নতুন ধর্মবোধ থেকে সরাতে চেয়েছেন, কিন্তু এতে অন্য কারো হস্তক্ষেপ মেনে নেন নি। এরপর মালিনীকে নিজে ধর্মবিমুখ করতে না পেরে তিনি রাষ্ট্রনীতি এবং ধর্মনীতি থেকে মালিনীকে রক্ষা করতে প্রস্তুত হন এরপর তিনি আরো এগিয়ে যান, নিজে ধর্ম গ্রহণ করেন এবং মেয়ের সঙ্গে প্রজাদের সেবা শুরু করেন। মহিষীর

এই আচরণগুলো স্থূল বোধ থেকে সূক্ষ্মবোধে উত্তীর্ণ হয়েছে। প্রয়োজনে তিনি ধর্ম ত্যাগ করেন, ব্রাহ্মণকে গালি দেন, প্রজার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে বলেন, আবার কন্যার সঙ্গে প্রজার সেবাও করেন। তাই তিনি মাতৃত্বের ধর্মে নতুন রূপের রূপকার।

গান্ধারীর আবেদন নাটকে গান্ধারী ন্যায়নিষ্ঠ মা। ন্যায়ের প্রতি মমত্ববোধ তার চরিত্রকে বিস্ময়াপন্ন করেছে। নাটকে গান্ধারীর প্রবেশ হয়েছে দুর্যোধনের বিজয়ের পর। ততক্ষণে তিনি রাজমাতা হয়েছেন। কিন্তু তিনি ত্যাগ করতে চান এই পরিচয়। এমনকি পুত্র দুর্যোধনকে পর্যন্ত। কারণ তিনি সত্য ন্যায় এবং ধর্মের পক্ষে। দুর্যোধন অধর্ম করে পঞ্চপাণ্ডবকে নির্বাসনে পাঠিয়ে নিজে রাজা হয়েছে। সঙ্গত কারণেই তিনি হয়েছেন রাজমাতা। এ রাজমাতা পদ তার কাছে বজ্রসম। ন্যায়ই তার একমাত্র আরাধ্য। তাই তিনি স্বামী ধৃতরাষ্ট্রকে বলেন দুর্যোধনকে ত্যাগ করতে। তার মাতৃত্ব পাপকে প্রশ্রয় দেয় না। ধৃতরাষ্ট্রকে তিনি বলেন, দুর্যোধনকে ত্যাগ করে তিনি ধর্মকে রাখতে চান। কারণ অধর্মকে বয়ে বেড়ানো আর কাঁটা বক্ষে আলিঙ্গন করা এক কথা। ধৃতরাষ্ট্রকে মনে করিয়ে দেন যে, তিনি শুধু পিতাই নন, রাজাও। ধর্ম-রক্ষা-কাজ রাজার উপর সমর্পিত। ন্যায়পরায়ণা গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রকে আরো বলেন :

নিষ্পাপেরে দুঃখ দিয়ে নিজে পূর্ণ সুখ
লইয়ো না, ন্যায়ধর্মে কোরো না বিমুখ
কৌরবপ্রাসাদ হতে–(৩খ,পৃ.৮৬)

ন্যায়ের প্রতি তিনি এতোই দৃঢ়চেতা যে, দুর্যোধনকেও পাণ্ডবদের সঙ্গে নির্বাসনে যাওয়ার কথা বলেন, বঞ্চিত পাণ্ডবদের সমদুঃখভার বহন করতে বলেন। "... রবীন্দ্রনাথের গান্ধারী যে ধর্মের কথা বললেন সে ধর্ম বীরের ধর্মমাত্র নয়, তা মানুষের ধর্ম। দুঃখের মূল্যে তা মূল্যবান।"[১৩০]

গান্ধারী চরিত্রে নারীর প্রতি নারীর সহমর্মীতা প্রকাশ পেয়েছে স্পষ্টভাবে। যদিও সাধারণভাবে ঈর্ষা হওয়াই স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিকতাকে তিনি অতিক্রম করেছেন। দৌপদীর অপমান তিনি মেনে নেন নি। তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে জিজ্ঞাসা করেন, কোনো প্রজা যদি বিনা দোষে পরগৃহ হতে টেনে সতী অবলাকে অপমান করতো তাহলে কী বিধান হতো? তিনি বলেন :

সমস্ত নারীর হয়ে নয়নের জলে
বিচার প্রার্থনা করি। (৩খ,পৃ.৮৭)

এ বিচার নিজের সন্তানের বিরুদ্ধে। সন্তান দুর্যোধন পঞ্চপাণ্ডবের সাথে বিরোধ বাধিয়ে দ্রৌপদীর উপরও জুলুম করেছে, এ জন্য গান্ধারীর কাছে সে কাপুরুষ। "গান্ধারীর পরিচয় কুরুমাতা রূপে নহে, সমগ্র নারীজাতির পক্ষে

বিচারপ্রার্থী প্রতিনিধিরূপে। মাতৃহৃদয়ের সমস্ত স্নেহদুর্বলতা জয় করিয়াই তাহার কণ্ঠে শাশ্বত ন্যায়নীতির অনিবার্য বিজয়বার্তা বজ্রনিঃস্বনে উদগীরিত হইয়াছে।"[১৩১]– এই নীতিবোধ গান্ধারীর মাতৃত্বের মুকুটস্বরূপ। এই নীতির কারণেই দ্রৌপদীর আর্তকণ্ঠরবে জননী গান্ধারীর শেষ গর্ব চূর্ণ হয়ে যায়। গান্ধারী আর্তনাদ করে ওঠেন :

মহারাজ, শুন মহারাজ,
এ মিনতি। দূর করো জননীর লাজ,
বীরধর্ম করহ উদ্ধার, পদাহত
সতীত্বের ঘুচাও ক্রন্দন; অবনত
ন্যায়ধর্মে করহ সম্মান – ত্যাগ করো
দুর্যোধনে। (৩খ,পৃ.৮৮)

রবীন্দ্রনাথ নাটকে গান্ধারীর শেষ কথায় নারীর প্রতি নারীর মঙ্গল কামনাই প্রকাশ করেছেন। তিনি দ্রৌপদীকে বলেছেন :

তুমি হবে একাকিনী
সর্বপ্রীতি, সর্বসেবা, জননী, গেহিনী–
সতীত্বের শ্বেতপদ্ম সম্পূর্ণ সৌরভে
শতদলে প্রস্ফুটিয়া জাগিবে গৌরবে। (৩খ,পৃ.৯৩)

তবে, সকল নারীর প্রতিই তিনি আশীর্বাদক নন। দুর্যোধনের স্ত্রী ভানুমতি দ্রৌপতির অলংকার নিয়ে উল্লাসে মত্ত হলে তিনি অমঙ্গল আশংকায় ভীত হন। এখানে প্রশ্ন থেকে যায় গান্ধারী অমঙ্গলের আশংকায় ভীত, নাকি অন্যায়ে মর্মাহত। তিনি ভানুমতিকে বলেন, স্বজনদুর্ভাগ্য নিয়ে আনন্দ না করতে। এটা নীতিকথা। নীতি আসলে কী? গান্ধারীর কাছে যা সত্য-ন্যায়-নীতি তার মাপকাঠি কোথায়? এই নীতি ক্ষত্রিয় নারীনীতির সঙ্গে মেলে না। এ হলো সর্বাঙ্গীণ কল্যাণকামী নীতি। "সত্য ও ন্যায়ধর্মের মর্যাদারক্ষাতেই তাঁহার সমস্ত মানসিক প্রয়াস কেন্দ্রীভূত।"[১৩২] এছাড়া গান্ধারী অন্তপুরবাসী হলেও তাঁর রাজনৈতিক বিচক্ষণতা সুবিবেচক বিচারকের মতো। তারই মুখে উচ্চারিত হয়েছে–

দণ্ডিতের সাথে
দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে
সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার। যার তরে প্রাণ
কোনো ব্যাথা নাহি পায় তারে দণ্ডদান
প্রবলের অত্যাচার। (৩খ,পৃ.৮৮)

ন্যায়ধর্মের এই উদাহরণ বাংলাসাহিত্যে বিরল। অকাঠ্য তার যুক্তি। তিনি বলেন, যে রাজার পুত্র নয়, তারও পিতা আছে। রাজপিতার যে মর্মবেদনা অন্য পিতারও তাই। সুতরাং নিজের পুত্রকে শাস্তি না দিয়ে অন্যের পুত্রকে দিলে মহা-অপরাধী হওয়াই বিচার। কারণ সকলেই বিশ্ববিধাতার সন্তান। বিশ্ববিধাতা পুত্রের বিচার করতে পিছু হটেন না, স্নেহে অন্ধ হন না। ব্যথা দিয়ে ব্যথা পেলেই তার বিচারের অধিকার আছে – এই গান্ধারীর নিজ মনের শাস্ত্র। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র যখন দূর্যোধনের কোনো বিচার না দেন, তখন বিধির বিধি-র জন্য প্রতীক্ষায় থাকেন তিনি। অন্যায়ের কোনো প্রতিকার করতে না পেরে তিনি নিজের মনকে শান্ত করতে স্থির হন। গান্ধারীর মাতৃত্ববোধ এভাবে জটিল অবস্থায় পরিণত হয়েছে। এক দিকে তিনি সন্তানকে ফেলতে পারেন নি, আবার সন্তানের অন্যায়ের জন্য সন্তানের শাস্তি কামনাও করেছেন। পুরো নাটকে একটিবার মাত্র গান্ধারী চরিত্রে সাধারণ নারীর মতো ক্ষুদ্র দুর্বলতা দেখা যায়। সেইটি হলো, একবার দুর্যোধনকে ত্যাগ করার ব্যাপারে তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে যুক্তি দেখান এভাবে–

> এ প্রার্থনা শুধু কি আমারি
> হে কৌরব? কুরুকুলপিতৃপিতামহ
> স্বর্গ হতে এ প্রার্থনা করে অহরহ
> নরনাথ! ত্যাগ করো, ত্যাগ করো তারে। (৩খ, পৃ.৮৫)

এখানে মনে হয়, নিজের নীতিবোধের চেয়ে পূর্বপুরুষের অভিশাপের ভয়ে তিনি বেশি ভীত। এই স্থান ছাড়া, নাটকে সর্বক্ষণই গান্ধারী দুর্যোধনের অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। সর্বত্রই তার নিজস্ববোধ প্রকট। তারপরও দেখা যায় সামগ্রিক বিচারে গান্ধারী শেষ পর্যন্ত দুর্যোধনের মঙ্গল চেয়েছেন। তবে এই চাওয়ার ধরনটি একটু আলাদা। ধৃতরাষ্ট্র বা দুর্যোধন কেউ-ই যখন পাণ্ডবদের প্রতি ন্যায় আচরণ করে না, তখন গান্ধারী পাণ্ডবদের আশীর্বাদ করেন। তিনি মনে করেন পাণ্ডবদের আশীর্বাদ করলে তার পুত্রের অপরাধ খণ্ডন হবে। অর্থাৎ সবকিছুর পরও গান্ধারী দুর্যোধনের মা। তাই গান্ধারীর ক্ষেত্রেও শেষ পর্যন্ত মাতৃত্ব জয়ী হয়েছে। তবে এ মাতৃত্ব খুব সহজ পথে যায় নি। কারণ তিনি ন্যায় পরায়ণ এবং পাণ্ডবদের প্রতি স্নেহশীল, নারীর প্রতি সহমর্মী। আর এর বিপরীত কাজ করে অপরাধী হয়েছে তার নিজের সন্তান। সন্তানের প্রতিও মায়ের মাতৃত্ব প্রবল– এটাই স্বাভাবিক। প্রমথনাথ বিশী বলেছেন, "গান্ধারীচরিত্রে সত্যকার দ্বন্দ্ব নাই, পুত্র ও ধর্মের মধ্যে কে রক্ষণীয় সে বিষয়ে তাহার কোনো ভ্রান্তি নাই।"[১৩৩]– কিন্তু গান্ধারীর চরিত্রবিশ্লেষণে দেখা গেছে ধর্ম এবং সন্তানবাৎসল্যের দ্বন্দ্ব তাকে ক্ষত-বিক্ষত করেছে। এই দুয়ের সমন্বয় করার জন্য তিনি চেষ্টা করেছেন। একেকবার একেকরকম করে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন। এ জন্যই তিনি কখনো দুর্যোধনকে শাস্তি দিতে বলেছেন, কখনো পাণ্ডবদের সঙ্গে বনে যেতে বলেছেন, এবং শেষ পর্যন্ত কিছুই করতে না পেরে পাণ্ডবদের আশীর্বাদ করেছেন। তাই প্রমথনাথ বিশীর এ মন্তব্য আমরা

মানতে পারি না। তবে পাণ্ডবদের প্রতি স্নেহশীলতাও তার আশীর্বাদের কারণ। আবার এর আড়ালে রয়েছে দুর্যোধনের কল্যাণ কামনা। তাই ধর্মবোধ এবং সন্তানবাৎসল্যের টানাপোড়েনে অনেকটা বিধ্বস্ত গান্ধারী চরিত্র।

কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ নাটকে কুন্তী-ই নারী চরিত্র। তিনি কর্ণ এবং পঞ্চপাণ্ডবের মা। জন্মের পর যে কর্ণকে ত্যাগ করেছিলেন এতো বছর পর সেই সন্তানের কাছে মাতৃত্বের পরিচয় দিতে এসেছেন কুন্তী। এইখানে নাটকের শুরু। "কন্যাবয়স হইতে তাহার সমস্যা– ধর্ম রাখিবে, না পুত্র রাখিবে?"[১৩৪] অবশেষে পুত্রকে জলে ভাসিয়ে দিয়ে ধর্মকেই রেখেছিলেন তিনি। তাই কর্ণ জন্মপরিচয়হীন সন্তান হয়ে বেঁচে রইলেন। তবে, কর্ণের পরিচয় না দিতে পেরে কুন্তী যন্ত্রনায় বিদ্ধ হয়েছেন বারবার সে কথা কুন্তী উল্লেখ করেছেন।। যখনই কর্ণের পরিচয় নিয়ে কথা উঠেছে, রাজকুলে জন্ম নয় বলে কর্ণ অপমানিত হয়েছেন তখনই কুন্তী যন্ত্রনাদগ্ধ হয়েছেন বলে জানা যায়। কিন্তু এগিয়ে এসে জনসম্মুখে কর্ণের পরিচয় দেন নি। তবে দুর্যোধন যখন কর্ণকে অঙ্গরাজ্য দিয়েছে তখন খুশি হয়েছেন। কুন্তীর বুকে কর্ণের জন্য সর্বক্ষণ হাহাকার ছিলো। তিনি বলেছেন :

ত্যাগ করেছিনু তোরে
সেই অভিশাপে পঞ্চপুত্র বক্ষে ক'রে
তবু মোর চিত্ত পুত্রহীন। (৩খ,পৃ.১৪৯)

কষ্ট পেয়েছেন, কিন্তু পুত্রকে কাছে টানেন নি কখনোই। অথচ, যখন কর্ণের কাছে পঞ্চপাণ্ডবের পরাজয় ঘনিয়ে এসেছে, রাজ্য হারানোর অসম্মান সামনে এসেছে তখন কুন্তী ছুটে এসেছেন কর্ণের কাছে স্বয়ং কর্ণকেই ভিক্ষা চাইতে। বলেছেন :

ফিরাতে এসেছি তোরে নিজ অধিকারে।
সূতপুত্র নহ তুমি, রাজার সন্তান–
দুর করি দিয়া বৎস, সর্ব অপমান
এসো চলি যেথা আছে তব পঞ্চ ভ্রাতা। (৩খ,পৃ.১৪৯)

অর্থাৎ পঞ্চপাণ্ডবের জয় নিশ্চিত করতেই কর্ণের পরিচয় দিতে চেয়েছেন – ভাইদের মাঝখানে এসে বাস করতে বলেছেন। পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে এক হয়ে যুদ্ধ করে জয়ী হতে বলেন। ভাইকে দিয়ে ভাই হত্যার পাপ থেকে রক্ষা করতে চান সন্তানকে। তবে এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নাই যে, কুন্তী পক্ষপাতদোষে দুষ্ট মা-চরিত্র। তিনি পাণ্ডবদের জয় নিশ্চিন্ত করতে চেয়েছেন। কর্ণের বিপদে কোনো দিন এগিয়ে আসেন নি, কিন্তু পঞ্চপাণ্ডবের বিপদে কর্ণের কাছেই ভিক্ষা চাইতে এসেছেন। এ ঘটনা কুন্তীর ভাগ্যের বিড়ম্বনাও বটে। কারণ, কুমারীবয়সের দ্বন্দ্ব আবার তার জীবনে ফিরে এসেছে। এবারে তিনি পুত্রকে ফিরিয়ে নিতে এসেছেন। তবে তা তার মাতৃত্বকে কলুষমুক্ত করে

না। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেছেন, "মূলে কর্ণের প্রতি কুন্তীর স্নেহ অপেক্ষা পঞ্চপাণ্ডবকে রক্ষা করার আগ্রহই বেশি পরিস্ফুট। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কুন্তী পরিত্যক্ত সন্তানকে মায়ের কোলে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়ার জন্য বেশি আগ্রহশীলা।"[১৩৫] –এ কথার সঙ্গে একমত হতে পারি না। কুন্তী এতো দিন পর কেন কর্ণকে মাতৃক্রোড়ে নিতে এসেছেন! যে দিন 'রাজকুলে' জন্ম নয় বলে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করার অধিকার পান নি কর্ণ, লজ্জায় আনত মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেদিন কুন্তী যন্ত্রণাদগ্ধ হয়েছেন, কিন্তু সামনে এসে পরিচয় দেন নি। অন্যদিকে কর্ণ পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন দেখে পাণ্ডব-পরাজয় আশঙ্কায় ছুঁটে এসেছেন। আবার কর্ণ পাণ্ডবদের সঙ্গে যোগ দিলেন না বলে হাহাকার করে বলেছেন :

সেইদিন কে জানিত, হায়,
ত্যাজিলাম যে শিশুরে ক্ষুদ্র অসহায়
সে কখন বলবীর্য লভি কোথা হতে
ফিরে আসে একদিন অন্ধকার পথে,
আপনার জননীর কোলের সন্তানে
আপন নির্মম হস্তে অস্ত্র আসি হানে।
এ কী অভিশাপ!(৩খ,পৃ.১৫০)

এই সংলাপের কারণে কুন্তীর মাতৃত্ব প্রশ্নবিদ্ধ হয়েই রইল। সমস্ত জীবন ধরে অবহেলিত অপমানিত বঞ্চিত কর্ণকে কুন্তী ক্ষমা করতে পারলেন না। অথচ ক্ষমা করাই উচিত ছিলো, কারণ কর্ণ ধর্মরক্ষার জন্যই কুন্তীর সঙ্গে ফিরলেন না। কর্ণ তো দুর্যোধনকে কথা দিয়েছেন, অর্জুনের সঙ্গে তিনি লড়বেন– কথা রক্ষা না করা তো অধর্ম। সন্তানের এই সততায় তার খুশি হওয়া উচিত ছিলো। কারণ কুন্তীরই কারণে কর্ণ আজ দুর্যোধনের সহযোগী। কিন্তু পাণ্ডবদের চিন্তায় তিনি দিশেহারা তাই কর্ণের সততার কথা তার মনে এলো না। আবার তার নিজের জীবনেরও তিনি যন্ত্রণাদগ্ধ হয়েই রইলেন। কারণ তিনি সমাজধর্মের শিকার– অসহায় নারী। কুমারীজীবনের সন্তানের পরিচয় দেওয়া তার জন্য সত্যিই কঠিন ছিলো। কুন্তীর সমস্ত জীবনের এই কষ্টের দিকটি শেষ পর্যন্ত কষ্টেরই থেকে গেলো। নীহাররঞ্জন রায় মন্তব্য করেছেন, "কুন্তী সমাজধর্মের ভয়ে আদিম মাতৃধর্ম পালন করেন নাই; সেইজন্যই পরে কর্ণের বীরধর্মের কাছে কুন্তীর মাতৃধর্মের দাবী পরাভূত হইতে বাধ্য হইল।"[১৩৬] এ দিক দিয়ে কুন্তী আজীবনের যন্ত্রণাদগ্ধ মা-চরিত্র। পঞ্চপাণ্ডবের অহংকারী মা হয়েও তিনি দগ্ধ হয়েছেন প্রথম সন্তানের শূন্যতায়। তবে, সমাজ-ধর্মের ভয়ে কর্ণের পরিচয় এতো দিন দেন নি, অথচ পাণ্ডবের জয়ের জন্য সমাজ-ধর্মকে উপেক্ষা করে পরিচয় দিতে এসেছেন। এ আচরণ তাকে পাণ্ডবদের প্রতি পক্ষপাতমূলকই প্রমাণ করে।

প্রায়শ্চিত্ত নাটকে মহিষী'র চরিত্রে স্ত্রী, মা এবং শাশুড়ি চরিত্রের সমন্বয় রয়েছে। 'স্ত্রী' হিসেবে তিনি স্বামীকে ভয় পান। স্বামীর আদেশ বিধাতার আদেশ মনে করে অঘটনও ঘটান। 'মা' হিসেবে তিনি সন্তানের মঙ্গল চান, কিন্তু কোনো বুদ্ধিদীপ্ত কাজে বা কৌশলের মাধ্যমে সন্তানের মঙ্গলময় কোনো কাজ করেন না। 'শাশুড়ি' হিসেবে কূটবুদ্ধিসম্পন্ন, খারাপ এবং ভয়ংকর নারী। রাজা পুত্রবধূ সুরমাকে পছন্দ করেন না বলে মহিষীও সুরমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন, সর্বক্ষণ কটুকথা বলেন। বিনা অপরাধেই তিনি সুরমাকে বলেন :

> পোড়ামুখী, আমার বাছাকে তুই কী করলি? আমার বাছাকে আমায় ফিরিয়ে দে। এসে অবধি তুই তার কী সর্বনাশ না করলি? অবশেষে – সে রাজার ছেলে – তার হাতে বেড়ি না দিয়ে কি তুই ক্ষান্ত হবি নে? (৫খ,পৃ.২৪৪)

মহিষী নিজেও জানেন যে সুরমা ভালো মেয়ে, তবু রাজার অনুবর্তী হয়ে তিনি সুরমাকে গঞ্জনা দেন। এখানে তার মেরুদণ্ডহীনতা প্রকাশ পায়। তার নিজস্ব কোনো মতামত নেই। তিনি সুরমাকে বাপের বাড়ি পাঠানোর জন্য ওষুধ পর্যন্ত খাওয়ান। ওষুধ খাওয়ানোর পর সুরমা যখন মৃত্যু মুখে পড়েন তখন তার ভিতরের একজন সরল মানুষ বেড়িয়ে আসে। তিনি নিজে নিজে বলেন :

> যে যা বলুক, বউমা কিন্তু লক্ষ্মী মেয়ে। ওকে এমন জোর করে বিদায় করলে কি ধর্মে সইবে? (৫খ,পৃ.২৪৪)

এর পর তিনি দাসীকে নিজের হার খুলে দেন উল্টো ওষুধ এনে সুরমাকে বাঁচানোর জন্য। এখানে সরল এবং মনুষত্বসম্পন্ন মহিষীকে উন্মোচণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু তখন আর সময় নেই। ততক্ষণে সুরমা মারা গিয়েছেন। এর আগে রামমোহনের সঙ্গে আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহারও মহিষীর সুন্দর মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন সময় দাসী বামীর সঙ্গে কথোপকথোনে মহিষীর সরল মনের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সরলতা এবং বুদ্ধিহীনতা তাকে ভীরু রাখতে রাখতে অঘটন ঘটাতে ঠেলে দিয়েছে। তাই তিনি ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ করেন।

চিরকুমার-সভার জগত্তারিণী সমাজ জীবনে প্রতিদিনের দেখা মা-চরিত্র। সন্তানের চিন্তা এবং ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন। মেয়ের জামাইয়ের উপর মানসিকভাবে নির্ভরশীল। মেয়ে বড়ো হয়েছে বলে তাদের বিয়ের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হন তিনি। আবার বিধবা মেয়ের লেখাপড়া নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। সবগুলো বৈশিষ্ট্যই বাঙালি 'মা' বৈশিষ্ট্য।

শোধবোধ নাটকে তিনটি মা-চরিত্র আছেন। একজন সতীশের মা বিধুমুখী। তিনি সতীশের সমস্ত অন্যায় আবদার মেনে নেন। এ জন্য সতীশ বাস্তব জ্ঞানহীন খামখেয়ালি এবং মেরুদণ্ডহীন মানুষে পরিণত হয়। বিধুমুখী সন্তানের ব্যাপারে এতোই অন্ধ যে, বংশীয় ঐতিহ্য সোনার গুড়গুড়িটা বের করে দেন বন্দক রেখে টাকা এনে বান্ধবীকে নেকলেস উপহার দেওয়ার জন্য। কারণ এ ছাড়া সতীশের মান থাকে না। অন্যদিকে বিধুমুখীর দিদি নিঃসন্তান

এবং টাকাওয়ালা। তাই বিধুমুখী ব্যক্তিত্বহীনের মতো দিদির কাছ থেকে সতীশের জন্য স্যুটসহ বিভিন্ন দামী জিনিস সংগ্রহ করেন নিঃসঙ্কোচে। স্বামীর মৃত্যুর পর দেখা যায় স্বামী সতীশকে কিছুই দিয়ে যায় নি। তখন তিনি নির্দ্বিধায় দিদির বাড়ি গিয়ে ওঠেন। দিদির হঠাৎ সন্তান হলে তিনি কালিঘাটে গিয়ে মানত করেন দিদির সন্তানের মৃত্যু কামনা করেন।– অন্যের সন্তানের ব্যাপারে তিনি এতোটাই নিষ্ঠুর। অর্থাৎ তিনি সকল সন্তানের মা হতে পারেন নি, শুধুমাত্র নিজের সন্তানের প্রতিই তার মাতৃত্ব।

আরেকজন মা সুকুমারী। তিনি বিধুমুখীর দিদি। প্রথম জীবনে নিঃসন্তান ছিলেন। তাই বোনের ছেলে সতীশের প্রতি তার ভালোবাসার অন্ত ছিল না। পৃথিবীর সমস্ত বিপদ থেকে তিনি সতীশকে আড়াল করতে চেয়েছেন। এমনকি সতীশের পিতা সতীশকে বাহুল্য কিছু দেন না বলে তিনি নিজে তা পূরণ করেছেন। শুধু তাই নয়, সাহেবী পোশাক কিনে দিয়ে লাহিড়ি বাড়ির মেয়ে নলিনীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পাঠিয়েছেন। এরপর তার নিজের ছেলে হলে তার চরিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে যায়। তিনি সতীশকে শত্রু বানিয়ে ফেলেন। বাড়ি থেকে তাড়ানোর জন্য উঠেপড়ে লাগেন। বাবুয়ানা বাদ দিয়ে কাজকর্মে মন দিতে বলেন। এমনকি তিনি যা কিছু এক সময় করতে বলেছেন, সে সব করতে চাইলে তিরস্কার করেন :

> লাহিড়ীসাহেবের ওখানে তোমার এত ঘন ঘন যাতায়াতের দরকার কী তা তো ভেবে পাই নে। তারা সাহেব মানুষ; তোমার মতো অবস্থার লোকের কি তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা সাজে। আমি তো শুনলাম, তোমাকে তারা পোঁছে না, তবু বুঝি ঐ রঙিন টাইয়ের উপর টাইরিং পরে বিলাতি কার্তিক সেজে তাদের ওখানে আনাগোনা করতেই হবে! তোমার কি একটুও সম্মানবোধ নেই। এ দিকে একটা কাজ করতে বললে মনে মনে রাগ করা হয়, পাছে ওঁকে কেউ বাড়ির সরকার মনে ক'রে ভুল করে। কিন্তু সরকারও তো ভালো– সে খেটে উপার্জন ক'রে খায়। (৯খ,পৃ.১৫৯)

এভাবে প্রতিনিয়ত সতীশের ব্যাপারে স্বেচ্ছাচরী হয়ে সতীশ এবং তার মা বিধুমুখীকে যন্ত্রণা দেন। অর্থাৎ সুকুমারীও সকল সন্তানের মা হতে পারেন নি, শুধুমাত্র নিজের সন্তানের প্রতিই তার মাতৃত্ব।

নাটকে মিসেস লাহিড়ি আরেকজন মা। তিনি নাটকে খুব কম সময়ের জন্য উপস্থিত হন। সন্তান নলিনীর ব্যাপারেই তার উৎকণ্ঠা প্রকাশ পায়।

গৃহপ্রবেশ নাটকের সবগুলো চরিত্রই একমুখী। যে ভালো সে পুরোপুরিই ভালো। আবার যে খারাপ সে পুরোপুরিই খারাপ। নাটকে মাসি চরিত্রটিতে মাতৃত্বের পরিপূর্ণ প্রকাশ। তিনি বিধবা, তার সন্তান মারা গেছে অনেক আগে। এরপর ভাগ্নে-ভাগ্নি-ভাগ্নেবউ সকলেরই মা হয়ে উঠেছেন তিনি। তিনি প্রচণ্ড ধৈর্যশীল নারী। প্রথম দৃশ্যেই দেখা

যায় ভাগ্নে যতীনের অসুস্থতা তাকে যন্ত্রণার শেষ সীমায় পৌঁছে দিয়েছে। তাই তার এখন একমাত্র চিন্তা যতীনকে পার্থিব সমস্ত দুঃখ-চিন্তা হতাশা থেকে মুক্ত রাখা। তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করছেন যেন কোনো মতেই যতীন কিছু নিয়ে কষ্ট না পায়। প্রথম সংলাপেই মণির প্রতি তিনি সেই আকুতি প্রকাশ করেন। তিনি বলেন :

> বউমা, তোমার পায়ের শব্দের জন্যে যতীন কান পেতে আছে তা জানো। এই সন্ধের মুখে রুগীর ঘরে ঢুকে নিজের হাতে আলোটি জ্বেলে দাও, তার মন খুশি হোক। (৯খ,পৃ.১৭৪)

কিন্তু মণি যতীনের ঘরে কিছুতেই যাবে না। যতীনের কোনো কাজে হাত দেবে না। মাসির রাগ হওয়ার কথা, মণিকে জোর করার কথা। কিন্তু তিনি তার কোনোটিই করেন না। মণিকে বুঝিয়ে ব্যর্থ হলে তিনি যতীনের কাছে মিথ্যে কথা বলে মণির দোষগুলো ঢাকেন, যতীনের প্রতি মণির প্রবল ভালোবাসার কথা বলে যতীনকে আনন্দ দেন; সুখ দেওয়ার চেষ্টা করেন। যতীনের দুটি বিষয়ে সুখ। একটি তার স্ত্রী মণি আর অন্যটি মনের মতো করে নিজের বাড়িটি তৈরি করা। কিন্তু দুটিতেই যতীন পুরোপুরিভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। আর এ দুটিকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করাই মাসির লক্ষ্য। তিনি হিমিকে বলেন:

> আজ ওকে কেবলই ভোলাতে হচ্ছে। বাড়িটাকে নিয়েও, মণিকে নিয়েও। (৯খ,পৃ.১৭৫)

যতীন অনেকটা পাগলের মতোই বাড়ি বন্দক রেখে সেই টাকা দিয়ে বাড়ি বানানোর কাজ শুরু করেছিল। বাইরের দিকটা যত্ন করে গড়তে গিয়ে সমস্ত টাকা শেষ করে ফেলেন, ভিতরের কোনো কাজে হাতই দিতে পারলেন না। কিন্তু মাসি তাকে সব সময়ই বাড়ির ভিতরের কাজ হচ্ছে বলে আশ্বাস দেন। তিনি মিথ্যে করে বলেন, তেতলার ঘরে পাথর বসানো শেষ হয়েছে, দরজার দুধারে মঙ্গলঘট রাখা হয়েছে, মেঝেতে পদ্মফুলের আলপনা করা হয়েছে। যতীন তাই শুনে খুশি হয়ে ওঠেন। বাড়ির নাম দেন মণিসৌধ। মাসি বলেন, মণিকে বিয়ের লাল বেনারসি পরিয়ে ফুল দিয়ে সাজিয়ে সেই তেতলার ঘরে বসিয়ে রাখা হয়েছে। যতীন আরো খুশি হন। যেতে চান সেখানে। মিথ্যে ধরা পড়বার ভয়ে এবারও মাসি দমে যান না, নতুন করে মিথ্যা বলেন। বলেন, ডাক্তারের নিষেধ আছে, এতো ধকল যতীনের শরীর সইবে না। যতীন সমস্ত বাড়িতে আলো জ্বালতে বললে মাসি বলেন বেশি আলো যতীনের চোখে অসহ্য হবে। এমনি করে তিনি যতীনকে সুখ দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু হিমির মন খুঁত খুঁত করে। এমনি মিথ্যে করে ভোলাতে তার মন সায় দেয় না। কিন্তু মাসির যুক্তি হলো–

> মৃত্যু যখন সামনে, তখন ঘর তৈরি সারা হোক না-হোক, কী এলো গেল। তাই ওকে বলি, একান্তমনে সংকল্প করেছ যা সেইটেই সম্পূর্ণ হয়েছে। (৯খ,পৃ.১৭৫)

শুধু বাড়িই নয়, মণিকে নিয়েও মিথ্যে কথার শেষ নেই। তিনি যতীনকে বলেন, বাইরে থেকে বোঝা যায় না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে মণি যতীনের জন্য খুব ভেঙে পড়েছে। মণি সব সময় যতীনের ঘরে আসতে চায়, কিন্তু কচি মনে

কষ্ট হবে বলে মাসিই তাকে আসতে দেন না। আবার বলেন, যতীনের সামনে মণি ভালোবাসা খুলতে চায় না, তাই আড়ালে গিয়ে কাঁদে। নিজের হাতে খাবার তৈরি করে দেয়। নিজের হাতে শাল বুনে দিয়েছে। যতীনের মনে হয় এ শাল যেন হিমির হাতে দেখেছিল। ধরা পড়ে মাসি তখুনি আবার শুধরে নেন; বলেন, হিমি মণিকে শালটা বোনা দেখিয়ে দিচ্ছিল। এভাবেই যতীনের কাছে মণির ভালোবাসাসৌধ রচিত করেন মাসি। তিনি হিমিকে বলেন :

> তোর বউদিদিকে যিনি সুন্দর করেছেন, তাঁর সংকল্পের মধ্যে ও সম্পূর্ণ। চিরদিনের যে মণি, ভগবানের আপন বুকের ধন যে মণি সেই তো কৌস্তভরত্ন– তার মধ্যে কোথাও কোনো খুঁত নেই। মৃত্যুকালে যতীন বিধাতার সেই মানসের মণিকেই দেখে যাক। (৯খ,পৃ.১৭৫)

মাসি যে শুধু যতীনের মন ভালো রাখার চেষ্টা করেন তাই নয়, তিনি মণিকেও কষ্ট দেন না। মণির অবাধ্যতায় কষ্ট পান কিন্তু জোর করে তাকে দিয়ে কোনো কাজ করান না, পাছে মণির মনে কষ্ট হয়। মাসি নিজে বলেন ঠিকই যে তিনি মণির উপর রাগ করেন, ক্ষমা করতে পারেন না। কিন্তু এ তার রাগ নয়, অভিমান। আবার মাসী নিজের ঘরের সম্মানের ব্যাপারে সাবধানীও। ডাক্তারকেও তিনি বলেন না যে মণি যতীনের ঘরে যেতে চায় না, রোগীর পথ্য তৈরি করতে চায় না। আবার ডাক্তার যখন মাসিকেই অভিযুক্ত করে বলেন, বউয়ের উপর শাশুড়ির স্বাভাবিক ঈর্ষা বা রীষ থেকেই মণিকে যতীনের কাছে ঘেষতে দিচ্ছেন না, তখনো নিজের মাথায় সে দোষের বোঝা নেন তিনি। বলেন :

> কথাটা মিথ্যে নয়, তা রীষ থাকতেও পারে। মনের মধ্যে কত পাপ লুকিয়ে থাকে, অন্তর্যামী ছাড়া আর কে জানে। (৯খ,পৃ.১৭৯)

প্রতিবেশিনীকে বলেন, 'ছেলেমানুষ, দিনরাত রুগীর কাছে থাকলে বাঁচবে কেন। আমরাই তো ওকে জোর ক'রে'–, 'পাড়ার মেয়েরা তো ওকে বিয়ে করে নি সুরো। আমার যতীন ওকে বোঝে।', 'যতীন নিজে বিছানায় বদ্ধ থাকে, মনি ঘুরে বেড়িয়ে এলে সেইটেতেই যেন যতীন ছুটি পায়। রুগীর পক্ষে সে কি কম।'– এমনি করেই মাসি ঘরে বাইরে তাল রেখে চলেন। তার দেবরের ছেলে অখিলও তাকে সম্পত্তির জন্য অত্যাচার করে অতিষ্ট করে তোলে। বেনামিতে যতীনের সম্পত্তি বন্দক নেওয়া, সুদের টাকা নেওয়া সবই তার কীর্তি। এ বিষয়ে একেবারে শেষ সময়ে মাসি কথা বলেন। এখানে দেখাযায় মাসি অন্যায়কে শেষ পর্যন্ত মানতে পারলেন না। তিনি বলেন :

> ঘরে-বাইরে কেবলই মিথ্যে বলে বলে দম বন্ধ হয়ে এল। এখন শোনো, তোমার মক্কেল তুমি নিজেই– এ কথা গোড়া থেকেই জানি। (৯খ,পৃ.১৯০)

আরো বলেন :

> এখন শোন। এতকাল তোর সেই মক্কেলকে সুদ দিয়ে এসেছি আমারই পৈতৃক গয়না বেচে। ... আজ আমার আর কিছু নেই। কাজেই কাকির সম্পত্তি দেওরপো'র সিন্ধুকেই গেছে। প্রেতলোকে আমার শ্বশুরের তৃপ্তি হয়েছে। (৯খ,পৃ.১৯১)

তবু এই পর্যন্তই। অখিলের প্রতিও তিনি নির্মম হন নি কখনো। তার চরিত্রের ত্রুটি হলো, তিনি পরিপূর্ণ ভালো মানুষ– কোনো খারাপ দিক নেই। মানবচরিত্র কখনো এরকম হতে পারে না। অনেক দুঃসময়েও তিনি মণির নামে করা অনেক টাকার লাইফ ইনস্যুরেন্স বাঁচিয়ে রাখেন। তিনি বলেন :

> যতীনকে তো বাঁচাতে পারব না, যতীনের এই দানকে বাঁচাতে পারলুম, আমার মনে এই সুখ থাকবে। (৯খ,পৃ.১৮২)

হৃদয়হীন মণি শেষ দৃশ্যে এসে যখন যতীনের পায়ে এসে পড়ে, তখনো তিনি মণিকে ক্ষমা করে দেন। কোনো রূঢ় কথা বলেন না, বরং যতীনকে বলেন মণিকে আশীর্বাদ করতে। মাসি তো তবে মণিরও মা। মাসির মাতৃত্ব তাই কলুষহীন মাতৃত্ব। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেছেন, "এমন অনুপম মাতৃ-চরিত্র বাংলা-সাহিত্যে খুব কম আছে। মাসির যতখানি হৃদয়-মাধুর্য, বুদ্ধির দীপ্তিও তাহা অপেক্ষা কম নয়,– কর্মক্ষমতাও সমানভাবে বর্তমান। সে মণিকে বুঝাইতেছে, যতীনকে কৌশলে ভুলাইতেছে, প্রতিবেশিনীদের ঠেকাইতেছে। অখিলের সঙ্গে বাড়ীরক্ষার ব্যবস্থা করিতেছে, তাহার বুদ্ধি ও কর্মদক্ষতা পরিচালনী শক্তিরূপে সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু কোথাও তাহার অন্তর্নিহিত দৃঢ়তা, গাম্ভীর্য ও সংযমের ভারসাম্য বিচলিত হয় নাই।"[১৩৭] সর্বাত্মকভাবে মাসি চরিত্রটি 'অতি ভালো' হয়ে উঠেছে। ভারতীয় সংস্কৃতির 'ধৈর্য' বোধ সম্পূর্ণরূপে তার চরিত্রে বিদ্যমান।

নটীর পূজা নাটকে লোকেশ্বরী মহিষী। রাজঅন্তঃপুরে তিনিই প্রথম বৌদ্ধধর্মকে আহ্বান করেছিলেন। ভিক্ষু ধর্মরুচিকে ডাকিয়ে প্রতিদিন কল্যাণপঞ্চবিংশতিকা পাঠ করিয়ে তবে জল গ্রহণ করেছেন, একশো ভিক্ষুকে অন্ন দিয়ে তবে ভাঙতেন উপবাস, প্রতি বছর বর্ষার শেষে সমস্ত সংঘকে ত্রিচীবর বস্ত্র দেওয়া ছিল তার ব্রত। এরপর সেই ধর্ম নিয়ে তিনি দ্বিধায় পড়েছেন। তার স্বামী বিম্বিসার হিংসা এড়িয়ে শান্তির জন্য রাজ্য ছেড়ে ধর্মকর্ম করতে চলে গেছেন রাজ্যের বাইরে; পুত্র রাজপুরী ছেড়ে সিংহাসন ছেড়ে তাকে ছেড়ে ভিক্ষু হয়ে চলে গেছেন। এটাই তার কষ্ট। যারা বৌদ্ধ ধর্মের পূজা করে নি, তারা পুত্র নিয়ে সুখে আছে অন্যদিকে তিনিই হয়েছেন পুত্রহীন। তাই তিনি আর বুদ্ধের জন্মোৎসব পালন করতে রাজি নন। তিনি বলেন :

> আমি আজ স্বামীসত্ত্বে বিধবা, পুত্রসত্ত্বে পুত্রহীনা, প্রাসাদের মাঝখানে থেকেও নির্বাসিতা। এটা তো মুখের কথা নয়। যারা তোমাদের ধর্ম কোনোদিন মানে নি তারা আজ আমাকে দেখে অবজ্ঞায় হেসে চলে যাচ্ছে। তোমরা যাঁকে বল শ্রীবজ্রসত্ত্ব, আজ কোথায় তিনি - পড়ুক-না তাঁর বজ্র এদের মাথায়। (৯খ,পৃ.২২৪)

দেখা যাচ্ছে, ধর্ম পালন করতে না চেয়েও তিনি ধর্মকে বিশ্বাস করছেন। এজন্যই তিনি 'শ্রীবজ্রসত্ত্বে'র খোঁজ করছেন। লোকেশ্বরীর বিশ্বাস এবং আচরণে বারবার দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হয়েছে। পুত্র ভিক্ষু হয়েছে বলে তিনি দিশেহারা। বৌদ্ধ ধর্ম অস্বীকার করছেন। আবার যখন পুত্রের আগমনের সংবাদ শোনেন তখনই বলেন, 'কে বলে ধর্ম মিথ্যা!' এবং উচ্চারণ করেন :

> বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি
> ধর্ম্মং সরণং গচ্ছামি
> সংঘং সরণং গচ্ছামি। (৯খ,পৃ.২২৯)

তার পুত্র আসলো ঠিকই, কিন্তু তিনি নিজের পুত্রকে আর ফিরে পেলেন না। সম্মুখে দেখেন এক অচেনা বৌদ্ধভিক্ষুকে। সন্তানের সঙ্গে মায়ের নাড়ীর যোগ। চোখের সামনে সেই সন্তানকে তিনি 'অসন্তান'রূপে দেখতে পান। তিনি বুঝতে পারেন, পুত্রের সঙ্গে শুধু বিচ্ছেদ নয় বিরোধ ঘটেছে। তার মন আবার বিদ্রোহ করে ওঠে। তিনি বলেন :

> এ ধর্ম পুরুষের তৈরি। এ ধর্মে মা ছেলের পক্ষে অনাবশ্যক; স্ত্রীকে স্বামীর প্রয়োজন নেই। যারা না পুত্র, না স্বামী, না ভাই, সেই-সব ঘরছাড়াদের একটুখানি ভিক্ষা দেবার জন্যে সমস্ত প্রাণকে শুকিয়ে ফেলে আমরা শূন্য ঘরে পড়ে থাকব! মল্লিকা, এই পুরুষের ধর্ম আমাদের মেরেছে, আমরাও একে মারব। (৯খ,পৃ.২৩২)

পুত্র-দর্শনের পর লোকেশ্বরী যেন একেবারে ধর্মের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। যিনি ছিলেন বুদ্ধের সেবক তিনিই যেন হলেন বিরুদ্ধজন। ড. সাধনকুমার ভট্টাচার্য এ সম্পর্কে বলেছেন, "রাণী লোকেশ্বরী ধর্মের জন্যই ধর্মকে আশ্রয় না করে– বিত্তের জন্য, পুত্রের জন্য, মানের জন্য, এককথায় স্বার্থসিদ্ধির উপায় হিসাবেই ধর্মকে আশ্রয় করেছেন এবং করেছেন বলেই পুত্রের সন্ন্যাসে বিচলিত হয়ে সত্য ধর্মে আস্থা রাখতে পারেননি।"[১৩৮]– এ কথা যুক্তিযুক্ত নয়। ধর্মকে তিনি অন্তরেই গ্রহণ করেছেন। আর এ জন্যই ধর্ম বিরুদ্ধতা তার মুখেই শুধু– মন্ত্র উচ্চারনের সঙ্গে তিনি নমস্কারও করেন। তার মনে প্রতিক্ষণ একটি যুদ্ধ চলে। মুখে তিনি বলেন 'অহিংসা ইতরের ধর্ম'। তিনি ক্ষত্রিয়; হিংসা ক্ষত্রিয়ের বিশাল বাহুতে মাণিক্যের অঙ্গদ, নিষ্ঠুর তেজে দীপ্যমান। তিনি ক্ষত্রিয়ের গুণকীর্তন করেন। তিনি অন্তরে যা বিশ্বাস করেন, তাকে চাপা দিয়ে মুখে অন্য কথা বলেন। এটা ঘটেছে শুধুমাত্র তার মাতৃত্বের জন্য। কোমল মাতৃত্ববোধ তাকে দিয়ে কঠিন কথা বলায়। তিনি কন্যা বাসবীকে বলেন :

> বনস্পতি নির্মূল করবার জন্যেই এসেছেন তোমাদের গুরু। তাও সে পরশুরামের মতো কুঠার হাতে করবেন এমন শক্তি নেই। কোমল শাস্ত্রবাক্যের পোকা তলায় তলায় লাগিয়ে দিয়ে মনুষ্যত্বের মজ্জাকে জীর্ণ করবেন, বিনা যুদ্ধে পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করে দেবেন। তাঁদেরও কাজ সারা হবে আর তোমরা রাজার মেয়েরা মাথা মুড়িয়ে ভিক্ষাপাত্র হাতে পথে পথে ফিরবে! তার আগেই যেন মর, আমার এই আশীর্বাদ। (৯খ,পৃ.২৩৪)

তিনি এই কটূ কথা বললেন ঠিকই কিন্তু এই সময়েই যখন 'নমঃ পিনাকহস্তায়।'– শুনতে পান, তখন বৌদ্ধধর্মের পরাজয়ে আফসোস করেন। কারণ এ ধর্মের মূল তার বুকের মধ্যে। আবার নিজের এই প্রাণের ধর্মকে সমূলে উচ্ছেদ করবার জন্য সচেষ্ট হন। পরক্ষণেই বলেন, 'বাঁধন ছিঁড়তে বড়ো বাজে।' মল্লিকা তাকে পরামর্শ দেন বুদ্ধের ধর্মকে চাপা দিতে দেবদত্তের কাছে নতুন মন্ত্র নিতে। এ কথায়ও তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে ওঠেন। বলেন :

> ছি ছি, বোলো না, বোলো না, মুখে এনো না। দেবদত্ত ক্রূর সর্প, নরকের কীট। যখন অহিংসাব্রত নিয়েছিলাম তখনো মনে মনে তাকে প্রতিদিন দগ্ধ করেছি। আর আজ! যে আসনে আমার সেই পরমনির্মল জ্যোতির্ভাসিত মহাগুরুকে নিজে এনে বসিয়েছি তাঁর সেই আসনেই দেবদত্তকে ডেকে আনব! (জানু পাতিয়া) ক্ষমা করো প্রভু ক্ষমা করো। (৯খ,পৃ.২৩৫)

এরপর তিনি নিজের মনের কথা অকপটে বলেন।

> ভিতরে উপাসিকা আছে, সে ভিতরেই থাক, বাইরে আছে নিষ্ঠুরা, আছে রাজকুলবধূ, তাকে কেউ পরাস্ত করতে পারবে না। মল্লিকা, আমার নির্জন ঘরে গিয়ে বসি গে, যখন ধুলার সমুদ্রে আমার এতকালের তরণী একেবারে ডুবে যাবে তখন আমাকে ডেকো। (৯খ,পৃ.২৩৫)

– এভাবেই তার জীবন চরম দ্বন্দ্বময় জটিল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে এগিয়েছে। পূজার বেদীতে নটী শ্রীমতীর নৃত্যের আদেশ হলে তাকে সেখানে ডাকা হয়। বুদ্ধপূজাস্থলের এই অপমান তিনি মেনে নিতে পারেন না। তাই তিনি শ্রীমতীকে আড়ালে ডেকে বিষ দেন খাওয়ার জন্য। অর্থাৎ তিনি চান এ পাপ যেন ঘটতে না পারে। এই ব্যবস্থা অস্বীকার করে শ্রীমতী গান এবং নাচ শুরু করে। লোকেশ্বরী যখন দেখেন এ হলো বুদ্ধের প্রতি নিজেকে নিবেদনের গান, তখন তিনি অভিভূত হন। শ্রীমতী গহনাগুলো একে একে আবর্জনার স্তূপে বিসর্জন দিলে লোকেশ্বরীর শরীর আনন্দে দুলে ওঠে। শ্রীমতীকে রক্ষিণীরা মেরে ফেললে লোকেশ্বরী শ্রীমতির মাথা কোলে তুলে নেন। তিনি বলেন :

> নটী, তোর এই ভিক্ষুণীর বস্ত্র আমাকে দিয়ে গেলি। এ আমার। (৯খ,পৃ.২৫০)

লোকেশ্বরীর মনে সমস্তক্ষণই দ্বন্দ্ব ছিল। কিন্তু তিনি বৌদ্ধ ধর্মকে কখনোই অবজ্ঞা করতে পারেন নি। সন্তানের জন্য মাতৃ-হাহাকার তাকে যন্ত্রণাবিদ্ধ করেছে বলে তিনি দিশেহারা হয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি সেই ধর্মেই স্থির হন। নীহাররঞ্জন রায় লোকেশ্বরীর চরিত্রকে নাটকের মানদণ্ডের সঙ্গে তুলনা করেছেন– "রানী লোকেশ্বরীর অন্তর্নিহিত গভীর চিত্তদ্বন্দ্ব, অঙ্কের পর অঙ্কে আবর্তিত হইয়া চতুর্থ অথবা শেষ অঙ্কে যে মহান পরিণতির মধ্যে মুক্তি পাইল, সেই রানী লোকেশ্বরী তাঁহার সমস্ত দ্বন্দ্ববিক্ষোভ লইয়া এই নাটকের নাটকীয় দীপ্তির মানদণ্ডরূপে বিরাজমান।"[১৩৯] সত্যিই তাই। নাট্যকাহিনিটি এগিয়ে নিয়েছে লোকেশ্বরীর দ্বন্দ্বময় মানসলোক এবং শেষ পর্যন্ত তিনি একটি বিন্দুতে স্থির হয়েছেন। রণেন্দ্রনারায়ণ রায় বলেছেন, "লোকেশ্বরীর বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ কি হিন্দুধর্মের ওপর বৌদ্ধধর্মের জয়ের ইঙ্গিত? হয়তো না। কোন কোন ক্ষেত্রে বৌদ্ধধর্মের আবেদন হিন্দুধর্মের চেয়ে গভীর, তবে বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের

স্থান দখল করতে পারে না, বা বৌদ্ধধর্মের মধ্যে ব্যক্তির মর্যাদার যে স্বীকৃতি আছে যা সমাজসৃষ্ট কুসংস্কারকে অস্বীকার করে তা হিন্দুধর্মও অবহেলা করতে পারে না।"[১৪০] ধর্মবোধ যাই হোক না কেন, রানি লোকেশ্বরীর মাধ্যমে নটীর বস্ত্রধারণ সাম্যবাদের বিজয় প্রকাশ করেছে। মহিষী হয়ে তিনি নটীকে সম্মান করেছেন। এর মধ্য দিয়ে মানুষকে সম্মান করা হয়। এভাবে মহিষীর মাতৃহৃদয় বিশ্বহৃদয় হয়েছে।

চণ্ডালিকা নাটকে মা চণ্ডাল-বধূ। তিনি জাদু জানেন, মন্ত্র পড়ে অসাধ্য সাধন করেন। তবে তার প্রধান পরিচয় মাতৃত্বে। মেয়ে প্রকৃতি চণ্ডাল জন্মের অস্পৃস্যতা ঘুচিয়ে মানুষ জন্মের সম্মান পেতে চান। প্রকৃতি বুদ্ধশিষ্য আনন্দের প্রেমে পড়েন। মন্ত্র পড়ে আনন্দকে এনে দেওয়ার জন্য মায়ের কাছে বায়না ধরেন প্রকৃতি। এই অবাস্তব আশা ত্যাগ করার জন্য প্রথমে তিনি মেয়েকে বোঝান। অভিশাপ লাগার ভয় দেখান। তিনি জানেন বিধাতার লিখন খণ্ডানো যায় না। চণ্ডালিকার ভাগ্যে দাসত্বই লেখা। তিনি ভিক্ষু সম্পর্কে বলেন :

> মনে রাখিস প্রকৃতি, ওদের কথা কানেই শোনবার, কাজের খাটাবার নয়। অদৃষ্টদোষে যে-কুলে জন্মেছিস তার কাদার বেড়া ভাঙাতে এমন লোহার খোনতাও নেই কোনোখানে। অশুচি তুই, তোর অশুচি হাওয়া ছড়িয়ে বেড়াস নে বাইরে, যেখানে আছিস সেইখানটুকুতেই থাক সাবধানে। এই জায়গাটুকুর বাইরে সর্বত্রই তোর অপরাধ। (১২খ,পৃ.২১৭)

জাতিভেদ প্রথায় এটাই বিধান। মা সমাজবাস্তবতার এই কথা কিছুতেই অস্বীকার করতে পারেন না। কিন্তু প্রকৃতির অসহ্য দুঃখ দেখে মা বিচলিত হন। মহাপাপ জেনেও তাই তিনি মন্ত্র পড়েন আনন্দকে প্রকৃতির কাছে নিয়ে আসার জন্য। এই পাপ কাজ করার আগে তিনি ক্ষমা চেয়ে নেন মহাপ্রভুর কাছে। তিনি বলেন :

> তুমি মহাপুরুষ, অপরাধ করবার শক্তি আমার যত, ক্ষমা করবার শক্তি তোমার তার চেয়ে অনেক বেশি। প্রভু, অসম্মান করতে বসেছি, তবু প্রণাম গ্রহণ করো। (১২খ,পৃ.২২০)

সন্তানের স্বপ্ন পুরণের জন্য এই মহাপাপ কাজে তিনি হাত দেন। মন্ত্র পড়তে পড়তেও তিনি প্রকৃতিকে জিজ্ঞাসা করেন, প্রকৃতি এর পরিণতি সহ্য করতে পারবে কি-না। আবার মহাপুরুষকে রক্ষা করার জন্য মন্ত্র ফিরিয়ে নেবেন কি-না– সে কথাও জিজ্ঞাসা করেন। যদিও জানেন মন্ত্র ফেরাতে গেলে তার নিজের মৃত্যু অবধারিত। তবু তিনি মন্ত্র ফেরাতে চান, এখানে তার শ্রদ্ধাবনত মনের পরিচয় পাওয়া যায়। এবং শেষ পর্যন্ত এই নিষ্ঠুর মন্ত্র পড়তে পড়তে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। বুদ্ধের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানান এভাবে–

> জয় হোক, প্রভু। আমার পাপ আর আমার প্রাণ দুই পড়লো তোমার পায়ে, আমার দিন ফুরল ঐখানেই– তোমার ক্ষমার তীরে এসে। (১২খ,পৃ.২২৭)

মায়ের অবিচল শ্রদ্ধা ছিলো বুদ্ধের প্রতি। তেমনি মেয়ের প্রতিও অপরিমিত স্নেহ। মেয়ের যন্ত্রণা তিনি সহ্য করতে পারলেন না, তাই পাপের পথে পা বাড়ান। নাটকে এই মায়ের মাতৃত্ব 'অন্ধ মাতৃত্বে'র প্রকাশ।

তাসের দেশ নাটকে একজন মা চরিত্র রয়েছে। তিনি রাজপুত্রের মা। অর্থাৎ রাজমাতা। একটি দৃশ্যে তাকে পাওয়া যায়। এতেই বোঝা যায় তিনি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং বুদ্ধিমতী। রাজপুত্র 'রূপকথার দেশে'র খোঁজে বেড়িয়ে পড়তে চান পঙ্খীরাজ সাজিয়ে। রাজমাতা এতে বাধা দেন না। রাজপুত্রের মনোভাব তিনি পুরোপুরিই বোঝেন। তিনি বোঝেন যে, রাজপুত্রের অভাব *অভাবেরই অভাব*। পাওয়া জিনিসে যখন বিতৃষ্ণা জন্মে যায়, তখন সে ছটফট করে। তাই তিনি রাজপুত্রকে বাধা দেন না। বরং সন্ধ্যার সময় আরতির কাজল পরাতে চান চোখে, যেন পথের অমঙ্গল কেটে যায়। তিনি বলেন :

> বাছা, তোমাকে ধরে রাখতে গেলেই হারাব। তুমি বইতে পারবে না আরামের বোঝা, সইতে পারবে না সেবার বন্ধন। আমি ভয় ক'রে অকল্যাণ করব না। ললাটে দেব শ্বেতচন্দনের তিলক, শ্বেত উষ্ণীষে পরাব শ্বেতকরবীর গুচ্ছ। যাই কুলদেবতার পুজো সাজাতে। (১২খ,পৃ.২৩৮)

রাজমাতার এই বোধ সাধারণ নারীর মতো নয়। এতে তার ভিতরের বিচক্ষণ নারীর পরিচয় পাওয়া যায়। এবং এই মাতৃত্ব সংযমী মাতৃত্ব।

৫. ধর্মের প্রতি সম্যকভাবে সমর্পিত চরিত্র :

যারা ধর্মকেই একমাত্র অবলম্বন মনে করেন এবং সে ধর্মের জন্য যে কোনো কাজ করতে পারেন, সেই চরিত্রগুলো এই বিভাগর অন্তর্ভুক্ত।

রমাবাই ধর্মান্ধ এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন নারী। তার এই বোধের কাছে মাতৃত্বও হার মেনেছে। নিজের মেয়েকে জোর করে পরপুরুষের সঙ্গে চিতায় তুলে দিয়ে ধর্ম রক্ষা করেছেন রমাবাই। তার কাছে মানবধর্ম-মাতৃধর্মের চেয়ে সংস্কার বড়ো। এ জন্যই তিনি বিশ্বাস করতে পারেন নি যে ব্রাহ্মণ মেয়ের স্বামী যবন হতে পারে। তাই তিনি আশ্চর্য এবং রাগান্বিত হয়ে বলেছেন :

> ম্লেচ্ছ, পতি সে তোমার!(৩খ,পৃ.১০৬)

রমাবাই মনে করেন যে হিন্দু জীবাজীর সঙ্গে অমাবাইয়ের বিয়ের বাগদান হয়েছিল, সেই জীবাজী-ই তার স্বামী। তার মতে মৃত জীবাজীর সঙ্গে সহমরণে গেলে অমাবাই 'সতী' হবে। বিশ্বে সতীত্বের জয়ধ্বনি উঠবে। "রমাবাই বিচার-বিবেকহীন, অবিচলিত সংস্কারধর্মের প্রতীক। সংস্কার তাহার জীবনে এমন বদ্ধমূল যে, উহার প্রভাবে

হৃদয়ের স্বাভাবিক ধর্ম, বিচার-বুদ্ধি সব মৃত। সংস্কার, প্রথা ও লোকমতই তাহার জীবনের সত্য।"[১৪১] রমাবাইয়ের মধ্যে মেয়ের জন্য কোনো কষ্টবোধ প্রকাশ পায় না। এক নিষ্ঠুরতম সংস্কারে আবদ্ধ থেকে তিনি নিজে আরো বেশি করে নিষ্ঠুর হয়েছেন। তার মধ্যে কোনো দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় নি। একমুখী তার বৈশিষ্ট্য। কন্যার কুযশে নিজের সতীত্বে কলঙ্ক স্পর্শ করে তাকে। অমাবাইকে চিতায় তোলার মাধ্যমে গর্ভের লজ্জা নিবারণ করেন তিনি। নিজের মেয়েকে চিতায় তুলে নিষ্ঠুর আনন্দে মত্ত হতে তার বুক কাঁপে না। আবার এ কাজ করবার সময় তার স্বামী বাধা দিলে তিনি স্বামীকে পর্যন্ত সৈন্য দ্বারা বেঁধে রাখেন। এভাবে তার চরিত্র পিশাচে পরিণত হয়েছে।

নটীর পূজা নাটকে রাজকন্যা মল্লিকা একটি চতুর চরিত্র। তিনি সকলের সম্মুখে থেকেও যেন আড়ালে। যে কথাটি বলেন, তা ঠিক কার দিকে সমর্থন করলো তা-ও ঠিক করে সকলে বুঝতে পারে না। তবে খুব আশ্চর্যজনকভাবে সত্য কথা বলেন তিনি। রাজা অজাতশত্রুর ধর্মকর্ম নিয়ে তিনি বলেন :

> যাদের অনেক আছে তাদেরই অনেক আশঙ্কা। উনি রাজ্যেশ্বর, তাই ভয়ে ভয়ে সকল শক্তির সঙ্গেই সন্ধির চেষ্টা বুদ্ধশিষ্যের সমাদর যখন বেশি হয়ে যায় অমনি উনি দেবদত্ত-শিষ্যদের ডেকে এনে তাদের আরো বেশি সমাদর করেন। ভাগ্যকে দুইদিক থেকেই নিরাপদ করতে চান। (৯খ,পৃ.২২৫)

শুধু রাজা নন, নাটকে দেশের প্রায় সকল লোকই বৌদ্ধধর্ম এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম নিয়ে দোলুল্যমান। একে মল্লিকা মনে করেন 'পাগলামীর হাওয়া' এই হাওয়ার গতির স্থিরতা নেই। এই অস্থির হাওয়ায় মল্লিকা ধৈর্যশীল-স্থির-অবিচলিত। কথা কম বলেন, কোনো রকম রাগান্বিত উক্তি করেন না, শক্তিরও অপব্যয় করেন না। কিন্তু যা করতে চান নিঃশব্দে করেন। তারই অবিচলতায় পূজাস্থলে শ্রীমতীর নৃত্যের মতো অপকর্ম ঘটে। কিন্তু তার কোনো প্রত্যক্ষ সংযোগ এর সঙ্গে থাকে না। রত্নাবলীই সকল ব্যবস্থা করেন, তবে রত্নাবলীর পিছনে মল্লিকার উস্কে দেওয়ার হাত স্পষ্ট। মল্লিকার সবচেয়ে বড়ো গুণ তিনি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং সত্যভাষী। পরিস্থিতি বিবেচনায় তিনি দৃঢ়ভাবে বলেন :

> এই বলে যাচ্ছি, আজ সন্ধ্যাবেলায় ঐ অশোকচৈত্যে পুজো হবেই। (৯খ,পৃ.২৪৩)

বুদ্ধদেবের দয়াশীলতা আর দেবদত্তের হিংসা সম্পর্কেও তিনি বলতে ছাড়েন না। তিনি বলেন :

> দয়ালু দেবতাকে মানুষ মুখের কথায় ফাঁকি দেয়, হিংসালু দেবতাকে দেয় অর্ঘ্য। (৯খ,পৃ.২৪৩)

পুরো নাটকে মল্লিকার মতো এমন করে সত্য কথা আর কেউ বলেন নি। শেষ পর্যন্ত বোঝা যায় মল্লিকা ক্ষত্রিয়ধর্মমুখী, তাই মৃত শ্রীমতীকে তিনি ভিক্ষুণী সম্বোধন না করে নটী সম্বোধন করেন।

রাজকন্যা রত্নাবলীর মানস জগতে সব সময় রাজকন্যার অহংকার বিদ্যমান। পুরো নাটকে তিনি একমুখী। বৌদ্ধধর্মের প্রতি তার কিছুমাত্র মমতা দেখা যায় না, বরং বিদ্বেষ স্পষ্ট। তার কথায় এর পরিপূর্ণ প্রকাশ দেখা যায়। তিনি বলেন :

> ভ্রমক্রমে পূজ্যকে পূজা না করতে পারি কিন্তু অপূজ্যকে পূজা করার অপরাধ আমার দ্বারা ঘটে না। (৯খ,পৃ.২৩৪)

রত্নাবলী যথার্থ রাজরক্তবাহী দুর্বিনীত ক্ষত্রিয় মানুষের মতো কথা বলেন। পূজার ভারপ্রাপ্ত শ্রীমতীকে নির্বাসন বা প্রাণদণ্ড দিয়ে গৌরব বাড়িয়ে না দিয়ে তিনি শ্রীমতীকে অন্য শাস্তি দেন। যেখানে শ্রীমতী পূজারিণী হয়ে পূজা করতে যাচ্ছিলেন, সেখানে তাকে নটী হয়ে নাচার আদেশ দেন। এই ক্রূর বুদ্ধি অত্যাচারী রাজ-বুদ্ধি। তিনি মাতা লোকেশ্বরীকেও উদ্ধ্যতভাবে বলেন :

> মোহে পড়ে যে-মিথ্যাকে মান দিয়েছিলেন তাকে দূরে সরিয়ে দিলেই মোহ কাটে না। সেই মিথ্যাকে অপমান করুন তবে মুক্তি পাবেন। (৯খ,পৃ.২৩৫)

তার মতে ভিক্ষু হলেই মানুষ উচ্চ জাতের হয় না– মন্ত্র পড়লে রক্ত বদল হয় না। তিনি মনে করেন ভিক্ষুধর্ম রাজধর্মকেও নষ্ট করে। গুজব ওঠে পিতা বিম্বিসারকে হত্যা করা হয়েছে। এতে রত্নাবলী বিচলিত হন না। বরং বৈদিক ধর্মের যোগ্য প্রতিনিধির মতো পিতা সম্পর্কে তিনি বলেন :

> মহারাজ বিম্বিসার পিতার বৈদিক ধর্মকে বিনাশ করেছেন। সে কি পিতৃহত্যার চেয়ে বেশি নয়? ব্রাহ্মণরা তো তখন থেকেই বলছে যে-যজ্ঞের আগুন উনি নিবিয়েছেন, সেই ক্ষুধিত আগুন একদিন ওঁকে খাবে। (৯খ,পৃ.২৪৩)

মহারাজ বিম্বিসারকে সতিসত্যিই হত্যা করে বৈদিক ধর্মগুরু দেবদত্তের শিষ্যরা। এই শিষ্যরা এতোই দুর্বিনীত হয়ে ওঠে যে, দেবদত্তের অনুসারী রাজা অজাতশত্রু ভয় পেয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুদেরকে ডাকেন অহোরাত্র পাপমোচন মন্ত্র পড়ার জন্য। এ সংবাদেও রাজকন্যা রত্নাবলী নিজের চিন্তা থেকে সরেন না। বরং ভিক্ষুরা আসার আগেই শ্রীমতীকে দিয়ে নৃত্য করাতে চান। যেন এক বিকৃত মানসিকতা তাকে তাড়া করে। অবশেষে নাচতে শুরু করেন অলংকারে সজ্জিত শ্রীমতী। গানের মাধ্যমে বুদ্ধের বন্দনা করেন তিনি। এরপর একে একে গয়নাগুলো আবর্জনার স্তুপের মধ্যে ফেলে দেন। এরও পর তিনি নটীর বেশ ফেলে দেন ভিতরে রয়েছে ভিক্ষুণীর পীতবস্ত্র। তখন রত্নাবলী রক্ষিণীদের রাজ আদেশ পালন করতে বলেন। রক্ষিণীর অস্ত্রাঘাতে মৃত্যু হয় শ্রীমতীর। আর মুখে উচ্চারণ করেন বৌদ্ধমন্ত্র। এই প্রথমবারের মতো রত্নাবলীর মনে ভয় জাগে। সবাই যখন পালঙ্ক আনতে চলে যায় তখন রত্নাবলী শ্রীমতীর পা স্পর্শ করে বৌদ্ধমন্ত্র বলতে শুরু করেন। শ্রীমতীর ভক্তির স্বরূপ তাকে রূপান্তরিত করে।

৬. লোভী চরিত্র :

গান্ধারীর আবেদন নাটকে ভানুমতি গান্ধারীর সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্র। পঞ্চপাণ্ডবের দুরবস্থা তাকে উল্লাসিত করে। তার প্রথম আগমনেই দেখা যায় সে দ্রৌপদীর অলংকার পেয়ে প্রচণ্ড খুশি এবং শত্রুপরাভবকে শুভক্ষণ বলছে। দ্রৌপদী যখন অলংকার পরতো, সেই মাণিক্যের জ্যোতি ভানুমতির বুকে বিদ্ধ হতো। সে দম্ভভরে বলে :

আমারে সাজায়ে তারে যেতে হল বনে। (৩খ,পৃ.৯০)

এ থেকে বোঝা যায় ভানুমতির মনে কোনো কষ্ট নেই, অনুশোচনা তো নয়ই। বরং সে আনন্দিত, অনেকটা প্রতিশোধের উল্লাসে উন্মত্ত। ক্ষত্রিয় ধর্ম তার মনে দৃঢ় ভাবে প্রথিত। জয়-পরাজয় আসবেই এবং তাকে সহজভাবে মেনে নেওয়া ক্ষত্রবীরাঙ্গনার ধর্ম। অন্যের প্রতি দুর্বল হলে তাদের চলে না। তাই ভানুমতি দ্রৌপদীসহ পঞ্চপাণ্ডবের বনবাসে দুঃখিত হয় না। অহংকারে সে গান্ধারীকে বলে :

বিমুখ ভাগ্যেরে তবে হানি উপহাসে
কেমনে মরিতে হয় জানি তাহা দেবী–
কেমনে বাঁচিতে হয় শ্রীচরণ সেবি
সে শিক্ষাও লভিয়াছি। (৩খ,পৃ.৯১)

এ মন্তব্য কোনো কোমল নারীর নয়, রাজনৈতিক বিচক্ষণ ব্যক্তির মতো। যার মধ্যে অলংকারের লোভ এবং রাজ্যলোভ সমানভাবে বিদ্যমান।

লক্ষ্মীর পরীক্ষা নাটকে ক্ষীরো ঈর্ষাপরায়ণ, স্বার্থপর এবং লোভী চরিত্র। সে রানি কল্যাণীর দাসী। সবাইকে ঈর্ষা করা তার স্বভাব। সে কারো সুনাম করে না, আবার কারো সুনাম সহ্যও করে না। কল্যাণীর দানশীলতা দেখে সে মনে করে, যার সম্পদ আছে সে দান করে – এটাই স্বাভাবিক; এর মধ্যে কোনো মহানুভবতা নেই। রানির সম্পদশীলতা দেখে সে ঈর্ষা করে, আবার অন্য দাসীদের রানি কিছু দেবেন বলে দাসীদেরও বিদায় করে দেয়। শুধুমাত্র নিজের আত্মীয়-স্বজন নিয়ে রানির বাড়ি থাকে এবং নিজের বিভিন্ন বিপদের কথা বলে টাকা নেয়। আর অন্য সকলকে শুনায়, তার টাকা থাকলে সেও এমন দান-দক্ষিণা দিতো। এছাড়া, অন্যায় এবং মিথ্যাচারিতা করে ধরা পড়লেও নির্লজ্জের মতো সপ্রতিভ থাকে। এরপর লক্ষ্মীদেবী তাকে স্বপ্নে রানি করে দেন। ক্ষীরো রানি হয়ে অত্যাচারি হয়ে ওঠে। দাসীদেরকে বকাঝকা করে, কুর্নিশ করায়। সব কিছু হারিয়ে রানি কল্যাণী তার কাছে এলে কল্যাণীকে সে উপহাস করে। এরপর লক্ষ্মীদেবী নিজে ঠাকুরানী সেজে এসে ভিক্ষা চাইলে তাকেও অপমান করে।

লক্ষ্মী তখন সমস্ত কিছু নিয়ে চলে যান। ক্ষিরো স্বপ্নে এত জোড়ে কথা বলেছে যে পাড়াশুদ্ধ লোক জেগে গিয়েছে। মূলত ক্ষিরো নিজে যা, স্বপ্নেও সে তাই দেখে, তবে শেষ পর্যন্ত তার শুভ বুদ্ধির উদয় হয়। রানি কল্যানী সেখানে এসে হাজির হন। সে কল্যানীকে প্রণাম করে বলে :

বড়ো কুস্বপ্ন দিয়েছিল বিধি,
স্বপনটা ভেঙে বাঁচলেম দিদি!
একটু দাঁড়াও, পদধূলি লব–
তুমি রানী, আমি চিরদাসী তব। (৩খ,পৃ.১৪৫)

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষীরো সম্পর্কে বলেছেন, "তাহার বুদ্ধিমত্তা, উপায়কুশলতা, ফাঁকি ধরা পড়িলেও অক্ষুণ্ন সপ্রতিভতা, অন্যান্য প্রার্থিনীবৃন্দের প্রতি তাহার মুখ-নাড়া-দেওয়া মুরুব্বিয়ানা, সর্বোপরি রাণীর প্রতি তাহার গোপন ঈর্ষা ও অবচেতন মনে রাণী হইবার সুপ্ত উচ্চাভিলাষ– এই সমস্ত চরিত্রবৃত্তি তাহাকে একটি অদ্ভুত জীবন্ত সত্তায় পরিণত করিয়াছে।"[১৪২] গার্হস্থ্য জীবনের সংসারবুদ্ধি, তুচ্ছ স্বার্থসাধনা, মিথ্যাচারিতা, চাটুভাষণ এবং লোভীর নিখুঁত চিত্র ক্ষীরোর মধ্যে বাস্তবসম্মতভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

৭.অন্যান্য চরিত্র

রবীন্দ্রনাথসৃষ্ট আরো কিছু চরিত্র রয়েছে যা এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করেছি। এখানে রয়েছে, নিঃস্বার্থ-উদার চরিত্র, নির্লিপ্ত চরিত্র এবং সুপ্তশক্তি সম্পন্ন চরিত্র।

নিঃস্বার্থ উদার চরিত্র :

লক্ষ্মীর পরীক্ষা নাটকে কল্যাণী মানবদরদী প্রজাহিতৈষি রানি। তিনি দানশীল এবং মিষ্টভাষী। দাসী ক্ষীরোর শত অপরাধও তিনি হেসে উড়িয়ে দিয়ে তাকে প্রশ্রয় দেন। আবার পাড়ার মেয়েরা অনেক পেয়েও আড়ালে তার নামে কুকথা বলে তা জেনেও তিনি তাদের সাহায্য-সহযোগীতা করেন, নতুন বউয়ের মুখ দেখে গায়ে গহনা পরিয়ে দেন। সব বুঝেও সবাইকে মাপ করবার আশ্চর্য ক্ষমতা তার মধ্যে আছে। তিনি মনে করেন, সামনাসামনি যা পাওয়া যায় তাই যথেষ্ট, আড়ালের কথা নিয়ে চিন্তা করে লাভ নেই। আবার ব্রাহ্মণ-শুদ্র সকলকেই এক রকমভাবে ভালোবাসেন। তাই মুখে যে যাই বলুক মনে মনে রানি কল্যাণীকে শ্রদ্ধা করে সকলেই। কল্যাণী নিজের সম্পর্কে বলেন :

ফাঁকি দিয়ে তারা ঘোচায় অভাব,
আমি দিই – সেটা আমার স্বভাব।
তাদের সুখ সে তারাই জানে
আমার সুখ সে আমার প্রাণে। (৩খ,পৃ.১১৮)

কল্যাণীর মধ্য দিয়ে বাঙালি নারীর চিরচেনা কল্যাণময়ী উদার দিকটি প্রকাশিত হয়েছে।

নির্লিপ্ত চরিত্র:

গৃহপ্রবেশ নাটকের মণি সমাজ-বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন এবং সমাজ-নির্লিপ্ত চরিত্র। নিজের খেয়াল-খুশি মতো তিনি চলেন পারিবারিক দায়িত্ব সামাজিক দায়ভার কোনোটির প্রতি-ই তার ভ্রূক্ষেপ নেই। তার স্বামী যতীন মৃত্যুশয্যায় শায়িত। কিন্তু এ নিয়ে তার কোনো দুঃখবোধ নেই। রোগীর ঘরে যেতে তার গা ছমছম করে। মালিশের গন্ধ পেলে হাসপাতালের কথা মনে হয়। এমনকি রোগীর পথ্য বানাতেও তিনি নারাজ। তিনি মাসিকে বলেন :

আমাকে তোমাদের বাগানের মালী করে দাও-না– সে আমি ঠিক পারব। (৯খ,পৃ.১৭৫)

মণির এই হলো মনোভাব। তিনি গাছ-ফুল ভালোবাসেন, কুকুর-বিড়াল জন্তু-জানোয়ার ময়ূর বাঁদর পোষেন, থিয়েটার-চিড়িয়াখানা দেখতে যান, অথচ স্বামীর প্রতি মমতা নেই। স্বামীর প্রতি তার এই আচরণ খুব যে বিচার-বিবেচনা করে করেন তা নয়। তবে, রোগ আর রোগী তার ভালো লাগে না। শুধু এইটেই তার বলার বিষয়, আর কিছু নয়। সৌন্দর্যের প্রতি তার আকর্ষন। তার উৎসব-উল্লাস-হৈচৈ ভালোলাগে। ছোটো বোনের অন্নপ্রসন্ন খাওয়ার জন্য অসুস্থ স্বামীকে রেখে বাবার বাড়ি রওনা হন নির্দ্বিধায়। কেবল নাটকের শেষ দৃশ্যেই তার চরিত্রের ব্যতিক্রম দেখা যায়। যতীনের তখন শেষ সময়। মণির বাবা মণিকে সঙ্গে করে ফিরিয়ে আসেন যতীনের বাড়ি। মণি এসে যতীনের পায়ের উপর পড়েন। এই দৃশ্য তার পুরো চরিত্রের সঙ্গে অসামঞ্জস্যকর। তার যে চরিত্র দেখা গেছে, তাতে নিজের পিতার কথা শুনেও এ কাজ মণির করার কথা নয়, আবার তিন দিনে মণির বয়সও এমন বেড়ে যায় নি যে, তার স্বামীর ব্যাপারে বোধোদয় হয়েছে। কিংবা মানসিক বোধ পরিবর্তনেরও কোনো কারণ ঘটে নি। তাই ঘরে ঢুকে ঘরের এক কোণে জড়োসড়ো হয়ে বড়ো বড়ো বিস্মিত চোখে যতীনের দিকে তাকিয়ে থাকলে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হতো। তারপরও পুরো নাটক জুরে মণি স্বাধীনচেতা। কারো কথায় তিনি নিজের পথ পরিবর্তন করেন নি। সব বিদ্রোহই সুফল বয়ে আনে না। মণির বিদ্রোহও নয়। মণি এক ধরনের মানুষের প্রতিনিধি। নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন, "মণির চরিত্র কল্পনা একটু অস্বাভাবিক।"[১৪৩] বাঙালি নারী মায়ায়-মমতায়-ভালোবাসায়

সিক্ত প্রাণ। সেক্ষেত্র মণি চরিত্রটি বাঙালিমানসে বেখাপ্পা মনের হয়। লোভীও নয়, স্বার্থপারও নয় শুধুই নিজের মনে পথ চলে। সমাজের কোনো কিছুর প্রতি দায়বদ্ধতা প্রকাশ করে না।

সুপ্তশক্তি সম্পন্ন চরিত্র :

কোন কোন মানুষের মধ্যে জাগরণী শক্তি আছে। তারা কখনো কখনো নিরব কার্যকলাপের মাধ্যমে আবার কখনো কখনো কিছু না করে কেবলমাত্র নিজের উপস্থিতিতেই একটি পরিস্থিতি বদলে দিতে পারেন।

প্রকৃতির প্রতিশোধ নাটকের বালিকা এ রকম একটি চরিত্র। বালিকা নিজের নাম জানে না, কারণ কেউ তাকে নাম ধরে ডাকে না। সকলে তাকে অশুচি বলে ডাকে। সে ধর্মভ্রষ্ট অনাচারী রঘুর দুহিতা। কেউ তাকে ভালোবাসে না, তার প্রতি কারো দয়া নেই। এমনকি দেব-মন্দিরের রক্ষকও তাকে দূর করে দেয়। বালিকা অমিয়াময়ী-লাবণ্যপ্রতিমা। সহজ-সরল তার মুখ। চরিত্রটি মনে এবং আচরণে সমজের যে কোনো বালিকার মতোই স্বাভাবিক। কিন্তু তার প্রতি সমাজের আচরণই বিরূপ। তারপরও সে কৌতূহলী এবং সহানুভূতিশীল। বালিকার চরিত্রে প্রথমেই লক্ষ্য করা যায় যে সে আশ্রয়হীন; ভালোবাসার আশ্রয়-সঙ্গের আশ্রয়। কারণ, তাকে কেউই নিজের কাছে ঘেষতে দেয় না। মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে তাই সে প্রশ্ন করে :

> ঘৃণায় সবাই যারে দেয় দূর করে
> সে কি, মা, তোমারও কোলে পায় না আশ্রয়? (১খ,পৃ.৩৬৮)

এখানে ধর্মগুরুদের চিরন্তন অসাম্য এবং নৈতিকতাকে প্রশ্ন করা হয়েছে। কারণ ধর্মগুরুরাই ধর্মকে চালনা করেন। বিধাতা স্বয়ং তো মন্দিরে অবস্থান করেন না। বিধার নামে বিধান দেন পুরোহিত। নিজের মতকে তিনি ধর্মের নামে প্রতিষ্ঠা করেন। তাই বিধাতার গৃহে বালিকার আশ্রয় মেলে না। আবার, নাটকে একজন মা তার নিজের সন্তানকে বুক-চেরা ধন বলছে, সেই মায়ের কাছেই যখন তার নিজের সন্তান 'বালিকা' সম্পর্কে জানতে চায় সে-ও এই বালিকাকে বলে ও 'কেউ না'। তখন বালিকা আবার অজানার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করে :

> এ কি কেউ না মা! এ কি নিতান্ত অনাথা!
> এর কি মা ছিল না গো! ও মা, কোথা তুমি। (১ম, ৩৬৮পৃ.)

এর-ও 'মা' ছিল – এটাই স্বাভাবিক। বালিকা নিজের অসহায় অবস্থা এভাবেই তুলে ধরেছে। সকলের অনাদর অবহেলার পর সন্ন্যাসীর কাছে সে আশ্রয় পায়। কারণ, সন্ন্যাসীর কাছে ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র বলে কিছু নেই। সন্ন্যাসী বলেন :

> তুমি না ত্যেজিলে মোরে আমি ত্যেজিব না। (১খ,পৃ.৩৬৯)

কিন্তু বালিকার মনে প্রথম থেকেই সংশয় থাকে যে, সন্ন্যাসী তাকে ছেড়ে চলে যাবে। শেষ পর্যন্ত সে আশংকা সত্যও হয়। তবে সন্ন্যাসী বালিকাকে অস্পৃস্য বলে ছাড়েন না, ছাড়েন নিজের সন্ন্যাসধর্মে ব্যাঘাত ঘটছে বলে। যদিও বালিকা নিজে কোনো ব্যাঘাত ঘটায় না। কিন্তু বালিকার মাধ্যমে সংসারের প্রতি টান অনুভব করেন সন্ন্যাসী। বালিকার খেলা দেখে, বালিকার ফুলতোলা দেখে সন্ন্যাসীর মনেও দোলা লাগে। এইখানেই বালিকার শক্তি বোঝা যায়। এ শক্তি জীবন্ত মানুষের ভালোবাসার শক্তি – কাছে টানার শক্তি। সন্ন্যাসী এই প্রাণের স্পন্দনকে দূরে সরিয়ে রাখতেই বালিকাকে রেখে চলে যান। কিন্তু যত দূরেই যান বালিকার কণ্ঠ শুনতে পান যেন। এই হলো বালিকার সুপ্ত থাকা জাগরণী শক্তি। শেষ পর্যন্ত মায়ার টানে বালিকার কাছে ফিরে আসত বাধ্য হন সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী ফিরে এলেন ঠিকই কিন্তু ততক্ষণে ঠাণ্ডায় মরে গেছে বালিকা। বালিকার এই ছোট্ট উপস্থিতি অনেক বড় প্রভাব ফেলে সন্ন্যাসীর জীবনে। শুধু তাই নয়, সন্ন্যাসজীবনের বিপক্ষে দার্শনিক ভিত্তিও স্থাপন করে। বালিকাই সন্ন্যাসীর ভিতরে সংসারধর্ম জাগ্রত করে। তারই কারণে সন্ন্যাসী পথিককে বলেন :

> কেন এরা সবে মোরে করিছে প্রণাম,
> আমি তো সন্ন্যাসী নই। ওঠো ভাই, ওঠো–
> এসো ভাই, আজ মোরা করি কোলাকুলি। (১খ,পৃ.৩৯১)

বালিকার মৃত্যুতে তিনি বিলাপ করতে থাকেন এভাবে–

> বাছা, বাছা, কোথা গেলি! কী করিলি রে–
> হায় হায়, এ কী নিদারুণ প্রতিশোধ! (১খ,পৃ.৩৯২)

নাটকে নিতান্ত অসহায় বালিকা একটি শক্তিরূপে আবির্ভূত হয়েছে। এ শক্তি প্রকৃতির স্বাভাবিক শক্তি। এই স্বাভাবিক-সাধারণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ অসাধারণকে দেখিয়েছেন। এখানেই তাঁর 'সীমার মাঝে অসীমের সুর।' রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন :

> প্রকৃতির প্রতিশোধ– এর ভিতরকার ভাবটির একটি তত্ত্বব্যাখ্যা লিখিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। সীমা যে সীমাবদ্ধ নহে, তাহা যে অতলস্পর্শ গভীরতাকে এক কণার মধ্যে সংহত করিয়া দেখাইতেছে, ইহা লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে।[১৪৪]

এই এক কণাই হলো বালিকা। বালিকার সহজ-সরল উপস্থিতি সন্ন্যাসীকে বুঝতে সাহায্য করে যে, সংসারের নিত্য কাজের মধ্যেই অসীম দেবলোকের সন্ধান পাওয়া যায়। এর জন্য লোকালয় ছেড়ে গুহাবাসী হতে হয় না। "মানবিক স্নেহ বালিকার মূর্তিতে গুহার মধ্য হইতে তাহাকে বাহির করিয়াছে, শেষে পথের নানা আকর্ষণে সংসারকে সে ভালোবাসিতে শিখিয়াছে, এই প্রেমেই সে আত্মকেন্দ্রিক গুহাজীবন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে এবং সীমার মধ্যেই অসীমকে দেখিতে পাইয়াছে।"[১৪৫] উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বালিকাকে মানবিক স্নেহের মূর্তি বলেছেন।

এর চেয়ে সুকুমার সেনের প্রকৃতির ছদ্মবেশ বোধটি বেশি তাৎপর্যপূর্ণ।– "যে হৃদয়বৃত্তি পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে ভাবিয়া সন্ন্যাসী আত্মতৃপ্ত হইয়াছিল, অনাথা রঘু-দুহিতার ছদ্মবেশে প্রকৃতিই তাহার অন্তরের নিপীড়িত হৃদয়বৃত্তি উস্‌কাইয়া দিল।"[১৪৬] এ কারণেই সন্ন্যাসী সন্ন্যাসধর্ম ত্যাগ করে সংসারধর্ম গ্রহণ করার সংকল্প করতে পেরেছেন। পরবর্তীতে *নৈবেদ্য* কাব্যের ৩০ সংখ্যক কবিতায়ও এই কথাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন। সেখানে পাওয়া যায় :

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।।
অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ![১৪৭]

সীমায়ই যে মুক্তি পাওয়া যায় তা নিচের আরো স্পষ্ট করে 'সীমার সার্থকতা' প্রবন্ধে বলেছেন রবীন্দ্রনাথ।

নিজের সীমার মধ্যেই সেই অসীমকে পাইতে হইবে, ইহা ছাড়া গতি নাই। সীমার মধ্যে অসীমকে ধরে না, এই ভ্রান্ত বিশ্বাসে আমরা অসীমকে খর্ব করিয়া থাকি।[১৪৮]

*প্রকৃতির প্রতিশোধ*এ যে তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে বলেছেন এভাবে –

শেষ কথাটা এই দাঁড়ালো শূন্যতার মধ্যে নির্বিশেষের সন্ধান ব্যর্থ, বিশেষের মধ্যেই সেই অসীম প্রতিক্ষণে হয়েছে রূপ নিয়ে সার্থক, সেইখানেই যে তাকে পায় সেই যথার্থ পায়।[১৪৯]

এর অনুঘটক এই বালিকা। গুহায় বসবাসরত কঠিন-পাষাণ হৃদয় সন্ন্যাসীর মনে স্নেহের সঞ্চার করে বালিকা।

'একটি বালিকা তাহাকে স্নেহপাশে বদ্ধ করিয়া অনন্তের ধ্যান হইতে সংসারের মধ্যে ফিরাইয়া আনে।'[১৫০]

চৈতালি কাব্যের 'বৈরাগ্য' কবিতায় মানুষের সংসার ছাড়া দেখে দেবতা বলে ওঠেন :

'হায়,
আমারে ছাড়িয়া ভক্ত চলিল কোথায়!'[১৫১]

অর্থাৎ দেবতা সংসারের সীমার মধ্যেই বিদ্যমান। তাকে পাওয়ার জন্য কোথাও যেতে হয় না। সন্ন্যাসীর মধ্যে এই অনুভব জাগ্রত করে বালিকা। কিন্তু বালিকা নিজে কোনো চেষ্টা করে না, বালিকার উপস্থিতি, স্বভাব, কর্মকাণ্ড, ভালোবাসাপূর্ণ পিতা-সম্বোধন সন্ন্যাসীকে সংসারধর্মী করে। সন্ন্যাসী তাই বলতে পেরেছেন–

যাক, রসাতলে যাক সন্ন্যাসীর ব্রত!
দূর করো, ভেঙ্গে ফেলো দণ্ড কমণ্ডলু!
আজ হতে আমি আর নহি রে সন্ন্যাসী! (১,পৃ.৩৮৯)

*বাল্মীকিপ্রতিভা*র ভূমিকায় সন্ন্যাসী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

সন্ন্যাসীর মধ্যে চিরকালের যে মানুষ প্রচ্ছন্ন ছিল তার বাঁধন ছিঁড়ল।[১৫২]

*বাল্মীকি প্রতিভা*র বালিকাও এমনি শক্তিধর। তার শক্তি দস্যু বাল্মীকিকে মহাকবিতে পরিণত করে। বালিকা বনের মধ্যে পথ হারিয়েছে। তখন আকাশে মেঘ করেছে, রাত্রি নেমেছে। তার শ্রান্ত-ক্লান্ত দেহ, চরণ অবশ। ঘরে ফেরার জন্য চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না। দস্যুরা তাকে দেখতে পায়। তারা বালিকাকে কালীপ্রতিমার কাছে বলি দেওয়ার জন্য বাল্মীকির সামনে হাজির করে। অসহায় বালিকা তখন নিজের বিপদ বুঝতে পারে। বেঁচে থাকবার জন্য তার অনাথ প্রাণ করুণ প্রার্থনা জানায়। বাঁধনে সে যে কষ্ট পাচ্ছে তাও জানায়। বালিকার এই করুণ আর্তিতে বাল্মীকির মন গলে যায়, চোখে জল দেখা দেয়। "বিস্ফোরক পদার্থের সাহায্যে জলস্রোতরোধকারী প্রাচীর ধ্বংস করার পর যে প্লাবন সৃষ্টি হয় অনুরূপ আবেগ প্লাবনে বাল্মীকির হৃদয় প্লাবিত হ'ল।"[১৫৩] বাল্মীকির মরুভূমির মতো পাষাণ হৃদয় করুণার প্লাবনে সিক্ত হয়ে ওঠে। তিনি বলেন :

কৃপাণ খর্পর ফেলে দে দে!
বাঁধন কর্ ছিন্ন, মুক্ত কর্ এখনি রে। (১খ,পৃ.৪০১)

বাল্মীকি শুধু বালিকাকেই ছেড়ে দেন না, দস্যুদের শিকারেও নিবৃত করেন। এমনকি ব্যাধরা পাখি মারতে এলে তিনি ব্যাধদেরও নিষেধ করেন। কিন্তু তাঁর সে নিষেধ ব্যাধরা না মেনে পাখিকে মারে। তখন সেই পাখির কষ্টে বাল্মীকি শ্লোক উচ্চারণ করেন। এভাবে বালিকার কারণেই বাল্মীকি দস্যুবৃত্তি ছেড়ে কবি হন। নাটকের শেষে 'সরস্বতী'র আবির্ভাব ঘটে। তাঁর সেই স্থিরচপলা, জোছনা মাখানো প্রতিমা দেখে বাল্মীকি অভিভূত হন। কালী প্রতিমাকে ছেড়ে সরস্বতীর কাছে আশ্রয় নেন। তিনি কালীকে বলেন:

পাষাণের মেয়ে পাষাণী, না বুঝে মা বলেছি মা!
এত দিন কী ছলকরে তুই, পাষাণ করে রেখেছিলি–(১খ,পৃ.৪০৯)

এরপর লক্ষ্মী দেবী এসে ধন-সম্পদ দিতে চাইলেও বাল্মীকি সরস্বতীকে খোঁজেন। নাটকের শেষে আবার সরস্বতীর আবির্ভাব ঘটে। সরস্বতী বলেন :

দীনহীন বালিকার সাজে
এসেছিনু এ ঘোর বনমাঝে
গলাতে পাষাণ তোর মন। (১খ,পৃ.৪১০)

তিনি আরো বলেন :

যে রাগিণী শুনে তোর গলেছে কঠোর মন
সে রাগিনী তোরই কণ্ঠে বাজিবে রে অনুক্ষণ। (১খ,পৃ.৪১০)

নাটকটি দস্যু বাল্মীকির মানবীয় গুণাবলীতে উত্তরণ এবং কবি হওয়ার কাহিনী। রবীন্দ্রনাথ নাটকের সূচনা-অংশে বলেছেন–

বাল্মীকিপ্রতিভাতে দস্যুর নির্মমতাকে ভেদ করে উচ্ছ্বসিত হল তার অন্তরগূঢ় করুণা। এইটেই ছিল তার স্বাভাবিক মানবত্ব যেটা ঢাকা পড়েছিল অভ্যাসের কঠোরতায়। একদিন দ্বন্দ্ব ঘটল, ভিতরকার মানুষ হঠাৎ এল বাইরে।[১৫৪]

বাল্মীকির এ রূপান্তর ঘটে বালিকার কারণে। এখানে বালিকার চেহারা-কণ্ঠস্বর-করুণাভিক্ষা ইত্যাদি বাল্মীকির মানসিক পরিবর্তনে প্রভাব ফেলেছে। রবীন্দ্র-মানসের দুটি বৈশিষ্ট্য বাল্মীকিপ্রতিভাতে প্রকাশিত হয়েছে বলে ড. সাধনকুমার ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন : এক. "বিকৃত অহংকারের বশে মানুষ স্বভাবকে যতোই আচ্ছন্ন করুক– যতো ভাবেই হনন করুক, স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে না পারা পর্যন্ত, তার আত্মার শান্তি নেই– মুক্তি নেই। একদিন না একদিন আত্মা প্রকৃতিস্থ হবেই– যে ভাবেই হোক তার ভারসাম্য সে রক্ষা করবেই। স্বধর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত না হলে প্রকৃতি কিছুতেই শান্ত হতে পারে না।"[১৫৫] দুই. "প্রাণের স্পর্শেই প্রাণ জাগে। কোমলের স্পর্শেই কঠোর প্রাণে কঠোর প্রাণে কোমলতার উৎস-মুখ অবারিত হয়– করুণার উত্তাপেই পাষাণ হৃদয় বিগলিত হয়– পাষাণের বাঁধ ভেঙে যায়– হৃদয় তার স্বধর্মকে ফিরে পায়। এই করুণার প্রতিনিধি কখনো আসে নিরুপায় করুণ বালিকা মূর্তিতে, কখনো আসে প্রীতিময়ী কুমারী মূর্তিতে, কখনো বা আসে প্রেমময়ী নারী মূর্তিতে।"[১৬৬]– এখানে প্রথম বৈশিষ্ট্য যে ভারসাম্যের কথা বলা হয়েছে, সেই ভারসাম্যের প্রত্যাশি রবীন্দ্রনাথ। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যের যে প্রাণ সেই প্রাণই বালিকা। বালিকার করুণ আর্তি শক্তিরূপে প্রকাশিত হয়েছে।

বিসর্জন নাটকে অপর্ণা ভিখারি বালিকা। তার ছোটো ছাগশিশু ধরে এনে দেবীর সামনে বলি দিয়েছে অনুচরেরা। সেই বিচারের জন্য রাজা গোবিন্দমাণিক্যের কাছে গিয়েছে অপর্ণা। গোবিন্দমাণিক্য মন্দির-রক্ষক জয়সিংহকে জিজ্ঞাসা করেন ছাগশিশু সম্পর্কে, কিন্তু জয়সিংহ এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না, কারণ অনুচররা কোথা থেকে পশু এনে বলি দেয় তা মন্দির-রক্ষকের জানার কথা নয়। তখনো সোপান বেয়ে রক্তচিহ্ন রয়েছে। অপর্ণা বলে ওঠে–

এ কি তারি রক্ত? ওরে বাছানি আমার!
মরি মরি, মোরে ডেকে কেঁদেছিল কত,
চেয়েছিল চারি দিকে ব্যাকুল নয়নে,
কম্পিত কাতর বক্ষে, মোর প্রাণ কেন
যেথা ছিল সেথা হতে ছুটিয়া এল না! (১খ,পৃ.৫৩৯)

অপর্ণার এই মাতৃত্ব এবং প্রেম গোবিন্দমাণিক্য এবং জয়সিংহের মনে প্রেমের সঞ্চার করে। "অপর্ণার মর্মবেদনার ঢেউ আসিয়া জয়সিংহের হৃদয়ে চেতনার আঘাত করে।"[১৫৭] এই প্রেমের চেতনারই মাধ্যমে অপর্ণা সামান্য মানুষ হলেও সনাতন ধর্মের ভীত ধরে টান দিয়েছে এবং শেকর উপড়ে ফেলেছে। কিন্তু তা নীরবে। তার কোনো লোকবল-অর্থবল-অস্ত্রবল নেই– তার শুধু প্রেম। অপর্ণা প্রেমের প্রত্যক্ষ প্রতিমা। এ প্রেম সার্বজনীন। শুধু মানুষে

সীমাবদ্ধ নয়। ছাগশিশুর প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা তার চরিত্রে মাতৃত্বের মহিমা দান করেছে। তার প্রেমের কাছে বিশ্বমাতা পর্যন্ত ছোটো হয়ে গেছেন। বিশ্বমাতার সামনে পশুবলি হয়, কিন্তু অপর্ণা পশুকে রক্ষা করতে চায় – ভিক্ষা অন্ন এক সঙ্গে ভাগ করে খায়। সে স্পর্ধা করে বলে :

কে তোমার বিশ্বমাতা! মোর
মোর শিশু চিনিবে না তারে।
.... আমি তার মাতা। (১খ,পৃ.৫৩৮)

বৌদ্ধ দর্শনের 'সর্বজীবে দয়া'র কথা অপর্ণা চরিত্রে পুরোপুরি প্রকাশিত। জীবের প্রতি অপর্ণার স্বাভাবিক প্রেম। হত্যার প্রতি স্বাভাবিক ঘৃণা। ধর্ম সম্পর্কে তার কোনো ভালোবাসা বা বিদ্বেষ নেই, কিন্তু হত্যাকারীকে সে ঘৃণা করে। তাই নির্দ্বিধায় বলে :

মা তাহারে নিয়েছেন?
মিছে কথা! রাক্ষসী নিয়েছে তারে! (১খ,পৃ.৫৩৮)

এ হলো অপর্ণার ক্ষোভ – সন্তান হারানোর যন্ত্রণা। সে মনে করে মা কখনো সন্তান হত্যা করতে পারে না, কিংবা হত্যাকারী কখনো মা হতে পারে না, বরং রাক্ষসী। এটি অপর্ণার নিজস্ববোধ – কোনো মতবাদের নয়। এই সরল-স্বাভাবিক বোধ সঞ্চারিত হয়েছে রাজা বিক্রমাদিত্য এবং দেবীর সেবক জয়সিংহের মধ্যে। বিক্রমাদিত্য পশুবলি নিষিদ্ধ করেন আর জয়সিংহ নিজের বুকের রক্ত দিয়ে পশুবলী প্রথার অবসান ঘটান। এবং শেষ পর্যন্ত ধর্মপুরোহিত রঘুপতির মধ্যেও পশুবলীর বিভৎস্যতা অনুভবিত হয়। রক্তপিপাসু দেবী সম্পর্কে রঘুপতি বলেন :

নাই। ঊর্ধ্বে নাই, নিম্নে নাই, কোথাও সে
নাই, কোথাও সে ছিল না কখনো। (১খ,পৃ.৫৯৭)

এ নাটকে অপর্ণা সহিংসতায় না গিয়েও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছে। শুধুমাত্র ছাগশিশু হত্যায় কষ্ট পেয়ে সেই কষ্ট প্রকাশ করেছে সে। আর যেখানে হত্যাযজ্ঞ হয় সে স্থান ত্যাগ করতে বলেছে অন্য মানুষদের। এ বলার মধ্যে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই, শুধু মধুর কণ্ঠে আহ্বান। এতেই বহু বছরের ভীত নড়েছে। রবীন্দ্রনাথ হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে এক প্রেমময় জগৎ গঠনের ডাক দিয়েছেন অপর্ণার মধ্য দিয়ে। "অপর্ণা-চরিত্রের মানবিক অংশ অপরিস্ফূট ও ক্ষীণ। সে একটা ছায়ামূর্তি বলিয়া মনে হয়। সে যেন 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর রঘু-দুহিতারই আর একটা রূপ। জয়সিংহের প্রতি তাহার প্রেমের পূর্ব-পর উদ্ভব ও পরিণতি নাই, আবেগের স্পন্দন নাই, চিত্তদ্বন্দ্ব নাই। ... প্রেম ও মানবতার মধ্যেই যে জীবনের সার্থকতা, তাহার ইঙ্গিত দিবার জন্যই যেন তাহার সৃষ্টি।"[১৫৮] অপর্ণার শক্তি অপরিমেয়। সে নিজে সনাতনী নিয়ম ভাঙ্গার উদযোগ করে নি। বনের পাখির মতো গান গেয়েছে। শুনে যাদের মনে দাগ কেটেছে তারাই করেছে সরব সংগ্রাম। এ দিক দিয়ে বলা যায় অপর্ণা চরিত্রটি সমাজের মনন গঠনে

শক্তিশালী প্রভাবক। "অপর্ণা চরিত্রের সঙ্গে শুধু অপর্ণা আসে নি, এই নামকরণের মধ্য দিয়ে প্রচ্ছন্নভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে অপর্ণাই দেবী ত্রিপুরেশ্বরী।"[১৫৯]– অশ্রুকুমার সিকদারের এ কথা মেনে নেওয়া যায় না। গোবিন্দমানিক্য বলেছেন বটে বালিকার বেশ ধরে দেবী এসে তাঁকে বলেছেন, জীবরক্ত তাঁর সহে না। কিন্তু অপর্ণা দেবী নয়। অপর্ণা সম্পূর্ণভাবে রবীন্দ্রনাথের মানস-বোধ। অপর্ণা প্রকৃতি, যে মানুষের মনের উপরে প্রভাব ফেলতে পারে। যার মধ্যে অসীমের শক্তি বিদ্যমান। সেই শক্তিই ধর্মের নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন, ""বিসর্জন" আমাদের ধর্মের একটা অর্থবিহীন নিষ্ঠুর সংস্কার ও আচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ, আর এই প্রতিবাদ প্রথম দেখা দিয়াছে একটি বালিকার ক্ষীণ কণ্ঠ হইতে।"[১৬০] এই বালিকাকে তিনি 'আইডিয়ার রসমূর্তি' বলেছেন– "অপর্ণা একটি আইডিয়ার রসমূর্তি, কোনও জীবনের বিকাশ নয়, রক্তমাংসের একটি মানবকন্যার রূপ তাহার মধ্যে কোথাও ফুটিয়া উঠে নাই।"[১৬১] জীবনের বিকাশ তার মধ্যে নাই ঠিক, কিন্তু কয়েকটি জায়গায় মানবকন্যার রূপ ফুটেছে। "... মানবঅতিরিক্ত ভাব আবার নাট্যকার অপর্ণাতে সর্বত্র রক্ষা করতে পারেন নি। প্রেমই যার সত্তা সে কি কখনো অভিশাপবাণী উচ্চারণ করতে পারে! শাপশাপান্ত করাতে কি নিতান্ত সাধারণ নারীর ভাবই স্পষ্ট হয়ে ওঠে না? রঘুপতির নির্বন্ধে জয়সিংহ যখন অপর্ণাকে মন্দির ছেড়ে যেতে বলে– তখন অপর্ণাকে আত্মবিস্মৃত হতে দেখি।"[১৬২] এছাড়া, রঘুপতি যখন দেবীর মুখ পিছন দিক করে রাখে তখন অপর্ণার মুখ ঘুরিয়ে জনতার দিকে করে দিয়ে দেবী 'বিমুখ' হন নি প্রমান করে। এটা সক্রিয় মানুষেরই রূপ। "সংস্কারহীন ভিখারিণীর পক্ষে সত্য সহজবোধ্য"[১৬৩] হয়েছে। যা জয়সিংহ বা জনতার পক্ষে সম্ভব হয় নি। "বিসর্জন-এর মধ্যে শুধু বলিদানের বিরুদ্ধে নয়, প্রতিমাপূজার বিরুদ্ধেও যেন একটা প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদ রহিয়াছে। গোবিন্দ মাণিক্য কেবল যে বলিদান বন্ধ করিয়াছেন তাহা নয় প্রতিমার প্রতি যেন ভক্তিও তাঁহার নাই। রঘুপতি নিজের অপরাধ প্রতিমার উপরে চাপাইয়া তাহাকে বিসর্জন দিয়া যেন সর্বদোষমুক্ত হইল, শান্তিলাভ করিল, দেবীর প্রতি তাহার আজন্মবিশ্বাস এবং ভক্তি মিথ্যা বলিয়া বুঝিল।"[১৬৪] – এ দিক দিয়ে অপর্ণা বৌদ্ধের অহিংস ধর্মের বাণী প্রচারক। *সর্বজীবে দয়া*, *জীবহত্যা মহাপাপ* গোবিন্দমাণিক্য-জয়সিংহের বোধে প্রতিষ্ঠিত করেছে, এবং শেষ পর্যন্ত রঘুপতির মধ্যেও যা সঞ্চারিত হয়েছে।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, প্রথমখণ্ড (সুলভ সংস্করণ), পৌষ ১৪১০, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৪৭৯। এরপর বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত 'রবীন্দ্র রচনাবলী' থেকে গৃহীত নাটকের উদ্ধৃতির পাশে শুধু খণ্ডসংখ্যা ও পৃষ্ঠানম্বর উল্লেখ করা হবে।

২. নীহাররঞ্জন রায়, *রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা*, বৈশাখ ১৪১৬, নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা-২৭০

৩. নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩২০

৪. ওয়াসি আহমেদ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথাসাহিত্য, সম্পা. আনিসুজ্জামান, *রবীন্দ্রনাথ, এই সময়ে*, ২০১২, প্রথমা, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৩১

৫. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্র-বিবেচনা*, শ্রাবণ ১৪১২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৬৬

৬. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *আগুন এবং অন্ধকারের নাট্য : রবীন্দ্রনাথ*, ২০০৯, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৫৩

৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মপরিচয়, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, চতুর্দশ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৬৪

৮. শঙ্খ ঘোষ, *কালের মাত্রা ও রবীন্দ্র নাটক*, ২০০৯, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা- ১০৪

৯. আবু সয়ীদ আইয়ুব, *পান্থজনের সখা*, ২০০৬, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৪২

১০. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৪

১১. সত্যেন্দ্রনাথ রায়, *রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের জগৎ*, ২০০৪, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৮৫

১২. নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩২২

১৩. ড. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্র-নাট্য সমীক্ষা রূপক-সাংকেতিক*, ২০০২, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৬৪

১৪. অজিতকুমার চক্রবর্তী, *কাব্যপরিক্রমা*, ১৩৭৪, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৪২

১৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৪

১৬. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা*, ১৩৭৯, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, পৃষ্ঠা-২০২

১৭. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, চতুর্থ খণ্ড, ১৯৯৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃষ্ঠা-২২০

১৮. নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩২১

১৯. প্রমথনাথ বিশী, *রবীন্দ্র নাট্য প্রবাহ*, ২০০৪, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১৯৯

২০.প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৯৬

২১.প্রমথনাথ বিশী, *রবীন্দ্র সরণী*, ১৪১৫, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১৩৭

২২.রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রেম, শান্তিনিকেতন, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, সপ্তম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৩৪

২৩.রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সামঞ্জস্য, শান্তিনিকেতন, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, সপ্তম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৩৭

২৪.রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গুহাহিত, শান্তিনিকেতন, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, অষ্টম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৫০

২৫.প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৫২

২৬.রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সামঞ্জস্য, শান্তিনিকেতন, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, সপ্তম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৩৬

২৭.রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গীতাঞ্জলি, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ষষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৩

২৮.রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গীতিমাল্য, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ষষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৪৭

২৯.সূত্র– প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রজীবনী*, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৪১৭, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৩২১

৩০.আবু সয়ীদ আইয়ুব, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪১

৩১.প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৩

৩২.রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শেষ লেখা, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১২২

৩৩.শঙ্খ ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১০৪

৩৪.প্রমথনাথ বিশী, *রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৯৯

৩৫.অশ্রুকুমার সিকদার, *রবীন্দ্রনাট্যে রূপান্তর ও ঐক্য*, ১৯৯৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৭৩

৩৬.উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-৩২৬

৩৭.রণেন্দ্রনারায়ণ রায়, *নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ*, ১৯৯৩, এ মুখার্জী এ্যাণ্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১৩০

৩৮.উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-৩৬২

৩৯.রণেন্দ্র নারায়ণ রায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৩১-১৩২

৪০.উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-৩৬৯

৪১.প্রমথনাথ বিশী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠ-৪২২

৪২.নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৩৮

৪৩.ড. সাধনকুমার ভট্টাচার্য, *রবীন্দ্র নাট্যসাহিত্যের ভূমিকা*, ২০০৬, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা-২০১

৪৪.প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রজীবনী*, তৃতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫১৬

৪৫.উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-৩৭৫

৪৬.রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গীতাঞ্জলি, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, নবম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫০০

৪৭.সুকুমার সেন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৪৭

৪৮.উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা -৩৭৯

৪৯.রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,*চিঠিপত্র*, সপ্তম খণ্ড, ১৩৯৯, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১৬১

৫০.আবু সয়ীদ আইয়ুব, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৯৪

৫১.প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৯৫

৫২.প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৯৫

৫৩.প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮৪

৫৪.রণেন্দ্রনারায়ণ রায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৩৩

৫৫.প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রজীবনী*, চতুর্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৪৩

৫৬.ড. সাধনকুমার ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা–১৫৭

৫৭.শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা*, প্রথম খণ্ড, ১৪০০, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১৯৭

৫৮.সুকুমার সেন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৯৬

৫৯.শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৯৭

৬০.রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভূমিকা, তপতী, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, একাদশ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৫৭

৬১.ড. সাধনকুমার ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা–১৯৬

৬২.রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সূচনা, চিত্রাঙ্গদা, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২১১

৬৩.উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬০

৬৪.প্রাগুক্ত

৬৫.সুকুমার সেন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২০৩

৬৬.প্রমথনাথ বিশী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৭

৬৭.শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৮৭

৬৮.হুমায়ুন আজাদ, *নারী*, ২০০৭, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১৩৫-১৩৬

৬৯.পম্পা মজুমদার, *রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস*, ২০০৭, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১২৩

৭০.সৌমিত্র শেখর, *চিত্রাঙ্গদা এবং নারীর আত্মমুক্তিসাধনা*, পাণ্ডুলিপি, বিংশ খণ্ড ২০০৬, বাংলা সাহিত্য সমিতি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা-৩৬

৭১.কালী প্রসন্ন সিংহ (অনুবাদ), *মহাভারত*, ১৯৮৭, তুলি-কলম, কলকাতা, পৃষ্ঠা-২৬৫

৭২.প্রমথনাথ বিশী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৫

৭৩. কালী প্রসন্ন সিংহ (অনুদিত), *মহাভারত*, প্রথম খণ্ড, ২০১০, তুলি-কলম, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১৩১

৭৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পঞ্চভূত, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৯২৪

৭৫.প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৯২৬

৭৬.প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রজীবনী*, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৮১

৭৭.রণেন্দ্র নারায়ণ রায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬৭

৭৮.সুকুমার সেন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২০৪

৭৯.প্রমথনাথ বিশী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩০৮

৮০.ড. সাধনকুমার ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা–১৬৯

৮১.নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা–২৯৩

৮২.প্রমথনাথ বিশী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮০

৮৩.শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২০৬

৮৪.প্রাগুক্ত

৮৫.সুনন্দা বড়ুয়া, *বাংলা সাহেত্যে বৌদ্ধ উপাখ্যান*, ১৯৯৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃষ্ঠা-২৪৩

৮৬.মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, *রবীন্দ্রনাথের ধর্ম*, সম্পা. আনিসুজ্জামান, রবীন্দ্রনাথ, ২০০১, অবসর, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১০৯

৮৭.প্রমথনাথ বিশী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৭

৮৮.উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮৯

৮৯.সুকুমার সেন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা–২৩৬

৯০.সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *ধ্রুপদী নায়িকাদের কয়েকজন*, ২০১২, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১৪৯-১৫০

৯১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দশম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৫১

৯২. পিনাকেশ সরকার, রক্তকরবী : প্রেমের বিচিত্র বিচ্ছুরণ, *রবীন্দ্রচর্চার নানা প্রসঙ্গ*, ২০১২, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১৭১

৯৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নাট্যপরিচয়, রক্তকরবী, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, অষ্টম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৫১

৯৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অভিভাষণ, রক্তকরবী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৭১৬

৯৫. ড. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৬

৯৬. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৩৩

৯৭. প্রমথনাথ বিশী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৬০

৯৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৩১

৯৯. শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী, *রক্তকরবী ও অন্যান্য*, ২০১২, সুজন প্রকাশনী, কলকাতা, পৃষ্ঠা- ৬০-৬৬

১০০. বেগম আকতার কামাল, রবীন্দ্রনাথের নাট্যকবিতা ও কাব্যনাট্য : কতিপয় প্রসঙ্গ, *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*, ২০১১, সম্পা. মোবারক হোসেন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃষ্ঠা-২১৬

১০১. সুকুমার সেন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৪৬

১০২. ড. সাধনকুমার ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা–২০০

১০৩. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৬৭

১০৪. রণেন্দ্রনারায়ণ রায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৪

১০৫. স্বরোচিষ সরকার, *অস্পৃশ্যতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ*, ২০০৫, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা-৯৬

১০৬. সৌমিত্র শেখর, তাসের দেশ : রূপকথার রূপকল্পে সমকাল এবং নেতৃত্ব-অন্বেষণ, *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, ত্রয়োবিংশ খণ্ড, ১ম ও ২য় সংখ্যা, জুন ও ডিসেম্বর, ২০০৫, পৃষ্ঠা-২১

১০৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, অষ্টাদশ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩০৯

১০৮. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, রবীন্দ্রনাথের জিজ্ঞাসা, *সাহিত্যের অভিজ্ঞতা*, ২০০০, সময়, ঢাকা, পৃষ্ঠা-২১

১০৯. কনক মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রসাহিত্যে নারী প্রগতি, সম্পা.আনু মাহমুদ, *রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্রচিন্তা ও বিশ্বমানবিকতা*, ২০০৫, গ্রন্থমেলা, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১৭৮

১১০. দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগাযোগ : কুমুর গান, সম্পা. আবুল হাসনাত, *সার্ধশতজন্মবর্ষে রবীন্দ্রনাথ*, কালি ও কলম, সপ্তম বর্ষ : একাদশ সংখ্যা, ১৪১৭, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১৫৪

১১১. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আলোচনা, *এই সময়ে*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৯১-১৯২

১১২. অশ্রুকুমার সিকদার, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৭০

১১৩. সুকুমার সেন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২২০

১১৪. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২২১

১১৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভূমিকা, অরূপরতন, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, সপ্তম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৬১

১১৬. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৯

১১৭. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬৩

১১৮. প্রমথনাথ বিশী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৪৮

১১৯. প্রাগুক্ত

১২০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ধর্ম্মপদ, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৭৫৭

১২১. সন্‌জীদা খাতুন, তাঁর গান, আমার কাছে, *রবীন্দ্রনাথ, তাঁর আকাশ-ভরা কোলে*, ২০০৭, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৭৩

১২২. ড. সাধনকুমার ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা–১৯০

১২৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মপরিচয়, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, চতুর্বিংশ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৭২

১২৪. নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৪৪

১২৫. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রজীবনী*, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৭৫

১২৬. ড. অজিতকুমার ঘোষ, *বাংলা নাটকের ইতিহাস*, ১৪১১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা,পৃষ্ঠা-২৬২

১২৭. প্রমথনাথ বিশী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬৪

১২৮. নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২০৭

১২৯. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৫০

১৩০. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানুষের ধর্ম : রবীন্দ্রনাথ, *উনিশ বিশের কড়চা*, ১৪০৯, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৫৯

১৩১. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৮৯

১৩২. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮০

১৩৩. প্রমথনাথ বিশী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৭

১৩৪. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৬

১৩৫. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১০৫

১৩৬. নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৯৬

১৩৭. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৫৮

১৩৮. ড. সাধনকুমার ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা– ১৯০

১৩৯. নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৪৪

১৪০. রণেন্দ্র নারায়ণ রায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৩

১৪১. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৯০

১৪২. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৩৯

১৪৩. নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৩৪

১৪৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনস্মৃতি, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, নবম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫০০

১৪৫. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৭৩

১৪৬. সুকুমার সেন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৯৩

১৪৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নৈবেদ্য, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, চতুর্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৮১

১৪৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,পথের সঞ্চয়, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬৯২

১৪৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভূমিকা, প্রকৃতির প্রতিশোধ, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৫৯

১৫০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,পথের সঞ্চয়,*রবীন্দ্র রচনাবলী*, নবম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫০০

১৫১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চৈতালি, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৩

১৫২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভূমিকা, বাল্মীকিপ্রতিভা, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৯৫

১৫৩. রণেন্দ্রনারায়ণ রায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮

১৫৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৯৫

১৫৫. ড. সাধনকুমার ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা–১৪১

১৫৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা–১৪২

১৫৭. সুকুমার সেন প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা–১৯৯

১৫৮. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৪১

১৫৯. অশ্রুকুমার সিকদার, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৪

১৬০. নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৭৪

১৬১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৭৭

১৬২. সনজীদা খাতুন, বিসর্জন : রূপান্তর, *রবীন্দ্রনাথ : বিবিধ সন্ধান*, ১৯৯৪, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৩৮

১৬৩. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রজীবনী*, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৮৬

১৬৪. ড. অজিতকুমার ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৬২

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

রবীন্দ্র-নাট্যে নারীচরিত্র : পারস্পরিক তুলনা

একজন মানুষের সঙ্গে অন্য মানুষের চরিত্র আলাদা। কিন্তু কখনো কখনো কোনো বিষয়ে আবার এই আলাদা চরিত্রগুলো বৈশিষ্ট্যে এক হয়ে যায়। আবার একই সম্পর্ক-শিরোনামের চরিত্রের মধ্যেও কিছু পার্থক্য থাকে। চতুর্থ অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নারী চরিত্রগুলোর শ্রেণিবিভাগ করে বিশ্লেষণ করেছি। এখানে দেখেছি বিভিন্ন বিভাগে অনেকগুলো রানি-চরিত্র, বেশকিছু প্রেমিকা চরিত্র, মা-চরিত্র, বালিকা-চরিত্র ইত্যাদি রয়েছে। এরা শিরোনামে এক হলেও আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। আবার আলাদা শিরোনামের হলেও অনেক সময় চরিত্রগত মিল লক্ষ্য করা যায়। তাদের পারস্পরিক আলোচনায় বেড়িয়ে আসে মানবচরিত্রের সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর দিক।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক *রাজা ও রানী*তেই আমরা সুমিত্রার মতো ব্যক্তিত্ববান-প্রজাদরদী রানি পাই। তার চিন্তাচেতনা সম্পূর্ণভাবে প্রজাহিতৈষী। প্রজার কল্যাণের জন্য তিনি জীবন দিয়েছেন। তার পরিণতির পিছনে একটিমাত্র কারণ যে, তিনি নারী হয়ে পুরুষকে অতিক্রম করেছেন। রাজা বিক্রমদেব শত্রুদের ভয় করেছেন, কিন্তু রানি সুমিত্রা ভাইয়ের সাহায্য নিয়ে বন্দী করেছেন শত্রুদের। নারী বন্দী করে এনেছে শত্রুকে – এ ঘটনা মেনে নিতে পারেন নি বিক্রমদেব। তার কাছে মনে হলো এ স্পর্ধা। বিক্রমদেবের কাছে মনে হলো না যে, প্রজার কল্যাণে সুমিত্রা মায়ের ভূমিকা পালন করেছেন। সুমিত্রার সন্তান নেই, তিনি মা নন কিন্তু তার সমস্ত মন জুড়ে প্রজার জন্য মাতৃত্ববোধ অবিচলিত। তিনি বলেছেন :

> ওই শোনো ক্রন্দনের ধ্বনি– সকাতরে
> প্রজার আহ্বান। ওরে বৎস, মাতৃহীন
> নোস তোরা কেহ, আমি আছি– আমি আছি–
> আমি এ রাজ্যের রানী, জননী তোদের। (১খ,পৃ.৪৫৭)

রানি সুমিত্রা তার স্বামীর রাজ্যের প্রজা এবং পিতার রাজ্যের প্রজাদের প্রতি সমান মাতৃত্ব অনুভব করেছেন। বিক্রবদেব যখন তার এবং তার ভাইয়ের সন্ধানের জন্য প্রজাদের বাড়ি-ঘর পুড়িয়ে তাদের হত্যা করে, তখন কোনো উপায় না পেয়ে তিনি জীবন দেন। তুলনামূলকভাবে, এই বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে রানি গুণবতী সুমিত্রার একেবারে বিপরীত চরিত্র। তিনি সন্তান কামনায় দেবীকে প্রসন্ন করতে পশুবলি দিতে চান। এই একটিমাত্র কারণে তিনি নিজের সমস্ত বোধবুদ্ধি বিলীন করে দিয়েছেন, একবারও প্রজার কথা চিন্তা করেন নি। তার ব্যক্তিগত

অনুভূতি রাষ্ট্রকে সংঘাতের দিকে ঠেলে দিয়েছে। স্বামী-সংসার সব কিছু উপেক্ষা করে তিনি দেবীর সামনে পূজো দিতে চান। তিনি কোনো যুক্তি মানেন নি। গোবিন্দমাণিক্যের অহিংসবোধ এবং জীবের প্রতি প্রেমবোধ তাকে স্পর্শ করে নি। একটি সন্তানের জন্য তিনি যেমন পশু বলি দিতে চান, তেমনি মানবশিশু ধ্রুবকেও বলি দিতে চান। এ রকম বিকৃত তার চিন্তা। গুণবতীর এই চিন্তার সঙ্গে শ্যামার ঐক্য রয়েছে। শ্যামা বজ্রসেনকে পাওয়ার জন্য প্রেমিক উত্তীয়কে কোটারের কাছে পাঠান, অবশ্য পরে তার বোধোদয় হয়ে ছুটে যান কারাগারে কিন্তু তখন সময় শেষ হয়ে গিয়েছে। তাই উত্তীয়-হত্যার দায়ভার তারই উপরে পড়ে। একজনকে রক্ষা করতে গিয়ে অন্যজনকে ফাঁসির কাষ্ঠে তুলে দিয়েছেন শ্যামা। গুণবতীর ইচ্ছাও তাই– নিজের সন্তানের আশায় অন্যের সন্তান বলি দিতে চান। গোবিন্দমাণিক্য সিংহাসন ছেড়ে রাজ্য ছেড়ে নির্বাসনে যাচ্ছেন দেখেও গুণবতীর কোনো চিন্তা-আক্ষেপ বা ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি মন্দিরে পশুবলি দিয়ে তারপর নির্বাসনেই যেতে চান। তারমানে কোনো পরিস্থিতিই তাকে নিজের লক্ষ্য থেকে চ্যুত করতে পারে না। গুণবতী সম্পূর্ণ 'অমানুষ' চরিত্র। "সুমিত্রা রানীর মর্যাদা রক্ষার জন্য, রাজ্যশ্রীর সম্মানের জন্য আত্মত্যাগ করিল; গুণবতী নারীর অন্ধ instinct- কে চরিতার্থ করিবার জন্য প্রলয়ংকরী মূর্তি ধারণ করিতে পরাঙ্মুখ হইল না।"[১] সুমিত্রা তাই যতোটা মহৎ, গুণবতী ততটাই হিংস্র চরিত্র। সুমিত্রা রাজার ভালোবাসার চেয়ে রাজকর্তব্য বেশি বড়ো মনে করেছেন, গুণবতী রাজার ভালোবাসার সুযোগ নিতে চেয়েছেন। সুমিত্রার সঙ্গে এখানে সুরমার তুলনা চলে। সুরমাও উদয়াদিত্যের নিজের কাছে থাকার চেয়ে প্রজার কাজে পরগণায় থাকাটা যুক্তিযুক্ত মনে করেন। সুমিত্রা রাজনীতি সচেতন এবং অস্তিত্বশীল নারী, গুণবতী ধর্মনিষ্ঠ এবং নিজের মহিষী-দম্ভে অহংকৃত নারী। মহিষী লোকেশ্বরীও ধর্মনিষ্ঠ মা-চরিত্র। তবে তিনি গুণবতীর মতো কর্তব্যহীন, যুক্তিহীন, দাম্ভিক নন। নিজের সন্তান ভিক্ষু হয়ে চলে গেছেন, রক্তপাত এড়াতে স্বামী বিম্বিসার সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে রাজপুরী ছেড়েছেন। এই অবস্থায় দিশেহারা হওয়া তার জন্য খুবই স্বাভাবিক। তারপরও তিনি ধৈর্য ধরেছেন এবং বৌদ্ধের অহিংসানীতিতে স্থির হয়েছেন। সন্তানকে ফিরে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় কর্তব্যবুদ্ধি বিসর্জন দেন নি, দিকবিদ্বিক জ্ঞানশূন্য হয়ে অন্যের অনিষ্ট করেন নি। কিংবা ব্রাহ্মণ দেবদত্তের মতো কারো সঙ্গে মিলিত হয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন নি। পুরো নাটকে লোকেশ্বরীর মানসিক দ্বন্দ্ব দেখি। তিনি অন্তরে প্রবলভাবে 'অহিংস' ধর্মকে ভালোবাসেন, অন্যদিকে সন্তান হারানোর কষ্টে জর্জরিত। এই দুইয়ের মধ্যে তার জীবন পিষ্ঠ হয়েছে। এ কারণে তিনি কখনো বৌদ্ধধর্মের বিপক্ষে কথা বলেছেন, কখনো নিজের অন্তরের সত্য উপলব্ধিতে বৌদ্ধধর্মের পক্ষে কথা বলেছেন। উভয়দিকের যুক্তিতেই তিনি প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি ক্ষত্রিয়ের পক্ষে কথা বলেন এভাবে–

> তা হলে নির্দয়তা করবার গুরুতর কাজ গ্রহণ করবে কে? কেউ যদি না করে তবে বীরভোগ্যা বসুন্ধরার কী হবে গতি? যত-সব মাথা-হেঁট-করা উপবাসজীর্ণ ক্ষীণকণ্ঠ মন্দাগ্নিম্লান নির্জীবের হাতে তার দুর্গতির কি সীমা থাকবে? (৯খ,পৃ.২৩৩)

দেশ-রক্ষা সম্পর্কে এ কথা উপেক্ষা করার নয়। রাজনৈতিজ্ঞের মতোই তার এ বাণী। সে সময় দেশরক্ষায় ক্ষত্রিয়ের বিকল্প কেউ চিন্তা করতে পারেন নি। আবার তিনি বৌদ্ধ ধর্মের পক্ষে যখন বলছেন, তখন বুঝিয়ে দেন, কত গভীর সে ধর্মের মূল।

> দুর্বলের ধর্ম মানুষকে দুর্বল করে। দুর্বল করাই এই ধর্মের উদ্দেশ্য। যত উঁচু মাথাকে সব হেঁট করে দেবে। ব্রাহ্মণকে বলবে সেবা করো, ক্ষত্রিয়কে বলবে ভিক্ষা করো। এই ধর্মের বিষ অনেক দিন স্বেচ্ছায় নিজের রক্তের মধ্যে পালন করেছি। সেইজন্যে আজ আমিই একে সব চেয়ে ভয় করি। (৯খ,পৃ.২৩৩)

আপাতদৃষ্টিতে বিপক্ষের কথা মনে হলেও, মা যেমন সন্তানকে প্রশ্রয়ের গালি দেন– এও তেমনি। – এমনি দুদিকের জোড়ালো যুক্তির মানসিক অবস্থায় লোকেশ্বরী বিধ্বস্ত হয়েছেন। কিন্তু কোনো অঘটন ঘটান নি। জনসমাগমের বাইরে নিভৃতে নিজের মনে ভালো-মন্দ বিচার করেছেন। এবং শেষ পর্যন্ত সত্যধর্মের পক্ষে স্থির হয়েছেন। "এই নারী মহা-প্রজাবতী গৌতমী, রাহুলমাতা যশোধারা প্রভৃতি আত্মত্যাগী নারীর প্রতিভূ। তাঁদের জীবন দ্বন্দ্ব এই নারীর চরিত্রকেও দোলায়িত করেছে। লোকেশ্বরীর জ্বালা যন্ত্রণা নাটকের প্রতিটি সোপান বেয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে। নাটকের শেষপ্রান্তে এসে দেখি লোকেশ্বরী তাঁর কর্তব্যে স্থির, আত্মবিশ্বাসে অকল্পিত।"[২]এর তুলনায় গুণবতী নিজের চিন্তায় একেবারে সরলরৈখিক। নিজের মনে ভালো-মন্দ যুক্তি-তর্ক করেন নি। একরোখাভাবে নিজের ইচ্ছা চরিতার্থ করতে চেয়েছেন। তার কাছে স্বামীর ভালোবাসা, জীবের প্রাণের প্রতি মমত্ব, মানবশিশুর প্রতি সহৃদয়তা– সবকিছুই অর্থহীন। তিনি শুধু নিজের গর্ভে একটি শিশু ধারণ করতে চান এবং রাজপরিবারে সেই শিশুর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে চান।

সুমিত্রা এবং গান্ধারী সমগোত্রীয় রানি চরিত্র। দুজনেই ন্যায়ের পক্ষে কথা বলেছেন। সুমিত্রার স্বামী প্রজাদের ন্যায্য অধিকার দিচ্ছেন না। গান্ধারীর স্বামী ধৃতরাষ্ট্র নিজের সন্তানের অন্যায় মেনে নিয়ে ন্যায়ের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন– পাণ্ডবদের নির্বাসনে পাঠিয়েছেন। সুমিত্রা এবং গান্ধারী দুজনেই তাদের নিজ নিজ স্বামীকে সংশোধন করার চেষ্টা করেছেন এবং দুজনেই ব্যর্থ হয়েছেন। এক্ষেত্রে সুমিত্রার পদক্ষেপ সক্রিয়। তিনি সরাসরি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। সুমিত্রার মতো গান্ধারী সাহসী হয়ে নিজে কোনো উপায় বের করার দুঃসাহস দেখান নি। কেবলমাত্র ধৃতরাষ্ট্রের কাছে আর্তি জানিয়েছেন–

> মাতা আমি নহি? গর্ভভারজর্জরিতা
> জাগ্রত হৃদপিণ্ডতলে বহি নাই তারে?

স্নেহবিগলিত চিত্ত শুভ্র দুগ্ধধারে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে নাই দুই স্তন বাহি
তার সেই অকলঙ্ক শিশুমুখ চাহি?
শাখাবন্ধে ফল যথা সেইমত করি
বহু বর্ষ ছিল না সে আমারে আঁকড়ি
দুই ক্ষুদ্র বাহুবৃন্ত দিয়ে– লয়ে টানি
মোর হাসি হতে হাসি, বাণী হতে বাণী,
প্রাণ হতে প্রাণ? তবু কহি, মহারাজ,
সেই পুত্রদুর্যোধনে ত্যাগ করো আজ। (৩খ,পৃ.৮৫)

– নিজের মনের যন্ত্রণা চেপে রেখে সন্তানকে নির্বাসনে পাঠাতে বলেছেন গান্ধারি। ন্যায়ের পক্ষে সমস্ত যুক্তি উপস্থাপিন করেছেন। আতাউর রহমান বলেছেন : "*গান্ধারীর আবেদন* নাট্যের প্রতি আমি আকৃষ্ট হই গান্ধারীর ঋজু চরিত্রশক্তির জন্য, শ্রেয়োবোধের স্বপক্ষে নারীর এমন দার্ঢ্য ও শক্তিরূপ দর্শন, ইতিহাস ও সাহিত্যে বিরল।"[৩] আতাউর রহমানের এই মন্তব্য গান্ধারী চরিত্র মূল্যায়নে যথাযথ। এরপর গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রকে টলাতে না পেরে দ্রৌপদীকে আশীর্বাদ করে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। তবে, গান্ধারীর আশীর্বাদের আরেকটি কারণ হলো, তার সন্তানের যেন অমঙ্গল না ঘটে। এ ক্ষেত্রে বোঝা যাচ্ছে, গান্ধারি তাই শেষ পর্যন্ত মাতৃত্বের গণ্ডি অতিক্রম করতে পারেন নি। অন্যদিকে সুমিত্রা স্ত্রীর গণ্ডি অতিক্রম করেছেন অনায়াসে। কারণ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের অজুহাতেও রাজার কাছে এসে পরাজয় স্বীকার করে ধরা দেন নি তিনি। তিনি দেশের সম্মানের প্রতি এতোই বিবেকবান। অন্যদিকে, রানি সুদর্শনা প্রজাসাধারণের কথা কিছু চিন্তা করেন নি, চিন্তা করেন নি নিজের পিতৃকূলের কথাও। তার ব্যক্তিগত রূপজমোহের কারণে রাজপুরীতে এবং তার পিতার রাজ্যে বিপর্যয় নেমে আসে। ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব এবং ব্যক্তিগত প্রাপ্তি তার চারিত্রিক ঘটনার মূল বিষয়। দুর্বিষহ জীবনযাপনের পর তিনি সত্যপ্রেমের সন্ধান পেয়েছেন। অন্যদিকে সুমিত্রা দুর্বিসহ জীবনযাপনের পর মৃত্যুকে বরণ করে বিক্রমদেবকে সত্যের সন্ধান দিয়েছেন। "প্রিয়তমের প্রেমেই প্রিয়তমকে ছাড়িয়া যাইতে হইল, পরিপূর্ণ প্রেমজ্যোতির অরুণালোকের মধ্যে তাহার স্বামীকে বাঁচাইবার জন্য তাহাকে আত্মদান করিতে হইল।"[৪] রবীন্দ্র-নাট্যের আরেকটি রানি চরিত্র *মালিনী* নাটকের মহিষী। তার চরিত্রের দ্বন্দ্ব লোকেশ্বরীর সঙ্গে কিছুটা এক রকম। মহিষীর মেয়ে মালিনী রাজ্যে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করছেন। তা নিয়ে রাজ্যের ব্রাহ্মাণরা অসন্তোষ্ট হয়ে মালিনীর নির্বাসন দাবী করে। এ সময় রাজাও দিশাহারা হয়ে পড়েন। এই রকম পরিস্থিতিতে মহিষীর ভূমিকা খুব বুদ্ধিদীপ্ত এবং যুক্তিপূর্ণ। অন্য রানিদের নিজেদের প্রত্যক্ষ ঘটনা ছিলো। সেই ঘটনায় তারা ভূমিকা রেখেছেন। এখানে মহিষীর প্রত্যক্ষ ঘটনা নয়, কন্যার ধর্মবোধ এবং

রাজ্যের ব্রাহ্মণদের মধ্যে দ্বন্দ্ব। সেখানে তাকে নিজস্বতা প্রমাণ করতে হয়েছে। প্রথমত, মহিষী মেয়েকে দেখে মুগ্ধ, কারণ তার মনে নিরাভরণ ধার্মিক মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা আছে। তার নিজের পিতাকে তার পিতৃব্য পিতৃধন থেকে বঞ্চিত করেছিল। তখন তার পিতা শুধুমাত্র পৈতৃক দেবতামূর্তি শালগ্রামশিলা নিয়ে দরিদ্রকুটিরে ধার্মিক জীবনযাপন করতেন। ধার্মিক হিসেবে তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ এবং স্বনামধন্য। নিজপিতার সেই সৌম্যমূর্তির প্রতি যে মুগ্ধতা, মেয়ে মালিনীকে দেখেও তার সেই মুগ্ধতা। তিনি বলেন :

কে তোমারে বোঝে
মা আমার! কথা শুনে জানি না কেন যে
চক্ষে আসে জল। যেদিন আসিলি কোলে
মায়েরে ব্যাকুল করি, কে জানিত তবে
বাক্যহীন মূঢ় শিশু, ক্রন্দনকল্লোলে
সেই ক্ষুদ্র মুগ্ধ মুখ এত কথা কবে
দুই দিন পরে। থাকি তোর মুখ চেয়ে,
ভয়ে কাঁপে বুক। ও মোর সোনা মেয়ে, (২খ,পৃ.৩১৭)

এই পর্যন্ত সংলাপে তার মুগ্ধতা প্রকাশ পায়। এরপরই তিনি শঙ্কা প্রকাশ করেন–

এ ধর্ম কোথায় পেলি, কী শাস্ত্রবচন?
আমার পিতার ধর্ম সে তো পুরাতন
অনাদি কালের। কিন্তু মা গো, এ যে তব
সৃষ্টিছাড়া বেদছাড়া ধর্ম, অভিনব
আজিকার-গড়া। কোথা হতে ঘরে আসে
বিধর্মী সন্ন্যাসী? দেখে আমি মরি ত্রাসে।
কী মন্ত্র শিখায় তারা, সরল হৃদয়
জড়ায় মিথ্যার জালে? লোকে না কি কয়
বৌদ্ধেরা পিশাচপন্থী, জাদুবিদ্যা জানে,
প্রেতসিদ্ধ তারা। (২খ,পৃ.৩১৭)

বৌদ্ধধর্মের প্রতি সামাজিকভাবে এক ধরনের ভীতি আছে। এই ভীতিতে ভীত মহিষী। কিন্তু এ নিয়ে কোনো মানসিক দ্বন্দ্ব তার মধ্যে বিস্তার লাভ করে নি। তিনি বলেছেন, এবং একটি সরল-সাধারণ-সনাতনধর্মোচিত সমাধান দিয়েছেন। অবশ্য তার সমাধান অনেকটা কৌশলগত। বলেছেন :

শিবপূজা করো দিনযামী
বর মাগি লহো, বাছা, তাঁরি মতো স্বামী।
সেই পতি হবে তোর সমস্ত দেবতা,
শাস্ত্র হবে তাঁরি বাক্য, সরল এ কথা। (২খ,পৃ.৩১৭)

মেয়ের প্রতি এমনি করে নিজের ভূমিকা এগিয়েছেন– কোনো জোর-জবরদস্তি করেন নি। আবার নিজেও কোনো দুঃশ্চিন্তায় ভোগেন নি। ব্রাহ্মাণরা যখন মালিনীর নির্বাসন চেয়েছে, তখন মহিষীর চরিত্রের বলিষ্ঠতা দেখা যায়। রাজার রাজনীতি এবং ব্রাহ্মণের ধর্ম নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। তবে, তিনি ভোলেন না যে মালিনীকে সংসারী করলে সকল অমঙ্গল-আশঙ্কা কেটে যাবে। বিয়ে-সংসার এবং সন্তানে যে মালিনীর মুক্তি– এ ধারণা মহিষীর বদ্ধমূল। মালিনীর সম্পর্কে অন্য কারো সিদ্ধান্ত তিনি মেনে নেন না। কি রাজার কি প্রজার। হয়তো মালিনীর মধ্যে নিজ পিতার প্রতিচ্ছবি খুঁজে পান তাই। তার পিতার ধর্মের সঙ্গে মালিনীর ধর্ম আলাদা হলেও সততায় এবং নিষ্ঠায় তারা এক। তাই সন্তানস্নেহের সঙ্গে যোগ হয়েছে পিতৃবোধ। সঙ্গত কারণে, মনের গহণে মেয়েকে তিনি সমীহও করেন। রবীন্দ্র-নাট্যে সমস্ত রানি চরিত্রের মধ্যে *মালিনী*র মহিষী চরিত্রটি একেবারে আলাদা। মহিষীর যেন কোনো ধর্মের প্রতি গাঢ় বিশ্বাস নেই। লোকেশ্বরী বৌদ্ধ ধর্মে স্থির হয়েছেন, গুণবতী দেবী কালীর ক্ষমতা সম্পর্কে অবিচল ছিলেন, অন্যদিকে মহিষী প্রচলিত কোনো ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করেন নি। আদি ধর্মকে আকড়ে থাকার জন্য মালিনীকে চাপ দেন নি, পীড়াপীড়ি করেন নি এমনকি বলেনও নি। বৌদ্ধধর্মকে তিনি পিশাচপন্থী বলে আশংকা করেছেন, কিন্তু সেখান থেকে সরানোর জন্য কোনো ব্যবস্থা নেন নি। দেখাযাচ্ছে, ধর্মরক্ষা বা ধর্মত্যাগ নিয়ে তার কোনো চিন্তাই নেই। তার কাছে সংসারধর্ম প্রকারান্তরে নারীধর্মই মূখ্য। আবার, এর জন্যও তিনি কোনো বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেন নি। অন্য রানিদের ক্ষেত্রে দেখেছি, তারা নির্দিষ্ট কোনো বিষয় নিয়ে সংগ্রাম করেছেন, দ্বন্দ্বে ভুগেছেন। মহিষীর সে সব কিছু নেই। মহিষী কোনো কিছু চেয়েছেন, এবং তা মালিনীকে বা রাজাকে বলেছেন। তাও খুব জোরালোভাবে নয়। তবে, তার জোরালোভাবে রয়েছে মাতৃত্ব-অধিকারের অহংকার। সুমিত্রা প্রজাদের মঙ্গলের অধিকার চেয়েছেন, মহিষী মালিনীকে শুধুমাত্র নিজের অধিকারে রাখতে চেয়েছেন, অন্য কারো এমনকি রাজার খবরদারী বা শাসনও পছন্দ করেন নি। অন্যদিকে সুমিত্রা প্রজাদেরকে নিজের সন্তান মনে করেন। তাই তিনি প্রজার প্রতি বিদেশী শাসকদের শাসন মেনে নেননি। মহিষী এবং সুমিত্রার এই সন্তানপ্রিয়তা অনেকটা একসূত্রে গাঁথা। সুমিত্রা শুধু প্রজাদরদীই নন, প্রেমময়ীও। সুমিত্রার এই বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে ইলার ঐক্য রয়েছে। "ইলা ও সুমিত্রা দুজনেই প্রেমে অবিচল, একনিষ্ঠ, এবং দুজনেই নিজেদের সকল ভোগ ও সহজ আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিয়া এবং সুমহান ত্যাগকে বরণ করিয়া নিজের এবং নিজের প্রিয়তমের জীবনকে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।"[৫] এ

ক্ষেত্রে সুমিত্রার ত্যাগ ইচ্ছাকৃত, ইলার ত্যাগ বাধ্যগত। সুমিত্রা প্রজাধর্মে বিশ্বাসী, ইলাও তাই। এ কারণেই কুমারসেন কর্তব্যপালনের জন্য বিয়ে স্থগিত রেখে যুদ্ধে গেলে, তিনি আপত্তি করেন না, অনুমতি দেন। কুমারকে আটকানোর চেষ্টা করেন না। তবে তিনি সুমিত্রার মতো প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অবতীর্ণ হন নি। এখানে তাদের পার্থক্য। আর সবচেয়ে বড়ো পার্থক্য হলো, সুমিত্রা মৃত্যুর মধ্য দিয়ে কষ্টের অবসান ঘটিয়েছেন। ইলার দুর্ভাগ্য, তিনি কুমারের স্মৃতি বুকে নিয়ে কষ্টভোগের জন্য বেঁচে রইলেন।

সুমিত্রা এবং চিত্রাঙ্গদার প্রজাহিতৈষীর বৈশিষ্ট্যে কিছু মিল রয়েছে। তারা আবেগের চেয়ে কর্তব্যকে বড়ো মনে করেছেন। প্রজার স্বার্থের ব্যাপারে কোনো আপোষ বা গাফিলতি করেন নি। বিক্রমদেবের প্রেমে প্রজাকে ভোলেন নি সুমিত্রা, আবার অর্জুনের প্রেমে মোহিত হয়ে প্রজাকে অরক্ষিত রেখে প্রেমলীলায় থাকেন নি চিত্রাঙ্গদা। চিত্রাঙ্গদা অর্জুনের কাছে আসার সময় শত্রুর পথে প্রহরী বসিয়েছেন, প্রজার নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছেন। প্রজার জন্য সুমিত্রা সংসার ছেড়েছেন, চিত্রাঙ্গদা অর্জুনের সঙ্গে সংসারে জড়ান নি। সুমিত্রা মৃত্যুর আগে জেনে যেতে পারেন নি বিক্রমদেবের মানসপরিবর্তনের কথা– পরিমিত ভালোবাসার কথা। চিত্রাঙ্গদা নিজের চেহারায় ফিরে এসেও জেনেছেন অর্জুন তাকে পেয়ে ধন্য হয়েছেন। দেবযানীকেও কচ বর দিয়েছেন সমস্ত গ্লানি ভুলে সুখী হওয়ার জন্য। বেঁচে থেকে দেবযানী সুখী হবে কি না তার নিশ্চয়তা নেই, সুমিত্রা পরম দুঃখেই প্রাণত্যাগ করেছেন। তবু তিনি বিক্রমদেবের সঙ্গে আপোষ করেন নি। এই রকমভাবে আমরা দেখি, মায়ের অনুরোধ সত্ত্বেও প্রচলিত ধর্মের সঙ্গে আপোষ করেন নি প্রকৃতি। বলেছেন :

কেন দিব ফুল, কেন দিব ফুল
কেন দিব ফুল আমি তারে–
যে আমারে চিরজীবন
রেখে দিল এই ধিককারে। (১৩খ,পৃ.১৭১)

প্রচলিত ধর্মে অস্পৃশ্যতার অবসান ঘটাতে চেয়েছেন প্রকৃতি। প্রকৃতি আরো বলেছেন :

আমি চণ্ডালী, সে যে মিথ্যা, সে যে মিথ্যা,
সে যে দারুণ মিথ্যা।
শ্রাবণের কালো যে মেঘ
তারে যদি নাম দাও 'চণ্ডাল',
তা ব'লে কি জাত ঘুচিবে তার,
অশুচি হবে কি তার জল।
তিনি ব'লে গেলেন আমায়–

নিজেরে নিন্দা কোরো না,

মানবের বংশ তোমার,

মানবের রক্ত তোমার নাড়ীতে। (১৩খ,পৃ.১৭৫)

"বস্তুত প্রকৃতিনাম্নী চণ্ডালিনীর ভনিতায় এ বক্তব্য স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের।"[৬] এ রকমভাবে সংকীর্ণধর্মের উর্ধ্বে উঠে মানবধর্মের জয় ঘোষণা রবীন্দ্রনাথের বোধগত বৈশিষ্ট্য। এ কথা স্বীকৃত যে, "রবীন্দ্রনাথ নিজেকে সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখেন নি।"[৭] সীমাকে অতিক্রম করে নিজস্ব এক মানবিক বোধে তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত। এ বৈশিষ্ট্যেই সৃষ্ট অমাবাই। অন্যদিকে মালিনী রাষ্ট্রে আনতে চেয়েছেন বৌদ্ধধর্ম। কুমুদিনী পারিবারিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। অর্থাৎ এরা সকলেই পরিবর্তন চেয়েছেন। তেমনি রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তন চেয়েছেন নন্দিনী এবং সুমিত্রা। মহিষী লোকেশ্বরী ব্রাহ্মণ্যধর্মের পরিবর্তে বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠা চেয়েছেন, কিন্তু রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তন চান নি। তিনি মনে করেছেন, রাজা বিম্বিসার একই সঙ্গে রাজধর্ম এবং বৌদ্ধধর্ম পালন করবেন, রাজপুত্র সংসারে থেকে যথা নিয়মে রাজা হবেন। তাই বিম্বিসার এবং রাজপুত্র রাজ্য ছাড়লে তিনি দিশেহারা হয়ে ওঠেন। এবং নিজের মনে দীর্ঘ দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে সত্যধর্মে উপনীত হন। 'মা'এবং 'মহিষী'র ভূমিকায় লোকেশ্বরীর চেয়েও তীব্র দ্বন্দ্বে ভুগেছেন কুন্তী। রবীন্দ্র-নাট্যের সকল মা চরিত্রের মধ্যে কুন্তী চরিত্রটি সবচেয়ে দ্বন্দ্বময় এবং অসহায়। একদিকে কুমারী মাতার লজ্জাজনক অধ্যায়, অন্যদিকে স্বীকৃতহীনসন্তান কর্ণ দ্বারা স্বীকৃতসন্তান পঞ্চপাণ্ডবের নাশ। অতঃপর কুন্তী কর্ণকে জানিয়েছেন যে, কর্ণই তার প্রথম সন্তান। লোকলজ্জায় কর্ণকে তিনি শিশু অবস্থায় ত্যাগ করেছিলেন। তিনি বলেন :

যবে মুখে তোর

একটি ফুটে নি বাণী তখন কঠোর

অপরাধ করিয়াছি– বৎস, সেই মুখে

ক্ষমা কর কুমাতায়। সেই ক্ষমা বুকে

ভর্ৎসনার চেয়ে তেজে জ্বালুক অনল,

পাপ দগ্ধ ক'রে মোরে করুক নির্মল। (৩খ,পৃ.১৪৯)

সন্তানের কাছে মায়ের এই ক্ষমা ভিক্ষা, কোনো মা চরিত্রেই নেই। কিন্তু কর্ণ পাণ্ডব পক্ষে না আসায়, কুন্তী চিরবিরহীই থাকেন। কুন্তী এবং লোকেশ্বরী কেউ-ই সন্তানকে আর আপন করে পান নি।

লোকেশ্বরীর মতো বৌদ্ধধর্মের অনুসারী শ্রীমতী এবং মালিনী। তবে তারা লোকেশ্বরীর মতো দ্বন্দ্বে ভোগেন নি। শ্রীমতী ত্যাগ করেছেন নিজের নটীজীবন, মালিনী ত্যাগ করেছেন রাজ-ঐশ্বর্য। লোকেশ্বরীর মানসদ্বন্দ্ব দূর করার জন্য শ্রীমতীকে জীবন দিতে হয়েছে। শ্রীমতীর ধর্মবোধ এতো দৃঢ়। মালিনীর ধর্মবোধও দৃঢ়। প্রজাবিদ্রোহের মুখে

তিনি নির্বাসনে যেতে চেয়েছেন। কিন্তু সুপ্রিয়র সান্নিধ্য তাকে সাধারণ নারীর প্রেমবোধে পৌঁছে দেয়। তাই বলা যায়, লোকেশ্বরী শ্রীমতী মালিনী তিনজন বৌদ্ধধর্মের অনুসারী হলেও তাদের মানসবোধে পার্থক্য স্পষ্টভাবে রয়েছে।

রেবতী ও গান্ধারীর পারিবারিক পরিবেশ এবং রাজনৈতিক ঐতিহ্য প্রায় এক কিন্তু তারা ভিন্ন স্বভাবের মানুষ। রেবতীর স্বামী রাজভ্রাতা চন্দ্রসেন। নাবালক পুত্র কুমারসেনকে রেখে রাজা মারা গেলে ভ্রাতুষ্পুত্র সাবালক হওয়া পর্যন্ত চন্দ্রসেন রাজ্যক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। এরপর তিনি কুমারসেনকে রাজ্য দিতে গরিমষি করেন। প্রায় একই রকমভাবে গান্ধারীর স্বামী ধৃতরাষ্ট্র স্বয়ং রাজা। তিনি ছোটো ভাই পাণ্ডুর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী পাঁচ ছেলে এবং ছেলেদের স্ত্রী দ্রৌপদীর প্রতি অবিচার করেন। অবস্থান এক হলেও, রেবতী এবং গান্ধারী বিপরীতমুখী চরিত্র। রেবতী কুমারসেনকে বঞ্চিত করার জন্য চন্দ্রসেনকে প্ররোচিত করেন। বিক্রমদেবের সঙ্গে কুমারসেনকে বন্দী করার ষড়যন্ত্র করেন। চন্দ্রসেন কুমারসেন এবং সুমিত্রার প্রতি এতোটুকু স্নেহার্ত হলে রেবতী কৌশলে তাতে বিষ ঢেলে দেন। চন্দ্রসেন এবং রেবতীর কথোপোকথনে রেবতীর মানসজগৎ বোঝা যাবে–

চন্দ্রসেন। তোমার নিষ্ঠুর বাক্য শুনে দয়া হয়
কুমারের 'পরে– প্রাণে বাজে, ইচ্ছা করে
ডেকে নিয়ে বেঁধে তারে রাখি বক্ষোমাঝে,
স্নেহ দিয়ে দূর করি আঘাতবেদনা।
রেবতী। শিশু তুমি! মনে কর আঘাত না ক'রে
আপনি ভাঙিবে বাধা? পুরুষের মতো
যদি তুমি কার্যে দিতে হাত, আমি তবে
দয়ামায়া করিতাম ঘরে ব'সে ব'সে
অবসর বুঝে। এখন সময় নাই। (১খ,পৃ.৫০১)

এতোটাই নিষ্ঠুর রেবতীর মন। এরপর কুমারের ছিন্ন মাথা এবং সুমিত্রার মৃত্যু দেখেও রেবতীর মনে এতোটুকু কষ্টের উদয় হয় না। বরং চন্দ্রসেন রেবতীর প্রতি রোষান্বিত হলে রেবতী মনে করেন চন্দ্রসেনের এ রোষ চিরস্থায়ী হবে না– সন্তানসহ তার সুসময় ফিরে আসবে। অন্যদিকে, ধৃতরাষ্ট্রের সামনে দুর্যোধন অন্যায়ভাবে পঞ্চপাণ্ডবকে নির্বাসনে পাঠাচ্ছে দেখে গান্ধারী নিজপুত্র দুর্যোধনকে ত্যাগ করার আর্জি পেশ করেন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে। তিনি চান দুর্যোধনকেও পাণ্ডবদের সঙ্গে নির্বাসনে পাঠাতে। দ্রৌপদীকে অপমান করার শাস্তিও তিনি দাবী করেন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে। দেখাযায়, রেবতী যতটা নীতিহীন গান্ধারী ততটাই নীতিবান। রেবতীর নিষ্ঠুরতা বধ্যভূমির জল্লাদকেও হার মানায়; গান্ধারী ন্যায়ের প্রতি দয়াবান এবং অন্যায়ের প্রতিও রেবতীর মতো নিষ্ঠুর হতে পারেন না।

গান্ধারী এবং রমাবাই চরিত্রের কিছু ঐক্য এবং দ্বন্দ্ব রয়েছে। দুজনেই নিজেদের আদর্শে অবিচল। তাদের সমস্যা সন্তান নিয়ে। তাদের সন্তানরা ধর্মের অবমাননা করেছেন। তারা সন্তানের উপর নিজের বোধের প্রকাশ দেখতে চেয়েছেন। তবে, গান্ধারী এবং রমাবাইয়ের ধর্মাদর্শে দ্বন্দ্ব রয়েছে। গান্ধারীর আদর্শ নীতিধর্ম; রমাবাইয়ের আদর্শ হিংস্রব্রাহ্মাণ্যধর্ম। গান্ধারী নিজের মনের স্বাভাবিক স্নেহকে বিসর্জন দিতে পারেন নি, রমাবাই স্বাভাবিক স্নেহকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন। প্রমথনাথ বিশী বলেছেন : "ধর্মাদর্শের ভেদ ছাড়িয়া দিলে গান্ধারী ও রমাবাই চরিত্রে মৌলিক ঐক্য আছে; দ্বন্দ্বহীন, কৃতনিশ্চয়, স্থিরপন্থা, অনমনীয়, প্রবল ইচ্ছাশক্তিময়ী এই দুই রমণী।"[৮]– এ মন্তব্যে একটি বিষয়ে দ্বিমত আছে, তা হলো গান্ধারী দ্বন্দ্বহীন নন, গান্ধারীর মনের দ্বন্দ্ব আমরা উপরের আলোচনায় দেখেছি। এছাড়া, অন্য বৈশিষ্ট্যগুলোর ঐক্য রয়েছে। ভারতবর্ষের বিশাল রাজনৈতিক জটিলতা গান্ধারীর জীবনকে জটিল করেছে। রমাবাইয়ের জীবনে প্রভাব ফেলেছে তারই নিজস্ব ধর্মবোধ, তাই তার ক্ষেত্র সংকীর্ণ। এই সংকীর্ণ ক্ষেত্রেই তিনি হিংস্র হয়েছেন প্রবলভাবে। কন্যা অমাবাইকে জীবন্ত চিতায় তুলে হত্যা করেছেন। অন্যদিকে গান্ধারীর সঙ্গে দুর্যোধনের দেখাই হয় নি। তিনি আবেদন জানিয়েছেন স্বামী ধৃতরাষ্ট্রের কাছে। তার হিংস্রতা নেই তবে বাক্যবাণ প্রবলতর।

মা-চরিত্রের মধ্যে মাসী এবং চণ্ডাল-বধূর মাতৃজীবনে মিল আছে খুব কম পরিমাণে। অন্যায় জেনেও মাসী মিথ্যা বলে অসুস্থ যতীনকে ভুলিয়েছেন এবং যতীনকে শান্ত রেখেছেন। চণ্ডালবধূও অন্যায় জেনেই মেয়ে প্রকৃতির দুঃখ দূর করতে মন্ত্র পড়ে ভিক্ষু আনন্দের সাধনা ভঙ্গ করেছেন। আবার দুজনেই শেষ পরিণতি জানেন। মাসী জানেন যতীন বাঁচবে না, চণ্ডালবধূ জানেন তিনি নিজে মারা যাবেন। তাই তাদের দুজনের জীবনই যন্ত্রণাদায়ক।

গান্ধারী, *মালিনী* নাটকের মহিষী এবং কুন্তী এই তিনজন মা তাদের সন্তানের ছোটোবেলা নিয়ে বড়োবেলার সঙ্গে তুলনা এবং আলোচনা করেছেন। যে সন্তান ছোটোবেলায় গান্ধারীর আদরের ধন ছিলো, সেই মায়ের কাছে হয়েছে সবচেয়ে অপরাধী, অন্যদিকে মহিষী মালিনীকে দেখে বিস্মিত হয়েছেন। ছোটো সেই অবুঝ শিশু মহীরুহ হয়ে ধর্ম প্রচার করছে। আর কুন্তী বিধ্বস্ত এবং বিপর্যস্ত। কারণ যে ছোটো শিশুকে তিনি একদিন নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন, সেই আজ তার অন্য সন্তানদের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করেছে। তিনজন মায়ের অতীতের সঙ্গে বর্তমনের তুলনা মা জীবনে সন্তানের অতীতসন্ধানী দৃষ্টির পরিচায়ক।

রাজপরিবারের নারীরা কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করেন। সেই বৈশিষ্ট্যে একেকজন একেক রকম, কখনো কখনো আবার এক রকম আচরণও করেন। গান্ধারী যেমন রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে মনে করিয়ে দেন যে, তিনি রাজা– রাজকর্তব্যই তার আসল কাজ, তেমনি মালিনীও নিজের নির্বাসন সম্পর্কে তার পিতাকে মনে করিয়ে দেন যে, তিনি রাজা– রাজকর্তব্যই তার আসল কাজ। গান্ধারী আবেদন জানিয়েছেন পুত্রের নির্বাসনের জন্য,

মালিনী আবেদন জানিয়েছেন নিজের নির্বাসনের জন্য। দুজনেই ধর্মনিষ্ঠ-কল্যাণকামী, যদিও তাদের ধর্মবোধ এবং রাজার সঙ্গে সম্পর্ক আলাদা।

কল্যাণী-সুরমা চরিত্র দুটি বনের পাখির মতো মনের আনন্দে মানুষের সেবা করেছেন। একইভাবে মানুষকে ক্ষমাও করেন। কল্যাণী সকলকে দান করেন, তবু অনেকে তার বদনাম করে। এ সম্পর্কে তিনি নিজে দণ্ড দেন নি, বলেছেন :

> সামনে যা পাই তাই যথেষ্ট,
> আড়ালে কী ঘটে জানেন কেষ্ট। (৩খ,পৃ.১১৮)

এ রকম ভাগবতের স্ত্রী অপমানজনক কথা বললেও সুরমা বলেন :

> ভয় নেই কামিনী! আমার যতদিন খাওয়া-পরা জুটবে তোদেরও জুটবে। (৫খ,পৃ.২৪১)

এদের দুজনের পারিবারিক পরিবেশ এক। তবে কল্যাণী নিজে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী রানি, সুরমা রাজপরিবারের কোণঠাসা রাজপুত্র-বধূ। কল্যাণী সর্বাত্মকভাবে স্বাধীন, নিজের ইচ্ছেমতো সকলকে দান করতে পেরেছেন। সুরমা তা নয়, পদে পদে তার পারিবারিক এবং রাজনৈতিক বাধা। তাই রানি হলেও কল্যানী রাজনীতিতে অংশ নিতে পারেন নি, পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনযাপনের মধ্যে আবদ্ধ রয়েছেন। তার পরিসর ছোটো। অন্যদিকে সুরমা দেশের বৃহত্তর রাজনীতির অংশ হয়েছেন। প্রজাদরদী সুবিবেচক রাজনৈতিজ্ঞের মতো উদয়াদিত্যকে বলেছেন :

> পরগনা তো কেড়ে নিলেন, কিন্তু তুমি চলে এলে প্রজারা যে মরবে। (৫খ,পৃ.২১৫)

সুরমা রাজপুরীর অভ্যন্তরে থাকলেও রাজ্যের সমস্ত প্রজাদের সুখ-দুঃখের ভাগীদার হয়েছেন। সাহায্য-সহযোগীতা করেছেন। তার এই আচরণ রাজা মেনে নিতে পারেন নি, তাই তাকে জীবন দিতে হলো। তবে, মৃত্যুর আগে তিনি স্বামী-ননদ-প্রজাসাধারণ এমনকি শাশুড়ীর কাছে পর্যন্ত 'লক্ষ্মী' আখ্যা পেয়েছেন। – এইভাবে রবীন্দ্র-নাট্যে মহিষী, রানি, মা, মাসি চরিত্র বিভিন্নভাবে বিভিন্নদিকে মোড় নিয়েছে।

অপর্ণা বালিকা। তার ধন-সম্পদ, ঐশ্বর্য, প্রভাব-প্রতিপত্তি কিছু নেই, শুধু করুণাময়ী মাতৃমন রয়েছে। সমস্ত জীবের প্রতি তার মাতৃত্ব। ব্রাহ্মণেরা পশু বলি দিয়ে উল্লসিত হয়। কিন্তু ছাগশিশু বলি দেওয়ায় অপর্ণার মধ্যে কষ্টের উদ্রেক হয়। ছাগশিশুকে সে সন্তানের মতো পালন করতো। তার রক্ত দেখে অপর্ণা শিওরে ওঠে- কাঁদতে থাকে। জয়সিংহ তাকে বোঝানোর চেষ্টা করে যে, তার পশুকে বিশ্বমাতা নিয়েছে, তাই কান্না শোভা পায় না। অপর্ণার তখন বিশ্বমাতাকে মাতা মনে হয় না, কারণ মাতা সন্তানকে কখনো হত্যা করতে পারেন না। অপর্ণার মন কোমল; এই

কোমলতাই তার শক্তি। তার স্বভাব স্নিগ্ধ, সুন্দরই তার আরাধনা। প্রকৃতির স্নিগ্ধতা তার স্বরূপ। এই অপর্ণার সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী চরিত্র রানি গুণবতী। "একজন একটি মানবশিশুর লোভে দেবীসমক্ষে শত শত মহিষ ও ছাগশিশু বলি দিবার জন্য প্রস্তুত, অপরজন একটিমাত্র ছাগশিশু হত্যার জন্য দেবীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। .. এইখানে দুইটি নারীহৃদয়ের বিপরীত আবেদন ও আকাঙ্ক্ষা।"[৯] অপর্ণা সমস্ত জীবের প্রতি মমতাবান, গুণবতী শুধুমাত্র নিজের সন্তান চান। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেছেন, "প্রাণ-কামনার দ্বারা রানী প্রকৃতপক্ষে প্রেমেরই জয়ঘোষণা করিয়াছেন, মানুষের সত্যধর্মের পরিচয় দিয়াছেন।"[১০]– এ কথা ঠিক নয়। প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ চাইলে তা কখনোই প্রাণের বা প্রেমের জয় ঘোষণা হয় না। গুণবতীর মনে প্রেমের কোনো বোধ নেই। কেবলমাত্র মা হওয়ার প্রবল ইচ্ছা তার মধ্যে ক্রিয়া করেছে। আর ক্রিয়া করেছে মহিষীর দম্ভ। কোনো বিবেকবুদ্ধি-যুক্তিতর্ক তার মনে স্থান পায় নি। গুণবতী প্রেমিক কি-না তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। তার কোনো প্রেমময় মুহূর্ত নাটকে নেই। গুণবতী একবার বলেছেন :

ব্যর্থ প্রেম দেখা দেয় রোষের ধরিয়া
ছদ্মবেশ! (১খ,পৃ.৫৪৯)

আরেকবার বলেছেন :

আর নহে প্রেমখেলা,
সোহাগক্রন্দন। (১খ,পৃ.৫৫০)

গুণবতী ব্যর্থপ্রেম এবং প্রেমখেলার কথা বলেছেন ঠিকই কিন্ত তার প্রেমখেলা নাটকে অনুপস্থিত; সোহাগক্রন্দন আছে পূর্ণমাত্রায়। দেবীর পূজার জন্য কাকুতি-মিনতি তিনি করেছেন। তবে, গোবিন্দ্যমাণিক্যের প্রতি প্রেম এবং সন্তানকামনা এ দুয়ের মধ্যে কোনো টানাপোড়েন তার মনে ঘটে নি। গোবিন্দমাণিক্য জীবের প্রতি মমতাবশত জীববলি দিয়ে পূজা নিষেধ করে ফুল দিয়ে পূজা নিবেদনের প্রথা চালু করেন। এ বিষয় নিয়ে গুণবতী প্রেমসংক্রান্ত কোনো নতুন বোধ চেতনায় আসে নি। তাই, "গুণবতীর প্রেম গোবিন্দমাণিক্যের সংকল্পের পথে, বিবেকসংগত সিদ্ধান্তের পথে বাধা সৃষ্টি করেছে, আর অপর্ণার প্রেম জয়সিংহকে অনুপ্রাণিত করেছে সেই বিবেকসংগত সিদ্ধান্ত নেবার জন্য।"[১১] সুকুমার সেন বলেছেন, "মন্দিরে যে আসন্ন ট্রাজেডি ঘনাইয়া উঠিতেছে তাহা অপর্ণা অনুভব করিয়া কেবলি ব্যাকুলভাবে জয়সিংহকে ডাকিতে লাগিল।"[১২] –শুধু যে ট্রাজেডি ঘনাচ্ছে তাই নয়, প্রথম থেকেই অপর্ণার মনে ট্রাজেডি রয়েছে এবং সে ট্রাজেডি ঘটেছিলো মন্দির প্রাঙ্গনেই। তাই এই ট্রাজিক স্থানে কাউকেই অপর্ণা থাকতে দিতে চায় না। এ কারণে জয়সিংহকে ডাকতো। পরে রঘুপতি দেবীকে গোমতীর জলে ফেলে দিয়ে জয়সিংহের জন্য হাহাকার করলে, অপর্ণার মনে রঘুপতির জন্যও করুণার জন্ম হয়। তাই তাকেও অপর্ণা এই

বিভৎস্য স্থানে থাকতে দিতে রাজি নয়। এ কারণেই রঘুপতিকেও সে বলে, সেখান থেকে চলে যেতে। করুণার প্রতীক অপর্ণা সকলের জন্যই ভালোবাসা অনুভব করেছে। গুণবতীর সঙ্গে এখানেই তার সবচেয়ে বড়ো পার্থক্য। অপর্ণা এবং গুণবতীর মধ্যে সাধারণ মিল হলো তারা দুজনই একমুখী চরিত্র। যার যার বিশ্বাসে একনিষ্ঠ। তারা নিজেদের বিশ্বাস নিয়ে কোনো রকম দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভোগেন নি। শেষ দৃশ্যে রঘুপতিকে 'পিতা' সম্বোধন করা অপর্ণার চরিত্রের একমুখীতাই প্রকাশ করে। অবশ্য রঘুপতির মানসপরিবর্তনের পরই অপর্ণা রঘুপতির প্রতি সহানুভূতিশীল হয়। অপর্ণার এই বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে নন্দিনীর মিল রয়েছে। নন্দিনী যক্ষপুরীর ভিত নাড়িয়ে দেন। রঘুপতির মতো রাজারও মানস পরিবর্তন ঘটে। রাজা সত্যের সন্ধান পান। "নন্দিনী রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রেম ও কল্যাণের মূর্ত প্রতীক। জীবনের সর্ব গ্লানি থেকে সে শক্তিমান পুরুষকে বাঁচিয়েছে, মুক্তি দিয়েছে তাকে আত্মগ্লানির পাপপঙ্ক থেকে, সর্বনাশা আত্মদহন থেকে।"[১৩]যে রাজা রঞ্জনকে মেরে ফেলেন, সেই রাজারই সঙ্গে রাজনিয়ম ভাঙতে বের হন নন্দিনী, রঘুপতিকে নিয়ে যেমন অপর্ণা মন্দির থেকে বের হয়। "নন্দিনীকে সামাজিকভাবে বন্দিনী ভারতীয় নারীদের নেতৃত্বে যেন সংস্থাপন করলেন লেখক।"[১৪]অপর্ণা এবং নন্দিনী দু'জনই দুজন পুরুষকে রক্ষা করেছেন এবং দুটি রাজ্যের বুকে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে থাকা নিয়মকে ভেঙ্গে এক আনন্দ-ভূবন তৈরির দিকে যাত্রা করেছেন। এছাড়া, সবচেয়ে বড়ো কথা, যারা এই নিয়মের রক্ষক তাদের বিশ্বাস ভেঙ্গে দিয়েছেন। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেছেন, "অপর্ণা যেন *রক্তকরবী*র নন্দিনীর পূর্বাভাস। নন্দিনীর তুলনায় তার সাফল্য অধিক। ... নন্দিনীকে লড়তে হয়েছে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে, যেটি অনেক বেশী সুসংহত ও সুপ্রতিষ্ঠিত। অপর্ণার লড়াইটা ছিল পুরোহিততন্ত্রের বিরুদ্ধে যেটি ছিল তুলনামূলকভাবে দুর্বল।"[১৫] এদের মতো *তাসের দেশ*-এর হরতনীও। "'তাসের দেশ'-এ হরতনী নন্দিনীর ভূমিকা নিলো। ... হরতনী প্রথম আঘাত করে প্রাচীনত্বের প্রতীক দহলা পণ্ডিতের দেয়া নিয়ম ও বক্তব্যকে।"[১৬] অপর্ণা এবং নন্দিনীর আচরণ এবং জীবনযাপনেও কিছু মিল রয়েছে। অপর্ণা স্বাধীনভাবে চলাচল করে, অবাধ তার গমনপথ। নন্দিনীও তাই। নন্দিনী যেন রক্তকরবী। "*রক্তকরবী* জীবনের সেই স্বতঃচলা সত্তা, যা আপন শক্তিতে মানবরচিত সকল বিরুদ্ধতা জয় করে নিজেকে বিকশিত করে।"[১৭]এখানে অপর্ণা এবং নন্দিনীর পার্থক্য হলো, অপর্ণা রঘুপতির কাছ থেকে দূরে থেকেছে, কিন্তু নন্দিনী কাউকে ভয় পান নি, রাজা-গোসাই সকলের সামনে যেমন গিয়েছেন, তেমনি তাদের সামনে অন্যায়ের প্রতিবাদও করেছেন। অবশ্য নন্দিনী প্রতিবাদ করতে শুরু করেন নাটকের শেষের দিকে। অন্যদিকে অপর্ণা প্রতিবাদ করেছে নাটকের শুরুতে, এরপর রঘুপতি যখন দেবীর মুখ জনতার দিক থেকে ঘুরিয়ে রাখেন, তখন দেবীর মুখ ঘুরিয়ে জনতার সামনে এনে ধর্ম-পুরোহিতের বিরুদ্ধতা করে দুঃসাহস দেখায়। অপর্ণা এবং নন্দিনী দুজনেরই বন্ধন নেই। তারা মানুষের মনে মুক্তির বোধ সঞ্চার করেছেন। তাদের দুজনের জন্য দুটি হিংস্রপ্রথার বিলোপ ঘটেছে। আবার এই কাজ করতে

গিয়ে তারা তাদের প্রিয় মানুষকে হারিয়েছেন। অপর্ণা হারিয়েছে জয়সিংহকে, নন্দিনী রঞ্জনকে। এবং তারা দুজনই ক্ষতবিক্ষত প্রেমিক-মন নিয়ে বেঁচে থাকবেন। এমনি বিক্ষত পরিণতি ঘটে মালিনীরও। "অপর্ণা জয়সিংহকে যে সত্যের সন্ধান দিয়াছিল, "মালিনী"তে মালিনী সুপ্রিয়কে সেই সত্যের সন্ধান দিয়াছে।"[১৮] –অবশ্য সত্যের সন্ধান পেতে জয়সিংহের দ্বন্দ্ব ছিলো, সুপ্রিয়ের সেরূপ মানসিক দ্বন্দ্ব ছিলো না। সঙ্গত কারণেই অপর্ণার যতটা কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে, বার বার যেতে হয়েছে মন্দিরে, মন্দির ত্যাগের আহ্বান করতে হয়েছে, রঘুপতির ছলাকলা প্রকাশ করার জন্য কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছে, মালিনীকে তার কিছুই করতে হয় নি। আবার ব্যক্তিগত জীবনে মালিনী যতটা সক্রিয় অপর্ণা ততটা নয়। মালিনী রাজকন্যা এবং ধর্মপ্রচারক। বৌদ্ধধর্মের ভিক্ষুরা তাকে উপদেশ দেন এবং ধর্ম প্রচারে উৎসাহিত করেন। মালিনী এই ধর্মের জন্য নির্বাসনে পর্যন্ত যেতে রাজি হন। আবার প্রজারা তাকে দেবী হিসাবে মেনে নিলে তিনি রাজপুরীতে বসে সকলকে দেখা দেন– উপদেশ দেন। নিজধর্মের প্রতি তিনি যেমন আস্থাশীল তেমনি সক্রিয়। ক্ষেমংকর সসৈন্য রাজপুরীতে আসছিল, সুপ্রিয়ের সংবাদে রাজা তাকে আটক করেন। এ সংবাদে মালিনী চিন্তা করেন ক্ষেমংকর এলেই ভালো হতো। "অহিংসা ও মৈত্রী দ্বারা তাহার হিংসাকে সে জয় করিতে পারিত।"[১৯]– অপর্ণা এমন করে কিছু ভাবে নি। এমন কি জয়সিংহের আত্মাহুতির পর অপর্ণা এ সম্পর্কে কোনো চিন্তা করে নি যে, অপর্ণার আচরণ কোন রকম হলে জয়সিংহকে বাঁচানো সম্ভব হত। সে দিশেহারার মতো দেবীর কাছেই জয়সিংহকে ফিরে চেয়েছে। এখানে অপর্ণা চরিত্রের নিজস্বতা ক্ষুণ্ন হয়েছে। দেবীর বিপরীতে যে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ সে করেছিলো, আপনজনের মৃত্যুতে তা সাধারণ বোধে পরিণত হলো। অপর্ণার কোনো আলাদা ধর্মও নেই। সে অহিংস ধর্মে ডাক দিয়েছে ঠিকই কিন্তু তা বৌদ্ধের মতানুসারে নয় নিজের মনের ডাক অনুসারে। তাই মালিনীর ধর্মবোধর জন্য দৃঢ় ভিত্তি ছিলো, অপর্ণার তা ছিলো না। অপর্ণাকে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে তুলনা করা যায়। প্রকৃতি যেমন আপন শক্তিবলে মানব মনের আবেগকে পরিবর্তিত করে তেমনি শক্তি অপর্ণার। মালিনীর চেয়ে অপর্ণা ধর্মের ভিতকে বেশি নাড়াতে পেরেছে। এ ক্ষেত্রেও বলা যায়, প্রকৃতির শক্তি অন্য সকল শক্তির চেয়ে বড়ো। অপর্ণা এবং মালিনী দুজনই তাদের নায়কদের সত্যের সন্ধান দিয়েছেন, কিন্তু তাদের বাঁচিয়ে রাখতে পারেন নি। জয়সিংহের মৃত্যু গৌরবের আর সুপ্রিয়ের মৃত্যু প্রতারিতের। সুপ্রিয়ের মৃত্যুতে ক্ষেমংকরের কোনো রূপান্তর ঘটেছে কিনা বোঝা যায় না, মালিনী ক্ষেমংকরকে ক্ষমা করতে বলায় ক্ষেমংকরের কোনো ভাবান্তরও নাটকে স্পষ্ট করা হয় নি। তাই মালিনীর প্রেমিকের শেষ রক্ষা হলো না। বিদ্রোহী পূর্বাবস্থায়ই রয়ে গেলো। অন্যদিকে জয়সিংহের মৃত্যু পুরো পরিস্থিতিকেই উল্টে দিয়েছে। পুরোহিত দেবীকে অস্বীকার করে মূলত ধর্মকেই অস্বীকার করেছেন, গুণবতী নিজের জেদ ছেড়ে স্বামী গোবিন্দমাণিক্যের কাছে ফিরে গেছেন। এদিক দিয়েও মালিনীর চেয়ে অপর্ণা বেশি শক্তিশালী।

চিত্রাঙ্গদা-দেবযানী-প্রকৃতি-শ্যামা চারজন প্রেমিক-নারী। এদের প্রেমিকপুরুষকে প্রথম দেখার ঘটনা প্রায় এক। চিত্রাঙ্গদা অর্জুনকে, দেবযানী কচকে, প্রকৃতি আনন্দকে এবং শ্যামা বজ্রসেনকে দেখেন আকস্মিকভাবে। প্রথম দেখাতে চিত্রাঙ্গদা-প্রকৃতি-শ্যামা তিনজনই প্রেমে পড়েন। তারা সকলেই প্রায় সমপরিমাণে আবেগাপ্লুত হন এই তিনজন পুরুষকে পাওয়ার জন্য। দেবযানী আকস্মিকভাবে কচকে দেখে বিস্মিত হয়েছেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রেমে পড়েন নি। তবে এক ধরনের মুগ্ধতা জন্ম নিয়েছিল যে কারণে তিনি পিতার কাছে ভিক্ষা চেয়েছেন পিতা যেন কচকে শিষ্য করে নেন। এদের মধ্যে চিত্রাঙ্গদা, দেবযানী এবং শ্যামা শুধুমাত্র প্রেমিকপুরুষকে পেতে চেয়েছেন, প্রকৃতি প্রথমত চেয়েছেন নিজের 'মানুষ' স্বীকৃতি এবং পরে প্রেমিকপুরুষকে। রবীন্দ্রনাথ কাদম্বিনী দেবীকে লিখেছেন–

> নিজেকে দীন বলিয়া দুর্ব্বল বলিয়া ছোট বলিয়া অপমান করিয়ো না, কারণ, তাহা কখনই সত্য নহে। তোমার অন্তরাত্মার মধ্যেই বিজয়লক্ষ্মী বসিয়া আছেন তাঁহাকে দেখিলেই তোমার আর কোনো ভয় থাকিবে না– তুমি যে কি মহৎ তাহা নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিবে– তুমি ঈশ্বরের আনন্দের ধন– এই বার্ত্তা নিজেকে শুনাইয়া দাও![২০]

এই একই ডাক প্রকৃতির মনে ধ্বনিত হয়েছে। তাই আনন্দকে তার একান্তই প্রয়োজন হয়েছে।

চিত্রাঙ্গদা মৃগয়ায় বেড়িয়ে হঠাৎ অর্জুনের সামনে পড়েন এবং এই প্রথম তার নিজেকে নারী মনে হয়। অর্জুনের কথা তিনি ছোটোবেলা থেকেই জানতেন তাই তাকে দেখে মুগ্ধ হন। তার প্রেম পাওয়ার জন্য পুরুষবেশ পরিবর্তন করে নারীবেশে অর্জুনের সামনে গেলে অর্জুন তার কুশ্রী চেহারাকে প্রত্যাখান করেন। তখন তিনি মদন এবং বসন্তদেবের শরণাপন্ন হন। বসন্তদেবের দানে এক বছরের জন্য অপূর্ব সুন্দর হয়ে দাঁড়ান অর্জুনের সামনে। এবার অর্জুন চিত্রাঙ্গদার প্রতি আসক্ত হন। এরপর চিত্রাঙ্গদার মনে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এ দ্বন্দ্ব ব্যক্তিত্বের। মানুষ চিত্রাঙ্গদাকে মূল্যায়ণ না করে, তার বীরত্ব-মানসবৈশিষ্ট্য কোনো কিছু বিবেচনায় না এনে ধার-করা বাহ্যিক রূপ দেখে পাগল হয়েছিলেন অর্জুন। অর্জুনের এই ব্যবহারে চিত্রাঙ্গদা অপমানিত বোধ করেন। "অর্জুনকে সে চেয়েছিল প্রেমিকরূপে, পেল কামার্তরূপে।"[২১] অর্জুনের এই পতন তিনি সইতে পারলেন না, তিনি বুঝত পারলেন, সকল পুরুষই এক রকম– রূপের মায়ায় ধর্ম বিসর্জন দিতে পারে। অবশ্য রূপের মায়ায় বজ্রসেন শেষ পর্যন্তও ধর্ম বিসর্জন দিতে পারেন নি– যন্ত্রণাদগ্ধ হয়েছেন। কিন্তু পরাক্রমশীল অর্জুন সত্যিই রূপের কাছে কঠোর হতে পারেন নি। অর্জুনের উপর থেকে চিত্রাঙ্গদার মোহ কেটে যায় প্রথমেই। এক বছর পর তিনি নিজের স্বরূপে ফিরে আসেন। অর্জুনকে বলেন, তার 'মানুষ' মর্যাদার প্রতি মর্যাদাবান হলেই তাকে চেনা যাবে, তাছাড়া নয়। বসন্তের বরে পাওয়া রূপ সম্পর্কে তিনি বলেন :

সে আমার হীন ছদ্মবেশ। (২খ,পৃ.২৪০)

চিত্রাঙ্গদা নিজের বাস্তবতা সম্পর্কে, নিজের ব্যক্তিত্ব এবং অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন। তাই তিনি নিজের কথা দেরিতে হলেও অকপটে বলতে পেরেছেন। প্রেমপুরুষের চিরতরে চলে যাওয়া দেখে অকপটে কথা বলেছেন দেবযানীও। সদ্য স্নান করে সাজি হাতে ফুল তুলতে গিয়েছেন বনে, সেই সময় তরুণ অরুণপ্রায় গৌরবর্ণ, চন্দনে চর্চিত ভাল, কণ্ঠে পুষ্পমালা, পরনে পট্টবাস, অধরে-নয়নে প্রসন্ন হাসিযুক্ত কচ সেখানে আসেন। দেবযানী তাকে দেখে বিস্মিত হয়ে তার পরিচয় শুধান। কচ জানান, তিনি দেবযানীর দ্বারে এসেছেন দেবযানীর পিতার শিষ্য হওয়ার জন্য। দেবযানী কচকে নিজপিতার শিষ্য করে দেন। চিত্রাঙ্গদা এবং শ্যামার কাছে তাদের নায়করা কোনো কিছু চাইতে আসেন নি, প্রকৃতির কাছে আনন্দ শুধু চেয়েছিলেন এক গণ্ডুষ জল। অন্যদিকে দেবযানীর কাছে কচের চাওয়া বিদ্যাশিক্ষা। কচের জীবন সার্থক করেছে এই শিক্ষা। সে দিক দিয়ে কচের প্রতি দেবযানীর চাওয়া সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত। তাছাড়া কচ দেবযানীর প্রতি অনুরক্ততা দেখিয়েছেন, তাই দেবযানীর নারী হৃদয়কে পুরুষকে বাঁধার যে দোষ সমালোচকেরা দিচ্ছেন, তা দেবযানীর প্রতি অবিচারই করা হচ্ছে। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেছেন, "দেবযানীকে কবি বাস্তব নারীরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন, চিত্রাঙ্গদার মতো ইহাকে ভাবের বাহন করেন নাই।"[২২] – দেবযানী সম্পর্কে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের কথা সত্য। তবে, চিত্রাঙ্গদা ভাবের বাহন নন। তিনিও বাস্তব নারী। পূর্ববর্তী আলোচনায় তা দেখিয়েছি। চিত্রাঙ্গদা যেমন প্রেমিক অর্জুনের মন বুঝতে পারলেন, দেবযানীও তেমনি কচের মনের বোধকে বুঝতে পারলেন। বুঝলেন, কচ স্বর্গে গিয়ে দেবযানীকে ভুলে যাবেন। তাই বললেন :

আমারে করিয়া বশ পিতার হৃদয়ে
চেয়েছিলে পশিবারে– কৃতকার্য হয়ে
আজ যাবে মোরে কিছু দিয়ে কৃতজ্ঞতা,
লব্ধমনোরথ অর্থী রাজদ্বারে যথা
দ্বারীহস্তে দিয়ে যায় মুদ্রা দুই-চারি
মনের সন্তোষে। (২খ,পৃ.৩০৮)

অনেক কৌশল করে নিজের প্রেমের কথা বলে অতঃপর তিনি রাখঢাক না রেখে সরাসরি কথা বললেন। কোনো উপায়য়েই যখন কচকে আটকাতে পারলেন না, তখন অভিশাপ দেন। দেবপুত্রের বিরুদ্ধে অসুরকন্যার এ এক বড়ো বিদ্রোহ। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "দেবযানীর প্রেম-নিবেদন ব্যর্থ হইল দেখিয়া সে কচকে অভিশাপ দিল। রবীন্দ্রনাথের এই নারী 'বিসর্জনে'র গুণবতীর ন্যায় হিংস্র, প্রতিহিংসাপরায়ণা।"[২৩]– এই উক্তি দেবযানীর অধিকারবোধের চেতনাকে নৃশংসভাবে আঘাত করেছে। সহস্রবছর দেবযানীর সেবা গ্রহণ করে এবং দেবযানীর সঙ্গে প্রেমের খেলা খেলে তাকে প্রত্যাখ্যান করা প্রেমিক হিসাবে কাপুরুষতা। এই কাপুরুষ প্রেমিককে

মাপ করে নিজে যন্ত্রণাদগ্ধ হলে সমাজ-সংসার দেবযানীকে আদর্শ নারী হিসেবে মাথায় তুলে রাখতো, কিন্তু নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি চেষ্টা করেছেন এবং ব্যর্থ হওয়ার পর অভিশাপ দিয়েছেন। নারীর এই ঔদ্ধত্য মেনে নেন নি পুরুষপ্রতিনিধিরা। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় দেবযানীকে গুণবতীর মতো হিংস্র-প্রতিহিংসাপরায়ণ বলেছেন। এ কথা সত্য নয়। এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য তিনবার রাক্ষসরা কচকে হত্যা করেছে, দেবযানী কচের জীবন ফিরিয়ে দিয়েছেন। তাছাড়া, দেবযানী কচের বিদ্যা পুরোপুরি কেড়ে নেন নি। বলেছেন :

> শিখাইবে, পারিবে না করিতে প্রয়োগ। (২খ,পৃ.৩০৯)

এটা ঠিক যে, ভালোবাসার মানুষকে অভিশাপ দেওয়া দেবযানীর ঠিক না। অভিশাপ না দিয়ে কষ্ট সহ্য করলে তিনি উদরতার পরিচয় দিতেন। কিন্তু যুগে যুগে নারীরা আর কত কষ্ট সহ্য করবে? তারা কি তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে একটু অভিশাপও দিতে পারবে না! প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতো প্রায় একই কথা বলেছেন প্রমথনাথ বিশী। তিনি বলেছেন, "প্রেমৈকসত্তা দেবযানী ত্যাগের এ মহিমা বুঝিতে পারিবে না– তাহার কুলিশকঠোর নারীচিত্তে ত্যাগের স্থান নাই, ক্ষমার স্থান নাই।"[২৪]– অর্থাৎ নারীর অকপটতা এবং অধিকার তিনিও স্বীকার করলেন না। দেবযানী তাই দুরকমভাবে বঞ্চনার শিকার হয়েছেন। একদিকে তিনি প্রেমিকের কাছে বঞ্চিত হয়েছেন, অন্যদিকে সমালোচকেরও সহানুভূতি পান নি। নিজের মনের চাওয়ার কথা বলতে গিয়ে এতোটাই হতভাগ্য হন দেবযানী।

অকপটে বিদ্রোহী হয়েছেন *চণ্ডালিকার* প্রকৃতিও। তার বিদ্রোহ ধর্মের বিদ্রোহ-সম্মান পাওয়ার জন্য বিদ্রোহ। কুয়ো তলায় জল তুলছিলেন প্রকৃতি, হঠাৎ ভিক্ষু আনন্দ এসে জল চাইলেন। প্রকৃতি আনন্দকে দেখে মুগ্ধ হলেন। মুগ্ধ হলেন আনন্দও। চিত্রাঙ্গদার ভাগ্যে অবশ্য অর্জুনের মুগ্ধতা ছিলো না, যতক্ষণ না তিনি বসন্তের বরে সুন্দর হলেন। অন্যদিকে, প্রকৃতি চিত্রাঙ্গদার মতো সপ্রতিভ হতে পারলেন না, কারণ তিনি ছোটো জাতের নারী। তবে, জাতের সংকোচ ঘুচিয়ে দিলেন আনন্দ নিজেই। কারণ বৌদ্ধ ধর্ম জাতিভেদ মানে না। তাদের কাছে সবাই একই মানুষ। আনন্দ আর কিছু বলতে পারলেন না, সুন্দরী নারীর কণ্ঠলগ্ন হয়ে থাকা বৌদ্ধধর্মের আদর্শ নয়। চলে গেলেন তিনি। কিন্তু প্রকৃতির মনে হলো আনন্দ আবার তার কাছে আসবেন–

> দিনের পর দিন চলে যায়, এলেন না তো। কোনো কথা না ব'লে তবু কথা দিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু রাখলেন না কেন কথা। আমার মন যে হল মরুভূমির মতো; ধূ ধূ করে সমস্তদিন, হু হু করে তপ্ত হাওয়া, সে যে পারছে না জল দিতে। কেউ এসে চাইলে না। (১২খ,পৃ.২১৭)

প্রকৃতপক্ষে, আনন্দের কথায় এবং আচরণে প্রকৃতির দুটি সত্তা জেগে ওঠে : মানুষসত্তা, প্রেমিকসত্তা।– দুটিই তার কাছে নূতন। এই সত্তা দুটির স্বীকৃতির জন্য আনন্দকে তার দরকার। তাই তিনি আনন্দকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল

হয়েছেন। একবার শুধু আনন্দ বলে গেলেন যে, 'যে মানব আমি সেই মানব তুমি, কন্যা'– এতে সমাজ চণ্ডালিকাকে 'মানুষ' মর্যাদা দিবে না। আনন্দর আরো দায়িত্ব আছে। প্রকৃতিকে 'মানুষ' হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব না নিলে আনন্দর নীতিকথা অর্থহীন। প্রকৃতির মনে কালিমা তিনি ঘুচিয়েছেন। এতে প্রকৃতি নিজে সমৃদ্ধ হয়েছেন, কিন্তু তিনি যদি ব্রাহ্মণশ্রেণিতে গিয়ে নিজের সমান অধিকারের কথা বলেন, তবে তিনি ধিকৃত এবং অপমানিত হবেন। তাই প্রকৃতি একা নিজের সম্মান প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন না। আনন্দ যদি পাশে থেকে সকলকে দেখিয়ে প্রকৃতির জন্মকালিমা ঘুচায়, তবেই সম্ভব প্রকৃতির 'মানুষ' মর্যাদা পাওয়া। প্রকৃতির ভিতরে যে বোধের সঞ্চার করেছেন আনন্দ, তার দায়িত্ব আনন্দকে নিতেই হবে। অর্থাৎ প্রকৃতি আনন্দর প্রতিও একধরনের বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। তিনি ধার্মিক এবং দার্শনিককে মনে করিয়ে দিয়েছেন, শুধু মুখের কথায় কিছু হয় না। কাজের মাধ্যমে তা প্রমাণ করতে হয়। "পদে-পদে বঞ্চিতা ও অপমানিত এই ওজস্বিনী চণ্ডালিকা যে বিদ্রোহিনী হবে ঈশ্বরতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।"[২৫] শুধু ঈশ্বরতন্ত্রের বিরুদ্ধে নয়, সামাজিক এবং মানবিক অসংগতির বিরুদ্ধেও বিদ্রোহী হয়েছেন তিনি। প্রথমে বিদ্রোহী হয়েছেন, তারপর হয়েছেন প্রেমিক। প্রকৃতির রূপ আনন্দকেও ব্যাকুল করে দিয়েছিলো। তবে তিনি চান নি বিদ্রোহী হতে, বরং নিজের আদর্শে স্থির হওয়ার আপ্রাণ সংগ্রাম কররেছেন। "প্রকৃতির মনের দর্পণেই দেখি, কী প্রাণান্তকর সংগ্রাম করছেন আনন্দ এই রূপসীর মায়াবন্ধন ছিন্ন করে এতদিন যে-মুক্তির একনিষ্ঠ সাধনা তিনি করে এসেছেন বুদ্ধের প্রিয় শিষ্যরূপে, সেই মুক্তলোকে ফিরে গিয়ে নিষ্কাম ধ্যানে ও কর্মে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে।"[২৬] কিন্তু আনন্দ পারলেন না। আসতেই হলো প্রকৃতির কাছে। আবার আনন্দ যখন এসেছেন, তখন প্রকৃতি আনন্দর নিজের সাধনা সম্পর্কে সহানুভূতিশীল হয়ে পড়েন। এ জন্যই তিনি বলেন :

> তাঁর পথ আসছে শেষ হয়ে– তার পরে? তার পরে কী। শুধু এই আমি! আর কিছু না! এতদিনের নিষ্ঠুর দুঃখ এতেই ভরবে? শুধু আমি? কিসের জন্য এত দীর্ঘ, এত দুর্গম পথ! শেষ কোথায় এর! শুধু এই আমাতে!(১২খ,পৃ.২২৬)

"এত বড়ো ধর্ম থেকে চ্যুত হয়ে আনন্দ এসেছেন প্রকৃতির কাছে যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত, আত্ম-পরাজয়ের গ্লানিতে পাংশুবর্ণ, এসেছেন মাথা হেঁট করে। এ দৃশ্য প্রকৃতি সইতে পারল না।"[২৭] আনন্দর আত্মপরাজয় দেখে এবং নিজের ক্ষুদ্রতা দেখে প্রকৃতির প্রেমিক মন আবার বিদ্রোহ করে ওঠে। তিনি যাকে ভালোবাসেন, তাকে পরাজিত হতে দিবেন না, জয়ীই করবেন। ভালোবাসার মানুষের সাধনাকে ব্যর্থ হতে দেবেন না। প্রকৃতির মন প্রকৃত প্রেমবোধে উত্তীর্ণ হলো। "যুবতীর রোম্যান্টিক প্রেম নিজের সীমানা ছাড়িয়ে পরিণত হলো মৈত্রীভাবনায়।"[২৮] আনন্দেকে নিজের জগতে ফিরিয়ে দিলেন প্রকৃতি। "প্রকৃতির জীবনে প্রেমের যে আবির্ভাব তা সূক্ষ্ম গভীর

অনুভূতির সোপান বেয়ে জীবনের সিংহদ্বারে তাকে উপনীত করেছে। তার মন মুগ্ধ হয়েছে আনন্দের অনিন্দ্যসুন্দর রূপের চেয়ে মনের তেজস্বিতা ও মাধুর্যের প্রতি। প্রকৃতির প্রেম অধ্যাত্মিক মুক্তির মধ্যে প্রাণময়।"[২৯]তাই জয়ী হলো প্রকৃতির প্রেমিক সত্তা। "প্রকৃতির প্রেম প্রাণিকতা থেকে অবশেষে উঠে গেল আধ্যাত্মিকতার স্তরে। তুলনায় রাজেন্দ্রনন্দিনী চিত্রাঙ্গদার প্রেম প্রথম থেকে শেষ অবধি পার্থিব, প্রাণধর্মী।"[৩০] চিত্রাঙ্গদার প্রেম পার্থিব হওয়ার সঙ্গত কারণ আছে। তিনি নিজে রাজেন্দ্রনন্দিনী এবং সৌর্যে-বীর্যে রাজমানবী। মহান রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে প্রজাদের মধ্যে তার সুনাম আছে। 'মানুষ' স্বীকৃতির জন্য অর্জুনের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয় নি। আবার অর্জুনের প্রেম পাওয়ার পর বুঝতে পেরেছেন রূপজমোহের ক্ষুদ্রতাদোষে দোষী অর্জুন। তাই তিনি অর্জুনের প্রতি মোহগ্রস্ত থাকেন নি। চিত্রাঙ্গদা এবং প্রকৃতির সাধারণ মিল হলো– তারা দুজনই প্রেমিকপুরুষকে পাওয়ার জন্য অলৌকিক উপায় অবলম্বন করেছেন এবং দুজনেই কৃতকার্য হয়েছেন। "আবার দুজনেই মোহভঙ্গের সাহস অর্জন করিয়া অলৌকিকতার পাশ মুক্ত করিয়া প্রেমাস্পদকে ছাড়িয়া দিয়াছে।"[৩১] অন্যদিকে দেবযানী এদের থেকে আলাদা। তিনি প্রেমাস্পদকে ছেড়ে দিতে চান নি, বরং নিজের কাছে রেখে পৃথিবীতেই স্বর্গ রচনা করতে চেয়েছেন। এরপর নিজের অধিকার আদায়ে ব্যর্থ হয়ে প্রেমিককে অভিশাপ দিয়েছেন। এমনি ব্যর্থ হয়েছেন শ্যামাও। কিন্তু শ্যামা প্রেমিককে অভিশাপ দেন নি। তার মানে এই নয় যে, দেবযানীর চেয়ে শ্যামা প্রেমিক-নারী হিসেবে মহৎ। এখানে মহত্বের প্রশ্ন নয়, দুজনেই বঞ্চিত হতে বাধ্য হয়েছেন। তবে দেবযানী হয়েছেন প্রবঞ্চিত। এবং নিজের অধিকার আদায়ের জন্য তার যে চেষ্টা তা প্রশংসনীয়।

চিত্রাঙ্গদা এবং প্রকৃতির মতো শ্যামার প্রেমিকপুরুষ দর্শনও ছিলো আকস্মিক এবং নাটকীয়। শ্যামা যৌবনবতী। মনের মতো প্রেমিকপুরুষ খুঁজে পাননি– সখীরা তাকে মনে করিয়ে দেয় 'জীবনে পরম লগন কোরো না হেলা'। এরকম সময়ে একদিন শ্যামা নিজের সভাগৃহে সখীদের নিয়ে সজ্জা-সাধন করছেন। এমন সময় বজ্রসেন ছুটে আসে সেখানে আর পিছনে কোটাল আসে 'ওই চোর ওই চোর' বলে। এক মুহূর্তের জন্য শ্যামা বজ্রসেনকে দেখতে পান। দেখেই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। সখীর মাধ্যমে বজ্রসেনসহ কোটালকে ডেকে আনেন। বলেন :

তোমাদের এ কী ভ্রান্তি–
কে ওই পুরুষ দেবকান্তি,
প্রহরী, মরি মরি!
এমন করে কি ওকে বাঁধে!
দেখে যে আমার প্রাণ কাঁদে। (১৩খ,পৃ.১৯৩)

শ্যামার দীর্ঘ জীবনে কোনো পুরুষকে দেখে এমন মুগ্ধ হন নি, যেমন হলেন বজ্রসেনকে দেখে। তাকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। অথচ, কারাগার থেকে তাকে ছাড়ানো শ্যামার সাধ্যের বাইরে। অজানার উদ্দেশ্যে তিনি সাহায্য প্রার্থনা করেন :

আছ কি বীর কোনো,
দেবে কি ওরে জড়িয়ে মরিতে
অবিচারের ফাঁদে
অন্যায় অপবাদে। (১৩খ,পৃ.১৯৪)

তার ডাকে কোনো বীর সাড়া দেন না, সাড়া দেন প্রেমিক উত্তীয়। অবশ্য উত্তীয় অন্যায়-অবিচারের প্রতিকার করতে আসেন না, শ্যামার ডাকে আসেন। শ্যামার প্রতিই তার জীবন নিবেদন করেন। বজ্রসেনের পরিবর্তে উত্তীয়কে হত্যা করে কোটাল। বজ্রসেন মুক্তি পান। বজ্রসেন প্রেমিকনারী খুঁজছিলেন, যাকে তিনি ইন্দ্রমণির হার পরাবেন। শ্যামাকে দেখে বজ্রসেন বুঝতে পারেন, এই নারীকেই তিনি খুঁজছেন। দুজনের মনের মিলন হয়। শ্যামা নিজের সমস্ত ঐশ্বর্য-প্রতিপত্তি ফেলে বজ্রসেনের সঙ্গে চলে যান। এরপরই উত্তীয়ের আত্মহুতির কথা শুনে বজ্রসেন শ্যামাকে পাপী মনে করেন। শ্যামাকে ভালোবাসলেও দূরে ঠেলে দেন। শ্যামার জীবনে কোনো অবলম্বনই অবশিষ্ট থাকে না। তার প্রেম তাকে নিঃস্ব-রিক্ত করে দেয়। "হতভাগী শ্যামা তো তাহার দুর্দমনীয় প্রণয়াবেগের ফলে সব কিছুই হারাইল।"[৩২] শ্যামা নিজে অপরাধ করেছেন বলে বজ্রসেনকে অভিশাপ দেওয়ার কোনো পরিস্থিতি তৈরি হয় নি। তাই তিনি শুধু ক্ষমাই প্রার্থনা করেন–

এসেছি প্রিয়তম, ক্ষমো মোরে ক্ষমো।
গেল না গেল না কেন কঠিন পরান মম–
তব নিঠুর করুণ করে! ক্ষমো মোরে। (১৩খ,পৃ.২০২)

কিন্তু ক্ষমা পেলেন না শ্যামা। একা চলে যেতে বাধ্য হলেন। – এই চারজন নারীই শেষ পর্যন্ত প্রেমিকপুরুষের সঙ্গে এক সঙ্গে জীবনযাপন করতে পারেন নি। অর্জুন ব্রত পালনে ছিলেন, তাকে নিজভূমে ফিরতে হবে, চিত্রাঙ্গদা সঙ্গে যাবেন না, কারণ তিনি তার দেশের রাজা। দেশরক্ষা এবং দেশশাসনের ভার তার উপরে। দেবযানী কচকে বলেছেন স্বর্গে না ফিরে মর্তেই তারা দুজনে মিলে স্বর্গ রচনা করবেন। কিন্তু কচ 'সঞ্জীবনীবিদ্যা' শিখে দেবতাদের কাছে ফিরে যাবেন– এটাই তার উদ্দেশ্য। তাই শত চেষ্টা করেও কচকে নিজের কাছে রাখতে পারেন নি দেবযানী। অন্যদিকে, প্রকৃতির ক্ষেত্রে– "প্রাণময়ী প্রেম দিয়ে সে আনন্দকে টেনে আনতে চেয়েছিল তার পাশে, শয্যাসঙ্গীরূপে, স্বামীরূপে।"[৩৩] আনন্দ এলেনও কিন্তু প্রকৃতির ভিতরের প্রেমপূর্ণ মন আনন্দর সঙ্কীর্ণ সংসারী জীবন মেনে নিতে পারলো না। আবার প্রকৃতি চিত্রাঙ্গদার মতো পাশে থাকতেও চাইলেন না। চিত্রাঙ্গদা বলেছিলেন–

যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সংকটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী,
আমার পাইবে তবে পরিচয়। (২খ,পৃ.২৪১)

প্রকৃতি সে রকম কিছু চাইলেন না। তিনি একাই তার মনুষ্যত্বের সম্মান নিয়ে থাকবেন। আনন্দ চলে যাবেন নিজের সাধনাক্ষেত্রে। অন্যদিকে, শ্যামা উন্মাদের মতো চেয়েছিলেন বজ্রসেনের সঙ্গে বাস করতে। কিন্তু বজ্রসেন শ্যামাকে ক্ষমা করতে পারলেন না। হত্যা করার জন্য আঘাত করলেন, কিন্তু শ্যামা জীবিত রইলেন।বজ্রসেন জানলেন শ্যামা মারা গিয়েছে। তিনি বুঝতে পারলেন, শ্যামার প্রতি তার অগাধ প্রেম। তাই মৃত শ্যামার উদ্দেশ্যে বললেন :

এসো এসো এসো প্রিয়ে,
মরণলোক হতে নূতন প্রাণ নিয়ে।
নিষ্ফল মম জীবন
নীরস মম ভুবন
শূন্য হৃদয় পূরণ করো
মাধুরীসুধা নিয়ে। (১৩খ,পৃ.২০১)

এবার জীবিত শ্যামা বজ্রসেনের সামনে এলে বজ্রসেন আবার শ্যামাকে প্রত্যাখ্যান করেন। কিছুতেই ক্ষমা করতে পারেন না। তাই শ্যামা বজ্রসেনের কাছে থাকতে পারলেন না। বজ্রসেনকে প্রণাম করে চলে যান। "দ্বন্দ্ব এবং সংঘাতে জীবনের শোচনীয় পরিণতি তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন 'শ্যামা' নাটকে। এখানে জীবনের সুগভীর দুঃখ ও বেদনা ট্র্যাজেডিতে ঘনীভূত। ... রবীন্দ্রনাথের এই ট্র্যাজেডি চেতনা আবহমান কালের ভারতীয় আদর্শে গড়া। জীবনের সত্যকে পেতে হলে সাধনা দিয়ে পেতে হয়, দুঃখের মূল্যে তাকে পাওয়া চাই। বাস্তব জীবনে সত্যকে পেতে গেলে দুঃখের প্রকোপে তা অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায়। তাঁর ট্র্যাজেডি চরিত্র শ্যামার মধ্যে তা পরিলক্ষিত হয়। এখানেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় কবির পার্থক্য। কালিদাস 'শকুন্তলা' কাব্যের নায়িকা শকুন্তলাকে দুঃখের কষ্টিপাথরে যাচাই করেছেন, অতঃপর বিকিয়ে দিয়েছেন তার দাম্পত্য জীবনের আনন্দ। রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি পরিকল্পনায় হারিয়ে যাওয়া জীবন ফিরে আসে না, তাঁর 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের বিভা, 'বাঁশরী' নাটকের বাঁশরী সরকার দুঃখের মূল্যেও বাস্তব জীবনের প্রতিষ্ঠা পায়নি। 'বিসর্জন' নাটকের রঘুপতি, অপর্ণা পিতা সম্বোধন

তাঁকে জীবনে সত্যের সন্ধান দিয়েছে, কিন্তু হারিয়ে যাওয়া জীবন আর ফিরে পাননি। রবীন্দ্রনাথ 'শ্যামা' নাটকেও জীবন সত্যের পরিচয় দিয়েছেন কিন্তু এখানে জীবনকে ফিরে পাওয়া গেল না।"[৩৪]

দেখা যাচ্ছে, চারটি ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপট হলেও চিত্রাঙ্গদা-দেবযানী-প্রকৃতি-শ্যামা কেউ-ই তাদের প্রেমিকপুরুষের সঙ্গে সংসার ধর্ম করতে পারলেন না। মনের মধ্যে কষ্ট নিয়ে একা জীবনযাপনের পথ বেছে নিলেন অথবা বাধ্য হলেন। আমরা দেখতে পাই, রবীন্দ্রনাথের নায়িকারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের কাঙ্ক্ষিত পুরুষকে পায় নি। নন্দিনীকেও দেখি এতো প্রতীক্ষার পর রঞ্জনের সঙ্গে তার দেখা হলো না। রঞ্জন এলো ঠিকই, কিন্তু নন্দিনী তাকে মৃত অবস্থায় পেলেন। অন্যদিকে সুমিত্রাও শেষ পর্যন্ত রাজা বিক্রমদেবের সঙ্গে মিলতে পারলেন না, মৃত্যুকে বরণ করলেন। বালিকা অপর্ণা এবং মালিনীও তাই। বিভার স্বামী আরেকটি বিয়ে করতে যাচ্ছে দেখে বিভা কাশীবাসী হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বাঁশরিও একা থেকেছেন শেষ পর্যন্ত। নায়িকাদের মধ্যে গর্ভবতী হওয়ার কারণে কুমুদিনী স্বামীর সংসারে ফিরে গেছেন। কিন্তু এ যাওয়া চিরদিনের জন্য নয়। তিনি বলেছেন :

> একদিন ওদেরকে মুক্তি দেব, আমিও মুক্তি নেব, চলে আসবই– এ তুমি দেখে নিয়ো। মিথ্যে হয়ে মিথ্যের মধ্যে থাকতে পারব না। (১৮খ,পৃ.২২৭)

অর্থাৎ কেউ-ই মিলন-সুখ পেলেন না। রবীন্দ্রনাথের চিত্রের মাধ্যমে এই নিঃসঙ্গ নারীদের বোধ স্পষ্ট হয়। "... পোর্ট্রেটগুলি নিঃসঙ্গতার প্রকাশ। ফিগরগুলি শুদ্ধ রংয়ের মধ্যে বিচ্ছিন্ন এবং পটভূমিবিহীন। তাদের মুখাবয়বে ক্ষতের চিহ্ন, যন্ত্রণার চিহ্ন, এই ক্ষত এই যন্ত্রণা স্ব-আরোপিত। স্ব-আরোপিত অন্য অর্থে, কোনো ব্যক্তি নয়, তাঁর ঘনিষ্ঠ মহিলারা এবং ঐসব মহিলা উদ্ভাবিত তাঁর সৃষ্ট কুমু সুচরিতা দামিনী লাবণ্যরা একটি নির্দিষ্ট সমাজ ব্যবস্থার ভারে নিঃসঙ্গ, সেজন্যই ব্যক্তিক এবং সামাজিক আরোপণ এই ক্ষেত্রে অর্থহীন। আবার তাঁর পোর্ট্রেটগুলির ক্ষেত্রে আমরা সম্মুখীন হই চোখের, চোখের প্রকাশ ব্যঞ্জনার। এই চোখের দিকে তাকিয়ে থাকুন। আত্মমগ্ন নয়, চোখগুলি চেয়ে আছে তাদের অবস্থান থেকে। কি ঘটছে তারা জানে না, সেজন্য ঐসব চোখ নিঃসঙ্গ, এবং দূরবর্তী এবং নির্মম।"[৩৫] নায়িকাদের মধ্যে নলিনী এবং গুণবতীই প্রেমিকপুরুষের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গভাবে মিলন-সম্পর্কে যেতে পেরেছেন। পুরো নাটক জুড়ে নলিনীর প্রেমের তল খুঁজে পাওয়া যায় না। এরপর সতীশের দুঃসময়ে তিনি গিয়ে পাশে দাঁড়ান। অন্যদিকে গুণবতীও গোবিন্দমাণিক্যের কাছে ফিরে গেছেন এবং তাদের প্রেমময় মিলন ঘটেছে। তাদের কথোপোকথনে তা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে–

> গুণবতী। আজ দেবী নাই–
>
> তুমি মোর একমাত্র রয়েছ দেবতা।
>
> গোবিন্দমাণিক্য। গেছে পাপ। দেবী আজ এসেছে ফিরিয়া

আমার দেবীর মাঝে। (১খ,পৃ.৫৯৮)

গুণবতী এবং গোবিন্দমাণিক্যের মিলন ঘটেছে আকস্মিকভাবে। তবে এই মিলনে শুধু রাজা-রানিরই মিলন ঘটে নি, অহিংসনীতির জয় ঘোষিত হয়েছে।

চিত্রাঙ্গদা এবং কুমুদিনী চরিত্রের মানসিক বোধে একটি মিল লক্ষ করা যায়। তারা দুজনই নিজের সন্তানকে নিজের কাছে রাখার চিন্তা করেন নি। পিতার কাছে সন্তান থাকবে, অর্থাৎ সন্তান পিতার উত্তরাধিকার এই বোধ থেকে তারা বেরিয়ে আসতে পারেন নি। চিত্রাঙ্গদা বলেছেন :

গর্ভে
আমি ধরেছি যে সন্তান তোমার, যদি
পুত্র হয়, আশৈশব বীরশিক্ষা দিয়ে
দ্বিতীয় অর্জুন করি তারে একদিন
পাঠাইয়া দিব যবে পিতার চরণে–
তখন জানিবে মোরে, প্রিয়তম। (২খ,পৃ.২৪১)

কুমুদিনী বলেছেন :

ততদিনে ওদের ছেলেকে আমি ওদের হাতে দিয়ে যাব। এমন কিছু আছে যা ছেলের জন্যও খোওয়ানো যায় না। (১৮খ,পৃ.২২৭)

এখানে কুমুদিনী চিন্তা করেছেন তার ছেলে হবে। এতে তার পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে। চিত্রাঙ্গদা 'যদি পুত্র হয়' বলে নিজের চিন্তাধারায় পুরুষতন্ত্রের পরিবর্তে মানবতন্ত্র প্রকাশ করেছেন। তবে, তারা দুজনই নিজের সন্তানকে নিজের উত্তরাধিকাররূপে চিন্তা করতে পারেন নি। এখানেই তাদের গতানুগতিক নারীসত্ত্বার এবং প্রচলিত সামাজিকবোধের সীমাবদ্ধতা। তবে তাদের চরিত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের দৃঢ়তাও রয়েছে। চিত্রাঙ্গদা বলেছেন :

আমি চিত্রাঙ্গদা। রাজেন্দ্রনন্দিনী। (২খ,পৃ.২৪০)

কুমুদিনী বলেছেন :

আমি ওদের বড়োবউ, তার কি কোনো মানে আছে যদি আমি কুমু না হই। (১৮খ,পৃ.২২৭)

– দেখাযাচ্ছে, এরা দুজনই নিজস্বতায় বিশ্বাসী। বাঙালি সমাজে বিয়ের পরে নারীরা স্বামীসত্তায় বিলীন হয়ে যায়, নিজের নামে আর পরিচিত হয় না। চিত্রাঙ্গদা এবং কুমুদিনী সেই নিয়মের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করেছেন। তারা নিজের নামে, নিজের বংশপরিচয়ে, নিজের অস্তিত্বে অস্তিত্ববান হতে চেয়েছেন। কুমুদিনী শেষ দৃশ্যে মধুসূদনের হাত ধরে বলেছেন–

চলো, তবে যাই আমাদের ঘরে। (১৮খ,পৃ.২২৮)

এই কথা আপাতদৃষ্টিতে কুমুদিনীর মুখে খাপছাড়া-বেমানান মনে হয়। কিন্তু এর আগেই কুমুদিনী সমস্ত কথা বলেছেন, বলেছেন নিজের ফিরে আসার কথা-নিজের অস্তিত্বের কথা। তাই 'আমাদের ঘর' বললেও তিনি বন্দী হতে যাচ্ছেন না। সেখানে যদি নিজের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে তিনি হয়তো সংসারে থাকতে পারেন, তাছাড়া ফিরে আসবার পথ তার ঠিক করাই রয়েছে। তবে এ কথা ঠিক যে তিনি মেনেই নিলেন। ফিরে আসার জন্য হলেও গেলেন মধুসূদনের ঘরে। অর্থাৎ আপোষ করলেন। রবীন্দ্রনাথ কাদম্বিনী দেবীকে চিঠিতে লিখেছিলেন,

> জীবন যখন পাইয়াছ, বাঁচিতেই যখন হইবে তখন নিজের সঙ্কীর্ণ অবস্থার ঊর্দ্ধে অনন্ত আকাশের মধ্যে মাথা তুলিতেই হইবে– আলো পাইতেই হইবে, মুক্তবায়ুর মধ্যে আত্মাকে বিস্তৃত করিতেই হইবে। বাহিরের প্রতিকূলতা যতই কঠিন অন্তরের শক্তি ততই প্রাণপণ বলে উদ্বোধিত করিতে হইবে।[৩৬]

– এই অন্তরের শক্তির সন্ধান কুমুদিনী পেয়েছেন। তাই চিত্রাঙ্গদা এবং কুমুদিনীর নিজস্বতার স্বরূপ আলাদা হলেও শক্তি এক।

পতিতা নারী এবং শ্রীমতী চরিত্র দুটির সামাজিক অবস্থান এক। দুজনই তাদের নিজস্ব পতিত জগত থেকে আধ্যাত্মিকতায় উন্নীত হয়েছেন এবং নিজস্বতা অর্জন করেছেন। দুজনেই রাজ-পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কিত, কিন্তু রাজ-ভীতি জয় করেছেন। পতিতা নারীর ক্রমবিকাশ প্রকাশমান। সমস্ত জীবন তিনি চাটুবাক্য শুনেছেন এরপর ঋষিকে দেখে সত্য এবং প্রেমের সন্ধান পান। ঋষির তপস্যা ভঙ্গের জন্য মন্ত্রী দ্বারা আদেশপ্রাপ্ত হয়ে তিনি অন্যান্য বারাঙ্গনার সঙ্গে বনে গমন করেন। বনে গিয়ে বনের পরিবেশ এবং ঋষিকে দেখে তার নবজন্ম লাভ হয়। ঋষির সরল-মুগ্ধ দৃষ্টি দেখে পতিতা অভিভূত হয়ে পড়েন–

> হৃদয়ে আমার নারীর মহিমা
> বাজায়ে উঠিল বিজয়ভেরী।
> ধন্য রে আমি, ধন্য বিধাতা
> সৃজিছে আমারে রমণী করি। (৩খ,পৃ.৯৬)

তাকে দেখে ঋষির পতিতা বলে মনে হয় নি। তিনি বিস্মিতকণ্ঠে বলেন :

> কোন দেব আজি আনিলে দিবা!
> তোমার পরশ অমৃতসরস
> তোমার নয়নে দিব্য বিভা। (৩খ,পৃ.৯৬)

অনেক চাটুবাক্য পতিতা শুনেছেন, কিন্তু এমন সত্যবাণী তিনি শোনেন নি। ঋষির কথায় তিনি নিজের ভিতরের দেবত্ব অনুভব করেন, তিনি বুঝতে পারেন মানুষের ভিতরেই দেবতা বাস করে। তিনি বলেন :

দেবতারে মোর কেহ তো চাহে নি
নিয়ে গেল সবে মাটির ঢেলা। (৩খ,পৃ.৯৭)

এখানে পতিতার সঙ্গে *চণ্ডালিকার* প্রকৃতির সামঞ্জস্য রয়েছে। নিগৃহীত পতিতা নারী ঋষির কথায় নিজের 'মানুষ' পরিচয় অনুভব করেন। আর তখনই অবসান ঘটান নিজের পতিতা জীবনের। প্রকৃতির মতো তার মধ্যে প্রেমিকনারীর উন্মেষ ঘটে। অন্য পতিতা নারীরা যখন ঋষিকে নিয়ে কামুকী খেলায় মত্ত হয়, তিনি আক্ষেপ করে বলেন :

আমি হয়ে ছাই তোমারে লুকাই
এমন ক্ষমতা দিল না বিধি। (৩খ,পৃ.৯৮)

তবে পতিতা প্রকৃতির আনন্দকে চাওয়ার মতো ঋষিকে কখনো পেতে চান নি। ঋষির পূজার ফুল মাথায় তুলে নিয়ে সমস্ত জীবন কাটাতে চেয়েছেন। এই ফুলের গন্ধেই তার হৃদয় ভরে থাকবে, অন্য কোনো গন্ধ আর কোনো দিন তিনি তার মনে ঢুকতে দেবেন না। তার কথা শুনে মন্ত্রী বাঁকা হাসি হেসেছেন। এতে থেমে যান নি পতিতা। তিনি মন্ত্রীকে বুঝিয়েছেন, একদিন তার পূজা হয়েছে, চিরদিন এই প্রতিমার বিসর্জন। এর চেয়ে বেশি তিনি চান না। তার মধ্যে যদি দেবতা নাও থাকে তাতেও দুঃখ নেই তিনি মাটির প্রতিমা। দেবতার লীলা সমাপন করে তিনি নিজেই জলে ঝাপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন করবেন। বারাঙ্গণার নিমর্ম জীবনে এমনি করেই সত্যপ্রেমের সন্ধান মিলেছে। তিনি নিজের মানবজন্মকে অনুভব করতে পেরেছেন। মন্ত্রীর সামনে তাই সত্য উচ্চারণ করতে তার বুক কাঁপে নি। তিনি স্পর্ধা করে বলেছেন–

তুমি অমাত্য রাজসভাসদ
তোমার ব্যাবসা ঘৃণ্যতর,
সিংহাসনের আড়ালে বসিয়া
মানুষের ফাঁদে মানুষ ধর। (৩খ,পৃ.৯৩)

শ্রীমতীও রাজ নটী। তিনি এরকম আরেক সত্যের সন্ধান পান। এই সত্যেরই জন্য নিজের নটী পরিচয় ঘুচান তিনি। শ্রীমতী সন্ধান পান সত্যধর্মের। যে দিন ভগবান বুদ্ধ বিম্বিসারের রাজবাড়িতে অশোকতলায় বসেছিলেন সেদিন শ্রীমতীকেও ডেকেছিলেন মহিষী লোকেশ্বরী। কিন্তু শ্রীমতী সে দিন যান নি। কারণ শ্রীমতীর মতে তাঁকে দেখা মানে পূজা দেওয়া, কিন্তু তখন তিনি মলিন ছিলেন, তার মধ্যে নৈবেদ্য প্রস্তুত ছিলো না। এ হলো তার মানসিক বোধ। তিনি বলেন :

> অত সহজে তাঁর কাছে গেলে যে যাওয়া ব্যর্থ হয়। তাঁকে কি চেয়ে দেখলেই দেখি, তাঁর কথা কানে শুনলেই কি শোনা যায়? (৯খ,পৃ.২৩০)

শ্রীমতী এরপর অন্তরে বুদ্ধকে পেয়েছেন। তাই বুদ্ধের জন্মতিথিতে পূজার অধিকার পান শ্রীমতী। তিনি অন্তরে সত্যকে পান বলেই সকল মানুষের সামনে সত্য উচ্চারণ করতে পারেন। রাজকন্যাদের মুখের উপর কথা বলতে তার এতটুকুও দ্বিধা হয় না। বলেন-

> কৃত্রিম সৌজন্যের দিন আমার গেছে। মিথ্যা স্তব করব না, স্পষ্টই বলব, তোমাদের চোখে যাঁকে দেখেছ তোমরা তাঁকে দেখ নি। (৯খ,পৃ.২৩০)

পতিতা নারী এবং শ্রীমতী দুজনেই অন্তরে সত্য উপলব্ধি করেছেন। তাই সাধারণ সংকোচ-ভয় তাদের কেটে গেছে। মন্ত্রী-রাজকন্যা কাউকেই ভয় পান নি। গহনা-স্বর্ণমুদ্রা-পুরস্কার কোনো কিছুর প্রলভনই তাদের আটকে রাখতে পারে নি। পতিতা নারী স্বর্ণমুদ্রা এবং পুরস্কার রাজমন্ত্রীকে ফিরিয়ে দিয়েছেন, শ্রীমতী গহনা এবং মূল্যবান বসন আগুনে নিক্ষেপ করেছেন। পতিতাকে জীবন দিতে হয় নি, কিন্তু শ্রীমতী নিজের জীবন দিয়েছেন তাঁর অন্তরের সত্যের জন্য। "নটী যে অবদান রেখে গেল তা বহু দিনের সঞ্চিত অন্ধকার ধূলিজালকে ছিন্ন করে দিল। ... রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য নাটকের মতো প্রেমের পরিণতি এখানে নেই। আছে জীবনের মহত্তম অবদান। পরম শ্রেয়কে পাওয়ার আনন্দে নটী তার শেষ নৃত্য সমাপন করেছে। সে আপন কামনা বাসনার ঊর্ধ্বলোকে আসীন। তার হৃদয়ের না-বলা অব্যক্ত কথাগুলো এখানে গান ও নাচের মধ্যে ফুটে উঠেছে। সচল ও সজীব হয়ে তা জীবন্ত রূপ পরিগ্রহ করেছে। এখানে মন, বুদ্ধিবৃত্তি ও চিত্তবৃত্তির মিলন ঘটেছে।"[৩৭] পতিতা এবং শ্রীমতীর কিছু অনৈক্যও আছে। পতিতা নারীর সত্য উপলব্ধি একান্তই তার নিজের। এর কারণে পারিবারিক-সামাজিক-রাষ্ট্রীয় কোনো কিছুর উপর প্রভাব পড়ে নি। শ্রীমতীর উপলব্ধি ধর্মবোধ। তাই রাজঅন্তঃপুরে যেমন পারিবারিক জীবনে প্রভাব ফেলে তেমনি রাষ্ট্রীয় জীবনেও। এ জন্য শ্রীমতীর মৃত্যু সংবাদ শুনে মহারাজ অজাতশত্রু ভয়ে কম্পিত হন, ক্ষত্রিয়-বিশ্বাসী রত্নাবলী বৌদ্ধমন্ত্র পড়ে বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করেন। অর্থাৎ পতিতা নারীর পরিসর ছোটো, শ্রীমতীর পরিসর বড়ো। তবে ছোটো পরিসরের কারণে পতিতা নারীর সংগ্রাম এবং সাহস বেশি দেখাতে হয়েছে, কারণ তার পিছনে কোনো সংঘবদ্ধ শক্তি বা আদর্শ নেই, এ শুধুই তার নিজের অনুভূতি। শ্রীমতীর ধর্মীয়বোধের পিছনে পুরো ধর্ম সম্প্রদায় এবং স্বয়ং মহিষী লোকেশ্বরী ছিলেন, তাই তাকে সাহস দেখাতে বেগ পেতে হয় নি। তাদের প্রেক্ষাপটও আলাদা। স্বীকৃত ধর্মবোধকে পালন করা কঠিন কিছু নয়, তাই শ্রীমতীর বিশ্বাসস্থাপন স্বাভাবিক। অন্যদিকে, পতিতা নারী অনেক বারাঙ্গণার সঙ্গে বনে গিয়েছেন, একইভাবে তারা ঋষিকে দেখেছেন। আবার ঋষি কোনো সত্যবাণীও তাদেরকে শোনান নি, কেবল পতিতার চেহারা এবং আচরণে মুগ্ধ হয়ে নিজের মনে বাক্য

উচ্চারণ করেছেন। এতেই একটি সত্য বোধ উপলব্ধ হয় পতিতার মনে। তিনি নিজের জীবনবোধ পরিবর্তন করে ফেলেন। বলা যায়, পতিতার বোধোদয় হয়েছে তার নিজেরই মধ্যে, শ্রীমতীর মতো বাইরের আরোপিত ধর্মবোধ নয়। আবার শ্রীমতীর ধর্মবোধ বাইরের হলেও তার অন্তরের উপলব্ধিই তাকে চরম সত্যে পৌঁছে দিয়েছে।

নলিনী-বাঁশরি-পুষ্পমালা– শিক্ষায় এবং সামাজিক মর্যাদায় এক। নলিনী এবং বাঁশরি প্রেমিক-সত্তা; পুষ্পমালা সামাজিক দায়িত্বপালনকারী।এরা তিনজনই উচ্চশিক্ষিত- ইংরেজিয়ানার সঙ্গে জড়িত। নলিনী-বাঁশরি সাহেবিয়ানার অনুকরণপ্রিয় পরিবারের সদস্য। পুষ্পমালার পরিবারের ঐতিহ্য সম্পর্কে নাটকে ইঙ্গিত নেই, তবে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ.তে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হওয়া মেয়ে। নলিনী ভারতীয় ঐতিহ্যের ধারক। "সাহেবিয়ানার কৃত্রিম আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হইলেও সে উহার অন্তঃসারশূন্যতা সম্বন্ধে ছিল যথেষ্ট সচেতন।"[৩৮] মা-বাবা তাকে সাহেবিয়ানার দিকে চালিত করতে চেয়েছেন, কিন্তু নলিনী কৌশলে তা এড়িয়েছেন। সবসময়ই তিনি নিজের ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী চলেছেন। তিনি সতীশকে ভালোবাসেন বলে সতীশের সকল আচরণ নির্দ্বিধায় মেনে নেন নি। সতীশের সাহেবিয়ানার অনুকরণের চেষ্টা দেখে তিনি বিরক্ত হন। এবং নিবারণের চেষ্টা করেন। আবার নন্দীর সাহেবিয়ানাকে ব্যঙ্গ করেন। কোনো পরিবেশ তার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। সতীশের দুঃসময়ে তার প্রেম বোঝা যায়। তিনি নিজের গহনা নিয়ে সতীশকে রক্ষা করতে ছুটে যান। নলিনীর বৈরি পরিবেশে ভারতীয় বোধ জাগ্রত রেখেছেন এবং কৃত্রিম সংস্কৃতিকে বর্জন করেছেন। নলিনী খুব ধীর-স্থিরভাবে নিজের কাজগুলো করেছেন। বাঁশরির সামাজিক এবং পারিবারিক পরিবেশ নলিনীর মতোই কিন্তু বাঁশরি নিজে ধীর-স্থির নন, সক্রিয় এবং চটপটে। "সমস্ত নাটকটি কম্পিত ও আবর্তিত হইয়াছে তাহার হৃদয়ের দুরন্ত ঝটিকায়।"[৩৯] সোমশংকর তাকে বাদ দিয়ে সুষমাকে বিয়ে করছে দেখে বিয়ে আটকাতে বাঁশরি সকল চেষ্টা করেন। তিনি সোমশঙ্করের কাছে যান, সুষমার সঙ্গে কথা বলেন, পুরন্দরের সঙ্গে বিতর্ক করেন। আধুনিক সোমশঙ্কর তারই সৃষ্টি। যে সোমশঙ্কর প্রথম কলকাতায় এসেছিলেন তিনি ছিলেন প্রায় মধ্যযুগীয়। একটু একটু করে তৈরিকরা সোমশংকরকে বাঁশরি প্রচণ্ডভাবে ভালোবাসেন। চোখের সামনে সোমশংকর অন্য মেয়েকে বিয়ে করছে, তাও আবার সোমশংকরও সুষমাকে ভালোবাসেন না, সুষমাও সোমশংকরকে ভালোবাসেন না। এ রকম একটি অবস্থায় নিজের প্রেমিকপুরুষকে বাঁশরি ছাড়তে পারেন না। এ জন্যই তার সমস্ত সংগ্রাম। এই সংগ্রাম করতে গিয়ে তিনি ক্ষিতীশকে ব্যবহার করেছেন। এখানেই বাঁশরি চরিত্রের কলুষ দিক। ক্ষিতীশের সঙ্গে বিয়ের প্রতিশ্রুতিতেও গেছেন। এরপরই তিনি জানতে পেরেছেন সোমশংকর তাকে আগের মতোই ভালোবাসেন, শুধুমাত্র ব্রত পালনের জন্য সুষমাকে বিয়ে করছেন। বাঁশরি এ কথায় ক্ষিতীশকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত বাতিল করেন। সোমশংকরের

ভালোবাসার বোধকে হৃদয়ে ধারণ করে জীবন কাটানোর সিদ্ধান্ত নেন। বাঁশরির সিদ্ধান্ত বুদ্ধিদীপ্ত নয়– আবেগনির্ভর। বাস্তব জীবনের কোনো অনুষঙ্গই তিনি চিন্তা করেন নি। সংসার জীবনে সোমশংকর এবং সুষমার মধ্যে যে প্রেমের জন্ম হবে না, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। এ বিষয়ে বাঁশরি কোনো চিন্তা করেন নি। সোমশংকরের কথা শুনে তিনি দ্বিধাহীনভাবে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। এটা বাস্তব আচরণ নয়, বরং তিনি প্রথমে বিয়ে ঠেকানোর জন্য যে আচরণ করেছিলেন তা অনেক বাস্তববোধসম্পন্ন। বাঁশরির এই আচরণের সঙ্গে দেবযানীর আচরণে ঐক্য রয়েছে। "একমাত্র দেবযানীই বোধ করি বাঁশরীর সর্বাংশে সমকক্ষ। দৃপ্ত, দর্পিত, উদ্ধত, স্বয়ং অদৃষ্টকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বানে উদ্যত। প্রেমের অবমাননায় ইহারা ইন্ধনহীন শিখার মতো নিষ্ঠুর নির্মম বিলাসিনী রোমান-সম্রাজ্ঞী হইয়া উঠিতে পারে, আবার প্রেমের জন্যই ইহারা অকস্মাৎ অকাতরে সর্ববিসর্জনপর অর্ধ-শাটিমাত্র-সহায় দময়ন্তীর মতো অরণ্য-অন্ধকারে নিঃশেষ আত্মবিলোপে সমর্থ।"[৪০] নলিনীর সঙ্গে বাঁশরির পার্থক্য এখানে যে, বাঁশরি ক্ষিতীশের সঙ্গে যে আচরণ করলেন তা ভারতীয় নারীর রূপ নয়। সাহেবিয়ানার কৃত্রিম রূপ– স্বার্থপরতা। নিজের প্রেমকে তিনি দেহাতীত করেছেন, আধ্যাত্মিকতার স্তরে উন্নীত করেছেন কিন্তু ক্ষিতীশের মন নিয়ে খেলতে দ্বিধা করেন নি। বাঁশরি নিজের প্রেমের ক্ষেত্রে দেবযানীর একেবারে বিপরীত। প্রেমিককে না পেয়ে তিনি একা থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং প্রেমকে আধ্যাত্মিকতার স্তরে নিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রেমবোধের এ এক বোধ– কামগন্ধহীন বিশুদ্ধ প্রেম– 'অঙ্গবিহীন আলিঙ্গনে সকল অঙ্গ ভরে'র বোধ। দেবযানী এই বোধের অনুসারী হতে পারেন নি। তিনি প্রেমিককে সংসারের প্রতিদিনের জীবনে না পেয়ে অভিশাপ দিয়েছেন। লাবণ্যও বাঁশরির চেয়ে বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন। এ কারণে তিনি অমিতের ভাবের কথায় না ভুলে শোভনলালকে বিয়ে করে সংসারী হয়েছেন। এ ক্ষেত্রে বাঁশরিকে সাংসারিকবুদ্ধিহীন আবেগাপ্লুত নারী বলা যায়।

অন্যদিকে, পুষ্পমালা শিক্ষিত-বুদ্ধিদীপ্ত নারী। নলিনী এবং বাঁশরির মতো তার প্রেমসংক্রান্ত কোনো সমস্যা নেই। পরিবার তাকে সাহেবিয়ানার দিকে ঠেলে দেয় নি, তিনি একটি গ্রামের দুজন তরুণকে কুসংস্কার থেকে ফিরিয়ে সংসারমুখী করেছেন। "পাড়া-গাঁর পরিবেশে পুষ্প যেমন বে-মানান, এই সরল নাটকের মধ্যেও তেমনি সে বেমানান।"[৪১] শুধুমাত্র বুদ্ধি-একাগ্রতা এবং জেদে তিনি নলিনী-বাঁশরির সমগোত্রীয়।

রবীন্দ্রনাথের দুটি অসামান্য সৃষ্টি অমাবাই-রমাবাই। দুজনই ধর্ম ও সতীত্বের কথা বলেছেন। কিন্তু তাদের আদর্শগত ধারণা বিপরীতধর্মী। অমাবাই হৃদয়ধর্মের অনুসারি, রমাবাই ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুসারি। অমাবাই প্রেমিকনারী। প্রেমে জাতিকূলবিচার নেই। যবনকে বিয়ে করে তার জাতি-ধর্ম-সতীত্ব নষ্ট হয়েছে তা তিনি বিশ্বাস করেন না।

হয়েছি যবনী
পবিত্র অন্তরে; নহি পতিতা রমণী-
পরিতাপে অপমানে অবনতশিরে
মোর পতিধর্ম হতে নাহি যাব ফিরে
ধর্মান্তরে অপরাধীসম। (৩খ,পৃ.১০৬)

অমাবাই এবং প্রকৃতি ধর্মের বোধে এক। প্রকৃতি বলেছেন :

যে-ধর্ম অপমান করে সে-ধর্ম মিথ্যে। অন্ধ ক'রে, মুখ বন্ধ ক'রে সবাই মিলে সেই ধর্ম আমাকে মানিয়েছে। কিন্তু সে দিন থেকে এই ধর্ম মানা আমার বারণ। (১২খ,পৃ.২১৯)

অর্থাৎ প্রকৃতি মানবধর্মকেই আক্রে ধরেছেন। অমাবাইয়ের কাছেও ধর্মের চেয়ে মানুষ বড়ো। "অমাবাই সত্যধর্মের তুলাদণ্ডে তাহার নিজের সমস্ত আচরণ মাপ করিয়াছে, তাহাতে বিন্দুমাত্র দোষ সে দেখে নাই। তাই তাহার কার্যে সে লজ্জিত নয়, অনুতপ্ত নয়, পিতা-মাতার ক্ষুদ্র সমাজধর্মের ব্যাখ্যায়, তাহাদের দুঃখ-লজ্জায় সে বিচলিত হয় নাই।"[৪২] রমাবাই অমাবাইয়ের মা। রমাবাই উগ্রধর্মবাদী। সংস্কারপ্রথা এবং লোকমতে তার পূর্ণবিশ্বাস। তার কাছে মানবধর্ম বা হৃদয়ধর্মের কোনো স্থান নাই। ব্রাহ্মণ জীবাজীর সঙ্গে অমাবাইয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছিল, রমাবাই মনে করেন যে জীবাজীই তার স্বামী। অথচ, যে যবনের সঙ্গে অমাবাইয়ের বিয়ে হয়েছে, সংসার করেছে, সন্তানের জন্ম হয়েছে, সেই যবনকে রমাবাই বলছেন পরপুরুষ। তাই রমাবাই জীবাজীর সঙ্গে অমাবাইকে জোর করে সহমরণে দেন। "এই নিষ্ঠুরতা আদৌ ধর্মরক্ষার জন্য নয়, ধর্মকে পতিত করার চেয়েও বড় এ পাপ, এ নারকীয় হত্যাকাণ্ড রমাবাইয়ের আত্মপক্ষ সমর্থনেরই উপায় মাত্র, দ্বিতীয় পথের দ্বিধা তাঁর চরিত্রে নেই, তিনি জানেন যে তিনি যা করছেন সেটাই একমাত্র পথ, কারণ তিনি মৌলবাদী। কন্যাকে দগ্ধ করে মারা– সে তো কন্যারই মঙ্গলের জন্য, এতে দ্বন্দ্ব দেখা দেবে কেন? অমাবাইয়ের চরিত্রেও দ্বন্দ্ব নেই। মৃত্যুর কষ্ট আছে, শিশু সন্তানকে ছেড়ে আসার দুঃখ আছে, পরপুরুষের সঙ্গে সহমরণে মরবার অপরিসীম লজ্জা আছে, মাতার বিবেকহীনতায় ধিক্কার আছে কিন্তু তাঁর চিত্তে কোনো বিভ্রান্তি নেই, তিনি তাঁর হৃদয় ধর্মের বিশ্বাসে স্থিত।"[৪৩]"অমাবাই যে-জ্ঞান দিনে দিনে ঠেকিয়া ঠেকিয়া লাভ করিয়াছে, রমাবাই যাহা কখনো লাভ করিতে পারিল না।"[৪৪] রমাবাই সনাতনপন্থী, অমাবাই আধুনিকবোধসম্পন্ন হৃদয়ধর্মপন্থী। "কন্যা অমাবাই যেমন সত্যধর্মে স্থির-বিশ্বাসী, মাতা রমাবাই তেমনি ক্ষুদ্র সমাজধর্মে অবিচল-বিশ্বাসী। দুইটি নারীচরিত্রের মধ্যেই কোনো দ্বন্দ্ব নাই। উভয়েই নিজ নিজ বিশ্বাসের দুর্ভেদ্য পাষাণপ্রাচীরে সুরক্ষিত।"[৪৫] অমাবাই এবং মালিনীর মধ্যে এক ধরনের সম্পর্ক রয়েছে। তারা দুজনেই কন্যা চরিত্র। দুজনেই তাদের সমাজের প্রচলিত ধর্মের বাইরে নতুন ধর্মের কথা বলেছেন। অমাবাই বলেছেন মানবধর্মের কথা, মালিনী বলেছেন অহিংস বৌদ্ধ ধর্মের কথা। এবং তাদের দুজনের জীবনেই তাদের নিজ নিজ মা বড়ো

ভূমিকা পালন করেছে। এ ক্ষেত্রে মালিনী ভাগ্যবান, কারণ তার মা তাকে সাহায্য করেছেন, নিজে তার ধর্মমত গ্রহণ করেছেন, এবং তার শিষ্যদেরকে সেবার ভারও নিয়েছেন। অন্যদিকে অমাবাই তার মা রমাবাইয়ের হিংস্রতার শিকার হয়েছেন। কন্যার উপর মায়ের আচরণ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রকৃতিও মালিনীর সঙ্গে তুলনীয়। প্রকৃতি জাতিভেদ না মেনে ভিক্ষু আনন্দকে পেতে মায়ের কাছে মন্ত্র পড়ার জেদ ধরেছেন। এখানে প্রকৃতির মা রমাবাইয়ের মতো নারী হলে প্রকৃতির ভাগ্যে কোনো নিষ্ঠুরতা ঘটতো। কিন্তু চণ্ডালিনী-মা প্রকৃতিকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন এবং অবশেষে কন্যার আবদার মেনে নিয়ে মন্ত্র পড়ে নিজে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। প্রকৃতির মা-ভাগ্য মালিনীর চেয়েও বেশি।

রাজা নাটকে সুদর্শনা এবং সুরঙ্গনার সামাজিক মর্যাদা এবং মানসিকবোধ সম্পূর্ণ আলাদা। তারপরও তাদের মধ্যে একটি সাধারণ মিল আছে। তা হলো– সাধনায় উত্তরণের আগে এরা দুজনই বাহ্যিক সৌন্দর্যের সাধক ছিলেন। তাছাড়া, তারা দুজনেই প্রথমাবস্থায় রাজাকে দেখে ভয় পেয়েছেন। এরপর দুঃখের পথ অতিক্রম করে দুজনেই রাজাকে বলেছেন সৌন্দর্যের অতিরিক্ত কিছু– অনুপম। সুদর্শনা অন্ধকারে রাজাকে অনুভব করে মাঝে মাঝে ভয় পান। তিনি বলেন :

> এই অন্ধকারের মধ্যে যখন তোমাকে দেখতে না পাই অথচ তুমি আছ বলে জানি, তখন এক-একবার কেমন-একটা ভয়ে আমার বুকের ভিতরটা কেঁপে ওঠে! (৫খ,পৃ.২৭৩)

শুধু অন্ধকারেই নয়, রাজাকে যখন তিনি প্রথমবার আগুনের আভায় সামনাসামনি দেখেন তখনো 'ভয়ানক' বলেন। একেবারে শেষ দৃশ্যে রাজাকে তিনি 'অনুপম' বলেছেন। সুরঙ্গমাও তাই। যখন 'নষ্ট হবার পথ' থেকে রাজা তাকে নিজের কাছে নিয়ে আসেন, তখন তিনি রাজাকে মনে করেছেন 'নিষ্ঠুর!, অবিচলিত নিষ্ঠুরতা!' এরপর আস্তে আস্তে রাজার প্রতি ভক্তি জন্ম নিলো। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন :

> যত ভয়ানক ততই সুন্দর। বেঁচে গেলুম, বেঁচে গেলুম, জন্মের মতো বেঁচে গেলুম। (৫খ,পৃ.২৭০)

শ্রীমতী নির্ঝরিণী সরকারকে রবীন্দ্রনাথ চিঠিতে লিখেছিলেন :

> নিজেকে সংসারের সকলের চেয়ে নীচে রাখ সুখ পাইবে– সেই তোমার দীনতার আসনে ভগবান তোমাকে সঙ্গ দিবেন।[৪৬]

এই 'দীনতার আসনে'র সন্ধান সুরঙ্গমা পেয়েছেন। নাটকে তার সাধনা-উত্তীর্ণ সময় দেখানো হয়েছে। আর সুদর্শনার সমগ্র পথপরিক্রমা দেখানো হয়েছে। সুদর্শনা তাই নিজের অজান্তেই পাপ করে চলেছেন। আর সুরঙ্গমা সুদর্শনার পাপ নিজের গায়ে মেখে সুদর্শনার কলঙ্ক কমাতে চান। "এতদিন সে অন্ধকার ঘরের দাসী ছিল, সে

আপনার ভিতরকার সাধনার নিষ্ঠার মধ্যেই স্থির হইয়া থাকিতে চাহিয়াছিল। এখন সে সংসারে আসিয়া সকলের কলঙ্কভাগী, সকলের পাপের দাহের অংশ গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। কারণ, তাহা না হইলে পাপ তো যায় না। পাপ যায় পাপের ভার গ্রহণ করিলে, অর্থাৎ পাপ যায় প্রেমে– কারণ, প্রেমেই ভার লয়, ভার বয়।"[৪৭] এখানে সুরঙ্গমার গান উল্লেখযোগ্য–

আমি তোমার প্রেমে হব সবার
কলঙ্কভাগী।
আমি সকল দাগে হব দাগি। (৫খ,পৃ.৩০১)

অন্যদিকে, "সুরঙ্গমার এই প্রেম, এই অচল নিষ্ঠাই সুদর্শনাকে ভিতরে ভিতরে গলাইয়াছে।"[৪৮] সুদর্শনা রাজা সম্পর্কে কিছুই জানেন না, রাজাকে নিয়ে বলা তার সকল কথাই ভুল প্রমাণিত হয়। তিনি বলেছিলেন, রাজাকে তিনি চিনতে পারবেন, পারেন নি। বরং প্রতারিত হয়েছেন। অন্যদিকে, রাজাকে নিয়ে সুরঙ্গমার সকল কথাই নির্ভুল। রানিকে তিনি বলেছেন–

রানী, তোমার কৌতূহলকে শেষকালে কেঁদে ফিরে আসতে হবে। (৫খ,পৃ.২৭৪)

আবার, বসন্ত উৎসবে ঠাকুরদার সঙ্গে সুরঙ্গমার কথোপোকথন এরকম –

সুরঙ্গমা। দেখো ঠাকুরদা, আজ এই উৎসবের ভিতরে ভিতরে কেবলই আমার মনে হচ্ছে, রাজা আমাকে এবার দুঃখ দেবেন।

ঠাকুরদা। দুঃখ দেবেন!

সুরঙ্গমা। হাঁ ঠাকুরদা। এবার আমাকে দূরে পাঠিয়ে দেবেন, অনেক দিন কাছে আছি সে তাঁর সইছে না। (৫খ,পৃ.২৯৪)

সুদর্শনার মনের চাওয়া ঠিক না হলেও সুরঙ্গমার মনে হওয়া কথাও ঠিক হলো। সুদর্শনাকে যেমন কাঁদতে হলো, তেমনি সুদর্শনার সঙ্গে সুরঙ্গমাকেও দূরে চলে যেতে হলো। তবে সুদর্শনা মানবচরিত্র। "সুদর্শনার বেদনা, আত্মদ্বন্দ্ব, গ্লানির অনুভূতি, অনুশোচনা ও বিনতি পাঠকের মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করে।"[৪৯] অন্যদিকে সুরঙ্গমার একমুখী, তত্ত্বপ্রধান, আধ্যাত্মিকচরিত্র পাঠককে আকর্ষণ করে না।

সুরঙ্গমা-শ্রীমতী চরিত্র দুটির মধ্যেও ঐক্য এবং দ্বন্দ্ব সুস্পষ্ট। সুরঙ্গমা নষ্ট হওয়ার পথে গিয়েছিলেন, শ্রীমতী ছিলেন রাজনটী। এরপর সুরঙ্গমা রাজার অনুগ্রহ লাভ করে রাজার কাজের দায়িত্ব পান, শ্রীমতীও ভগবান বুদ্ধের অনুগ্রহ লাভ করে পূজা করার অনুমতি পান। অর্থাৎ তাদের জীবনের প্রথম এবং পরিণতি পর্যায়ের ইতিহাস এক। দুজনেই একমুখী এবং দ্বিধা-দ্বন্দ্বহীন চরিত্র– নিজের ধর্মে সমর্পিত প্রাণ। সুরঙ্গমা রাজার দায়িত্ব পালনে কোনো বাধা পান নি এবং তার কর্মের মধ্য দিয়ে নাটকের কোনো বিশিষ্ট রস পরিণতি লাভ করে নি। তিনি শুধুমাত্র সুদর্শনাকে রাজা

সম্পর্কে বলেছেন, এবং রাজার স্বরূপ প্রকাশ করেছেন। সুদর্শনার পরিণতিতে নাটকের পরিণতি লাভ করেছে। অন্যদিকে, শ্রীমতীর পদেপদেই বাধা, নিজের বিচারবুদ্ধি দিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে এবং ধর্মের জন্য জীবনও দিতে হয়েছে। তাছাড়া "শ্রীমতীর নৃত্যই ত নাটকটির সমস্ত কথা ও ভাববস্তুকে একটি রসসমগ্রতা দান করিয়াছে।"[৫০]

ভানুমতি-রমাবাই-মল্লিকা চরিত্র তিনটি নিজ ধর্মে দৃঢ়চেতা চরিত্র। ভানুমতি এবং মল্লিকা ক্ষত্রিয় ধর্মের ধারক, রমাবাই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের। এরা তিনজনই হিংস্র প্রকৃতির। ভানুমতি এবং রমাবাই প্রত্যক্ষভাবে কাজ করেছেন, মল্লিকা কৌশলে কাজ করেছেন। ভানুমতি-মল্লিকা রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে সংযুক্ত, রমাবাই নিজস্ব ধর্মমতের সঙ্গে যুক্ত। তবে রাজনৈতিক কূটকৌশল এবং ধর্মীয় লেবাসের কৌশলী মল্লিকা চরিত্র ধূর্ত প্রকৃতির মানুষ। নিজেকে আড়ালে রেখে তিনি কর্ম উদ্ধার করেছেন। ভানুমতি এবং রমাবাই সরাসরি কাজ করেছেন।

নন্দিনী এবং কুমুদিনী দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্র, বিপরীত প্রেক্ষাপট কিন্তু শক্তিতে এক। তারা সচেতনভাবে বহুদিনের চেপেথাকা প্রথা বা রীতির পরিবর্তন চান। নন্দিনী অপেক্ষাকৃত বড়ো পরিসরে, রাজনিয়মের ভীত নড়ানোর জন্য প্রথমে ইচ্ছা করেছেন, তারপর সংগ্রাম করেছেন। কুমুদিনীর পরিসর ছেটো, কিন্তু যুগে যুগে গড়ে ওঠা প্রথার ভার অনেক বড়ো। প্রকৃতির স্নিগ্ধতার বিরুদ্ধে যন্ত্রের দাম্ভিকতার অবসানের জন্য নন্দিনী চেষ্টা করেছেন। রাজা তাকে আপন খেয়ালে যক্ষপুরীতে এনেছেন। কিন্তু রাজার খেয়ালে তার জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় নি। নিজের খেয়ালে তিনি সাজপোশাক করেছেন, ঘুরে বেড়িয়েছেন। অধ্যাপকের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন :

> অবাক হয়ে দেখছি, সমস্ত শহর মাটির তলাটার মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে অন্ধকার হাতড়ে বেড়াচ্ছে। পাতালে সুড়ঙ্গ খুদে তোমরা যক্ষের ধন বের করে করে আনছ। সে যে অনেক যুগের মরা ধন, পৃথিবী তাকে কবর দিয়ে রেখেছিল। (৮খ,পৃ.৩৫৮)

এই রকম, কুমুদিনীও মধুসূদনের বাড়ি গিয়ে সেখানকার রীতিনীতি দেখে অবাক হয়েছেন। কুমুদিনী ভাইয়ের সঙ্গে নান্দনিক জীবনযাপন করেছিলেন। মানুষের আচরণ যে এতোটা স্থূল হতে পারে, তা তার ধারণাও ছিলো না। তিনি ভাই বিপ্রদাসকে বলেছেন :

> আমি বরাবর কেবল তোমাকেই জানি, এখান থেকে অন্য জায়গা যে এত বেশি তফাত তা আমি মনে করতে পারতুম না। ছেলেবেলা থেকে আমি যা-কিছু কল্পনা করেছি সব তোমাদেরই ছাঁচে। তাই মনে একটুও ভয় হয় নি। মাকে অনেক সময়ে বাবা কষ্ট দিয়েছেন জানি, কিন্তু সে ছিল দুরন্তপনা, তার আঘাত বাইরে, ভিতরে নয়। এখানে সমস্তটাই অন্তরে অন্তরে আমার যেন অপমান। (১৮খ,পৃ.২০৮)

অর্থাৎ তারা দুজনই নিজের চেনা জগতের বাইরে অন্য জগতে প্রবেশ করেছেন। এ জগতটি স্বস্থিকর নয়। নন্দিনীর কাছে এটি আশ্চর্যজনক এবং কুমুদিনীর কাছে অপমানজনক স্থান। নন্দিনী দেখেন যক্ষপুরীতে মানুষের বন্দিত্ব, অন্যদিকে, "পুঁজি ও প্রভুত্ববিস্তারে সবিশেষ মনোযোগী মধুসূদনের যক্ষপুরীতে বন্দিনী কুমু।"[৫১]কুমুদিনী যদিও নিজের অধিকারের জন্য সংগ্রাম করেছেন, কিন্তু সে সংগ্রাম আসলে যুগ যুগ ধরে চলে আসা পারিবারিক-পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। ভারতবর্ষে সুন্দরের বিরুদ্ধে অসুন্দরের দৌরাত্মের অবসানের জন্য কুমুদিনী লড়াই করেছেন। "কুমুর মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক সভ্যতার ইতিবাচক প্রান্ত নারী-ব্যক্তিত্বের প্রশ্নটি উপস্থাপন করেছেন।"[৫২]অন্যদিকে, যক্ষপুরীতে নন্দিনী মুক্তিদাত্রীরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। "... নন্দিনীর প্রাণের বেগ এসে যখন পড়ল এই অন্ধ রাজকীয় যন্ত্রশক্তির ওপর, তখন তার বন্ধনমুক্তি।"[৫৩] যে রাজশক্তির বিরুদ্ধে নন্দিনী সংগ্রাম করেছেন, সেই রাজা নন্দিনীর দলে ভিড়েছেন। তাই নন্দিনীর সংগ্রাম সফল। কুমুদিনী কাউকে মুক্ততো করতে পারেনই নি, নিজেও এক অনিশ্চিত জীবনে পা রেখেছেন। কাঙ্ক্ষিত ফল না পেলেও সংগ্রামে তিনি সফল। অবশ্য মধুসূদন শেষ পর্যন্ত বিপ্রদাসের পায়ে প্রণাম করেছে, তবে শেষ পর্যন্ত মধুসূদনের আচরণ ভদ্রোচিত হবে কি না বোঝা যায় না। নন্দিনী এবং কুমুদিনী দুজনই স্বাধীনতাকামী। কিন্তু কঠোর বাস্তবতার কষাঘাতে জর্জরিত। নন্দিনী এবং কুমুদিনীর মতো আরেকটি স্বাধীন চরিত্র রয়েছে, *গৃহপ্রবেশের* মণি। অবশ্য মণির স্বভাব বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নন্দিনী-কুমুদিনীর মতো নয়। মণি বাস্তব সংসারে থেকে নির্লিপ্ত-উদাসীনভাবে স্বাধীন জীবনযাপন করেছে। বাস্তবতা তাকে ধরাশায়ী করতে পারে নি। স্বামী অসুস্থ অবস্থায় শয্যাশায়ী, মাসীশাশুড়ী এবং ননদ তাকে স্বামীর কাছে যেতে বলছে, প্রতিবেশিরা কানাঘুষো করছে, কিন্তু মণি নিজে নির্লিপ্ত। কোনো দায়িত্ব-কর্তব্যবোধ তাকে স্পর্শ করে নি। সে নির্দ্বিধায় বলেছে :

> মাসি, আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও। আমি দিনরাত এই-সব রোগের কাজ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে পারব না। (৯খ,পৃ.১৭৪)

মণির নিজের পক্ষে কোনো যুক্তি নেই। তার সঙ্গে স্বামী বা শ্বশুরবাড়ির কারো কোনো বিরোধ নেই। শুধুমাত্র তার মনের ইচ্ছাই তাকে সংসারের শোক-দুঃখ থেকে দুরে রেখেছে। সে পশুপাখি-গাছ-ফুল ভালোবাসে, নাটক-থিয়েটার-চিড়িয়াখানা ভালোবাসে কিন্তু অসুস্থ স্বামীকে ভালোবাসে না। অথচ স্বামী যতীন তাকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসেন। মণি বিধাতার এক ব্যতিক্রমী চরিত্র। হতে পারে, সে কেবল সুন্দরেরই পূজারি। সুন্দরের সঙ্গে যে কাঁটা আছে, তাকে পছন্দ করে না। অসুস্থ মানুষ এবং তার জন্য করণীয় কাজ তার কাছে অসুন্দর মনে হয়। তাই সে এদের কাছে ঘেষে না। নন্দিনী এবং কুমুদিনী যেমন মানবিক, যুক্তিবাদী এবং ন্যায়নিষ্ঠ, মণি তা নয়। মণি রবীন্দ্রমানসের এক খেয়ালি চরিত্র। সমাজে বাস করেও সমাজছাড়া। এমনি নিজ সমাজের সমাজছাড়া আরেকজন

নারী মোতির মা চরিত্রটি। মণির সঙ্গে তার কোনো সাদৃশ্য নেই, কেবল 'সমাজছাড়া' বৈশিষ্টটি রয়েছে; তা ঋণাত্মক অর্থে নয়, ধনাত্মক অর্থে। তিনি স্থূল পরিবারের মেয়ে স্থূল পরিবারের বউ, কিন্তু নিজে মানবিকতায় সূক্ষ্মবোধসম্পন্ন। নিজসমাজের বৈশিষ্ট্য ধারণ করেন নি। তাই তিনি কুমুদিনীর প্রতি মমত্ববোধসম্পন্ন। কুমুদিনী সংসারের কর্ত্রী হয়ে এলে, তিনি কুমুদিনীকে ঈর্ষা করেন নি। আবার কোনো লোভও তার নেই। তারই মতো অপ্রধান চরিত্র ভানুমতি-ক্ষীরো লোভী চরিত্র। ভানুমতি রাজ-মহিষী আর ক্ষীরো রানির দাসী। তারা একইভাবে নিজেদের লোভ প্রকাশ করেছে। তাদের চরিত্রে কোনো রকম মানবতা বা নীতিবোধ নেই। এমনকি পূর্বাপর চিন্তাও নেই। ভানুমতি কখনোই নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করে নি, বরং ক্ষত্রিয় নারীর স্পর্ধা তার চরিত্রে– তার চরিত্রে কোনো স্নেহ-মমতা নেই। অন্যদিকে, স্বপ্ন দেখে ক্ষীরোর মধ্যে অনুশোচনার উদ্রেক ঘটেছে।

"রবীন্দ্রনাথের চরিত্রসৃষ্টির মূলবৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি সমাজ, পরিবার এবং ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ব্যক্তিত্বকে স্থাপন করে, দ্বান্দ্বক পদ্ধতিতে চরিত্রগুলিকে বিকশিত করেন। সর্বোপরি সমগ্র দ্বন্দ্বের এবং যন্ত্রণার পরিমণ্ডলে কার্যকরী থাকে রবীন্দ্রমানসের নিরাসক্তি; প্রতিটি চরিত্রকে তিনি যথাযথ রূপদান করেন। এবং এই সামগ্রিক দ্বন্দ্ব লালিত হয় বৃহত ঐক্যবোধে– এর মধ্য থেকেই জীবনসংক্রান্ত এবং সমাজ-সভ্যতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছাটিও প্রতিফলিত হয়।"[৫৪] এই কথার সত্যতা পাওয়া যায় তাঁর প্রতিটি চরিত্র সৃষ্টিতে। *বাল্মীকির প্রতিভা* এবং *প্রকৃতির প্রতিশোধ* দুটি নাটকে দুজন বালিকার চরিত্রের মধ্য দিয়ে তাঁর নিরাসক্ত বোধ আরো চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। তারা দুজনেই অসহায়। একজন দস্যু দ্বারা ধৃত হয়ে বন্দী। তাকে দেবীর সামনে বলি দেওয়া হবে। অন্যজন ধর্মভ্রষ্ঠা রঘুর দুহিতা, তার সঙ্গে কেউ কথা বলে না, কাছে ডাকে না, আশ্রয় দেয় না। তাই মুক্ত অবস্থায় থাকলেও বন্দীর মতোই বিধ্বস্থ। তবে দুজনের ভিতরে সরল-সহজ শক্তি আছে। তার মাধ্যমে প্রকৃতির বিরুদ্ধে দাঁড়ানো দুজন শক্তিমান পুরুষের মানস পরিবর্তন করেছে তারা দুজন। অথচ চরিত্র দুটিই তাদের স্বাভাবিক নিয়মে বহমান ছিলো। তারা একই ধরনের কাজ করলেও তাদের কিছু পার্থক্য রয়েছে। প্রথমজন নিজের প্রাণ বধের ভয়ে আর্ত-কান্না করে। এই ভয়ার্ত কান্না বাল্মীকিকে মানবিক করে তোলে। খুব অল্প সময়েই সে দুঃসাধ্য সাধন করে। দ্বিতীয়জন সন্ন্যাসীকে ভালোবাসা দেয়। "শুধু তাহার ভালবাসা দিয়া ক্ষুদ্র বালিকা সন্ন্যাসীকে সংসারের স্নেহবন্ধনের মধ্যে ফিরাইয়া আনিল।"[৫৫]

খুব সাধারণ দুটি চরিত্র বিভা-হিমি। তাদের চরিত্রে সততা, ভালোবাসাপূর্ণ হৃদয়, সহানুভূতিপূর্ণ মন, বিবেক-বুদ্ধি, হিংসাহীনতা সমভাবে বিদ্যমান। তারা দুজনই নায়কের বোন। ভায়ের প্রতি দায়িত্ববান। বিভা রাজকন্যা এবং

বিবাহিত। কিন্তু পিতার খামখেয়ালিপনার জন্য স্বামীর বাড়ি যেতে পারেন নি, স্বামীর প্রতি তার ভালোবাসা এবং কর্তব্যবোধ আছে। তেমনি ভালোবাসা এবং কর্তব্যবোধ রয়েছে ভাই উদয়াদিত্য এবং ভাতৃবধূ সুরমার প্রতি। স্বামীর অপমান হবে বলে তিনি চিঠি লিখে নিজের বাড়ি স্বামীকে আসতেও বলেন না। পিতার উপর অভিমান করে থাকেন–

> আমার নিজের জন্যে অভিমান করি বুঝি! তিনি যে মানী, তাঁর অপমান কেন হবে?(৫খ,পৃ.২২৩)

ভালোবাসা-সম্পদ এই স্বামী এসে বিভার মাকে অপমান করে। তাই দুর্ঘটনা এড়াতে রাজার অগোচরে ভাই উদয়াদিত্য বিভার স্বামীকে তার দেশে পাঠিয়ে দেন। এ ঘটনায় ভাইয়ের প্রতি তার কর্তব্য আরো বেড়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে তার বৌদি মারা যান আর ভাই বন্দি হন। তিনি ভায়ের প্রতি এতোটাই কর্তব্যপরায়ণ যে, স্বামীর বাড়ি থেকে তাকে নিতে এলে তিনি ভাইকে কারাগারে একা ফেলে নিজের সুখের জন্য যান না, বরং ভাইয়ের দুঃখের ভাগ নিতে বাবার বাড়িতেই থাকেন। কিন্তু তার ভাগ্য নির্মম। কয়েকদিন পর ভাই উদয়াদিত্য যখন তাকে স্বামীর দেশে নিয়ে যান তখন দেখতে পান তার স্বামী ধূমধাম করে বিয়ে করতে যাচ্ছে। তার ভক্ত তাকে জানায়, সময় ফুরিয়ে গেছে। তিনি বলেন :

> আমি তপস্যা করে ফেরাব– আমি জীবন-মন দিয়ে ফেরাব। (৫খ,পৃ.২৬৩)

কিন্তু সত্যিই সে সময় আর নেই। তখন তিনি ভায়ের সঙ্গে কাশী রওনা হন। স্বামীর রাজত্বে গিয়ে মহিষী হতে পারলেন না। তার কষ্ট সম্পর্কে রামমোহন বলে–

> মা, তোমার পিতার হাতের আঘাত সেও তুমিই মাথায় করে নিয়েছ– আবার তোমার স্বামীর হাতের আঘাত সেও তুমিই নিলে। (৫খ,পৃ.২৬৪)

সংসারে বিভার জায়গা হলো না। উদায়াদিত্য, ধনঞ্জয় বৈরাগী, রামমোহনের সঙ্গে হাওয়ার মুখে তিনি ভাসিয়ে দিলেন তরী। বিভা চিরবঞ্চিত। তার পিতা তার মনের আবেগ বোঝেন নি বলে তাকে স্বামীর বাড়ি পাঠান নি অথবা তার স্বামীকে নিজের বাড়ি নিমন্ত্রণ করেন নি। তাই বিভা একদিকে যেমন স্বামী-সংসার পান নি, অন্যদিকে স্বামীর রাজ্যে মহিষী হওয়া থেকেও বঞ্চিত হয়েছেন। দাদামশাই বসন্ত রায় এবং বউদিদি সুরমাকে তিনি ভালোবাসতেন। রাজনৈতিক কারণে তাদের দুজনেরই মৃত্যু হলো। বেঁচে রইলেন শুধু দাদা উদয়াদিত্য। এই উদয়াদিত্যের সঙ্গেই তিনি কাশী গেলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি ভাইয়ের বোন হয়েই রইলেন।

পারিবারিক পরিবেশ আলাদা হওয়ার কারণে বিভা আর হিমির জীবন আলাদা। হিমি নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। পিতামাতাহীন, মাসীর কাছে বড়ো হয়েছে, তার একমাত্র ভাই অসুস্থ। নাটকে অসুস্থ ভাই যতীনকে ঘিরে তার জীবন আবর্তিত হয়েছে। স্বামী বা প্রেম সংক্রান্ত কোনো জটিলতা তার নেই। ভাইয়ের অসুখ হওয়ার কারণে

তিনি নিজের বিয়ের কথা অন্যকেও বলতে দেন না। এদের সবচেয়ে বড়ো পার্থক্য হলো বিভার বউদি স্বামীঅন্তপ্রাণ এবং বিভার বন্ধু। হিমির বউদি মণি স্বামীর প্রতি উদাসীন, আবার হিমির সঙ্গে বন্ধুত্বও নেই। এ ক্ষেত্রে ভায়ের প্রতি হিমির বাড়তি দায়িত্ব হলো মণি যে যতীনকে ভালোবাসে এই মিথ্যেকে সত্যি করে তোলা। এ কাজটি করতে কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছে। হিমির পরিসর ছোটো। কিন্তু দুঃখ ছোটো নয়। তিনি জানেন যে তার ভাই মারা যাবেন। এই দুর্বিসহ দুঃখ চেপে রেখে তাকে জীবন যাপন করতে হয়েছে। অন্যদিকে বিভা কোনো দুঃসংবাদ বা পরিণতি আগে থেকে জানতেন না, সব কিছুই তার জীবনে আকস্মিকভাবে ঘটেছে। দুটি আলাদা পরিবেশের কারণে তাদের ব্যক্তিত্বও আলাদা। বিভা সকল সময়ই ভীত এবং সচকিত থেকেছেন, শুধুমাত্র শেষ দৃশ্যে অর্থাৎ রাজপুরী থেকে মুক্ত হওয়ার পর স্বতঃস্ফূর্ত হয়েছেন। কিন্তু হিমি পুরো নাটকেই স্বতঃস্ফূর্ত। হিমি এবং বিভার মতো কুমুদিনীও ভাইভক্ত বোন। এদের চেয়ে কুমুদিনীর বিশিষ্টতা হলো, কুমুদিনী সক্রিয় চরিত্র। ভাইয়ের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করেছেন। বিভা এবং হিমি ঘটনাকে মেনে নিয়েছেন, কিন্তু কুমুদিনী ঘটনার জন্ম দিয়েছেন। ভাইকে রক্ষা করার জন্য তিনি শত্রুপক্ষের মানুষ মধুসূদনকে বিয়ে করতে রাজি হন। কোনো যুক্তিতর্কের তোয়াক্কা না করে তিনি বলেন :

> তুমি বুঝতে পারবে না দাদা। আমার যাঁর সঙ্গে বোঝাপড়া হয়ে গেছে তিনি আমার অন্তর্যামী। (১৮খ,পৃ.১৬৬)

এভাবে কুমুদিনী কারো কথা না শুনে নিজের মতে চলেন। কিন্তু ভাইয়ের শেষ রক্ষা করতে পারেন না। আবার নাটকের শেষে স্বামীর বাড়ি ফিরে গেলেও তিনি বিভার মতো ভায়ের বোন হয়েই রইলেন। তিনি বলেছেন :

> দাদা, এ সংসারে তুমি আমার আছ, এ কথাটাকে তো কোনো কিছুতেই মিথ্যে করতে পারবে না– তা আমি তোমার কাছেই থাকি আর দূরেই থাকি। (১৮খ,পৃ.২২৭)

–তাই বিভা-হিমি-কুমুদিনী তিনটি বোন একসুতোয় গাঁথা।

'রক্তকরবী'র চন্দ্রা এবং 'গৃহপ্রবেশে'র প্রতিবেশিনী-র মধ্যেও মিল এবং অমিল রয়েছে। তারা দুজনই একেবারে অপ্রধান চরিত্র। নাট্যকাহিনিতে তারা কোনো প্রভাব ফেলে নি। তাদের দুজনের মধ্যেই সাধারণ ঈর্ষা-প্রবণতা আছে। চন্দ্রা সুযোগ-সন্ধানী বা স্বার্থপর নয়, প্রতিবেশিনী নিজের স্বার্থের জন্য কূট-কৌশল অবলম্বন করেছে। সে হিমি এবং মাসীর কাছে মণির বদনাম করেছে–

> তোমরা যে বড়ো সাধ করে এমন রূপসী মেয়ে ঘরে আনলে– এখন দুঃখের দিনে তোমাদের পরী-বউয়ের রূপ নিয়ে কী হবে বলো তো। এর চেয়ে যে কালো কুচ্ছিৎ–(৯খ,পৃ.১৭৩)

আবার মণির সামনে গদগদগভাব প্রকাশ করেছে–

তোমাদের বউয়ের হাত খুব দরাজ। হবে না কেন। কত বড়ো ঘরের মেয়ে। বড়ো লক্ষ্মী। (৯খ,পৃ.১৭৪)

দেখা যাচ্ছে প্রতিবেশিনী খুব বিরক্তিকর এবং খারাপ চরিত্র। অন্যদিকে চন্দ্রা আড়ালে কথা বলে না। সে একমাত্র নন্দিনীকেই ঈর্ষা করে। এবং নন্দিনীর সামনেই কটূ-কথা বলে :

রাক্ষসী, তুই তাকে ধরিয়ে দিয়েছিস! তুই ওদের চর। (৮খ,পৃ.৩৮৭)

– দেখা যাচ্ছে, স্পষ্টবাদিতায় প্রতিবেশিনী অসৎ, কিন্তু চন্দ্রা সম্পূর্ণ সৎ। তাই প্রতিবেশিনী একটি ধূর্ত চরিত্র এবং চন্দ্রা প্রচলিত নারীর প্রতিনিধি।

বামী-ক্ষীরো-রোহিণী-সুরঙ্গমা চারজন তিন রানির দাসী। তাদের পেশা এবং সামাজিক অবস্থান এক, কিন্তু স্বভাব-চরিত্রে পার্থক্য অনেক। বামীর মধ্যে কোনো রকম ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা মতামত নেই। মহিষীর কথানুসারে চলে। মহিষীর কথায় সে সুরমাকে কড়া ওষুধ খাওয়ায়, এতে সুরমার মৃত্যু বা বেঁচে থাকা কোনোটাই তার মনে প্রভাব ফেলে না। তাই চরিত্রটি রক্তমাংসের মানবচরিত্র হয় নি। ক্ষীরো রানি কল্যাণীর দাসী। ক্ষীরো বামীর বিপরীত চরিত্র। সে পুরো মাত্রায় মানব। তার চরিত্রে ঈর্ষা অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। সে মিথ্যাবাদী, সুযোগসন্ধানী এবং কুটনি স্বভাবের। মানুষের গুণের প্রশংসা সে করে না। রানি কল্যাণীর খেয়ে-পরে সে এবং তার পরিবারের সকল সদস্য বেঁচে থাকে। কিন্তু রানির দাতা স্বভাবকে সে ভালো না বলে বরং বলে –

ভাত তুলে দেন মোদের মুখে,
নাম তুলে নেন পরম সুখে।
ভাত মুখে দিলে তখনি ফুরোয়,
নাম চিরদিন কর্ণ জুড়োয়। (৩খ,পৃ.১২২)

এখানে দেখা যাচ্ছে, ক্ষীরো অকৃতজ্ঞ। নিজে সে কল্যাণীর দয়ায় বেঁচে আছে, কিন্তু কল্যানীকেই স্বার্থপর বলছে। বলছে যে, কল্যাণী নিজের নামের জন্য দান-দক্ষিনা দেয়। শুধু তাই নয়, বাড়িতে অন্য চাকরকেও টিকতে দেয় না ক্ষীরো, কারণ কল্যাণী তখন সেই চাকরদেরও দান করবেন। সে এতোটাই স্বার্থপর। অন্যদিকে রোহিনী সুদর্শনার অন্তঃপুরের দাসী। তার মনে দাসীর স্বভাবসুলভ ঈর্ষা আছে, তবে তা মাত্রাতিরিক্ত নয়। সে বামীর মতো কাউকে মেরে ফেলে নি, আবার রানির সঙ্গে অকৃতজ্ঞতার আচরণও করে নি। রানির অন্তঃপুরের চারদিকে আগুন লাগলে সে রানিকে সাবধান করেছে–

রানী, ও দিকে কোথায় যাও। তোমার অন্তঃপুরের চার দিকে আগুন ধরে গেছে, ওর মধ্যে প্রবেশ কোরো না। (৫খ,পৃ.২৯৭)

তবে দাসী দাসীকে ঈর্ষা করবে এটা স্বাভাবিক। দেখায়ায়, সে সুরঙ্গমাকে ঈর্ষা করেছে। সুরঙ্গমার প্রশংসার উত্তরে সুরঙ্গমাকে ব্যঙ্গ করেছে। রাজাকে চেনার বিষয়ে সুদর্শনার সঙ্গে তার কথোপোকথনে এই ব্যঙ্গ স্পষ্ট বোঝা যায়।

রোহিনী। সুরঙ্গমাই আমাদের সকলের চেয়ে সেয়ানা হল বুঝি!

সুদর্শনা। তা যা বলিস। সে তাঁকে চেনে।

রোহিনী।এ কথা আমি কক্খনো মানব না। ও তার ভান। বললেই হল চিনি, কেউ তো পরীক্ষা করে নিতে পারবে না। আমরা যদি ওর মতো নির্লজ্জ হতুম তা হলে অমন কথা আমাদেরও মুখে আটকাত না। (৫খ,পৃ.২৮৯)

সুরঙ্গমাও রানি সুদর্শনার দাসী। কিন্তু তার আচরণ একটুও দাসীর মতো নয়। সে শিক্ষকের মতো সুদর্শনাকে শিক্ষা দিয়েছে, দার্শনিকের মতো ভবিষ্যৎবাণী করেছে। তাই সুরঙ্গমার চরিত্রটি দাসীর পর্যায়ে থাকে নি, রাজার ভক্তের পর্যায়ভুক্ত হয়েছে।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রজীবনী*, প্রথম খণ্ড, ১৪১৭, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃষ্ঠা-২৮৭

২. সুনন্দা বড়ুয়া, *বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ উপাখ্যান*, ১৯৯৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃষ্ঠা-২৬১

৩. আতাউর রহমান, রবীন্দ্রনাথ : তাঁর নাটকের প্রাসঙ্গিকতা, *রবীন্দ্রনাথ, এই সময়ে*, ২০১২, সম্পা. আনিসুজ্জামান, প্রথমা, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১১৭

৪. নীহাররঞ্জন রায়, *রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা*, বৈশাখ ১৪১৬, নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা-২৬৯

৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৭০

৬. স্বরোচিষ সরকার, *অস্পৃশ্যতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ*, ২০০৫, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৯৬

৭. প্রবীর প্রামাণিক, উনিশ ও বিশ শতকের নির্বাচিত প্রবন্ধকার, ২০১০, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৭৩

৮. প্রমথনাথ বিশী, *রবীন্দ্র নাট্য প্রবাহ*, ২০০৪, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, পৃষ্ঠা-২৪

৯. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৮৪

১০. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা*, ১৩৭৯, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, পৃষ্ঠা-২৯

১১. অশ্রুকুমার সিকদার, *রবীন্দ্রনাট্যে রূপান্তর ও ঐক্য*, ১৯৯৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৩৪

১২. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, চতুর্থ খণ্ড, ১৯৯৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃষ্ঠা-২০২

১৩. নীলিমা ইব্রাহিম, তিন নারী : বিনোদিনী, নন্তিনী ও কুমুদিনী, *রবীন্দ্রনাথ*, ২০০১, সম্পা. আনিসুজ্জামান, অবসর, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১৯১

১৪. সৌমিত্র শেখর, তাসের দেশ : রূপকথার রূপকল্পে সমকাল এবং নেতৃত্ব-অন্বেষণ, *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, ত্রয়োবিংশ খণ্ড, ১ম ও ২য় সংখ্যা, জুন ও ডিসেম্বর, ২০০৫, সম্প. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ঢাকা, পৃষ্ঠা-২১

১৫. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথের নাটকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা এবং বন্ধনের সত্য, *কালি ও কলম*, সপ্তম বর্ষ : একাদশ সংখ্যা, ১৪১৭, সম্পা. আবুল হাসনাত, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৩৬

১৬. সৌমিত্র শেখর, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২১

১৭. বেগম আকতার কামাল, রবীন্দ্রনাথের নাট্যকবিতা ও কাব্যনাট্য : কতিপয় প্রসঙ্গ, *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*, ২০১১, সম্পা. মোবারক হোসেন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃষ্ঠা-২২২

১৮. নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৮৩

১৯. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৫৭

২০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,*চিঠিপত্র*, সপ্তম খণ্ড, ১৩৯৯, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৯

২১. আবু সয়ীদ আইয়ুব, *পান্থজনের সখা*, ২০০৬, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১০৮

২২. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৭৩

২৩. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৮১

২৪. প্রমথনাথ বিশী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৬

২৫. আবু সয়ীদ আইয়ুব, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৯৯

২৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১১৫

২৭. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১১৮

২৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১১৮

২৯. সুনন্দা বড়ুয়া, *বাংলা সাহেত্যে বৌদ্ধ উপাখ্যান*, ১৯৯৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃষ্ঠা-২৬৫

৩০. আবু সয়ীদ আইয়ুব, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১০৬

৩১. প্রমথনাথ বিশী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৯৮

৩২. ড. অজিতকুমার ঘোষ, *বাংলা নাটকের ইতিহাস*, ১৪১১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা,পৃষ্ঠা-৩২২

৩৩. আবু সয়ীদ আইয়ুব, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১১৭

৩৪. সুনন্দা বড়ুয়া, *বাংলা সাহেত্যে বৌদ্ধ উপাখ্যান*, ১৯৯৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃষ্ঠা-২৮০

৩৫. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা, *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*, ২০১১, সম্পা. মোবারক হোসেন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১৫৪

৩৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬

৩৭. সুনন্দা বড়ুয়া, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৬০

৩৮. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৬২

৩৯. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৬৯

৪০. প্রমথনাথ বিশী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪২৫

৪১. অশ্রুকুমার সিকদার, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩০

৪২. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮৯

৪৩. আতাউর রহমান, মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাটক, *নাট্যপ্রবন্ধ বিচিত্রা*, ১৯৯৫, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৮৮

৪৪. প্রমথনাথ বিশী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৬

৪৫. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৯০

৪৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৪৮

৪৭. অজিতকুমার চক্রবর্তী, *কাব্যপরিক্রমা*, ১৩৭৪, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৪৭

৪৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৭

৪৯. প্রমথনাথ বিশী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২০৮

৫০. নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৪৫

৫১. সিদ্দিকা মাহমুদা, রবীন্দ্রদৃষ্টিতে আধুনিক সভ্যতা, *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*, ২০১১, সম্পা. মোবারক হোসেন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৩৮৪

৫২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৮৪

৫৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৮৪

৫৪. সৈয়দ আকরম হোসেন, *রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস দেশকাল ও শিল্পরূপ*, ১৯৬৯, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১৭২

৫৫. নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৫৪

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত নাট্যসমূহ অভিনিবেশ সহকারে পাঠ ও এর নারীচরিত্রসমূহ গভীরভাবে পরীক্ষা করে এ প্রতীতি জন্মায় যে, রবীন্দ্রনাথ নাটকে নারীচরিত্র সৃজন, প্রয়োগ, উপস্থাপন ও দার্শনিক ব্যাপ্তির আয়োজনে এক অতুলনীয় বিশ্বকর্মা। সর্বজ্ঞদৃষ্টিতে তিনি নারীর অন্তর্গত ও বহির্গত দিকসমূহ উপস্থাপন করেছেন। বাংলা নাট্যাঙ্গনে স্রষ্টা হিসেবে এককভাবে আর কোনো নাট্যকার সংখ্যায় এতো অধিক নারীচরিত্র সৃষ্টি করেন নি। নাটকে রবীন্দ্রনাথ শুধু সংখ্যাতেই অধিক পরিমাণে নারীচরিত্র সৃষ্টি করেছেন– তা নয়। এই চরিত্রগুলো বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যেও ভাস্বর। যেমন: সাধারণ গতানুগতিক নারীচরিত্র: এই ধারা সব নাট্যকারের সৃষ্টিতেই আছে; আছে রবীন্দ্রনাট্যেও। অন্য নাট্যকারের এ জাতীয় নারীচরিত্র থেকে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির পার্থক্য হলো, সাধারণের মধ্যে এরা অসাধারণ হয়ে ওঠেন। *রাজা ও রানী* নাটকে সাধারণ নারীচরিত্র ইলা তার প্রেমনিষ্ঠতার কারণে অসাধারণ! অন্য দিকে *রাজা* নাটকের দাসীচরিত্র রোহিণী সাধারণ কাজকর্ম যার পরিধিভুক্ত, নাটকে গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়াসংঘটনে যে সরাসরি যুক্ত নয়, তার পরও বিশেষভাবে দৃষ্টি দাবি রাখে। কারণ, তিনি কিছু গূহ্যতথ্য অবগত ছিলেন এবং সে তথ্যসমূহ রাজপরিবারের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলাকে বিশেষভাবে প্রতিভাত করেছে। রোহিণীর অসাধারণ আচরণের জন্যই অবশেষে জটিলতার জালে পুরো কাহিনি সম্যকভাবে সমর্পিত হয় নি। নাটকে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট বিদ্রোহী নারীচরিত্রগুলো পুরো বাংলা সাহিত্যেই অনন্য। প্রথমেই উল্লেখ করতে চাই দেবযানীর কথা। *মহাভারতএর* প্রেমিকনারীর সঙ্গে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব সংযোজন এই চরিত্রটিকে অস্তিত্বশীল নারীর উদাহরণে পরিণত করেছে। তাছাড়া, প্রচলিত নিয়মে নারীর 'মেনে নেওয়া' বিধিকে অস্বীকার করে দেবযানী নারীমুক্তির বোধে যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন তা একবিংশ শতাব্দীর নারীকেও শিক্ষা দেয়। অন্যদিকে, চিত্রাঙ্গদা প্রতিষ্ঠিত করেছেন সংসার জীবনের বাইরে রাষ্ট্রচালনা এবং দেশপ্রেম অর্থাৎ কর্মস্থান নারীর মূল ক্ষেত্র। চিত্রাঙ্গদাই প্রকাশ করলেন পুরুষের যেমন ব্যক্তিজীবন এবং বাইরের কর্মজীবন দুটি ভাগ রয়েছে, নারীরও তাই। – এই হলো মানুষের ধর্ম। মানবজীবনের দুটি ক্ষেত্র : সংসার এবং বিশ্বজগতের কর্মময় স্থান। এই দুটি ক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষ দুজনেরই সমান অধিকার। বিদ্রোহী নারী চরিত্র চণ্ডালিকা আরো শক্তিশালী। চণ্ডালিকা ধর্মীয়ভাবে মানুষের মধ্যকার শ্রেণিবিভাগ অস্বীকার করেছেন। মাতৃত্বপ্রধান চরিত্রগুলোর মধ্যে গান্ধারী অন্যতম বলিষ্ঠ চরিত্র। ন্যায় ধর্ম এবং মাতৃধর্মের জটিল মানসিক দ্বন্দ্বে তিনি পতিত হন এবং সেখানে ন্যায়ধর্মে অবিচল থেকে তিনি মাতৃধর্ম রক্ষা করেছেন। *চণ্ডালিকায়* মা চরিত্রটি মেয়ের জন্য নিজের বিশ্বাস বিসর্জন দিয়েছেন। ধর্মের প্রতি সম্যকভাবে সমর্পিত

চরিত্রগুলো এতোটাই ধর্মপ্রবণ যে, তাদের চরিত্র বিভৎস্য হয়ে উঠেছে। এদের মধ্যে রমাবাই সবচেয়ে বিভৎস্য এবং ঘৃণিত চরিত্র। তিনি ধর্মের নামে নিজের কন্যাকে পরপুরুষের সঙ্গে চিতায় পুড়িয়ে মারেন। ধর্মীয় গোড়ামী তার মধ্যে এতোটাই প্রবল যে, তার মাতৃমনে কোনো স্নেহ-মমতা এবং মানবতা নেই। এছাড়া নির্লিপ্ত চরিত্র হিসেবে মণি বাংলা সাহিত্যে অনন্য উদাহরণ। তিনি নিজের ইচ্ছে মতো চলেন, কোনো রকম বোধ দ্বারা চালিত নয়। তার ইচ্ছাই একমাত্র চালিকা শক্তি। আবার ক্ষীণপ্রাণ বালিকা নিজের উপস্থিতি দিয়েই সন্ন্যাসীর দর্শনকে টলিয়ে দেয়।

এভাবেই নাটকে রবীন্দ্রনাথ সৃষ্ট নারীচরিত্রগুলো অনন্য এবং পৃথক বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর হয়েছে। এই চরিত্রসমূহ শুধু পূর্ববর্তী সাহিত্য থেকেই আলাদা নয়, পাশ্চাত্যের ভাবধারার সঙ্গে এর কতকটা সঙ্গতিপূর্ণ। পুরোনো প্রথা এবং মানুষের আধুনিক দ্বন্দ্বময় জীবন তিনি সমান্তরালে সৃষ্টি করেছেন। সার্বিক বিশ্লেষণে এর সত্যতা আমরা পেয়েছি।

বর্তমান অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথের মানসগঠন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে দেখা গেছে পারিবারিক পরিবেশ, ধর্মীয় উদারতা, স্বাধীনভাবে বেড়ে ওঠার সাবলীলতা, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল, প্রকৃতির সৌন্দর্য, বন্ধুদের সহযোগিতা, উপনিষদ-বৌদ্ধ দর্শনের মানবিক বোধ, দেশ-বিদেশের সাহিত্য তাঁর মানসগঠনে সুপ্রভাব ফেলেছে। এছাড়া জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন সম্পর্কে যে সব নারীদের সংস্পর্শে তিনি এসেছেন, তাদের চরিত্রের প্রভাবও পড়েছে তাঁর মানসজগতে। আনা তরখড়-এর শিক্ষা-ব্যক্তিত্ব-সাবলীলতা, বিলেতের জন স্কটের পরিবারের মেয়েদের আধুনিক জীবনযাপন, বিলেতের নারীপুরুষের একত্রে নিঃসঙ্কোচ আমোদ-প্রমোদ করা, কাদম্বরী দেবীর প্রতি আকর্ষণানুভব, কাদম্বরীর প্রতি পরিবারের মানুষের উদাসীনতা-অবজ্ঞা, নিঃসন্তান কাদম্বরীর কষ্ট-অপমানের যন্ত্রণা, রবীন্দ্রনাথের নিজের জীবনে বালিকা স্ত্রী, জমিদারি পরগনার গ্রামীণ মেয়েদের দুর্বিষহ জীবন, চিন্তা-চেতনা ইত্যাদি তাঁকে নারীর প্রতি সহানুভূতিশীল হতে সাহায্য করেছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে রবীন্দ্রপূর্ব এবং রবীন্দ্রসমসাময়িক বাংলা নাটক নিয়ে আলোচনা করে রবীন্দ্রনাটকের স্বাভাবিক নাট্যপ্রতিভার অনন্যতা নির্দেশিত হয়েছে। আমরা দেখেছি পূর্ববর্তী এবং সমসমায়িক নাট্যকারদের একমুখী বিষয় এবং আঙ্গিকের স্থানে রবীন্দ্রনাথ এনেছেন বিচিত্র বিষয় এবং আঙ্গিক। গতানুগতিক-একঘেমেয়ি চরিত্রের স্থানে এনেছেন সংসারের দেখা বহুবিচিত্র ও দ্বন্দ্বসংকুল মানবচরিত্র এবং তাতে স্থাপন করেছেন নিজস্ব বোধ। শুধু সংখ্যার দিক দিয়ে নয়, সার্বিক বিচারে রবীন্দ্র-নাট্য ও এর নারীচরিত্রসমূহ বাংলা নাট্যসাহিত্যের সম্পদ। তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে রবীন্দ্র-নাট্যের বিষয় এবং আঙ্গিকগত দিক বিবেচনায় নাটকের বিভিন্নতা। অর্থাৎ মোটামুটিভাবে তাঁর নাটককে কত ভাগে ভাগ করা যায়, এবং এই ভাগগুলোর যৌক্তিকতা কী কী। এ অধ্যায়ে পূর্ববর্তী গবেষক ও সমালোচকদের

কৃত ভাগগুলো যাচাই করে ক্ষেত্রবিশেষে অসারত্ব তুলে ধরা হয়েছে এবং আমাদের যুক্তির নিরিখে করা হয়েছে নতুন ধারার বিভাজন। চতুর্থ অধ্যায়ে রবীন্দ্র-নাট্যের নারীচরিত্রগুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এখানে আমরা দেখেছি চরিত্রগুলোর মনের নানা রকম চিন্তা-চেতনা, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, আচার-আচরণ। চরিত্রগুলোর মানসবোধ এবং সম্পর্কের উপর নির্ভর করে শ্রেণিকরণ করা হয়েছে। এ অধ্যায়েই দেখা গেছে, সময়ের সঙ্গে তাঁর চরিত্রচিত্রণে পরিবর্তন এসেছে। অপেক্ষাকৃত পরবর্তী সময়ে রচিত নাটক কাহিনি-চরিত্র-পরিবেশ-ধর্মবোধ-চেতনাগত দিক দিয়ে যেমন উচ্চবোধসম্পন্ন, তেমনি নারী চরিত্রগুলো বলিষ্ঠ এবং দৃঢ়চেতা। উপরে এ নিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে নাটকের নারী চরিত্রগুলোর তুলনামূলক আলোচনা করেছি। সেখানে দেখা গেছে, রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন চরিত্রগুলোর সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর পার্থক্য। দেখা যায়, মাতৃচরিত্র, বালিকা চরিত্র, সাধারণ চরিত্র বা প্রেমিকা চরিত্র একই শিরোনামে হয়েও বিভিন্ন মানসিক এবং মানবিকবোধসম্পন্ন হয়েছে। একের থেকে অন্য আলাদা। আবার তাঁর নাটকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নারী চরিত্রের পরিবর্তনও ঘটেছে। মূল বোধ এক হলেও *রাজা* ও *রানী*র সুমিত্রার চেয়ে *তপতী*র সুমিত্রা শিক্ষা, ব্যক্তিত্ব এবং দর্শনগত দিক দিয়ে উচ্চস্তরের। *রাজা*র সুদর্শনার চেয়ে *অরূপরতন*এর সুদর্শনা বেশি অস্তিত্বশীল অন্যদিকে *শাপমোচন*এর কমলিকা অরুণেশ্বরের কাছে নিজের অস্তিত্ব পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করে তারপর অরুণেশ্বরের প্রতি নিজেকে সমর্পণ করেছেন। অর্থাৎ কমলিকা কোনো অধ্যাত্মচেতনা, বাধ্যতা বা কৃতজ্ঞতায় রাজাকে মেনে নেন নি, রাজার সম্পূর্ণ মনোযোগ এবং প্রেমে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। কমলিকা একটুর জন্যও নিজে কোনো ভুল করেন নি, সুদর্শনার অন্য পুরুষকে নিয়ে মনে দোদুল্যমানতা ছিলো, কমলিকার তা ছিলো না, কিন্তু অরুণেশ্বরকে নিয়েই তিনি চিন্তা করেছেন এবং অরুণেশ্বরের প্রেমে মুগ্ধ হয়েছেন। তাই রবীন্দ্রনাথের কমলিকা পরিপূর্ণ মানুষ। অন্যদিকে, প্রেমের ক্ষেত্রে দেখা যায় জীবনের শেষ পর্যায়ে লেখা *শ্যামা*য় শ্যামা অপেক্ষাকৃত বেশি বয়সী নারী। এতো বছর তিনি অপেক্ষা করেছেন মনের মতো একজন পুরুষ পান নি বলে। অর্থাৎ তার বিচার-বিবেচনা শক্তি এবং ভাবনার স্তর অন্য নারীদের চেয়ে বেশি। তাই অনেক বিচার-বিবেচনা করে তিনি প্রেমিক নির্বাচন করেছেন। যদিও শেষ রক্ষা করতে পারেন নি– সে প্রসঙ্গ অন্য, তার বিবেচনাশক্তিই মূখ্য। এই বিবেচনাবোধ নারীর মানস-উন্নয়নের পরিচায়ক। রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সে লেখা নারীরা খুব গভীরে চিন্তা করেন নি, পরবর্তী সময়ে লেখা নারীদের চিন্তা-চেতনার গভীরতা বেশি। তাছাড়া, শেষ বয়সে লেখা নারীরা উচ্চশিক্ষিত এবং অপেক্ষাকৃত সক্রিয়। তবে তাদের জীবনের দ্বন্দ্ব বেশি।

অনেক পরিবর্তন, অমিলের পরও এক রকম সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে সেই-টিই রবীন্দ্র-নারীর মূল্যবোধ। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সময়ের সঙ্গে নারীর বোধগত বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটলেও প্রায় সব চরিত্রের মধ্যেই প্রথা ভেঙে

নিজের অস্তিত্ব প্রকাশের চিন্তা রয়েছে। ১৮৯৪ সালে লেখা দেবযানী থেকে ১৯৩৩ সালে লেখা চণ্ডালিকা চরিত্র যেন একই সূত্রে গাঁথা। আরেকটি বড়ো বৈশিষ্ট্য হলো, নারীকে রবীন্দ্রনাথ কল্যাণময়ীরূপে সৃষ্টি করেছেন এবং এর জন্য সমাজ আরোপিত তথাকথিত 'স্নিগ্ধতা'কে অত্যাবশ্যক ভাবেন নি। তাই দেখা গেছে, কেউ স্নিগ্ধ থেকেছে, কেউ স্নিগ্ধতা বাদ দিয়ে প্রয়োজনে রুদ্র হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্যরূপে আমরা পেয়েছি, নারীকে তিনি সমাজের শক্তি ও সম্ভাবনারূপে কল্পনা করেছেন। যে শক্তি ও সম্ভাবনা সভ্যতা ও মনুষ্যত্বকে কেন্দ্রানুগকরণের মাধ্যমে ধারণ করে থাকে। এমনি চরিত্র অপর্ণা, নন্দিনী, সুরঙ্গমা, মালিনী। রবীন্দ্রনাট্যে নারীর সতীত্বের আলাদা বৈশিষ্ট্য নিরূপিত হয়েছে। মানসিক সতীত্বই সেখানে মূলকথা। অমাবাই, শ্রীমতী, পতিতা নারী তাদের দৃঢ়চেতা আচরণে তা প্রকাশ করেছেন। অন্যদিকে নারীর 'মেনে নেওয়া' মনোভাবের সঙ্গে দেবযানীও কোনো আপোস করেন নি। আমাদের গবেষণায় এভাবেই উঠে আসে রবীন্দ্রনাথের নাটকে সৃষ্ট নারীচরিত্রসমূহের শক্তি ও সম্ভাবনা। তবে, একথাও বিস্মৃত হওয়ার অবকাশ নেই, অতিসামান্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বৃত্তের বাইরে বেড়িয়েও খুব সূক্ষ্মভাবে বৃত্তের ভিতরে রয়ে গিয়েছেন। এ সীমাবদ্ধতা মূলত যুগের। যুগের এই ছায়াটুকু স্বীকার করেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা চলে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর রচিত নাটকে যে নারীচরিত্রসমূহ সৃষ্টি করেছেন তা যেমন সংখ্যায় প্রচুর, শক্তি ও সম্ভাবনাতেও তেমনি আলোক সঞ্চারী এবং তাই উত্তরকালে প্রভাববিস্তারীও বটে। এই আলোতেই পরবর্তীকালের সাহিত্যে নারীচরিত্রসমূহ অনেকটা আলোকপ্রাপ্ত, একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

সমাপ্ত

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট । এক

আকর গ্রন্থাবলী

১. *বাল্মীকি প্রতিভা*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড (সুলভ সংস্করণ), ১৪১০, বিশ্বভারতী, কলকাতা

২. *প্রকৃতির প্রতিশোধ*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত

৩. *মায়ার খেলা*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত

৪. *রাজা ও রানী*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত

৫. *বিসর্জন*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত

৬. *গোড়ায় গলদ*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত

৭. *চিত্রাঙ্গদা*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত

৮. *বিদায় অভিশাপ*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত

৯. *মালিনী*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত

১০. *বৈকুণ্ঠের খাতা*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত

১১. *কাহিনী*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত

১২. *চিরকুমার-সভা*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, অষ্টম খণ্ড, প্রাগুক্ত

১৩. *হাস্যকৌতুক প্রকাশ*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত

১৪. *ব্যঙ্গকৌতুক প্রকাশ*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত

১৫. *শারদোৎসব*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত

১৬. *মুকুট*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত

১৭. *প্রায়শ্চিত্ত*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, প্রাগুক্ত

১৮. *রাজা*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, প্রাগুক্ত

১৯. *ডাকঘর*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত

২০. *অচলায়তন*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত

২১. *ফাল্গুনী*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত

২২. *গুরু*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, সপ্তম খণ্ড, প্রাগুক্ত

২৩. *অরূপরতন*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, সপ্তম খণ্ড, প্রাগুক্ত

২৪. *ঋণশোধ*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, সপ্তম খণ্ড, প্রাগুক্ত

২৫. *মুক্তধারা*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, সপ্তম খণ্ড, প্রাগুক্ত

২৬. *বসন্ত*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, অষ্টম খণ্ড, প্রাগুক্ত

২৭. *গৃহপ্রবেশ*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, নবম খণ্ড, প্রাগুক্ত

২৮. *নটীর পূজা*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, নবম খণ্ড, প্রাগুক্ত

২৯. *শেষ বর্ষণ*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, নবম খণ্ড, প্রাগুক্ত

৩০. *শোধবোধ*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, নবম খণ্ড, প্রাগুক্ত

৩১. *নটরাজ*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, নবম খণ্ড, প্রাগুক্ত

৩২. *রক্তকরবী*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, অষ্টম খণ্ড, প্রাগুক্ত

৩৩. *শেষ রক্ষা*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, দশম খণ্ড, প্রাগুক্ত

৩৪. *পরিত্রাণ*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, দশম খণ্ড, প্রাগুক্ত

৩৫. *তপতী*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, একাদশ খণ্ড, প্রাগুক্ত

৩৬. *নবীন*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, একাদশ খণ্ড, প্রাগুক্ত

৩৭. *শাপমোচন*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, একাদশ খণ্ড, প্রাগুক্ত

৩৮. *কালের যাত্রা*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, একাদশ খণ্ড, প্রাগুক্ত

৩৯. *চণ্ডালিকা*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, প্রাগুক্ত

৪০. *তাসের দেশ*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, প্রাগুক্ত

৪১. *বাঁশরী*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, প্রাগুক্ত

৪২. *শ্রাবণ গাথা*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রাগুক্ত

৪৩. *নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রাগুক্ত

৪৪. *যোগাযোগ*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, অষ্টাদশ খণ্ড, প্রাগুক্ত

৪৫. *নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রাগুক্ত

৪৬. *মুক্তির উপায়*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রাগুক্ত

৪৭. *নৃত্যনাট্য শ্যামা*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রাগুক্ত

৪৮. *স্বর্গে চক্রটেবিল বৈঠক*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, অষ্টাদশ খণ্ড, প্রাগুক্ত

৪৯. *সুন্দর*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, অষ্টাদশ খণ্ড, প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট। দুই

<u>সহায়ক গ্রন্থ</u>

১. (ড.) অজিত কুমার ঘোষ : *বাংলা নাটকের ইতিহাস*, ১৯৮৫, জেনারেল প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

: *নাট্যতত্ত্ব ও নাট্যমঞ্চ*, ১৯৯১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

২. অজিতকুমার চক্রবর্তী : *কাব্যপরিক্রমা*, ১৩৭৪, বিশ্বভারতী, কলকাতা

৩. অতীন্দ্র মজুমদার (সম্পা.) : *চর্যাপদ*, ১৯৯৩, নয়া প্রকাশ, কলিকাতা

৪. অতুলচন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, মহেশচন্দ্র ঘোষ (অনু. ও সম্পা.) : *উপনিষদ*, ২০০০, হরফ, কলকাতা

৫. অমিতাভ চৌধুরী : *জমিদার রবীন্দ্রনাথ*, ১৩৯০, বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

: *রবিঠাকুরের পাগলা ফাইল*, ১৩৮৬, শেব্যা প্রকাশন, কলিকাতা

৬. অমিয়কুমার সেন : *রবি-সনাথ*, ১৩৮২, ইণ্ডিয়া ইন্টার ন্যাশনাল, কলিকাতা

৭. অমূল্য সরকার : *রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব*, ১৯৬৫, বাগার্থ, কলকাতা

৮. অরবিন্দ পোদ্দার : *রবীন্দ্রনাথ/রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব*, ১৯৮২, উচ্চারণ, কলকাতা

৯. অরুণকুমার বসু : *রবীন্দ্র-বিচিন্তা* (প্রথম পর্ব), ১৩৭৫, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা

১০. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : *রবীন্দ্র-বিবেচনা*, ১৪১২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

১১. অশ্রুকুমার সিকদার : *রবীন্দ্রনাট্যে রূপান্তর ও ঐক্য*, ১৩৭৪, গ্রন্থনিলয়, কলিকাতা

বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, ১৯৯৫, মডার্ণ বুক

১২. (ড.) অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

১৩. আজহার ইসলাম : *সাহিত্যে বাস্তবতা*, ১৯৮৫, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

১৪. আতাউর রহমান : *নাট্যপ্রবন্ধ বিচিত্রা*, ১৯৯৫, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

১৫. আনিসুজ্জামান (সম্পা.) : *রবীন্দ্রভাবনায় সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনীতি*, ২০০৮, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা

: *রবীন্দ্রনাথ, এই সময়ে*, ২০১২, প্রথমা, ঢাকা

১৬. আনু মাহমুদ : *রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্রচিন্তা ও বিশ্বমানবিকতা*, ২০০৫, গ্রন্থমেলা, ঢাকা

১৭. (ড.) আনোয়ারুল করীম : *রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ*, ২০০৮, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা

১৮. আফসার আহমদ : *বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠী নাট্য*, ২০০৮, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

১৯. আবুল আহসান চৌধুরী (সম্পা.) : *রবীন্দ্রনাথ ও শিলাইদহ*, ১৯৯০, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

২০. আবুল কাসেম ফজলুল হক : *সাহিত্যচিন্তা*, ১৯৯৫, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

২১. আবু সয়ীদ আইয়ুব : *পান্থজনের সখা*, ২০০৬, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

২২. (ড.) আলো সরকার (সম্পা.) : *রবীন্দ্র নাটকের ভূমিকা*, ১৯৮৭, রমা প্রকাশনী, কলিকাতা

২৩. (ডক্টর) আশরাফ সিদ্দিকী : *রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন*, ১৯৮৬, মুক্তধারা, ঢাকা

২৪. (শ্রী) আশুতোষ ভট্টাচার্য : *রবীন্দ্রনাথ ও লোক-সাহিত্য*, ১৩৮০, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা

২৫. আহমদ কবির (সম্পা.) : *আহমদ শরীফ রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, ২০১০, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা

২৬. আহমদ রফিক : রবীন্দ্রভুবনে পতিসর, ১৯৯৮, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা

: নানা আলোয় রবীন্দ্রনাথ, ২০১১, অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা

২৭. আহমাদ মাযহার : *রবীন্দ্রনাথ নারী বাংলাদেশ*, ২০০৯, জাগৃতি প্রকাশনী, ঢাকা

২৮. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : *রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা*, ১৩৭৯, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা

২৯. ওয়াহিদুল হক : *সংস্কৃতিই জাগরণের প্রথম সূর্য*, ২০০৫, ঐতিহ্য, ঢাকা

৩০. (শ্রী) কনক বন্দ্যোপাধ্যায় : *রবীন্দ্র নাট্য-সমীক্ষা*, ১৩৭৩, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

: *রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বনাটক*, ১৩৭২, এস্ ব্যানার্জি এণ্ড কোং,

কলিকাতা

৩১. কবীর চৌধুরী : *এ্যাবসার্ড নাটক*, ১৯৮৯, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

৩২. করুণা রাণী সাহা : *কালোত্তীর্ণ রবীন্দ্রনাথ*, ২০১২, বিভাস, ঢাকা

৩৩. কল্যাণীশঙ্কর ঘটক : *রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য*, ১৯৮০, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান

৩৪. কালীপ্রসন্ন সিংহ (অনুবাদ) : *মহাভারত*, ১৯৮৭, তুলি-কলম, কলকাতা

৩৫. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত : *মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরকাল*, ১৩৭১, রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী, কলকাতা

৩৬. কুমার রায় : *নাট্যভবিতব্য ও রবীন্দ্রনাথ*, ১৯৮৭, প্রতিভাস, কলকাতা

৩৭. কেতকী কুশারী ডাইসন : *রবীন্দ্রনাথ ও ভিকতোরিয়া ওকাম্পোর সন্ধানে*, ১৯৯৭, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৩৮. ক্ষেত্র গুপ্ত (সম্পা.) : *দীনবন্ধু রচনাবলী*, ২০০৬, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা

: *মধুসূদন রচনাবলী*, ২০০৯, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা

৩৯. গোপালচন্দ্র রায় : *রবীন্দ্রনাথের ছাত্রজীবন*, ১৩৯৩, পুস্তক বিপণি, কলকাতা

: *ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ*, সাহিত্য সদন, কলকাতা

৪০. গোপাল হালদার (সম্পা.) : *রবীন্দ্রনাথ, শতবার্ষিকী প্রবন্ধ সংকলন*, ২০১০, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

৪১. গোপীমোহন সিংহরায় : *রবীন্দ্র-সাহিত্যের নরনারী*, ১৯৯২, ভারবি, কলকাতা

৪২. গোলাম মুরশিদ : *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*, ২০০৬, অবসর, ঢাকা

: *সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক*, ১৯৮৪, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

: *নারী ধর্ম ইত্যাদি*, ২০০৭, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা

: *নারীপ্রগতির একশো বছর*, রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া, ২০১৩, অবসর, ঢাকা

: *সংকোচের বিহ্বলতা*, ১৯৮৫, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

: *কালান্তরে বাংলা গদ্য*, ১৩৯৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট

লিমিটেড, কলকাতা

৪৩. চিত্তরঞ্জন ঘোষাল : *জাতক সমগ্র*, ২০০৬, গ্রন্থিক, কলকাতা

৪৪. চিত্রা দেব : *ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল*, ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

৪৫. চিন্মোহন সেহানবীশ : *রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক চিন্তা*, ১৩৮৯, নাভানা, কলকাতা

৪৬. জিতেন্দ্রলাল বড়ুয়া : *বৌদ্ধ দর্শনের রূপরেখা*, ২০০১ বাংলা একাডেমী, ঢাকা

৪৭. জিয়া হায়দার : *নাট্য বিষয়ক নিবন্ধ*, ১৯৯৫, মুক্তধারা, ঢাকা

: *বাংলাদেশের থিয়েটার ও অন্যান্য রচনা*, ১৯৯১, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা

: *নাট্যকলায় বিভিন্ন ইজম ও এপিক থিয়েটার*, ১৯৯৫, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

: *থিয়েটারের কথা* (প্রথম-পঞ্চম খণ্ড), ২০০৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

৪৮. তপন বাগচী : *রবীন্দ্রনাথ : বৌদ্ধআখ্যান*, ২০১১, মূর্ধন্য, ঢাকা

৪৯. দীপক ঘোষ : *নাট্যবৃত্তান্ত*, ১৪০৩, সুপ্রীম পাবলিশার্স , কলকাতা

৫০. (ড.) দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় : *রবীন্দ্রনাট্য সমীক্ষা রূপক-সাংকেতিক*, ২০০২, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা

: *বাংলা নাট্যমঞ্চের রূপরেখা*, ১৩৯৪, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

৫১. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : *যে গল্পের শেষ নেই*, ১৯৯৭, উৎস মানুষ, কলকাতা

৫২. (ডক্টর) দেবীপদ ভট্টাচার্য : *রবীন্দ্র-চর্যা*, জেনারেল, ১৯৭৩, কলিকাতা

(ডক্টর) দেবীপদ ভট্টাচার্য (সম্পা.) : *গিরিশ রচনাবলী*, ১৯৯২, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা

৫৩. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সম্পা. আবদুশ শাকুর) : *আত্মজীবনী*, ২০০৮, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা

৫৪. নন্দগোপাল সেনগুপ্ত : *রবীন্দ্র-সংস্কৃতি*, ১৩৯৪, সাহিত্য প্রকাশ, কলকাতা

৫৫. নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী : *শাহজাদপুরে রবীন্দ্রনাথ*, ২০০৫, দে'জ পাবলিশিং,

কলকাতা

৫৬. (ড.) নিতাই বসু : *রবীন্দ্রনাথ ও সাম্যচিন্তা*, ১৩৯১, সাহিত্য প্রকাশ, কলিকাতা

৫৭. নিত্যপ্রিয় ঘোষ : *রঙ্গ প্রিয় রবীন্দ্রনাথ*, ১৯৮৬, জগদ্ধাত্রী পাবলিশার্স, কলকাতা

মুক্ত একক রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯০, প্যাপিরাস, কলকাতা

৫৮. নিমাইচন্দ্র পাল : *রবীন্দ্র নাটকে আঙ্গিক রূপক সাংকেতিক*, ১৩৯৪, রত্নাবলী,

: কলিকাতা

বুদ্ধ : ধর্ম ও দর্শন, ১৯৯০, অবসর, ঢাকা

৫৯. নীরুকুমার চাকমা : *রবীন্দ্রনাথ, তুলনামূলক আলোচনা*, ২০০১, এশিয়া

৬০. নীল কমল বিশ্বাস (সম্পা.) : পাবলিকেশনস, ঢাকা

৬১. নীহাররঞ্জন রায় : *রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা*, ১৩৪৮, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

: *ভারতীয় ঐতিহ্য ও রবীন্দ্রনাথ*, ২০০৪, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৬২. নেপাল মজুমদার : *ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিক এবং রবীন্দ্রনাথ* (চতুর্থ খণ্ড), ১৯৭১, চতুষ্কোণ প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা

৬৩. পবিত্র সরকার : *নাটকের সন্ধানে*, ২০০৮, প্রতিভাস, কলকাতা

৬৪. পম্পা মজুমদার : *রবীন্দ্র সংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস*, ১৩৭৯, জিজ্ঞাসা, কলিকাতা

৬৫. পিনাকেশ সরকার : *রবীন্দ্রচর্চার নানা প্রসঙ্গ*, ২০১২, এবং মুশায়েরা, কলকাতা

৬৬. (শ্রী) পুলিনবিহারী সেন : *রবীন্দ্রায়ণ* (১ম, ২য় খণ্ড), ১৩৬৮, বাক্-সাহিত্য, কলিকাতা

৬৭. পূর্বা সেনগুপ্ত : *জাতকমালা*, ২০০০, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা

৬৮. পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (সঙ্কলক ও অনুবাদক) : *ফরাসীদের চোখে রবীন্দ্রনাথ*, ১৯৬৩, রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী, কলকাতা

৬৯. (ড.) প্রদ্যোত সেনগুপ্ত : *বাংলার সামাজিক জীবন ও নাট্যসাহিত্য*, ১৯৭৬, সাহিত্যশ্রী, কলকাতা

৭০. (ডক্টর) প্রণয়কুমার কুণ্ডু : *রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য*, ১৯৬৫, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা

৭১. প্রবীর প্রামাণিক : *উনিশ ও বিশ শতকের নির্বাচিত প্রবন্ধকার*, ২০১০,বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা

: নদীয়া জেলার লোকধর্ম, ২০১০, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা

৭২. প্রবোধচন্দ্র সেন (সম্পা.) : *রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতীর শ্রদ্ধাঞ্জলি*, ১৯৬২, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

৭৩. প্রবোধচন্দ্র সেন : *ইচ্ছামন্ত্রের দীক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ*, ১৩৮৫, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা

: *ভারত পথিক রবীন্দ্রনাথ*, ২০১১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৭৪. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : *রবীন্দ্রজীবনী*, প্রথম-চতুর্থ খণ্ড, ১৪১৭, বিশ্বভারতী, কলকাতা

: *রবীন্দ্রবর্ষপঞ্জী*, ১৩৬৯, জিজ্ঞাসা, কলিকাতা

৭৫. প্রমথনাথ বিশী : *রবীন্দ্র সরণী*, ১৪১৫, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা

: *রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ*, ১৩৫৫, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা

: *রবীন্দ্র সাহিত্য বিচিত্রা*, ১৩৬১, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা

: *বাংলা সাহিত্যের নরনারী*, ১৩৬০, মৈত্রী, কলকাতা

৭৬. প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ : *প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ*, ১৩৯২, মহলানবিশ ট্রাষ্ট পরিচালন সমিতি, কলকাতা

৭৭. বিশ্বনাথ দে (সম্পাদক) : *রবীন্দ্র বিচিত্রা*, ১৩৭৯, সাহিত্যম্, কলিকাতা

৭৮. (শ্রী) বিশ্বপতি চৌধুরী : *কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ*, ১৩৭১, মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা

৭৯. বিশ্বনাথ রায় : *গুণগ্রাহী রবীন্দ্রনাথ*, ১৩৯৫, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

৮০. বিষ্ণু দে : *রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা*, ১৯৮৭ প্রতিভাস, কলকাতা

৮১. (শ্রী) বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য : *কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ*, ১৩৭১, জিজ্ঞাসা, কলিকাতা

: *বাংলা নাট্যরীতি*, ১৯৯৬, পুনশ্চ, কলকাতা

: *থিয়েটার ভাবনা*, ১৯৯৯, গণমন প্রকাশন, কলকাতা

৮২. বিষ্ণু বসু : *রবীন্দ্রনাথের থিয়েটার*, ১৯৮৭, প্রতিভাস, কলকাতা

বিষ্ণু বসু (সম্পা.) : *মধুসূদন-দীনবন্ধু রচনাবলী*, ১৯৮৭, তুলি-কলম, কলকাতা

৮৩. বুদ্ধদেব বসু : *প্রবন্ধ সমগ্র*, ২০১০, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা

বুদ্ধদেব বসু (ভূমিকা,অনুবাদ, টীকা) : কালিদাসের মেঘদূত, ২০০০, এম.সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা

৮৪. বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর : *সাহিত্যের অভিজ্ঞতা*, ২০০০, সময় প্রকাশনী, ঢাকা

৮৫. ভবতোষ দত্ত : *রবীন্দ্রচিন্তাচর্চা*, ১৩৮৯, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৮৬. (ড.) ভবানীগোপাল সান্যাল : *রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব*, ১৩৮০, মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

৮৭. ভবানীপ্রসাদ সাহু : *ধর্মের উৎস সন্ধানে (নিয়ানডার্থাল থেকে নাস্তিক)*, ১৯৯৪, প্রবাহ, কলকাতা

৮৮. ভুজঙ্গভূষণ ভট্টাচার্য : *রবীন্দ্র শিক্ষা-দর্শন*, ১৩৭৬, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

৮৯. (শ্রী) ভূদেব চৌধুরী : *পুণ্যস্মৃতি*, ১৩৪৯, মৈত্রী, কলিকাতা

৯০. মঞ্জুশ্রী চৌধুরী : *রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটক*, ১৯৮৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

৯১. (শ্রী) মন্তকুমার জানা : *রবীন্দ্র মনন*, ১৩৭৬, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা

৯২. মমতাজ উদদীন আহমদ (সম্পা.) : *মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রহসন*, ১৯৯০, বিশ্বসাহিত্য

কেন্দ্র, ঢাকা

৯৩. মীর মশাররফ হোসের (সম্পা. মাহবুবুল আলম) : *জমীদার দর্পণ*, ১৯৯৬, বর্ণবিচিত্রা, ঢাকা

৯৪. মুহম্মদ আব্দুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান : *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ১৩৮৯, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা

৯৫. মুহম্মদ নূরুল হুদা : *রবীন্দ্র-প্রকৃতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, ১৩৯৫, মুক্তধারা, ঢাকা

৯৬. মৈত্রেয়ী দেবী : *মংপুতে রবীন্দ্রনাথ*, ১৯৬৭, রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী, কলিকাতা

: *কুটিরবাসী রবীন্দ্রনাথ*, ২০০৮, মুক্তধারা, ঢাকা

৯৭. মোবাশ্বের আলী : *শিল্পীর ভূবন*, ১৯৯৫, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

৯৮. মোবারক হোসেন (সম্পা.) : *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*, ২০১১, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

৯৯. মোহাম্মদ আনসারুজ্জামান : *সাজাদপুরে রবীন্দ্রনাথ*, ১৯৯৫, মুক্তধারা, ঢাকা

১০০. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান : *রবীন্দ্রচেতনা*, ১৯৮৪, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

১০১. যতীন সরকার : *আমার রবীন্দ্র অবলোকন*, ২০১০, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা

১০২. রণেন্দ্রনারায়ণ রায় : *নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ*, ১৯৯৩, এ মুখার্জী এ্যাণ্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

১০৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : *চিঠিপত্র*, প্রথম-অষ্টাদশ খণ্ড, ১৩৯৯, বিশ্বভারতী, কলকাতা

: *ছিন্নপত্রাবলী*, ১৪১১, বিশ্বভারতী, কলকাতা

১০৪. রমেন্দ্রনারায়ণ নাগ : *রবীন্দ্র নাটকে গানের ভূমিকা*, ১৩৮৮, ডি. এম লাইব্রেরী, কলকাতা

১০৫. (ড.) রাধারমণ জানা : *পালিভাষা-সাহিত্য বৌদ্ধদর্শন ও রবীন্দ্রনাথ*, ১৯৮৫, পুস্তক বিপণি, কলকাতা

১০৬. রামেন্দু মজুমদার (সম্পা.) : *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা*, ১৯৮৬, মুক্তধারা, ঢাকা

: *তত্ত্ব ও শিল্পরূপ, নাট্যকলা বিষয়ক প্রবন্ধ সংকলন*, ১৯৯৭, সোসাইটি ফর এডুকেশন ইন থিয়েটার, ঢাকা

১০৭. শঙ্খ ঘোষ (ভূমিকা, অনুবাদ, অনুষঙ্গ) : *ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৩৮০

: *কালের মাত্রা ও রবীন্দ্র নাটক*, ১৯৬৯, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

: *কথার পিঠে কথা*, ২০১১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

১০৮. শফি আহমেদ : *নাট্যকথা : দূর ও কাছের*, ২০০১, ঐতিহ্য, ঢাকা

১০৯. শম্ভু মিত্র : *কাকে বলে নাট্যকলা*, ১৯৯৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

১১০. (ড.) শশিভূষণ দাশগুপ্ত : *টলস্টয় গান্ধী রবীন্দ্রনাথ*, মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা, ১৩৬৯

১১১. শান্তিকুমার দাশগুপ্ত : *রবীন্দ্রনাথের রূপক নাট্য*, বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

১১২. (শ্রী) শান্তিকুসুম দাশগুপ্ত : *বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম এবং প্রাচীন বৌদ্ধসমাজ*, ১৯৯৮, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা

: *রবীন্দ্রনাট্য পরিচয়* (১ম খণ্ড), ১৯৬৩, বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা

১১৩. শান্তিদেব ঘোষ : *গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ভারতীয় নৃত্য*, ১৩৯০, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

১১৪. শামসুল আলম সাঈদ : *নজরুল অনূদিত রুবাইয়াৎ ও অন্যান্য*, ২০০৩, কাগজ প্রকাশন, ঢাকা

১১৫. শিবনারায়ণ রায় : *প্রবন্ধ সংগ্রহ*, প্রথম খণ্ড, ২০১০, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

১১৬. (ডক্টর) শুকদেব সিংহ : *প্রবন্ধ সংগ্রহ*, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

১১৭. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : *রবীন্দ্র-কথাসাহিত্য : উপন্যাস*, ১৯৮১, এ.কে. সরকার অ্যাণ্ড কোং, কলিকাতা

: *রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা*, ১৩৭৩, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, কলিকাতা

১১৮. শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী : *রক্তকরবী ও অন্যান্য*, ২০১২, সুজন প্রকাশনী, কলকাতা

১১৯. সংঘমিত্রা বক্সী (মণ্ডল) : *বাংলা সাহিত্যের আঙ্গিনায় দ্রৌপদী*, ২০০৯, ছায়া পাবলিকেশন, কলকাতা

১২০. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : *বৌদ্ধ ধর্ম্ম*, ১৯০১, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা

১২১. সত্যেন্দ্রনাথ রায় (সম্পাদক) : *রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ*, *শিক্ষাচিন্তা*, *রবীন্দ্ররচনা-সংকলন*, ১৯৮২, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

১২২. সত্যেন্দ্রনাথ রায় : *রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের জগৎ*, ২০০৪, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

১২৩. সন্‌জীদা খাতুন : *রবীন্দ্রনাথ*, *বিবিধ সন্ধান*, ১৯৯৪, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

: *রবীন্দ্রনাথ*, *তাঁর আকাশ-ভরা কোলে*, ২০০৭, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা

১২৪. সফিউদ্দিন আহমদ : *বৃত্তাবদ্ধ রবীন্দ্রনাথ*, ১৯৭৬, বিভাস, ঢাকা

১২৫. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : *আগুন এবং অন্ধকারের নাট্য : রবীন্দ্রনাথ*, ২০০৯, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

: *ঊনিশ বিশের কড়চা*, ১৪০৯, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

১২৬. সাদ কামাল : *রবীন্দ্রভাবনায় নারী ও বিবাহ*, ২০১১,পত্রলেখা, কলকাতা

১২৭. (ড.) সাধনকুমার ভট্টাচার্য : *রবীন্দ্র নাট্যসাহিত্যের ভূমিকা*, ২০০৬, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

: *নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা*, ১৯৬৩, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা

১২৮. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : *প্রবন্ধ সমগ্র*, প্রথম খণ্ড, ২০০৭, বিদ্যা প্রকাশ, ঢাকা

: *ধ্রুপদী নায়িকাদের কয়েকজন*, ২০১২, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা

: *শেকস্‌পীয়রের মেয়েরা*, ২০০৪, ঐতিহ্য, ঢাকা

১২৯. (শ্রী) সীতা দেবী : *পুণ্যস্মৃতি*, ১৩৪৯, মৈত্রী, কলিকাতা

১৩০. সীমারেখা দাস : *নারীবাদী ভাবনায় বঙ্কিমের নারী*, ১৪১৩, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা

১৩১. সুকুমার সেন : *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (তৃতীয় খণ্ড), ১৩৫৩, ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, কলকাতা

: *রবীন্দ্রশিল্পে প্রেমচৈতন্য ও বৈষ্ণব ভাবনা*, ১৩৯৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

: *নট নাট্য নাটক*, ১৯৯১, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা

১৩২. (ডক্টর) সুধীরকুমার নন্দী : *রবীন্দ্রদর্শন অন্বেষণ*, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, কলিকাতা

১৩৩. সুধীর চক্রবর্তী (সম্পা.) : *বুদ্ধিজীবীর নোটবই*, ২০১০, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা

: *নানা রবীন্দ্রনাথের মালা*, ২০১০, পত্রলেখা, কলকাতা

১৩৪. সুনন্দা বড়ুয়া : *বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ উপাখ্যান*, ১৯৯৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

১৩৫. সুবন্ধু ভট্টাচার্য : *রবীন্দ্রনাট্য রাজা, শতবর্ষোত্তর সমীক্ষা*, ২০০৫, বামা পুস্তকালয়, কলকাতা

১৩৬. (শ্রী) সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত : *রবীন্দ্রনাথ*, ১৩৪১, এস. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা

১৩৭. সুরজিৎ দাশগুপ্ত : *দান্তে গ্যেটে রবীন্দ্রনাথ*, ডি.এম. লাইব্রেরী, কলকাতা

১৩৮. (ড.) সুরেশচন্দ্র বন্ধ্যোপাধ্যায় (সম্পা.) : *ভরত নাট্যশাস্ত্র*, ১৯৯০, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা

১৩৯. সুশোভন সরকার : *প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ*, ১৯৮২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

১৪০. সেলিনা হোসেন (প্রকাশক) : *একুশের প্রবন্ধ*, ১৯৯৯, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

১৪১. সেলিম আল দীন : *মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য*, ১৯৯৬, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

১৪২. সৈকত আসগর (সম্পা.) : *বাংলার লোকঐতিহ্য লোকনাট্য*, ১৯৯৯, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

১৪৩. সৈয়দ আকরম হোসেন : *রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস দেশকাল ও শিল্পরূপ*, ১৯৬৯, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

১৪৪. সৈয়দ শামসুল হক : *স্বাদিত রবীন্দ্রনাথ*, ২০১৩, শুদ্ধস্বর, ঢাকা

১৪৫. সৈয়দ শামসুল হক ও রশীদ হায়দার (সম্পা.) : *শতবর্ষের নাটক*, ১৯৯৪, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

১৪৬. সোমেন্দ্রনাথ বসু : *রবীন্দ্র অভিধান* (১ম-৪র্থ খণ্ড), ১৩৭৫, বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা

১৪৭. সৌমিত্র শেখর : *কথাশিল্প অন্বেষণ*, ২০০৬, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা

১৪৮. স্বরোচিষ সরকার : *অস্পৃশ্যতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ*, ২০০৫, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা

১৪৯. হরনাথ পাল : *রবীন্দ্রনাথ ও প্রাচীন সাহিত্য*, ২০১১, এস. ব্যানার্জী এন্ড কোং, কলকাতা

১৫০. হায়াৎ মামুদ : *সাহিত্য কালের মাত্রা*, ২০০৯, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা

: *ভ্রমি বিস্ময়ে, প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ*, ২০০৭, শব্দশৈলী, ঢাকা

১৫১. হায়দার আকবর খান রণো : *রবীন্দ্রনাথ, শ্রেণী দৃষ্টিকোণ থেকে*, ২০১১, গণসংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা

১৫২. হাসান আজিজুল হক : *রচনাসংগ্রহ*, প্রথম-চতুর্থ খণ্ড, ২০০৩, সাহিত্যিকা, ঢাকা

১৫৩. হুমায়ুন আজাদ : *নারী*, ২০০৭, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা

: *রবীন্দ্রপ্রবন্ধ, রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তা*, ১৯৯৯, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা

<u>সহায়ক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধাবলি</u>

১. গোলাম মুরশিদ : রবীন্দ্রনাথের নারী,*প্রথম আলো ঈদসংখ্যা* ২০১১, মতিউর রহমান (সম্পা.) ঢাকা

২. বিশ্বজিৎ ঘোষ : রবীন্দ্র-কবিতায় গৌতম বুদ্ধ : একটি ভিন্নমাত্রিক অনুসঙ্গ, *সার্ধশতজন্মবর্ষে রবীন্দ্রনাথ*, কালি ও কলম, সপ্তম বর্ষ : একাদশ সংখ্যা, ১৪১৭, আবুল হাসনাত (সম্পা.), ঢাকা

৩. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : রবীন্দ্রনাথের নাটকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা এবং বন্ধনের

: সত্য,*সার্ধশতজন্মবর্ষে রবীন্দ্রনাথ*, কালি ও কলম, সপ্তম বর্ষ : একাদশ সংখ্যা, ১৪১৭, আবুল হাসনাত (সম্পা.),

৪. সৌমিত্র শেখর : ঢাকা

চিত্রাঙ্গদা এবং নারীর আত্মমুক্তিসাধনা, *পাণ্ডুলিপি*, বিংশ খণ্ড, ২০০৬, সৌরেন বিশ্বাস (সম্পা.), বাংলা সাহিত্য সমিতি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

: তাসের দেশ : রূপকথার রূপকল্পে সমকাল এবং নেতৃত্ব-

: অন্বেষণ, *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, ত্রয়োবিংশ খণ্ড, ১ম ও ২য় সংখ্যা, জুন ও ডিসেম্বর, ২০০৫, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (সম্পা.), ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট । ৩

রবীন্দ্র-নাট্য তালিকা

১. *বাল্মীকি প্রতিভা* (১৮৮০)

২. *ভগ্নহৃদয়* (১৮৮১)

৩. *রুদ্রচণ্ড* (১৮৮১)

৪. কাল-মৃগয়া(১৮৮২)

৫. *প্রকৃতির প্রতিশোধ* (১৮৮৪)

৬. নলিনী(১৮৮৪)

৭. *মায়ার খেলা* (১৮৮৪)

৮. *রাজা ও রানী* (১৮৮৯)

৯. *বিসর্জন* (১৮৯০)

১০. *গোড়ায় গলদ* (১৮৯২)

১১. *চিত্রাঙ্গদা* (১৮৯৪)

১২. *বিদায় অভিশাপ* (১৮৯৪)

১৩. *মালিনী* (১৮৯৬)

১৪. *বৈকুণ্ঠের খাতা* (১৮৯৭)

১৫. *কাহিনী* (১৮৯৯)

ক. গান্ধারীর আবেদন

খ. পতিতা

গ. লক্ষ্মীর পরীক্ষা

ঘ. ভাষা ও ছন্দ

ঙ. সতী

চ. নরকবাস

ছ. কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ

১৬. *চিরকুমার-সভা* (১৯০৪)

১৭. *হাস্যকৌতুক প্রকাশ* (১৯০৭)

ক. ছাত্রের পরীক্ষা

খ. পেটে ও পিঠে

গ. অভ্যর্থনা

ঘ. রোগের চিকিৎসা

ঙ. চিন্তাশীল

চ. ভাব ও অভাব

ছ. রোগীর বন্ধু

জ. খ্যাতির বিড়ম্বনা

ঝ. আর্য ও অনার্য

ঞ. একান্নবর্তী

ট. সূক্ষ্ম বিচার

ঠ. আশ্রম পীড়া

ড. অন্ত্যেষ্টি-সৎকার

ঢ. রসিক

ণ. গুরুবাক্য

১৮. *ব্যঙ্গকৌতুক প্রকাশ* (১৯০৭)

ক. বিনি পয়সার ভোজ

খ. নূতন অবতার

গ. অরসিকের স্বর্গপ্রাপ্তি

ঘ. স্বর্গীয় প্রহসন

ঙ. বশীকরণ

১৯. *শারদোৎসব* (১৯০৮)

২০. *মুকুট* (১৯০৮)

২১. *প্রায়শ্চিত্ত* (১৯০৯)

২২. *রাজা* (১৯১০)

২৩. *ডাকঘর* (১৯১১)

২৪. *অচলায়তন* (১৯১১)

২৫. *ফাল্গুনী* (১৯১৬)

২৬. *গুরু* (১৯১৭)

২৭. *অরূপরতন* (১৯১৯)

২৮. *ঋণশোধ* (১৯২১)

২৯. *মুক্তধারা* (১৯২২)

৩০. *বসন্ত* (১৯২৩)

৩১. *গৃহপ্রবেশ* (১৯২৫)

৩২. *নটীর পূজা* (১৯২৫)

৩৩. *শেষ বর্ষণ* (১৯২৫)

৩৪. *সুন্দর* (১৯২৫)

৩৫. *শোধবোধ* (১৯২৬)

৩৬. *নটরাজ* (১৯২৬)

৩৭. *রক্তকরবী* (১৯২৬)

৩৮. *শেষরক্ষা* (১৯২৮)

৩৯. *পরিত্রাণ* (১৯২৯)

৪০. *তপতী* (১৯২৯)

৪১. *নবীন* (১৯৩০)

৪২. *শাপমোচন* (১৯৩১)

৪৩. *কালের যাত্রা* (১৯৩২)

৪৪. *চণ্ডালিকা* (১৯৩৩)

৪৫. *তাসের দেশ* (১৯৩৩)

৪৬. *বাঁশরী* (১৯৩৩)

৪৭. *শ্রাবণগাথা* (১৯৩৪)

৪৮. *নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা* (১৯৩৬)

Dhaka University Institutional Repository

৪৯. *যোগাযোগ* (১৯৩৬)

৫০. *নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা* (১৯৩৭)

৫১. *মুক্তির উপায়* (১৯৩৮)

৫২. *স্বর্গে চক্রটেবিল বৈঠক* (১৯৩৮)

৫৩. *নৃত্যনাট্য শ্যামা* (১৯৩৯)